ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি

-(২য় খণ্ড

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

বর্মণ পাবলিশিং হাউস
৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

প্রকাশক—
ব্রজবিহারী বর্মণ
বর্মণ পাবলিশিং হাউস
৭২, হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা

জুন, ১৯৫৩,

পাঁচ টাকা]

কালী-গঙ্গা প্রেস—৪৬।১, বেচুচাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি

মৌর্য্য যুগ

গৌতম বুদ্ধের পরে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতের ইতিহাসের বিশিষ্ট বিবর্ত্তন হইতেছে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের উদ্ভব। এই সময়ে মৌর্য্যদের অধীনে ভারতে একজাতীয়তা প্রাপ্ত সার্ব্বভৌমিক সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। এই সময়ে যখন ম্যাসিডোন-বীর আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করিতে আসেন তখন স্কন্দাবারে একজন ভারতীয় যুবক পলাতকরূপে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইনি মগধের রাজবংশের কোন জারজ সন্তান বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ইঁহার নাম ছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য। মুড়া নাম্নী নীচ জাতীয়া এক স্ত্রীলোকের গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাকে 'মৌর্য্য' নামে অভিহিত করা হইত; এইজন্য তিনি শূদ্র জাতীয় বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু আজকাল কেহ কেহ বলেন যে, তৎকালে 'মোরিয়া' নামে একটি ক্ষত্রিয়কুল ছিল এবং এখনও এই নামে একটি রাজপুত কুল আছে। সম্ভবতঃ এই বংশে অথবা এই বংশের কোন স্ত্রীলোকের গর্ভে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্যই তিনি 'মৌর্য্য' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয় জনশ্রুতি চন্দ্রগুপ্তকে 'শূদ্র' বলিয়াই অভিহিত করিয়াছে। পুরাণে চন্দ্রগুপ্তের গোষ্ঠীকে 'শূদ্র' বলা হইয়াছে। (১)

১। Pargiter—"Purana Text of the Dynasties of the Kali Age" P, 69; প্রাচীন ইউরোপীয়ান লেখক Justin চন্দ্রগুপ্তকে "Man of humble origin" বলিয়াছেন। বৌদ্ধ 'মহাবংশ'ও তাহাই বলিয়াছে।

প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের শ্রেণী-সংগ্রাম যে কিরূপ ভীষণ হইয়াছিল তাহা সাহিত্যের গুটিকতক শ্লোকের সাহায্যে অনুমান করা অপেক্ষা ঐতিহাসিক ঘটনার দ্বারাই বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। আলেকজাণ্ডারের অভিযানের পর যে ঐতিহাসিক নাটক ভারতের রাজনীতিতে অভিনীত হয়, তাহা যথার্থভাবে বুঝিলেই আমরা এই তথ্য সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বলেন, যে-ভারতীয় যুবক স্কন্ধাবারে আলেকজাণ্ডারের আশ্রয় গ্রহণ করেন তিনিই এই বিদেশীয় বীরকে প্রাচ্যের রাজা নন্দের বিপক্ষে অভিযান করিবার জন্য প্ররোচিত করিতেছিলেন। আলেকজাণ্ডার পঞ্জাব জয় করিবার পর শুনিলেন যে প্রাচ্যের মহাক্ষমতাশালী রাজা নন্দ চারি লক্ষ সৈন্য সহকারে তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিতে আসিতেছেন। এমন সময় ম্যাসিডনীয় সৈন্যেরা আর অধিক অগ্রসর হইতে চাহিল না। গ্রীক লেখকেরা বলেন যে তাহারা রণ-ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু কোন কোন নিরপেক্ষ ইউরোপীয় লেখক বলেন যে নন্দের সৈন্যবাহিনীর বহরের কথা শুনিয়াই তাহারা ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় এই পলাতক চন্দ্রগুপ্ত, যিনি তথায় রামায়ণের বিভীষণের ন্যায় জ্ঞাতি ও স্বজাতি এবং স্বদেশদ্রোহিতার লীলাভিনয় করিতেছিলেন, আলেকজাণ্ডারকে বলেন যে নন্দকে প্রজাবর্গ পছন্দ করেনা, সে নীচ-কুলোদ্ভব নাপিতের ঔরসজাত,—এইজন্য সকলে তাহাকে ঘৃণা করে ইত্যাদি।

এই পরাক্রান্ত বংশীয়দের সম্বন্ধে পুরাণে এইরূপ উক্ত আছে: 'শূদ্রার গর্ভজাত ও মহানন্দীর পুত্র মহাপদ্ম (নন্দ) রাজা হইবে এবং সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিবে…ইহার পরবর্ত্তী নৃপতিগণ শূদ্রবংশীয় হইবে… ইনি সমস্ত ক্ষত্রিয়দের উৎপাটিত করিবেন (বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের কথায় 'দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায়' উৎপাটিত করিবেন)…কৌটিল্য নামক

জনৈক ব্রাহ্মণ ইহাদের সমস্ত উৎপাটিত করিবেন...পরে রাজত্ব মৌর্য্যদের হস্তে যাইবে। (২)

শেষ নন্দরাজা কিংবা চন্দ্রগুপ্তের ধমনীতে শূদ্র রক্ত প্রবাহিত ছিল কিনা তাহা ঐতিহাসিকের গবেষণার ও নির্ণের বিষয়বস্তু। কিন্তু মৌর্য্যেরা যে শূদ্র বংশীয় ছিল ইহাই ভারতীয় লেখকেরা বলিয়াছেন। (৩) ব্রাহ্মণদের উপর ঘৃণার জন্য ক্ষত্রিয়দের বৈদিকধর্ম্ম পরিত্যাগ ও পরে রাজা নন্দ হস্তে তাহাদের ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়া এবং শেষে শূদ্রদের সাম্রাজ্য স্থাপন করা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্যে ভারতে একটা ঘোর বিপ্লবের পরিচয় পাই। সংস্কৃত সাহিত্যে একটা প্রবাদ আছে যে মহারাজ নন্দের পর আর বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিল না! এই জনশ্রুতির মধ্যে একটি মহাসত্য নিহিত আছে বলিয়া অনুমান হয়।

ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে সংগ্রাম এবং প্রথমোক্তদের জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ দ্বারা ব্রাহ্মণ শ্রেণী বিশেষভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল এবং ক্ষত্রিয় আধিপত্য ধ্বংস করিবার জন্য যে সবিশেষ চেষ্টান্বিত ছিল তাহা কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' ও তাহার কার্য্যেই প্রকাশ পায়। যখন ক্ষত্রিয়েরা বৈদিকধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল তখন তাহা রক্ষা করিবার জন্য বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণেরা অন্য অস্ত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং কৌটিল্য শূদ্রদেরই সেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। সামশাস্ত্রী মহাশয় বলেন, বৌদ্ধরা তাহাদের সাম্যবাদ-সম্মত ন্যায়, দানশীলতা ও সৌভ্রাত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাহাদের 'ধর্ম্মচক্র' আদর্শানুযায়ী যেমন প্রাচীন সাধারণতন্ত্রীয় অথবা মুষ্টিমেয় লোকের শাসনপদ্ধতির (Oligarchy) ধরণের গভর্ণমেণ্ট (শাসন-ব্যবস্থা) পছন্দ করিত, সেই যুগে তেমন কৌটিল্যের সময়ের ব্রাহ্মণ রাজনীতিকেরা এমন শাসনব্যবস্থা চাহিতে-

---

২। Pargiter—op. cit. p. 69; বিষ্ণুপুরাণ—৪, ২৪।

৩। R. Samasastry—Evolution of Indian Polity, P-144.

ছিল যদ্বারা বৈদিক পুরোহিতসংঘ বিশিষ্ট সুবিধাভোগ করিতে পারিবে ও তজ্জন্ত পূর্ব্বকালের স্থায় কৌমগত কলহ ও ঘৃণা আর থাকিবে না। এই সময়েই ভরদ্বাজ বলেন, সুযোগ পাইলে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরা ক্ষত্রিয় শাসন অপসারিত করিয়া ব্রাহ্মণ কবলিত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে পারে (৪); কিন্তু কৌটিল্য সেইমত গ্রহণ না করিয়া চন্দ্রগুপ্তের স্থায় অসভ্য শূদ্র সর্দ্দারদের (wild chiefs of Sudra origin). রাজারূপে খাড়া করেন। পুরাণ সমূহের মতে মহাপদ্ম নন্দের পর ক্ষত্রিয় কুলসমূহ নির্ব্বংশ হয়। তাহার পর 'পৃথিবীর রাজারা শূদ্র বংশীয় ছিল' (বিষ্ণুপুরাণ ৪, ২৪)। এই বিষয়ে সামশাস্ত্রী বলেন,—ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না যে, বিরুদ্ধবাদী ক্ষত্রিয় রাজাদের হাতে অত্যাচার উৎপীড়নের যন্ত্রণায় বিতাড়িত হইয়া ব্রাহ্মণেরা 'wild chiefs of Sudra descent' অর্থাৎ শূদ্র বংশীয় জঙ্গলী সর্দ্দারদের সাহায্য গ্রহণ করিতে লাগিল। জঙ্গলী কৌমগুলির দলপতিরাও এই সুযোগে অনেক আর্য্যরাষ্ট্রে রাজা হইয়া বসে (৫)। এই লেখকের মতে বিষ্ণুপুরাণে (L. V. 24). উল্লিখিত রাজা বিশ্বস্ফটিকের ব্যাপারটি এই বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের কথা সমর্থন করে। এই রাজার কথা পুরাণ সমূহে এইভাবে বর্ণিত আছে মগধে বীর 'বিশ্বসফাণী' (ভগবত পুরাণে—'বিশ্বস্ফরজি', বিষ্ণুপুরাণে—'বিশ্বস্ফটিক') সমস্ত রাজাদের পরাজিত করিয়া ভিন্ন জাতির লোকসমূহের যেমন কৈবর্ত্ত, পঞ্চক (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মদ্রক, বিষ্ণুপুরাণে যদু, ভাগবতে উভয় নামই আছে), পুলিন্দ এবং ব্রাহ্মণদের রাজা করিবে। তিনি বিভিন্নদেশে এই লোক সমূহকে রাজা করিবেন...ক্ষত্রিয় জাতিকে ধ্বংস করিয়া আর একটি ক্ষত্রিয়জাতি সৃষ্টি করিবেন (৬)। পার্জিটার এই

৪। কৌটিল্য—"অর্থশাস্ত্র" ৫, ৬।

৫। R. Samasastry—Evolution of Indian Polity, Pp. 140—144.

৬। Pargiter—"Purana Text of the Dynasties of the Kali Age" p. 73.

রাজার তারিখ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী বলিয়া বলিতেছেন। বিষ্ণুপুরাণে এই সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে: 'মগধে বিশ্বস্ফটিক নামে একজন রাজা অন্য জাতি সমূহকে (tribes) প্রতিষ্ঠিত করিবেন; তিনি ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস করিয়া জেলে, বর্ব্বর, যদু, পুলিন্দ এবং ব্রাহ্মণদের ক্ষমতায় উন্নীত করিবেন। পদ্মবতী, কান্তিপুর ও মথুরাতে নয়জন নাগ রাজত্ব করিবেন। দেবরক্ষিত নামে একজন রাজা সমুদ্রতীরে একটি নগরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কোশল, ওড্র, পুন্ড্রক, ও আভিরেরা (৭) এবং শূদ্রেরা সৌরাষ্ট্রে, অবন্তী, সুর, আরবুদ মরুভূমি দখল করিবে। শূদ্রগণ, অন্ত্যজগণ ও বর্ব্বরেরা সিন্ধুতীর, দ্বারিকা, চন্দ্রভাগা ও কাশ্মীরে অধীশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে অর্থাৎ রাজত্ব করিবে।'

পুরাণোক্ত এই তথ্যটি এতদিন পর্য্যন্ত ঐতিহাসিকদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করে নাই, তথাপি এতবড় পূর্ণ বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই লিপিবদ্ধ আছে। এই বিশ্বস্ফটিক রাজা কে? (৮)

৭। Pargiter— op. cit. Pp. 73—47.

৮। The Journal of the Bihar and Orissa Research Society—1933: Pp. 42—43 পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জয়সওয়াল তাঁহার 'History of India' C. 150 A. D.—350 A. D. নামক প্রবন্ধে বলেন—"বিশ্বস্ফটিক বা বিশ্বসফানির প্রকৃত নাম বাণস্পর (Vanashpara); ইনি শক সম্রাট কনিষ্কের অধীনে বেনারস প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা (ক্ষত্রপ) ছিলেন। তিনি খৃষ্টীয় ৯০ সাল হইতে ১৩০ সালের মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি স্থানীয় ভারতীয় সমাজকে ব্রাহ্মণশূন্য করিয়াছিলেন; উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের নামাইয়া নিম্নজাতীয় হিন্দু ও বৈদেশিকদের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন। ইনি ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস করিয়া একটি নূতন শাসকজাতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন! ইনি কৈবর্ত্তদের মধ্য হইতে লোক লইয়া একটি নূতন শাসক অথবা রাজকর্ম্মচারীশ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং অস্পৃশ্য পঞ্চকদের মধ্য হইতেও তদ্রূপ কর্ম্মচারী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আবার পঞ্জাব হইতে মদ্রক (মহাভারতের মতে ইহারা ব্রাহ্মণ-বর্জ্জিত; ইতিহাসে ইহাদিগকে জাতিভেদবিহীন কৌম বলে) "চক-পুলিন্দা" অর্থাৎ শক-পুলিন্দ জাতীয় লোক আনয়ন করিয়া বুন্দেলখণ্ড

ইনিই কি চন্দ্রগুপ্ত অথবা কোন কল্পিত ব্যক্তি? ইনি যেই হউন, ইনি যে ভারতের নেপোলিয়ান সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ভিনসেণ্ট স্মিথ্ (৮ক) সমুদ্রগুপ্তকে 'ভারতীয় নেপোলিয়ান' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় এই উপাধি যথার্থভাবে বিশ্বস্ফটিকের প্রতিই প্রযোজ্য হইতে পারে। প্রাচীন রোমীয় হইতে নর্ম্মান পর্য্যন্ত যত বৈদেশিক বিজেতারা 'গল' (ফ্রান্স) দেশ জয় করিয়া তথাকার অভিজাতশ্রেণী সংগঠন করিয়াছিল এবং সর্ব্ব বিষয়ে সুখ সুবিধার অধিকারী হইয়া পরাজিত গল (Gaul) জাতিকে পদদলিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারই বিরুদ্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে অভ্যুত্থান হইয়াছিল উহাকেই 'মহান ফরাসীবিপ্লব', বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই বিপ্লব 'সাম্যে'র নামে প্রাচীন অভিজাতশ্রেণীকে বিলুপ্ত করিয়া নেপোলিয়ানের উত্থানের পথ সুগম করিয়া দেয়। এই অজ্ঞাত-কুলশীল দরিদ্র উকিলের ছেলে ফ্রান্সের সম্রাট হইয়া কৃষককুল হইতে উদ্ভূত লোকদের দ্বারা একটা নূতন অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করে এবং সেই কুলের লোক দিয়া ইউরোপের চারিদিকে নিজের তাঁবেদারী রাজত্ব

ও বিহারের মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহে উপনিবেশন স্থাপন করায়। বাণস্ফর কুষাণ রাজনীতিক প্রণালী তাঁহার শাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। জয়সওয়াল বলেন—"এই বাণস্পরের বংশ এখনও বুন্দেলখণ্ডে আছে; তাহারা নীচ বংশীয় বলিয়া গণ্য হয় এবং রাজপুতদের সহিত বিবাহ করিতে পারে না।" লেখক অনুসন্ধানে জানিয়াছেন 'বণাফর' নামক একটি রাজপুতকুল এই স্থানে বাস করে। তাহারা রাজপুত ছত্রিশ কুলের বহির্গত এবং বিবাহ ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করে। কেহ কেহ বিশ্বস্ফটিককেই হয় মহাপদ্ম নন্দ অথবা চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া মনে করেন। জয়সওয়ালের বাণস্ফর ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী ছিলেন। মহাপদ্ম নন্দ কুষাণদের ন্যায় ব্রাহ্মণ-বিরোধী ও বর্ণাশ্রম-বিদ্বেষী ছিল না। এইজন্য বিশ্বস্ফটিককে বানস্ফর না বলিয়া নন্দকে তাহার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কবি চাঁদ বর্দাইয়ের এবং "আলহাখণ্ড" নামক চারণ-গাথা বর্ণিত মহোবার আলহা ও উদল নামক রাজকুমারদ্বয় বনাফর কুলের লোক ছিলেন। জয়সওয়ালের উক্তির সহিত এই তথ্য মিলে না।

৮ক। Vincent Smith: Early History of India.

সংস্থাপন করে। ইহাতে সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত ইউরোপ ক্ষিপ্ত হইয়া অবশেষে তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করে, এই মহাবিপ্লবের রাজনীতিক দিকে যতটা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল বিশ্বস্ফটিকের বা চন্দ্রগুপ্তের বিপ্লবের রাজনীতিক ক্ষেত্রে ততটাই পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল। বিশ্বস্ফটিক শক ক্ষত্রপ 'বাণস্পর' হইলেও তাঁহার এই মহা বৈপ্লবিক কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণদের পরিকল্পিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এবং পুরুষসূক্তের বর্ণসমূহের উৎপত্তি ও তাহাদের কর্ম্ম বিষয়ে ব্যবস্থাপদ্ধতি বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ শেষোক্ত আর্য্যবর্ণের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী এই বিপ্লবের দ্বারা খুব জোর ধাক্কা পায়। আর এই বিপ্লবের কর্ত্তা শক বাণস্পর হইলেও সে বৌদ্ধ রাজা কণিষ্কের অনুচর ছিল—একথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

যখন প্রাচীন ক্ষত্রিয় অভিজাত শাসকশ্রেণী বিধ্বংস হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র শূদ্র-শাসন প্রবর্ত্তিত হয় এবং কৌটিল্য কর্ত্তৃক একজন জারজ শূদ্র একজাতীয়তা প্রাপ্ত ভারতের প্রথম সম্রাটরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় ও ভারত আন্তর্জাতিক ইতিহাসে স্থান পায়, সেই সময় হইতেই ভারতের সর্ব্বত্র যথার্থ ইতিহাস আরম্ভ হয় বলিয়া পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ নির্দ্ধারণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত আন্তর্জাতিক-খ্যাতি-সম্পন্ন সম্রাট এবং হেলেনিষ্টিক পশ্চিম-এসিয়ার সম্রাট সেলিউকুশের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় (৯)।

৯। চন্দ্রগুপ্তের সহিত সেলিউকুশের বিবাহসূত্রে বন্ধন ঘটনাটি আজকাল গবেষণার বিষয় হইয়াছে। আজকালকার ইংরেজ লেখকগণ চন্দ্রগুপ্ত যে শেষোক্তের কন্যা বিবাহ করিয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ পান না। তাহারা বলেন—গ্রীক লেখকগণ শুধু ইহাই বলিয়াছেন যে তাহাদের মধ্যে একটা "matrimonial alliance" মাত্র হইয়াছিল। কিন্তু কে কাহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। অধ্যাপক মাহাফি বলেন—সেলিউকুশের অন্যান্য স্ত্রীর মধ্যে একজন ভারতীয় রমণী ছিলেন। তাহার উত্তরাধিকারী 'আন্টিওকুশ' পারস্য স্ত্রীর গর্ভজাত। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবার ফলে যখন সেলিউকুশ তাঁহাকে বর্ত্তমান আফগানীস্থান দান করে তখন সেলিউকুশের কন্যাদান

তাঁহার সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমা পারস্যের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বেদোক্ত 'দস্যু, দাস' ও পরবর্ত্তী যুগের শূদ্রেরা যখন ভারতের শাসকরূপে উন্নীত হইল তখন ফ্রান্সের ন্যায় পতিতদের উত্থান (Uprise of th e lowly i, e. the depressed, oppressed & tyrranised and the down-trodden common people) হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অর্থনীতিক ব্যাখ্যার বিবিধ factors-এর মধ্যে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের কলহ একটা কারণ ছিল বলিয়া শূদ্রের এই উত্থান সম্ভব হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এক্ষণে এই বিপ্লব পরবর্ত্তী ইতিহাসে কি প্রকারে কার্য্যকরী হইয়াছিল তাহার অনুসন্ধান করা যাউক।

মৌর্য্যযুগে রাজনীতিক ও সামাজিক গিল্ডগুলির বিশেষ সম্মান ছিল। অর্থনীতিক গিল্ডগুলির বিশিষ্ট অধিকার ছিল এবং বিশিষ্ট সুবিধাও ভোগ করিত। গিল্ডগুলি কতকটা ব্যাঙ্কের কাজ করিত; তাহারা টাকা জমা রাখিতে পারিত (১০)। এই সময়ের উচ্চশ্রেণীর লোকদের জমিদারী-বৃত্তির পরিবর্তে রাজসরকারী বৃত্তি ছিল। তাহারা রাজস্বের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত। ইহা মুসলমান যুগের 'জায়গীর প্রথা'র ন্যায় ছিল। এই সময়ে সরকারী হিসাব রক্ষক গিল্ডগুলির শুল্ক, পেশা ও কর্ম্মের হিসাব সরকারী পুস্তকে নিয়মিতরূপে লিখিয়া রাখা হইত (১১)। এই সময়ে ব্যবসায়ী সংঘগুলি ব্যতীত

করাই সম্ভবপর সত্য বলিতে হইবে। হালে ভিনসেণ্ট স্মিথও এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণে চন্দ্রগুপ্ত সুলুবের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে (৩,২৬,৪২)। কিন্তু এস্থলে কথা উঠিতে পারে যে ভবিষ্যপুরাণে বর্ত্তমানের রাজাদের নামের মত সেলিউকুশের নামটি কি হালেরই প্রক্ষিপ্ত নয়!

১০। J. N. Samaddar—Lectures on the Economic Condition of Ancient India, P. 125.

১১। অর্থশাস্ত্র—৬৯ পৃঃ; S. K. Das—Economic History of India: Pp. 155—175.

যৌথকারবার সমূহ (Joint-stock Companies) ছিল; অর্থশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে (পৃঃ ২৩৫)।

মৌর্য্যযুগের প্রাক্কালের প্রধান পুস্তক হইতেছে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' (কেহ কেহ বলেন কৌটিল্য ও চাণক্য একই ব্যক্তি)। এই পুস্তক আবিষ্কৃত হইবার পর পণ্ডিত মহলে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া যায়। একদিন বৈদেশিকেরা ভাবিতেন—হিন্দুগণ কেবল ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়াই জীবন কাটাইয়াছে। অবশ্য ব্রাহ্মণদের লিখিত পুস্তকসমূহ সেই প্রকার ধারণাও জন্মাইয়া দেয়। কিন্তু কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' আবিষ্কৃত হইবার পর সভ্য-জগতের পণ্ডিতগণ উপলব্ধি করিতেছেন যে, প্রাচীন ভারতীয়েরাও রাজনীতি-বিজ্ঞানের (Political Science) চর্চ্চা করিয়াছেন। কৌটিল্য আরিষ্টটলের (Aristotle) সমসাময়িক এবং উভয়েই দুইটি বিজয়ী সম্রাটের গুরু; উভয়েই প্রাচীনকালের বিভিন্ন দেশ সমূহের গঠনতন্ত্র (constitution) পাঠ করিয়া নিজেদের রাজনৈতিক বিজ্ঞান বিষয়ে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু আরিষ্টটল প্রাচীন গ্রীক 'নগররাষ্ট্র' (City-State) আদর্শের উর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। অন্যদিকে কৌটিল্য ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপয়িতার মন্ত্রণাদাতা ও প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি দেশে একটা গভীর রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব সাধন করিয়াছিলেন। আরিষ্টটল মহাপণ্ডিত হইলেও তিনি তাঁহার গ্রীক-জাতিসুলভ সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। আরিষ্টটলের 'On Politics' পুস্তক তদীয় গুরু প্লেটোর 'Ideal Republic' পুস্তকে প্রচারিত সাম্যবাদের (communism) বিরুদ্ধেই লিখিত হইয়াছিল, এবং উহা একটি 'মত' বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে। পক্ষান্তরে 'অর্থশাস্ত্র' মৌর্য্য সাম্রাজ্যের আইনরূপে গৃহীত হয়; পরে মনুও উহা উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। (১২)

১২। K. P. Jayaswal—The Age of Manu and Jagnavalka.

এই অর্থশাস্ত্রে কি প্রকার রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করা যাউক। প্রবাদ আছে, কৌটিল্য গান্ধার দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কৃষ্ণকায় ও কদাকার (১৩) ছিলেন বলিয়া একদা মহারাজ নন্দ কর্ত্তৃক ভীষণ অপমানিত হন। এই অপমানের প্রতিশোধকল্পে তিনি নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং শূদ্র চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা তিনি নিজ প্রতিহিংসা কামনা পূর্ণ করিলেন। তাহার ব্রাহ্মণাভিমানের ছাপ অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়, অথচ তাহাতে আবার শূদ্রেরও কথঞ্চিৎ সুখ-সুবিধায় ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। আমাদের অনুসন্ধানের প্রথম ও প্রধান বিষয়বস্তু হইতেছে শূদ্র ও পতিতদের সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে কি ব্যবস্থা ব্যবস্থিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ৩য় খণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে: "যে শূদ্র গোলামরূপে জন্মগ্রহণ করে নাই ও সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, এবং জন্ম দ্বারা যে 'আর্য্য' (আর্য্যপ্রাণ) (১৪); তাহাকে তাহার জ্ঞাতিরা বিক্রয় করিলে অথবা বন্ধক দিলে তাহারা ১২ পণ শাস্তি পাইবে; বৈশ্যদের এই প্রকার হইলে ২৪ পণ, ক্ষত্রিয়দের ৩৬ পণ, ব্রাহ্মণদের ৪৮ পণ···ম্লেচ্ছদের মধ্যে এই প্রকারের কার্য্যে দোষাবহ বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু কোন 'আর্য্য' গোলামে

১৩। কোন কোন লেখক তাঁহাকে সুপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আজকালকার মত এই যে "মুদ্রা রাক্ষস" নাটক খৃষ্টীয় ৫০০—৬০০ শতকে লিখিত হয়। অধ্যাপক হরোউইচ বলেন, ইহা মুসলমান আক্রমণের পর লিখিত হয়। (Prof. Horovitch—History of Sanskrit Literature)। 'অর্থশাস্ত্রে'র জার্ম্মান অনুবাদক J. J. Meyer তাহাকে দক্ষিণভারতীয় বলিয়া অনুমান করেন; (Das altindische Buch Vom Welt und Staatsleben: P. L. IV.); Jolly-রও এই মত।

১৪। জয়সওয়াল ও জয়চন্দ্র নারঙ্ (ভারতীয় ইতিহাস কী রূপরেখা দ্রষ্টব্য) 'আর্য্যপ্রাণ' শব্দটির এক অদ্ভুত নরতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ইহারা বলেন, যে শূদ্রের শরীরে আর্য্যরক্ত আছে, সেই 'আর্য্যপ্রাণ' এবং এই মিশ্রিত রক্তের লোকই এই আর্য্যের সুবিধা ভোগ করিত। কিন্তু মায়ার 'আর্য্যপ্রাণ' অর্থে 'আর্য্য' বলিয়াছেন।

পরিণত হইতে পারে না।" (১৫) তিনি আবার বলিতেছেন, "যে নিজেকে গোলামরূপে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে এরূপ ব্যক্তির পুত্র একজন 'আর্য্য' হইবে (১৬)। "যে পরিমাণ টাকার জন্য একজন গোলামে পরিণত লইয়াছে, সেই টাকা প্রত্যর্পণ করিলে সেই গোলাম পুনঃ তাহার 'আর্য্যত্ব' ফিরিয়া পাইবে" (১৭)। "যাহারা গোলামরূপে জন্মিয়াছে কিম্বা বাঁধা দিয়া (pledged) গোলাম হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেও উক্ত আইন খাটিবে।" (১৮) কৌটিল্যের আইনে গোলামের পুত্র 'আর্য্য', অর্থাৎ স্বাধীন নাগরিকত্ব প্রাপ্ত হইবে; এই ব্যবস্থায় জগতে আমরা তাঁহাকে একটা নূতন রীতি প্রবর্ত্তন করিতে দেখি। পৃথিবীর সর্ব্বত্র আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে যে গোলামের ছেলে গোলাম হয়। কৌটিল্যের পূর্ব্বে ভারতীয় আইন-ব্যবস্থাপকদের পুস্তকে দাসের পুত্র স্বাধীন হওয়ার কোন বিধি-ব্যবস্থা উল্লিখিত হইতে দেখা যায় না। অর্থশাস্ত্রে বিবাহ বিষয়ে কতগুলি নূতন আইন দৃষ্ট হয়—যেমন, কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মন্দ চরিত্রের লোক হইলে বা রাজদ্রোহী হইলে অথবা স্ত্রীর জীবনকে বিপজ্জন করিলে বা জাতিচ্যুত কিম্বা ক্লীব হইলে, তাহার স্ত্রী উক্ত স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারে (৩য় অধ্যায়)। আবার কৌটিল্য বিবাহ-বিচ্ছেদের (divorce) ব্যবস্থা যাহা অন্য কোন আইনকারকদের দ্বারা প্রদত্ত হয় নাই—[কারণ প্রথামত যে-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে তাহা কখনও বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না (৩,৩)] তাহাও দিয়াছেন (১৯)। তবে তিনি বলেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণার ভাব থাকিলে এই বিচ্ছেদে "মোক্ষ" (divorce) হইতে পারিবে; এতৎসঙ্গে তিনি 'নিয়োগপ্রথা'ও অনুমোদন করিয়াছেন। কৌটিল্য ব্রাহ্মণের শূদ্রাস্ত্রী গ্রহণেও অনুমতি

১৫। R. Shamasastry; Kautilya's Arthasastra,—Pp 222—223.

১৬-১৮। R. Samasastry; op. cit.—P. 224.

১৯। Kane—History of Dharmasastra, Pp. 96—97

দিয়াছেন। (২০) পুনঃ জজের অনুজ্ঞায় নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারিবে বলিয়াছেন।

এই আইন দ্বারা আমরা ভারতের ইতিহাসে একটি বড় তথ্য পাইলাম—শূদ্রের 'আর্য্যত্ব' প্রাপ্তি। এই আইনে 'আর্য্য' শব্দটি নরতত্ত্ব-বাচক নহে, রাজনীতিবাচক বলিয়া প্রতীত হইতেছে। এই আইনের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, মৌর্য্য সাম্রাজ্যের স্বাধীন বা মুক্ত প্রজারা সকলেই 'আর্য্য' বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদের রচিত পুস্তক সমূহে বর্ণিত কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন শ্রেণীর লোকই 'আর্য্য' বলিয়া গণ্য হইত; এখন তৎপরিবর্ত্তে সকলশ্রেণীর স্বাধীন লোকই 'আর্য্য' বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। শূদ্রদের পক্ষে ঐতিহাসিক চন্দ্রগুপ্তের বিপ্লবের ইহাই হইতেছে প্রকৃত খাঁটি লাভ! ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণদের শ্রেণী-সংগ্রামের ফলে শূদ্রেরা এই লাভ পায়! কৌটিল্যের অন্যান্য আইনের সর্ত্তাদি অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে তিনি ব্রাহ্মণকে চারিবর্ণের স্ত্রীলোক বিবাহ করিবার অনুমতি দিয়াছেন; কিন্তু ব্রাহ্মণের তাহার স্ববর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণী স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র সম্পত্তির অধিকাংশ ভাগ (৪ অংশ) পাইবে। তাঁহার আইনে প্রতিলোম বিবাহের সন্তানগণ নিন্দনীয় হইয়াছে, কারণ রাজারা স্বধর্ম্ম ভঙ্গ করিলে ইহারা উৎপন্ন হয়। ইহার অর্থ কি এই নয় যে, যে-সব রাজা ব্রাহ্মণ্য পদ্ধতি ভঙ্গ করিয়া উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকের সহিত নিম্নবর্ণের পুরুষের বিবাহের অনুজ্ঞা প্রদান করে তখনই প্রতিলোমজ সন্ততি সৃষ্ট হয়; তজ্জন্য ইহা খুব বিপ্লবী মত বলিয়াই কি নিন্দনীয় হইয়াছে? (২১) ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইতেছে যে,

২০। Kane op. cit. Pp. 96—97. 'অর্থশাস্ত্র': ৩—৪ খণ্ড, ২য় ও ৪র্থ অধ্যায়।

২১। ব্রাহ্মণ্যবাদীয় পুস্তকসমূহে প্রাচীনকালের বেণ রাজার কথা উল্লেখ আছে এবং তাহাতে তাঁহাকে গালিগালাজ করা হইয়াছে। ইনি নাকি প্রজাদিগকে বাধ্য করিয়াছিলেন যেন তাঁহাকে ব্যতীত অপর কোন দেবতার উপাসনা করা না হয় এবং

কোন ব্রাহ্মণেতর লোক অরক্ষিত ব্রাহ্মণ শ্রেণীর স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস করিলে সে আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবে।শূদ্রের বেলায় দণ্ড হইবে তাহাকে মাদুরে জড়াইয়া পোড়ান। (২২)

কৌটিল্যে আমরা ব্রাহ্মণদের দাবী পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকিতে দেখিতে পাই; তবু এই আইনের ফলে শূদ্রদের জীবন কতকটা ধারণোপযোগী হয়; শূদ্রেরা নাগরিক অধিকার লাভ করে। তবে ইহার মধ্যেও একটা ব্যবধান (প্রভেদ) করা হইয়াছিল, অর্থাৎ property qualification দ্বারা নাগরিকত্ব পাওয়া যাইত। গোলাম নয় সেইরূপ 'আর্য্য', অর্থাৎ যে অর্থনীতিক ব্যাপারে স্বাধীন, এইজন্য ভাল অবস্থার লোক —সে শূদ্র হইলেও 'আর্য্য'! সে আর্য্যের অধিকার পাইবে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের গণতন্ত্রের (Democracy) যুগেও আর্থিক আয়ের উপরই একজনের নাগরিক অধিকার লাভ নির্ভর করিত! রোমের একজন প্রলেটারিয়েটেরও আড়াইশত পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি থাকিলে সে রোমের নাগরিকত্বের অধিকার পাইত (২৩)। তদ্রূপ কৌটিল্যের আইনে অর্থনীতিক ক্ষেত্রে একজন স্বাধীন পুরুষ 'আর্য্য' বলিয়া পরিগণিত হইত! 'আর্য্য' হইলে যে সেই ব্যক্তি কতকগুলি অধিকার ও সুবিধা ভোগ করিতে পাইত তাহার প্রমাণ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৮২ শ্লোকে পাওয়া যায়: 'কোন গোলামের টাকা ঠকাইলে অথবা সে আর্য্য বলিয়া

সমাজে বর্ণভেদ উঠাইয়া দিয়া অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন করিয়াছিলেন। এতদ্বারা আমরা প্রাচীনকালের দুইটি তথ্য পাই: যথা—প্রথম বেণ নিজেকে Man-God-রূপে প্রচার করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়তঃ তিনি একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। পুরাণে বর্ণিত আছে যে ব্রাহ্মণেরা বেণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তাহাকে হত্যা করে। ব্রাহ্মণেরা তাহাকে বিকৃত ভাবেই চিত্রিত করিয়াছে।

২২। Arthasastra—pp. 283—285.

২৩। H. G. Wells—Outlines of History; P 390.

যে সুবিধাসমূহ ভোগ করে তাহা হইতে বঞ্চিত করিলে (আর্য্যভাব অপহরন্ত), একজন আর্য্যের জীবনকে গোলামীতে পরিণত করিলে যে জরিমানা হয় তদূর্দ্ধ জরিমানা প্রবঞ্চকের প্রতি শাস্তি বিধান হইবে। (২৪) অবস্থাপন্ন শূদ্র পতিতেরা যদিবা কিছু সুবিধা ভোগ করিতে পাইল, তবে যথার্থ দরিদ্র ও পতিতেরা পূর্ব্বের ন্যায়ই সামাজিক নির্য্যাতন ভোগ করিতে লাগিল। কৌটিল্যের বিধানে জাতিচ্যুত লোকেরা বা তাহাদের বংশধরেরা কোন সম্পত্তির বখরা পাইবে না, সূত, মাগধ, ব্রাত্য এবং রথকারদের বেলা সম্পত্তি উপযুক্ত বংশধরদের অর্শাইবে; চণ্ডালেরা পূর্ব্ববৎ নির্য্যাতীত হইত। কৌটিল্যের শূদ্রদের প্রতি এইরূপ নরম গরম ব্যবহারের ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, হয় বৌদ্ধদের হাত হইতে শূদ্রদের রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের 'আর্য্যত্ব'রূপ ঘুস দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল অথবা চন্দ্রগুপ্ত পতিত শূদ্রকুলোদ্ভব ছিলেন না। (২৫) শূদ্র রাজত্বে শূদ্র পূর্ণমুক্তি পাইল না কেন? উপরোক্ত প্রশ্নের মধ্যে কোন্‌টি সত্য তাহা অনুসন্ধানের বস্তু। উল্লেখযোগ্য যে জয়সওয়ালের মতানুসারে চন্দ্রগুপ্তের মাতা 'মোরিয়' ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভবা ছিলেন। কিন্তু অন্যত্র তাহাকে শূদ্রা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি হয় চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকের রাজত্বকালে। যদি চন্দ্রগুপ্তকে সম্রাট করিয়া ব্রাহ্মণেরা নিজেদের আধিপত্য একচেটিয়া করিয়া রাখিবার

২৪। Arthasastra—P 223.

২৫। J. J. Meyer বলেন, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সৃষ্টি প্রকরণ এবং চাতুর্ব্বর্ণ বিধান সবই রাখিয়াছেন; কিন্তু তিনি শূদ্রকে 'আর্য্য' বলিয়াছেন। মায়ারের মতে দুই এক জায়গায় শূদ্রের প্রতি যে কঠোর শাস্তিবিধানমূলক শ্লোক আছে, সেগুলি যে প্রক্ষিপ্ত তাহা বেশ পরিষ্কারই বুঝিতে পারা যায়। ডক্টর কালিদাস নাগ ("Les theories diplom de l' Inde ancienne et l' Arthasastra") 1923, P. 116. এবং অন্যান্যেরা বলেন, অর্থশাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত অংশ অনেক আছে। Meyer—P. XXXIV–LIV.

চেষ্টা করিয়া থাকে, তবে অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম (২৬) গ্রহণ করিয়া তাহাদের সেই আশায় ছাই দেয়। অশোক বৌদ্ধ হইয়া একটি অনুশাসনে (Fifth pillar—Edict Delhi Topra) (২৭) যজ্ঞে জীবহিংসা নিষেধ করিয়া দেন। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে (২৮), এই অনুজ্ঞা সমগ্র ব্রাহ্মণশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়; ব্রাহ্মণদের নিকট ইহা বিশেষ দূষণীয় ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ ইহা একজন শূদ্র রাজার হুকুম। অপর দুইটি অনুশাসনে (Sahasram and Rupnath Edict) (২৯) অশোক খুব জাঁক করিয়া বলিয়াছিলেন,—যাহারা পূর্ব্বে পৃথিবীতে দেবতা বলিয়া মান্য হইতেন, তাহাদের তিনি মিথ্যা দেবতায় পরিণত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীর মতে ইহার অর্থ—যাহারা 'ভূদেব' (ব্রাহ্মণ) বলিয়া সম্মান ও পূজা পাইত তাহাদিগকে তিনি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর অশোক ধর্ম্ম-মহামাত্র, অর্থাৎ নীতি-পর্য্যবেক্ষণের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণদের অধিকার ও সুবিধা ভোগের উপর হস্তক্ষেপ করেন (২৯ক)। ইহা ছাড়া তিনি তাঁহার কর্ম্মচারী-বৃন্দের উপর এই মর্ম্মে এক কড়া হুকুম দেন যে তাহারা যেন বিচারকালে "দণ্ড সমতা" ও "ব্যবহার-সমতা" প্রদর্শন করে (ইঙ্গিতভিয়ে

২৬। অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহার অনুশাসনগুলিতে তাহা স্পষ্টভাবে বিবৃত আছে। The Rupnath Rock Inscriptionএ তিনি নিজেকে "শাক্য" (বৌদ্ধ) বলিয়াছেন। The Maski Rock Inscription-এ নিজেকে তিনি বুদ্ধ শাক্য বলিয়াছেন।] The Sahasram Rock Inscription-এ তিনি নিজেকে Lay worshipper (উপাসক) বলিয়াছেন। এই বিষয়ে Hultzsch : Inscriptions of Asoka C.I.I. PpXLiii—XVI দ্রষ্টব্য।

২৭। C. I. I. Vol. I. Ed. by Hultzch.

২৮। H. P. Sastri: Journal of the Asiatic Society of Bengal —1910, p. 259.

২৯। H. H Kern—Manual of Indian Buddhism 113; C.I.I. Vol. I

২৯ক। C.I.I. Vol. I. South Rock Pillar, Delhi Topra.

ভিহিএসা কিংতিভিয়োহাল সমতা চ সিয় দণ্ডসমত চা) (৩০)। এতদ্বারা আইনে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা আইনের যে-সব অসুবিধা ভোগ করিত তাহা অশোক শোধরাইয়া দেন। ইহা হইতে বোধগম্য হয় যে শূদ্রগণ এখন রাষ্ট্রে ও আইনে সাম্য ব্যবহার পায় এবং উহারও নীচের পতিতশ্রেণীর লোকেরা আইনের সমানাধিকার ভোগ করিতে পায়। এতদ্বারা জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্মে অশোক সাম্য স্থাপন করেন। এই সাম্য ব্যবহার ব্রাহ্মণদের নিকট অতি অসহ্য ও আপত্তিজনক ঠেকিতেছিল, কারণ এই নববিধানে 'ব্রাহ্মণেরা অবধ্য ও মৃত্যুদণ্ডের অতীত' এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়।

শাস্ত্রিজী ও জয়সওয়ালের মতে ব্রাহ্মণদের প্রতিক্রিয়ার ফলে মৌর্য্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। জয়সওয়াল এই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে এই ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন (৩১): অশোকের প্রপৌত্র বৃহদ্রথের রাজত্বকালে বাহ্লিকের হেলেনিষ্টিক রাজা মিনানডার (ইহাকেই বৌদ্ধপুস্তক মিলিন্দাপহ্নে উল্লিখিত রাজা বলিয়া ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন) ভারত আক্রমণ করিয়া সাকেত (বর্ত্তমান অযোধ্যা) পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছেন, তখনও রাজা বিদেশী শত্রুকে বিতাড়িত করিবার কোন উদ্যোগ করেন নাই; কারণ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ অশোক বলিয়া গিয়াছেন, প্রেম দ্বারাই জয় করিতে হইবে "ধর্ম্মচরণেণ ভেরীঘোসো অহো ধর্ম্মঘোসো...(৩২)"। এই অবস্থায় জনৈক ব্রাহ্মণ বলেন, (৩৩) "কেবল মোহাত্মারাই বলে, যে প্রেমদ্বারা শত্রুজয় করিবে," অর্থাৎ আহাম্মকেরাই প্রেমদ্বারা শত্রুজয় করিতে চায়। ব্রাহ্মণদের মৌর্য্যশাসনের প্রতি বিদ্বেষের ইহা একটি পরিচয় (৩৪)। এই কালেই একদিন পাটলিপুত্র নগরে রাজসৈন্যের কুচকাওয়াচের সময় ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র রাজাকে

৩০। C. I.I. Fourth Pillar Edict Delhi—Topra. p125.

৩১। Jayaswal—Age of Manu and Jaynavalka.

৩২। C.I.I. vol I. Fourth Rock Edict, Girnar Pp. 6-7.

৩৩। 'গার্গী সংহিতা দ্রষ্টব্য।

হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করে। ব্রাহ্মণ-প্রতিক্রিয়া এই সময় হইতেই আরম্ভ হয়। এই সময়ে বৌদ্ধশাসন ভঙ্গ করিয়া রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণাধিপত্য প্রথম (৩৫) বিবর্ত্তিত হয়, আর এই সময়েই "মানবধর্ম্মশাস্ত্র" বা "মনুস্মৃতি" পুনঃ সঙ্কলিত বা নূতনভাবে লিখিত হয়। জয়সওয়ালের ও জলির (৩৬) মতে এই স্মৃতি পাটলীপুত্রে সুমতী ভার্গব নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। মানবধর্ম্মশাস্ত্রে অনেক মত আছে যাহা জয়সওয়ালের মতে পুষ্যমিত্রের কার্য্যাবলীর পোষকতা করিয়া লিখিত হইয়াছে। পুষ্যমিত্র রাজহন্তা (Regicide), এইজন্য মানবধর্ম্মশাস্ত্রে (৭, ২৭, ২৮, ১১১) কি প্রকার অবস্থায় অথবা কি প্রকার চরিত্রের রাজা বিনষ্ট হয় তাহার বর্ণনা আছে। জয়সওয়াল বলেন, রাজহন্তা পুষ্যমিত্রের কার্য্যের পক্ষে ওকালতি করিবার জন্য মানবধর্ম্মশাস্ত্রে এই সকল যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। এই স্মৃতিতে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন এবং শূদ্রের প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতিসমূহে শূদ্রবিদ্বেষ এত প্রবল ছিল না—ইহা আমরা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছি। কৌটিল্যে কর্ম্মবিশেষে শূদ্রকে মাদুর জড়াইয়া জীবন্ত দগ্ধ করিবার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু মনুস্মৃতি বা মানবধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে এই ধারণা জন্মে যে, ইহা যেন শূদ্রের প্রতি বিশিষ্টভাবেই ক্ষিপ্ত! মনুর মতে, শূদ্র বিচারকের পদ পাইতে পারে না (৮, ২০); রাজ্য শূদ্রবহুল, নাস্তিকতাক্রান্ত এবং দ্বিজশূন্য—সেই রাজ্য অচিরেই দুর্ভিক্ষ ও বহুবিধ ব্যাধি-প্রপীড়িত হইয়া বিনষ্ট হইয়া থাকে (৮, ২২)। এই পুস্তকে প্রথমে ব্রাহ্মণকে শূদ্রকন্যা স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে (৩, ১২—১৩); কিন্তু পরে উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে (৩, ১৪—১৯)। এই পুস্তকে 'নিয়োগ-প্রথা'

---

(৩৫) এই বিষয়ে B. N. Datta—Brahmanical Counter-Revolution in J. B. and O. R. S. vol. XXVII, 1941, pt. 11 দ্রষ্টব্য।

৩৬। Jolly—Recht and Sitte. P. 21.

সমর্থিত হইয়াছে (৯, ৫৯—৬৩) ; কিন্তু পরক্ষণেই আবার দ্বিজজাতির মধ্যে উহা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে (৯, ৬৪—৬৯)। এই সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, গোলাম স্ত্রীলোকের পুত্র তাহার মনিবের হয় ; কারণ তাহাদের উৎপাদিত সন্ততি তাহাদের প্রতিপালকেরই হয় (৯, ৫৫)। এইস্থলে মনু বলিতেছেন, যেমন গরু ঘোড়া প্রভৃতির বাচ্চা ইহাদের মালিকদেরই হয়, তেমনি দাসীর পুত্র তাহার মালিক প্রতিপালকেরই হয়। এতদ্বারা গোলামের ছেলে 'আর্য্য' হয়—অর্থশাস্ত্রের এই অনুজ্ঞা মানবধর্ম্মশাস্ত্রে প্রত্যাহার করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন অশোকের দণ্ড-সমতাও প্রত্যাহার করা হয়। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা নিম্নশ্রেণীর লোকদের উপর অত্যাচার করিলে দণ্ড কম হইবে, কিন্তু বিপরীত ঘটনাক্ষেত্রে দণ্ড অধিক হইবে—এই আইন পুনঃপ্রচলিত হয়। কিন্তু শূদ্রের প্রতি মনুর জীঘাংসা-প্রবৃত্তি চরমে উঠিয়াছে বলা যাইতে পারে যখন তিনি বলিতেছেন, নাম এবং জাতি তুলিয়া শূদ্র যদি দ্বিজ জাতির উপর আক্রোশ প্রকাশ করে, তবে একটি জলন্ত দশ অঙ্গুলী পরিমিত লৌহ শঙ্কু উহার মুখে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য (৮, ২৭১) ; দর্পের সহিত শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ দেয় তাহা হইলে রাজা তাহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করাইবেন (৮, ২৭২) ; শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠ জাতির প্রতি কোন প্রকার হিংসামূলক কার্য্য করে তাহা হইলে তৎকৃত অপরাধের জন্য হস্ত বা পদচ্ছেদ, পাছা কাটিয়া দেওয়া অথবা ওষ্ঠাধর ছেদন করা প্রভৃতি হইবে (৮, ২৭৯-২৮৩)! আইনের দিক দিয়া দাস আবার বঞ্চিত হয় ; কারণ মনু বলিতেছেন, "ব্রাহ্মণ বিশ্রব্ধচিত্তে দাস-শূদ্রের ধন আত্মসাৎ করিতে পারেন ; কোন জিনিসই তাহার নিজস্ব নহে। তাহার সমুদয় অর্থই ভর্তৃহার্য্য" (৮,৪১৭)।

এতদ্বারা গোলাম তৈজসপত্রের ন্যায় (Chattel] বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। মানবধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার একটা বিকৃত (morbid) মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুস্তকে শ্রেণী-সংগ্রামের

জন্য শ্রেণী-বিদ্বেষ কত ভীষণরূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্নোক্ত অনুজ্ঞা দ্বারাই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। কোন্ প্রকারের কন্যাকে বিবাহ করা যাইতে পারে সেই বিষয় বর্ণনাপ্রসঙ্গে মনু বলিতেছেন, "মস্তকের কেশ পিঙ্গল বা রক্তবর্ণ...যাহার চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ (৩৭)—এইরূপ কন্যাকে বিবাহ করিতে নাই (৩১৮)—ইতিহাসাদি কোন বৃত্তান্তে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের বিপদকালেও শূদ্রাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণের কোন কথা নাই (৩, ১৪)।" কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা শূদ্রাভার্য্যা গ্রহণ করিয়াছে এবং মনুর পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রকারেরা তাহার ব্যবস্থাও দিয়াছেন। রাজাদের কয়েকটি ধর্ম্মের মধ্যে "...প্রজাপালন এবং ব্রাহ্মণের সেবা করা রাজাদিগের মঙ্গল-দায়ক হয়" (৭, ৮৮)। রাজা অর্থাভাবে মরণাপন্ন হইলেও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে কখনও কর গ্রহণ করিবেনা (৭, ১৩৩)। অন্যদিকে রাজা কারুশিল্পী, শিল্পকর, দাস-দাসী অথবা যাহারা কেবলমাত্র শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে তাহাদের দ্বারা রাজা মাসিক একদিন নিজকার্য্য করাইয়া লইবেন (৭,১৩৮)। এই প্রকারে পতিতগণের শোষণ (exploitation) করিবার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইল। আদালতে কে কে সাক্ষ্য দিবার যোগ্য সেই বিষয়ের আলোচনাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, —'দাস', লোকবিগর্হিত ব্যক্তি, দস্যু, নিষিদ্ধ কার্য্যকারী ব্যক্তি, চণ্ডালাদি নীচজাতি প্রভৃতি লোকদিগকে অথবা এক ব্যক্তিকে সাক্ষী করিবে না (৮, ৬৬)। মনু নির্দ্দিষ্ট চরিত্রবিশিষ্ট সাক্ষী যখন আদালতে সাক্ষ্য দিবার জন্য শপথ করিবে তখন ব্রাহ্মণকে 'বল', ক্ষত্রিয়কে 'সত্য করিয়া বল', বৈশ্যকে 'গো-বীজ ও সুবর্ণ দ্বারা শপথ করিয়া বল', ও শূদ্রকে 'সমুদয়

---

(৩৭) যাঁহারা ভারতীয় আর্য্যদের Nordic বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বর্ণ-ভেদ (Caste-System) সমর্থন করেন, তাঁহারা মনুর উক্তি হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে, blond beauty ভারতীয়দের আদর্শ নয়; তাহা হইলে ভারতীয় আর্য্যের নর্ডিক (Nordic) উৎপত্তি কোথা হইতে সম্ভব হয়?

পাতকের শপথ করিয়া বল'—বর্ণ-বিশেষে প্রাড়বিবেক সাক্ষীদিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবেন (৮,৮৮)। এইরূপে আমরা দেখি যে, আদালতে শপথ গ্রহণের সময়ও শ্রেণী-বৈষম্য ফুটাইয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শূদ্রকে শপথ গ্রহণ করাইবার জন্য আরও কড়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, যথা : "শূদ্রকে অগ্নি-পরীক্ষা, জল-পরীক্ষা কিম্বা স্ত্রী-পুত্রাদির শির:স্পর্শরূপ পরীক্ষা করাইবে" (৮,১৪৪)। এতদ্বারা শূদ্রের কথা সত্য কিনা তাহা নিরূপণ করিবার জন্য trial by ordeal ব্যবস্থা হইল। অর্থনীতিক ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও বৈষম্য প্রতিষ্ঠা করা হয় : যথা, "উত্তমর্ণ ব্রাহ্মণ অধমর্ণের নিকট শতকরা দুই পণ, ক্ষত্রিয়ের নিকট তিন পণ, বৈশ্যের নিকট চারি পণ এবং শূদ্রের নিকট পাঁচ পণ হিসাবে প্রতিমাসে সুদ লইতে পারেন" (৮, ৪২)। এইস্থলে দেখা যায় যে, সুদ দেওয়ার ব্যাপারে উপরের শ্রেণীগুলিকে নিম্নশ্রেণীদের অপেক্ষা অধিক সুবিধার অধিকারী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। আবার ব্রাহ্মণ ব্যভিচার করিলে প্রাণান্তিক দণ্ড না হইয়া ব্রাহ্মণের মস্তকমুণ্ডন দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে—ইহাই বিধান; কিন্তু অন্যান্য বর্ণসমূহের প্রাণদণ্ড হইতে পারে (৮,৩৭৮—৩৭৯)। এতদ্ব্যতীত পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্রাহ্মণের প্রতি পক্ষপাতিত্বের চূড়ান্ত নিদর্শন করা হইয়াছে, যথা :—সকল পাপের পাপী হইলেও ব্রাহ্মণকে কদাচ বধ করিবে না (৮, ৩৮০)। রাজা কাহার দ্বারা কোন্ কার্য্য করাইয়া নিবেন তাহাতে বলা হইয়াছে—"পরন্তু ক্রীত হউক কিম্বা অ-ক্রীত হউক, শূদ্রের দ্বারা তিনি দাস্যকর্ম্ম করাইয়া লইবেন। কারণ, বিধাতা দাস্যকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। শূদ্র স্বামী (master) কর্ত্তৃক বিমুক্ত হইলেও দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হয় না। দাসত্ব কর্ম্ম তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। অতএব কে তাহাকে উহা হইতে মুক্ত করিতে পারে" (৮,৪১১—১৪)? এই প্রকারে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় পদ্ধতিতে শূদ্রকে চিরঅভিশপ্ত হইয়া থাকিবার ব্যবস্থা হইল। আর কৌটিল্য যে

দাসের পুত্র "আর্য্য" বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন উহা প্রত্যাহার করা হয় যখন সাত প্রকারের দাসের মধ্যে গৃহস্থ দাসীর পুত্র, পৌত্রাদি ক্রমাগত দাস গোলামের মধ্যে নির্দ্ধারিত হয় (৮,৪১৫)। ইহাতে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, দাস বা দাসীর পুত্র, অথবা বংশধর পুরুষানুক্রমে দাস হইবে—জন্ম হইতেই সে গোলাম হইবে। আবার এই দাস কোন ধন রাখিতে পারিবে না— উহা তাহার মনিবের হইবে (৮,৪১৬)। এতদ্বারা গোলামকে আবার তৈজসপত্রের (Chattel) ন্যায় করা হইল!

এইপ্রকারে শ্রেণী-বৈষম্য জীবনের সকল বিভাগেই ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিয়া বিষয়সম্পত্তি বিভাগকালে বলা হইতেছে—"ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্রমশঃ বিবাহিত চারিবর্ণের স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদিগের প্রাপ্য বিষয় বিভাগ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে: ব্রাহ্মণ তিন অংশ (ব্রাহ্মণী-গর্ভজাত ব্রাহ্মণের সন্তান খাঁটী 'ব্রাহ্মণ'), ক্ষত্রিয়া-সূত দুই অংশ; বৈশ্যাসূত দেড় অংশ এবং শূদ্রা-সূত একাংশ প্রাপ্ত হইবে (৯,১৪৯—১৫১)। ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে (১৫৩) যে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা কৌটিল্য-প্রদত্ত ব্যবস্থার সহিত মিলে। এই আইনে যেমন উচ্চশ্রেণীর দাবীর পরিচয় পাওয়া যায় তদ্রূপ অপর এক শ্লোকে উচ্চশ্রেণীর রক্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। স্বপত্নী শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতা পারশব নাম্নী কন্যা যদি অপর ব্রাহ্মণকে বিবাহ করে এবং তাহার কন্যাকে যদি অপর ব্রাহ্মণ বিবাহ করে এবং এইরূপ ব্রাহ্মণ-সংসর্গ যদি ধারাবাহিকভাবে সাতপুরুষ পর্যন্ত হয়, তাহা হইলে সপ্তম পুরুষে ঐ পারশবাখ্য বর্ণ (৩৮) বীজের উৎকর্ষতার জন্য ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়; এবং এইক্রমে যেরূপে শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়, তদ্রূপ

৩৮। হিট্‌লারের অধীনে জার্ম্মাণীতে এই প্রকারের একটি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। সেখানে কোন লোকের ধমনীতে ইহুদী রক্ত থাকিলে সে পতিত ও নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইত। কিন্তু যাহার ধমনীতে এই প্রকারে ইহুদী রক্ত থাকা সত্ত্বেও পুনঃ

ব্রাহ্মণেরও শূদ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটে; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ জানিবে" (১০, ৬৪—৬৫)। এতদ্দ্বারা আমরা এই বুঝি যে, উচ্চশ্রেণীর রক্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে; মনুর ভাষায় "সুবীজ সতত প্রশংসিত হইয়া থাকে" (১০,৭২)—উক্ত অভিমতটি নিম্নোক্ত শ্লোক দ্বারা আরও সুস্পষ্ট করা হইয়াছে; "ব্রাহ্মণের অনার্য্যা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান এবং অনার্য্যের ব্রাহ্মণী-গর্ভজাত সন্তান—এতদুভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, ব্রাহ্মণের অনার্য্যা গর্ভোৎপন্ন সন্তান পাক-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানযুক্ত হইলে সবিশেষ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়; কিন্তু অনার্য্যের ব্রাহ্মণী-গর্ভজাত সন্তান স্বভাবতঃ নিশ্চয়ই অপকৃষ্ট হইয়া থাকে" (১০,৬৬-৬৭) (৩৯)।

ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের দাবী রাজনীতিক্ষেত্রে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে; ক্লাসিক্যাল বা তৎপূর্ব্ব যুগের ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের শ্রেণী-সংগ্রামকালীন ব্রাহ্মণদের দাবীসমূহ মনু ব্রাহ্মণ সম্রাটের শাসনকালে পুনরায় উপস্থাপিত করিয়া বলিয়াছেন: "রাজা অতিশয় বিপদাপন্ন হইলেও কখন ব্রাহ্মণের কোপ জন্মাইবেন না; কারণ ব্রাহ্মণেরা কুপিত হইলে সবলবাহন রাজ্যকে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিতে পারেন অবিদ্বানই হউক আর বিদ্বানই হউক

যদি ক্রমাগত তিন পুরুষ খাঁটী জার্ম্মাণ রক্ত প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে সে আবার নাগরিকত্ব ফিরিয়া পাইবে। ইহা শ্রেণীগত বীজের শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকার পরিচায়ক। এই বিষয়ে Goldberg—The Jewish Problem দ্রষ্টব্য।

৩৯। মনুর উক্ত শ্লোকের 'অনার্য্য' শব্দের কুল্লূকভট্ট অর্থ করিয়াছেন—'শূদ্র'। কিন্তু 'অনার্য্য' হইলেই 'শূদ্র' হয় না—এই ব্যাপারটি ইতিপূর্ব্বে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। Buehler 'অনার্য্য' শব্দটির মানে করিয়াছেন—'Non-Aryan'; এই অর্থ ঠিক নহে। Jones ইহার মানে করিয়াছেন—'base-man' ও 'base-woman'। 'অনার্য্য' শব্দ 'নীচ', 'হীন' এবং 'ব্রাহ্মণ-বিরোধী'; কাজেই জোনসের প্রদত্ত অর্থই এস্থলে ঠিক বলিয়া মনে হয়।

ব্রাহ্মণ মহাদেবতাস্বরূপ" (৯,৩১৩,৩১৭)। এইস্থলে আমরা আবার উপরোক্ত যুগের দাবীগুলির প্রতিধ্বনি .শুনিতে পাই!

মনুতে শূদ্রের দুরবস্থার চূড়ান্ত হইয়াছে যখন শূদ্র ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে গেলে তাহার কাণে তপ্ত তৈল ঢালিয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে (৮, ২৭২), আর ব্রাহ্মণের দাবীর চূড়ান্ত হইয়াছে যখন মনু বলিতেছেন, "সনাতন বেদশাস্ত্র সকল ভূতকে ধারণ করিতেছেন। জ্ঞানিগণ ইহাকে মানুষের পুরুষার্থ সাধনের পরম উপায়স্বরূপ মনে করেন। সৈনাপত্য, রাজ্য, দণ্ড প্রদান, নেতৃত্ব এবং সর্ব্বলোকাধিপত্য. বেদশাস্ত্রজ্ঞই এই সকল পাইবার উপযুক্ত" (১২,৯৯,১০০)। এইস্থলে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, কেবল বেদ-শাস্ত্রজ্ঞই এই সকল পদ পাইতে পারে, অন্য লোকে নয়। ইহা দ্বারা কি রাজদ্রোহী বৌদ্ধ মনিবের প্রতি বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্রের নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতা ঢাকিবার জন্য বৈদিকধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণের দাবী এত উচ্চে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে? জয়সওয়াল বলেন, এই শ্লোকে পুষ্যমিত্রকে উল্লেখ করা হইয়াছে (৪০)। সর্ব্বশেষ, এই পুস্তকে আর একটি বিশেষ তথ্য পাই। মনু বলিতেছেন," রাজা বালক হইলেও সামান্য মনুষ্যবোধে তাঁহাকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়; পরন্তু তিনি মহান্ দেবতা, মনুষ্যরূপে অবস্থান করিতেছেন" (৭, ৭, ৮)। এইস্থলে ভারতীয় রাজনীতি-বিজ্ঞানে আমরা একটি নূতন অনুষ্ঠান প্রচারিত হইতে দেখি—Divine Right of King। রাজা ভগবানের প্রতিভূ, তিনি Man-God—এই মত আমরা পূর্ব্বে ভারতীয় সাহিত্যে পাই না, কিন্তু মনুতেই ইহা প্রথম পাই। প্রাচীন ঈজিপ্ত, ব্যাবিলন ও রোমের রাজত্বকালে যেমন রাজা হয় ভগবানের অবতার বা প্রতিভূ এই ভাবটি লক্ষ্য করি এবং মধ্য-যুগের ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাবকালে এই মত দেখিতে পাই,

৪০। Jayswal—Age of Manu and Jagnavalka. Kane—History of Dharmasastras.

ভারতে ও মনুতে আমরা এই মত পাইতেছি। ইহা হইতে আমরা এই হৃদয়ঙ্গম করি যে, সমাজে শ্রেণী-বিভেদ যত পাকাপোক্ত হইয়া স্থাণুবৎ হইতে লাগিল ততই উচ্চশ্রেণীর রক্তের বিশুদ্ধতা প্রচারিত হইতে লাগিল, কাহার সহিত বৈবাহিক আদান-প্রদান ও সামাজিক আহার-বিহারাদি চলিবে—এইসব ব্যাপারে বিধিনিষেধও প্রবর্ত্তিত হইয়া ক্রমশঃ পাকাপোক্ত হইতে লাগিল। প্রাচীন গ্রীস, রোম ও মধ্যযুগের ইউরোপের অভিজাত শাসনের যুগেও আমরা এই অনুষ্ঠান দেখিতে পাই। এই অবস্থায় সেই সকল দেশসমূহে পতিতরা পোষাক বা বাহ্য চিহ্নের বিভিন্নতা দ্বারা স্বাধীন ও উচ্চবর্ণের নাগরিকদের সহিত নিজেদের পার্থক্য ও প্রভেদ প্রদর্শন করিত। মনুতেও আমরা পতিতদের জন্য সেই ব্যবস্থা দেখিতে পাই। ভারতের শ্রেণীসমূহ যত বনিয়াদি স্বার্থ বিবর্ত্তিত করিয়া নিজেদের স্থাণুবৎ অচল করিতে লাগিল ততই উচ্চশ্রেণীর রক্তের বিশুদ্ধতা, জন্মের পবিত্রতা, আচার ব্যবহারের নানাপ্রকার বিভিন্নতা ও দাবীসমূহ উদ্ভূত হইতে লাগিল। শেষে আসিল Divine Right of King (রাজার ঐশিক ক্ষমতা বা অধিকার) মতবাদ। এইসব দ্বারা আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারি যে, ভারতীয় সমাজ সামন্ততান্ত্রিক যুগে প্রবেশ করিয়াছে।

মানবধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ও শূদ্র এবং পতিতদের প্রতি বিশেষ কঠোর ব্যবস্থা দেখিয়াই জয়সওয়ালের অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয় যে, মৌর্য্য-সাম্রাজ্য ভাঙ্গিবার পর ব্রাহ্মণাধিপত্যের সময় ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিয়া এই পুস্তক লিখিত হয়। এই মানবধর্ম্মশাস্ত্র বা মনুস্মৃতির উপরে আমাদের অধিক সময়ক্ষেপ করিতে হইতেছে; কারণ, এই পুস্তক ব্রাহ্মণ্যবাদীয় হিন্দুদের সমাজ-পদ্ধতি সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক পুস্তক। এতৎব্যতীত ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি বৌদ্ধদেশসমূহেও মনুস্মৃতি হইতে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সেই সকল দেশের আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে।

(৪১)। ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির ইতিহাসে কৌটিল্য, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য—এই তিনটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ-নির্দ্দেশক খুঁটি। এইস্থানে মনু আবার প্রামাণিক, যদিচ, যাজ্ঞবল্ক্য আইন বঙ্গদেশ ব্যতীত সমগ্র হিন্দু সমাজে গৃহীত হইয়াছে। জয়সওয়ালের মতে রাষ্ট্রীয় আইন বিষয়ে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রামাণিক আইন গ্রন্থ; মনু যে উহা সম্পূর্ণ উল্টাইতে পারেন নাই, সম্পত্তি বণ্টন বিষয়ে আমরা তাহা দেখিয়াছি; কিন্তু দাস-শূদ্রের আর্য্যত্বরূপ মুক্তি এবং অশোকের দণ্ড ও ব্যবহার-সমতা মনু উঠাইয়া দিয়া ভেদ ও বৈষম্যপূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। এই পুস্তকপাঠে পাঠকের দুইটি বিষয় বিশেষ করিয়া চোখে পড়িবে—ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ও শূদ্রের বিষম দুরবস্থা। এক্ষণে কথা এই, মানবধর্ম্মশাস্ত্রে শূদ্রের এত দুর্দ্দশা করাইল কেন? নারদস্মৃতিতে উক্ত আছে যে, আদিপুরুষ মনু ১০০,০০০ শ্লোকের একটি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। নারদ ইহাকে ১২,০০০ শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করেন; ভৃগুর পুত্র সুমতী ইহাকে পুনঃ ৪,০০০ শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করেন। মনুর এই সংক্ষিপ্তসারই সমাজে এখন প্রচলিত আছে (৪২)। এই সংবাদটি প্রথম স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্ আবিষ্কার করেন। পণ্ডিতেরা বলেন, এই মনুস্মৃতিতে দুইটি স্তর আছে; সেই জন্যই এত পরস্পর-বিসম্বাদী মতসমূহ পাশাপাশি রহিয়াছে (৪৩)। প্রচলিত সংকলনটিই সর্ব্বশেষ সঙ্কলন বলিয়া গৃহীত হয়। ইহাতেই শূদ্রবিদ্বেষ ও ব্রাহ্মণের রাজত্ব করিবার অধিকার প্রভৃতি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। জয়সওয়ালের মতে সুমতী ভার্গব নামক জনৈক ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে পাটলী-পুত্রে বাস করিত এবং সে-ই এই শূদ্র-বিদ্বেষপূর্ণ এবং পুষ্যমিত্রের কার্য্যের

৪১। Jolly—"Recht and Sitte."

৪২। Jolly—op. cit. P. 21.

৪৩। Kane—History of Dharmasastras; Jolly—Recht and Sitte, P. 21.

ওকালতি করিয়া মনুস্মৃতির শেষ সঙ্কলন করে। পুষ্যমিত্রের অধীনস্থ রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ-প্রতিক্রিয়ার চিহ্নও এই পুস্তকে পাওয়া যায়ঃ যথা, "বেদ-বিরুদ্ধ-মার্গাবলম্বী, বর্ণান্তর বৃত্তিজীবী, বিড়ালব্রতী, বেদশাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন, বেদ-বিরুদ্ধ তার্কিক ও বকব্রতী—ইহাদিগকে বাক্যদ্বারাও অর্চ্চনা করিবে না। পরন্তু অন্নদানে নিষেধ নাই" (৪,৩০)। এই শ্লোকের টীকায় কুল্লূকভট্ট "পাষণ্ডিনো" অর্থে "শাক্যভিক্ষু ক্ষপণকাদয়ঃ" বেদ-বিরুদ্ধ মার্গাবলম্বীদের বুঝিয়াছেন।

মানবধর্ম্মশাস্ত্রের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-প্রমাণাদি দ্বারা জয়সওয়াল যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এখনও সর্ব্বজনসম্মত না হইলেও অসমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। মানবধর্ম্মশাস্ত্রের রচনাকাল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে বলিয়া কানে ধার্য্য করিয়াছেন (৪৪)। জয়সওয়াল পুষ্যমিত্রের রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ১৮৪ সাল বলিতেছেন। উভয়েই অন্ধ্র-শতবাহন বংশের শাসন সময়ের পূর্ব্বে এই পুস্তকের শেষ সংকলনের তারিখ নির্দ্ধারণ করিতেছেন। এই কারণেই আমরা ইহাতে বেদ-বিরুদ্ধ বৌদ্ধদের এবং শূদ্রদের বিরুদ্ধে এতটা ক্ষিপ্ত হইতে দেখি। এই পুস্তকের তারিখ নির্ণয়কালে জয়সওয়াল বৌদ্ধ ও শূদ্র এক অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু কথা এই—সকল শূদ্রগণই কি বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-বিরোধী হইয়াছিল? ইহা সত্য না হইতে পারে, কিন্তু মৌর্য্যেরা বৌদ্ধ ও শূদ্র দুই একাধারে ছিল বলিয়া প্রতিক্রিয়াশীল বিপ্লব (orthodox counter-revolution) যুগে (৪৫) প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ লেখকেরা শূদ্রগণের প্রতি এত ক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই বিষয়ে শেষ কথা এই যে, মনুসংহিতা রাষ্ট্রমান্য আইনপুস্তক বলিয়া কখন গৃহীত হয় নাই—ইহাই জয়সওয়ালের অভিমত। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়ার সময় হইতে যে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য

৪৪। Kane—History of the Dharmasastras, P, 194.

৪৫। Jayaswal—Pp. 40-41.

আরম্ভ হয়ঃ ব্রাহ্মণ প্রথম বর্ণ, ব্রাহ্মণ রাজা হইতে পারে, ব্রাহ্মণ দেবতা ইত্যাদি—যে সামাজিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, যাহার জের আজ পর্য্যন্তও হিন্দুসমাজে চলিতেছে, 'মানবধর্ম্মশাস্ত্র' তাহার index-রূপে আজও ব্রাহ্মণদের দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে। আর একটি তথ্য কৌটিল্য ও মনু পাঠে আমরা অবগত হই,—যে শ্রেণীর হস্তে শাসনযন্ত্র আছে রাষ্ট্রের আইন প্রভৃতি সকল ব্যবস্থাও সেই শ্রেণীর সুবিধানুযায়ী সৃষ্ট ও বিধিবদ্ধ হয়। পুষ্যমিত্রের রাজত্বাধীন রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণাধিপত্যের প্রথম যুগ; রাষ্ট্রীয় আইন তখন সেই শ্রেণীর সুবিধানুসারে সৃষ্ট হয়।

মৌর্য্য-সাম্রাজ্য যথার্থ-ই ব্রাহ্মণ-প্রতিক্রিয়ার ফলে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল কিনা সেই বিষয়ে ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় সন্দেহ করেন। তিনি বলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের মত এই যে, অশোকের দণ্ড-সমতা ও ব্যবহার-সমতা এবং ব্রাহ্মণদের 'অবধ্যতা' রদ হওয়ায় তাহারা মৌর্য্য শাসনের বিরুদ্ধবাদী হইয়াছিল—তাহা সত্য নয়; কারণ, পূর্ব্বেও স্থল-বিশেষে ব্রাহ্মণ প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছে; সাহিত্যেই তাহার উল্লেখ আছে। কুরু-পাঞ্চালের যেসব ব্রাহ্মণেরা পলাইয়া জনকের সভায় গিয়াছিল তাহাদের কাছে ব্রাহ্মণের 'অবধ্যতা' অজ্ঞাত ছিল! বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩,৯,২৬) উল্লিখিত আছে যে, একজন ব্রাহ্মণ তার্কিক যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় মস্তকচ্যুত হইয়াছিল (৪৬)। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে (Vedic Index. II P. 84.) বর্ণিত আছে যে, মনিবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলে পুরোহিতের মৃত্যুদণ্ড হইতে পারে। আবার কৌটিল্যে (BK.IV. Ch XI.P.229) আছে যে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে ব্রাহ্মণকে জলে নিমজ্জিত করিয়া দিবে। এই সকল দৃষ্টান্ত প্রয়োগে শ্রীযুক্ত

৪৬। বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই দৃষ্টান্ত এখানে খাটে না। যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তর্কে সাকল্যের মস্তক পতিত হওয়ার গল্প (৩।৯।২৬) রাজার আদেশে হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ নাই।

রায়চৌধুরী বলেন যে, অশোকের বংশধরগণের সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার শক্তি ছিল না ; তাহারা ভেরীঘোষ অপেক্ষা ধর্ম্মঘোষ অধিক শ্রবণ করিয়াছিলেন (৪৭)।

শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী ব্রাহ্মণের বধ্যতার যে সকল উদাহরণ দিয়াছেন তাহা ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের শ্রেণী-সংগ্রামের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের উদাহরণ বলিয়া মনে হয়। কৌটিল্য মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন ; কাজে কাজেই, ব্রাহ্মণের বধ্যতা মানিয়া লইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরীর যুক্তি জয়সওয়ালের "Age of Manu and Jagnavalkya" নামক পুস্তক প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল। তাহাতেও ধর্ম্মঘোষ শ্রবণে বৃহদ্রথের ধ্বংস হয় বলিয়া বর্ণনা রহিয়াছে, কিন্তু তাহা মুখ্য কারণ নয়। কি সুবিধা পাইয়া পুষ্যমিত্র নিজের রাজত্ব সংস্থাপন করিতে পারিল তাহাই হইতেছে মুখ্য কারণ। বৌদ্ধ আন্তর্জ্জাতিকতার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় জাতীয়তাবাদ গ্রীক মেনানডারের আক্রমণ সময়ে লোকের নিকট অধিক কার্য্যকরী হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় এবং মনোভাবের এই পরিবর্ত্তনের একটি উপায় ছিল ব্রাহ্মণশ্রেণীর অসন্তোষ। এইজন্যই পুষ্যমিত্রের রণভেরী অধিক ফলপ্রদ হইয়া ব্রাহ্মণাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে (৪৮)।

বৌদ্ধবিপ্লবের স্বরূপ কি ছিল আজ তাহা কেহই সঠিক নির্দ্ধারণ করিতে

৪৭। H. C. Roy Choudhury—Political History of Ancient India. Pp. 245—250.

৪৮। শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরীর পুস্তকের সমালোচনায় মিঃ বার্ণেট স্বীকার করিয়াছেন—'Brahmanical influences cannot be ignored.' এই প্রকারের অভিমত ৬. Bhima Sankar Raoও প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার নিম্নলিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য : "Evolution of the Brahmanical Hierarchy in Ancient India"—Historical Research Society, vol.IV. pts. 1-4. 1930. p. 28.

পারেন না। কাহারও কাহারও মতে বৌদ্ধধর্ম্ম চাতুর্ব্বর্ণাশ্রম সমাজ-পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া একটা সাম্যবাদীয় নূতন সমাজ সংগঠন করিয়াছিল। পতিতেরা বুদ্ধ-প্রচারিত সাম্যবাদের বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজ-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল। সমাজের বেশীর ভাগ লোক এই প্রকারে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া গিয়াছিল। এইজন্যই বোধ হয় কৌটিল্য শূদ্রকে "আর্য্যত্ব" প্রদান করেন। আবার মনুর শূদ্রের প্রতি এত ক্রোধের কারণ শূদ্রকে হাতে রাখিবার জন্য অথবা শূদ্র রাজার শাসন প্রচলন হওয়ায় শূদ্রসাধারণকে রাজনীতিক অধিকার প্রদান করা হয়; তজ্জন্য মৌর্য্যদের অধীনে শূদ্র নবধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। যখন দেশের অধিকাংশ লোক বুদ্ধের ধর্ম্মঘোষ শ্রবণ করে তখন পুরোহিত ডাকাইয়া যাগযজ্ঞ করে কে? শূদ্রাধিপত্যের সময়ে ব্রাহ্মণের বনিয়াদী স্বার্থে বিশেষ আঘাত লাগে; তাই ব্রাহ্মণ-শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে মনু শূদ্রকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য তাহার (শূদ্র) বিরুদ্ধে এত কড়া বিধিনিষেধ প্রণয়ন ও বিধিবদ্ধ করেন। ফিক্ বলেন, বৌদ্ধপ্লাবন ভারতীয় সমাজকে ভাঙ্গে নাই; লোকে একই সমাজ-পদ্ধতির মধ্যে থাকিত, তবে তাহারা বিভিন্ন ধর্ম্মমত গ্রহণ করিত। তাঁহার মতে, ভারতীয় সমাজে প্রাচীন শ্রেণী-সঙ্ঘগুলি একই বিবর্ত্তনের ধারা ধরিয়া ক্রমশঃ বর্ত্তমান জাতিতে পরিণত হয়। বৌদ্ধ-বিপ্লব জাতিভেদ ভাঙ্গে নাই। সাম্য শাস্ত্রীয় মতে বৌদ্ধদেবের আক্রমণের ফলে ব্রাহ্মণেরা নিজেদের আহার ও বিহার বিষয়ে বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্য গণ্ডীবদ্ধ হইয়া জাতিতে (Caste) পরিণত হয় এবং অন্যান্য শ্রেণীরাও এই প্রথার নকল করিয়া জাতিতে বিবর্ত্তিত হয় (৪৯)। কিন্তু কোন যুক্তিই সম্পূর্ণ সত্য নহে। ইহা সত্য যে, বৌদ্ধেরা মুসলমান অথবা খৃষ্টানদের ন্যায় ভারতে পৃথক সমাজ সংগঠন করে নাই। তাহারা একই আইনে বিধিবদ্ধ ও ব্যবস্থিত

৪৯। S. Sastry—Pp. 40—41।

সমাজে বাস করিত। ভারতে তাহাদের পৃথক আইন ছিল না। বৌদ্ধদের Civil Law ব্রাহ্মণ্যবাদীয়দের সহিত এক বলিয়াই পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেছেন; কারণ, তাহাদের আলাদা আইন-পুস্তক আজ পর্য্যন্তও আবিষ্কৃত হয় নাই। ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বিদেশী বৌদ্ধেরাও প্রাচীন মনুস্মৃতি হইতে আইন গ্রহণ করিয়াছে। তবে যে সব ধর্ম্মবিষয়ক আইন দ্বারা সঙ্ঘ ও ক্রিয়াকাণ্ডাদি পরিচালিত হইত তাহা পৃথক ছিল। বোধহয় ভারতে নব-বৌদ্ধগণ(Nec-Ruddhists), যেমন—বৈষ্ণবপন্থী, কবীরপন্থী, নানকপন্থা প্রভৃতি যাহা আজ পর্য্যন্তও অনুসরণ করিতেছেন প্রাচীন বৌদ্ধেরাও তাহাই করিতেন। উদাহরণতঃ, একদল সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ সংঘারামে গিয়া ভিক্ষু হইত; একদল মন্ত্রাদি গ্রহণপূর্ব্বক দীক্ষিত হইয়া সমাজেই গৃহস্থরূপে অবস্থান করিত; কিন্তু নানাকারণে জাতি ভাঙ্গিয়া (বাঙ্গালার জাতবৈষ্ণবদের ন্যায়) পৃথক সমাজ সংগঠন করিবার প্রথার দৃষ্টান্ত নাই। পরবর্ত্তী সময়ে সহজযানী নেড়ানেড়ীর ন্যায় বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায় স্থাপিত হইয়াছিল এবং তাহাতে বৌদ্ধদের বিবাহাদি ব্যাপারে কোন প্রকার জাতি বা বর্ণভেদ ছিলনা; ইহারা কিন্তু ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের লইয়া সংঘটিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সমাজের বাহিরে একটা বৌদ্ধ-সমাজ সংগঠিত ও বিধিবদ্ধ হইবার প্রমাণ লামা তারানাথ প্রভৃতির বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধধর্ম্ম যে শূদ্র ও পতিতদের আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ এবং উভয় ধর্ম্মের নেতাদের মধ্যে যে প্রবল রেষারেষি ও সংঘর্ষ বিদ্যমান ছিল তাহারও যথেষ্ট এবং প্রচুর সাক্ষ্য-প্রমাণাদি আছে। অপরপক্ষে বৌদ্ধরাজাদের বর্ণাশ্রমের পরিচালক ও আশ্রয়স্থল বলা হইয়াছে। (৫০)

৫০। গৌড়লেখমালা—দেবপালদেবের "মুঙ্গের লিপি", পৃঃ ৪১-৪৪; ৩য় বিগ্রহপালদেবের "আমগাছি লিপি", পৃঃ ১২৬।

এক্ষণে বিচার্য্য-বিষয় এই যে, বৌদ্ধধর্ম্মের দান কি? বৌদ্ধধর্ম সাম্যবাদের সুমহান বাণী প্রচার করে। এইজন্য বৌদ্ধেরা সাম্যবাদকে প্রথমে ধর্ম্মজীবনে কার্য্যকরী করিবার জন্য চেষ্টা করে; সংঘারাম সমূহে কমুনিজম্ প্রচলিত ছিল—ধর্ম্মে শ্রেণী, বর্ণ বা মূলজাতীয় কোন পার্থক্য বা প্রভেদ করা হইত না। এই বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবেই আন্তর্জ্জাতিক ছিল। বৌদ্ধপ্রধানদেশসমূহে এই লক্ষণ এখনও বিরাজমান। কিন্তু সমাজে এই সাম্যবাদ কি প্রকারে প্রয়োগ করা হইত? অশোক একজন বৌদ্ধ সম্রাট; তাঁহার অধীনে একটি বিরাট আমলাতন্ত্র ছিল। এই বৌদ্ধরাষ্ট্রে সামাজিক স্তরভেদ বেশ ভালভাবেই বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধ-পরিচালিত এই রাষ্ট্রে সামাজিক সাম্যবাদ বিবর্ত্তন করিবার পক্ষে কোন প্রচেষ্টার পরিচয় আমরা ইতিহাসে পাই না। অর্থনীতিক সাম্য সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুব্যবস্থিত না হইলে সামাজিক সাম্যও হয় না,—এই সত্য মানবসমাজ তখনও উপলব্ধি করে নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম ধর্ম্মক্ষেত্রে জাতিভেদ (Caste System) ভাঙ্গিয়া দেয়, কিন্তু শ্রেণীভেদ (Class System) কোথাও ভাঙ্গিতে পারে নাই। তবে সম্রাট অশোকের আইনসমূহ হইতে ইহা হৃদয়ঙ্গম হয় যে, দণ্ড ও ব্যবহার-সমতা প্রভৃতি দ্বারা রাষ্ট্রে সকলকে এক আইনাধীন করতঃ এক রাজনীতিক সাম্যের উদ্ভব ও বিবর্ত্তনের প্রয়াস ও প্রচেষ্টা চলিতেছিল। হয়ত মৌর্য্য-সাম্রাজ্য আরও অধিককাল স্থায়ী হইতে পারিলে রোমীয় সম্রাট জাস্টিনিয়ান যেমন সর্ব্বপ্রকার ও সর্ব্ব-মূলজাতীয় প্রজাদের আইন দ্বারা রোমীয় প্রজার অধিকার প্রদান করতঃ রাজনীতিক্ষেত্রে সকলকে এক করিয়াছিল, ফরাসী-বিপ্লব যেমন সর্ব্ব-ফরাসী নাগরিককে রাজনীতিক সাম্য প্রদান করিয়াছিল, তদ্রূপ একটা রাজনীতিক সাম্য (political democracy) অভিব্যক্ত করিতে পারিত। কিন্তু পুষ্যমিত্রের অধীনে ব্রাহ্মণ্য-প্রতিক্রিয়ার ফলে তাহা বিনষ্ট হইয়া ভারতের রাজনীতিক

ও তজ্জন্য সামাজিক পদ্ধতি ভিন্ন পথে চালিত হয়। বহু পরে যখন পাল রাজাদের অধীনে বৌদ্ধধর্ম্ম পুনঃ পূর্ব্ব-ভারতে (মগধ ও বঙ্গ) রাজার ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আবার সেই সুযোগ আসিয়াছিল; কিন্তু এই সময়ের রাষ্ট্র সামন্ততন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই রাষ্ট্রের বৌদ্ধধর্ম্মও মহাযান-পন্থা উদ্ভূত করিয়া স্থানীয় আচার ও কুসংস্কারসমূহের সহিত আপোষ-রফা করিয়াছে; সেই বৌদ্ধধর্ম্ম পুরাপুরি বৈপ্লবিক নয়। তখন বাঙ্গালার ব্রাহ্মণেরা পাল রাজাদের উপহাস করিয়া বলিত—"বলাইত সাম্যবাদী, বিবাহ করিত ছত্রিশ-জাতি, ভূমিপ হইলে হইতে চায় ক্ষত্র, রাজন্য বলে বলায় যত্র তত্র।" কাজেই সাম্যবাদ সমাজে প্রতিষ্ঠা করিবে কে? তবে বুদ্ধ একটা এমন সংঘপ্রণালী (Organizational System) (৫১) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন যাহা আজ পর্য্যন্ত হিন্দুর অস্থি-মজ্জায় রহিয়াছে—ইহা হইতেছে বর্ত্তমানের ইউরোপীয় অ্যানার্কিষ্ট নামধারী সাম্যবাদিগণের গঠন-পদ্ধতির (Anarchist-Communist Organizational System) ন্যায়। ইহার অর্থ, প্রত্যেক সংঘ নিজের সংঘারাম মধ্যে কমুনিষ্ট সাম্যবাদ মানিয়া চলে, অর্থাৎ খাওয়া, থাকা ও অর্থাদি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপেই কমুনিষ্ট (এই সম্পর্কে ইহা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা ধর্ম্মের ভিত্তিতে সংস্থাপিত হইয়াছিল)। কিন্তু প্রত্যেকটি সংঘারাম অপরটি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন। উভয়ের উপরে কোন

৫১। Dr, R. C. Mazumder—Corporate Life in Ancient India & Dr. Narayan Chandra Banerjee—Development of Hindu Polity and Political Theories, Part I. P. 260 দ্রষ্টব্য। মজুমদার বলেন, এই সময় অন্যান্য ধর্ম্মগুরুদের সংঘ বুদ্ধ সংঘ হইতে more democratic ছিল। কতকগুলি সংঘে গোলামদের গ্রহণ করা হইত, কিন্তু বুদ্ধের সংঘে তাহা হইত না।

সংঘ বা একটা নেতৃমণ্ডলী ছিল না, উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে স্বয়ং বুদ্ধ তাহা মিটাইতেন। এই পদ্ধতিতে কোন কেন্দ্রীয় সভা (Central body) ছিল না। এইজন্য বৌদ্ধ-ধর্ম্মমণ্ডলী বিচ্ছিন্নভাবে থাকিত এবং তদ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায় উদ্ভব হইবার সুযোগ পাইত কিন্তু পরস্পরের মতানৈক্য মিটাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে Council (৫২) আহ্বান করা হইত। এই প্রকারের সংঘ বা ধর্ম্মমণ্ডলী গঠনপ্রণালী বুদ্ধের সময়ে অন্যান্য ধর্ম্ম-পন্থাতেও প্রচলিত ছিল। এতদ্বারা আমরা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে, ভারতীয় মস্তিষ্ক কেন্দ্রীভূত হইয়া কার্য্য করিবার বিপক্ষে চিরকাল পরিচালিত হইয়াছে। এই বিশাল দেশের জনগণকে একটা সংঘাধীনে আনয়ন করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্র হইতে পরিচালনা করিবার প্রচেষ্টা কখনও হয় নাই। এই জন্যই ভারতীয় সমাজ আজ শতধা বিভক্ত; এই জন্যই হিন্দু-সমাজে এত অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলা। কেবল রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতকে এক-কেন্দ্রীভূত করিবার চেষ্টা বার কতক হইয়াছিল; তাহার ফলে মৌর্য্য ও গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় এবং সাময়িকভাবে রাজনীতিক একজাতীয়তা সংস্থাপন হয় কিন্তু এই কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ভারতের জাতীয় জীবনে সর্ব্ববিষয়ে মাৎস্যন্যায় চিরকাল কার্য্যকরী হইয়াছে (৫৩)। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতীয় জীবনে ও সমাজে অর্থনীতিক সাম্যবাদ আনয়ন করিতে পারে নাই বলিয়াই অন্তর্হিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। মৌর্য্যযুগে শিল্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে "শ্রেণী" (Guild) সংগঠিত হইতে দৃষ্ট হয় এবং অর্থনীতিক ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস গঠিত হইতে দেখা যায়।

৫২। Dr. R. C. Mazumder—Corporate Life in Ancient India.

৫৩। ইউরোপের খৃষ্টীয় সমাজ অনুরূপ পদ্ধতির ঠিক বিপরীত দিকে কার্য্য করিয়াছে। খৃষ্টীয় মণ্ডলী পোপের (Pope) অধীনে দৃঢ়ভাবে কেন্দ্রীভূত। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের আমলাতন্ত্রের অনুকরণে খৃষ্টান চার্চ্চ নিজেকে সংগঠন করে। এইজন্যই ইউরোপ আজ এত প্রবল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রাহ্মণ্য-প্রতিক্রিয়ার যুগ

মৌর্য্যযুগের পর ব্রাহ্মণ্য-প্রতিক্রিয়ার যুগ আরম্ভ হয়। এই সময় সুঙ্গ, কন্ব বংশ মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া উত্তর-ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার করে; পরে দক্ষিণ-ভারতে অন্ধ্র-শতবাহন বংশ প্রভুত্ব করে।

এই সময়ের অর্থনীতিক অবস্থা পূর্ব্বের অভিব্যক্তির পথেই চলিতেছিল। এইযুগে শিল্প (Arts) ও শ্রমশিল্প (Crafts) ব্যবসায় প্রভৃতি পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবসায়ী সংঘে (Trade Guild) সংঘবদ্ধ হইতেছিল (১)। এই গিল্ড-গুলিই রাজশক্তির প্রধান সহায়রূপে ছিল। খৃঃ পূঃ তিন এবং দুই শতাব্দীতে সাঁচিস্তূপে খোদিত-লিপিসমূহে (২) দৃষ্ট হয় যে, শেঠরা (শ্রেষ্ঠী) এবং তাহাদের আত্মীয়েরা সমাজে আগেকার চেয়ে বিশিষ্ট পদ-প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহারা পদের দ্বারাই পরিচিত হইতেছে। এই সঙ্গে 'সোতিক' (তন্তুবায়), 'বডকি' (সূত্রধার), 'রাজুক' উল্লিখিত হইয়াছে। এই সাক্ষ্য দ্বারা দৃষ্ট হয় যে, মৌর্য্য ও তৎপর যুগে বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসারের সহিত বৈশ্যশক্তি ধীরে ধীরে শক্তিসঞ্চয় করিতেছে। রাজকীয় শাসন-বিভাগ (Administration) পূর্ব্ব-প্রথার অনুবর্ত্তী ছিল বলিয়াই মনে হয়; রাজবংশের পরিবর্ত্তন হইলেও শাসন-পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইত না।

১। A. Cunningham—The Bhilsa Topes; EP, Ind. vol. II. Votive descriptions from the Sanchi Stupas দ্রষ্টব্য।

২। EP. Ind. vol. II. Further Inscriptions from Sanchi—P, 369.

ইহাই ভারতের ইতিহাসে সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়। কিন্তু মৌর্য্য-যুগের কেন্দ্রীভূত শাসনের পরিবর্ত্তে সুঙ্গযুগে সামন্ত রাজার নাম খোদিত-লিপিতে দৃষ্ট হয় (৩)। মনূক্ত আইনসমূহ এই যুগের বিধি-ব্যবস্থাকে প্রতিবিম্বিত করে বলিয়া মনে হয়। মনু বলিতেছেন, "পুরুষানুক্রমে রাজকর্ম্মচারী, বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে পারদর্শী এবং ইহারা স্বয়ং শূর ও যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ, সৎকুলোদ্ভব এবং পরীক্ষিত—এরূপ সাত আটটী মন্ত্রী প্রত্যেক রাজার থাকা আবশ্যক (৭,৫৪)। এতদ্দ্বারা আমরা এই বুঝি যে, বৈদিক মতাবলম্বী (এই সময়ে ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মত পোষণ করিত এবং জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিত বলিয়া বৈদিক মতাবলম্বী ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বৌদ্ধযুগের সময় হইতে একদল বলিতে হইবে) উচ্চ কুলের পুরুষানুক্রমিক রাজকর্ম্মচারীশ্রেণী উদ্ভব করিবার চেষ্টা হইতেছিল; ইহার অর্থ দ্বিজবংশীয় আমলাতন্ত্র সৃষ্টি করিয়া একটা ব্রাহ্মণ্যবাদীয় অভিজাত দল গঠন করিবার চেষ্টা এই ব্রাহ্মণাধিপত্যের যুগে চলিতেছিল। ইহারা ব্রাহ্মণ্যবাদী বনিয়াদী স্বার্থের দল বলিয়া শূদ্র ও বৌদ্ধদের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন হইবে না—ইহাই গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। এই সঙ্গে মনু ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর প্রাধান্য দিতেছেন (৭,৫৮-৫৯)। মৌর্য্য-যুগের ন্যায় রাজকর্ম্মচারী নগদ মাহিয়ানা না পাইয়া জমি ও অন্যান্য প্রকারে তাহা গ্রহণ করিত:—যথা, গ্রাম্যলোকেরা অন্ন, পানীয় এবং ইন্ধনাদি যে-কোন বস্তু প্রতিদিন রাজাকে দান করিবে তৎসমুদয় গ্রামাধিপতির প্রাপ্য। কুল অর্থাৎ ষড়গবাকৃষ্ট হলদ্বয়ে কর্ষণযোগ্য ভূমি দশ গ্রামাধিপের বৃত্তিস্বরূপ প্রাপ্য, বিংশতি গ্রামাধিপের তাহার পঞ্চগুণ ভূমি, শতাধিপের একখানি গ্রাম এবং সহস্রাধিপের একটি নগর প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে (৭,১১৮—১১৯)। পূর্ব্বে যেমন বেতনের পরিবর্ত্তে গ্রাম প্রদান (মুসলমান-যুগের 'জায়গীর') করিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এইযুগেও সেই প্রথা

৩। B. Barua and G. Sinha—Barhut Inscriptions.

প্রচলিত ছিল। বোধ হয় বেতনের পরিবর্ত্তে গ্রাম ও নগরাদি পাওয়ার পদ্ধতি হইতে ক্রমশঃ একটি ভূম্যধিকারী শ্রেণী গড়িয়া উঠে। আমরা যে-যুগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি সেই যুগ হইতেই ধীরে ধীরে সামন্ততন্ত্র সংগঠিত হয় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

এইস্থলে একটি বিশিষ্ট প্রশ্ন উঠে যে, জমির মালিকানা সম্বন্ধে কিরূপ আইন বিবর্ত্তিত হইয়াছিল? আমরা বৈদিকযুগের অর্থনীতিক অবস্থার অনুসন্ধানকালে দেখিয়াছি যে, সেই সময়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-প্রথা অভিব্যক্ত হইয়াছে। বেদে জনসমূহের মধ্যে কৌম-প্রথা (tribal system) ছিল; কিন্তু জমি কৌমগত না হইয়া ব্যক্তিগত ছিল—ইহাই আমরা বেদে পাই। বেদে জমি সম্বন্ধে tribal communism-এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না (৪)। বেদে সম্পত্তি যৌথ বংশগত না হইয়া বংশের কর্ত্তার ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়; এইসঙ্গে জমি কৌমগত বা যৌথ বংশ-গত হইবার কোন নিদর্শন বেদে নাই (৫)। এক্ষণে বেদের পরবর্ত্তী যুগের অবস্থা কি ছিল তাহা আমরা স্মৃতিতে দেখিতে পাই। মনু বলিতেছেন, "যে-ব্যক্তি যে-ভূমিকে বনাদি কর্ত্তন পূর্ব্বক কর্ষণাদি দ্বারা উদ্ধার করে, সে-ভূমি তাহারই হইয়া থাকে" (৯,৪৪)। এতদ্বারা জমি ব্যক্তিগত

৪। লোকে একদিন Morgan-এর মত—পৃথিবীর সর্ব্বত্র বর্ব্বরযুগে tribal communism অবস্থার মধ্য দিয়া একটা জাতিকে বিবর্ত্তিত হইতে হইয়াছে—একথা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিল। Sir Henry Maine 'Ancient Law' নামক পুস্তকে Morganএর মতের স্বপক্ষে লিখিয়াছেন যে, বৈদিকভারতেও জমিতে tribal communism প্রথা ছিল। কিন্তু Baden Powell, 'Indian Village Community' নামক পুস্তকে মেইনের মতের ভুল প্রদর্শন করিয়াছেন। উপস্থিত সময়ে মর্গানের মতের সপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে।

৫। **Prafulla Chandra Basu—Indo-Aryan Polity, Pp. 26—27.**

সম্পত্তি বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। পুনঃ বলা হইতেছে, "পথ, গ্রামান্ত ও পরিহার ব্যতিরেকে ক্ষেত্রের শস্য এইরূপে নষ্ট হইলে তবে পশুপালকের বা পশুস্বামীর একপণ পাঁচগণ্ডা দণ্ড হইবে। কিন্তু সর্ব্বত্রই শস্যের ক্ষতিপূরণের জন্য ক্ষেত্রস্বামীকে অর্থ দিতে হইবে" (৮,২৪১)। আবার বলা হইয়াছে, "ভয় প্রদর্শন করিয়া যদি কেহ পরের গৃহ, তড়াগ, আরাম বা ক্ষেত্র হরণ করে তবে উহাকে পাঁচশত পণ দণ্ড করিবে; যদি অজ্ঞানে হরণ করে, তবে দুইশত পণ দণ্ড হইবে" (৮,২৬৪)। এই সকল উক্তি দ্বারা আমরা মানবধর্ম্মশাস্ত্র রচনাকালে অর্থাৎ মৌর্য্যযুগের পরে ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ার যুগেও রাজনীতিক পণ্ডিতদের দ্বারা জমিতে কর্ষণকারীর ব্যক্তিগত অধিকার বলিয়া দাবী করিতে দেখি। কিন্তু ভারতীয়-লেখমালা-সমূহ পাঠ করিলে এই তথ্য স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, অশোকের সময় থেকে খোদিত লিপিসমূহে দৃষ্ট হয় জমিতে রাজার মালিকানা-স্বত্ব ছিল। মনু ও জৈমিনি হয়ত অতীতের রীতির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের মত জানাইয়াছেন, হয়ত রাজ-শক্তি (Kingship) বিবর্ত্তিত হইয়া একটা আইনের বলে রাজা প্রজার ভূমি আত্মসাৎ করে।

জয়সওয়াল বলেন, এই যুগের অন্ধ্র-রাজাদের সমসাময়িক কালে উত্তর-ভারতে যাজ্ঞবল্ক্যের সংহিতা বিরচিত হয় (৬)। কানে খৃষ্টাব্দের প্রথম দুই শতক কিম্বা তাহারও পূর্ব্বে ইহার তারিখ নির্দ্ধারণ করেন (৭); জলি ইহাকে মনুর পরবর্ত্তী এবং অনেক বিষয়ে মানবধর্ম্মশাস্ত্র হইতে আধুনিক বলেন (৮)। জেকবি বলেন, যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য গ্রীক Astrology-র (জ্যোতিষশাস্ত্র) সহিত পরিচিত ছিলেন সেইজন্য ইহা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের

৬। Jayaswal—Age of Manu and Jagnavalkya.

৭। Kane—P. 187.

৮। Jolly—P. 19.

প্রাকালে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া ধরা যায় (৯)। এতদ্বারা অনুমান করা যায় যে, যাজ্ঞবল্ক্য শতবাহন বংশের রাজত্বের সমসাময়িক ছিলেন। বৌদ্ধভিক্ষুর প্রতি বিদ্বেষই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি বলিতেছেন, "হরিদ্রা রং-এর কাপড় পরিধানকারী ব্যক্তিগণ অশুভ-দর্শন" (১,২৭৩)। ইনি দ্বিজজাতিদের শূদ্রা ধর্ম্মস্ত্রী গ্রহণে আপত্তি করিয়াছেন (৫৬)। "শূদ্র কেবল নিজ জাতির মধ্যে বিবাহ করিবে" (৫৭)। "প্রতিলোম-বিবাহের সন্তানেরা 'অসৎ' ও অনুলোম-বিবাহের সন্তানেরা 'সৎ' বলিয়া পরিচিত হয়" (৯৫)। "শূদ্রগণ দ্বিজজাতিদের সেবা করিবে, তাহার অভাবে ব্যবসায় অথবা অন্য উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিবে, কিন্তু সর্ব্বদাই দ্বিজদের মঙ্গল করিবে" (১২০)। পৈতৃক সম্পত্তি বণ্টন সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, "একটি পুত্র শূদ্রা দাসীজাত হইলেও তাহার পিতার ইচ্ছানুসারে সম্পত্তির একাংশ পাইবে (১৩৬)। পিতার মৃত্যুর পর শূদ্রাজাত সন্তানকে তাহার অন্য ভ্রাতারা তাহাদের প্রত্যেকের সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ দান করিবে ; অন্য ভ্রাতা বা তাহাদের ভাগিনেয় না থাকিলে এই শূদ্রাজাত পুত্র সমস্ত সম্পত্তি পাইবে" (১৩৭)।

পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য শূদ্রাজাত সন্তানকে সনাতন ব্যবস্থারই অধীন রাখিয়াছেন ; তবে পূর্ব্ববর্ত্তী আইন ব্যবস্থাপকদের অপেক্ষা অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন, অন্য উত্তরাধিকারীর অবর্ত্তমানে শূদ্রাজাত পুত্র সমুদয় সম্পত্তির অধিকারী হইবে ; আবার পুত্র অভাবে কন্যাকেও বিষয়াধিকারিণী করিয়াছেন। এইস্থলে যাজ্ঞবল্ক্য পূর্ব্ববর্ত্তী আইনকারকদের অপেক্ষা অধিক অগ্রসর ও উদার ! কিন্তু শাস্তি সম্পর্কে তিনি পুরাতন স্মৃতিকারদেরই বৈষম্য বজায় রাখেন (২০৯—২৯১))।

ব্রাহ্মণ্য-প্রতিক্রিয়ার যুগে যে "যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা" বিরচিত হইয়াছিল তাহা আমরা তাহার ব্যবস্থা-প্রদত্ত আইন হইতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

৯। Jacobi—ZDMG. 30. 306.

যে "মিতাক্ষরা" আইন কেবল বাঙ্গালা দেশ ব্যতীত সমগ্র হিন্দুসমাজের আইনপুস্তক, যাজ্ঞবল্ক্যের সংহিতার উপরই তাহার ভিত্তি স্থাপিত। এই আইনে আমরা সম্পত্তিতে family communism রূপ ছাপ স্পষ্টতঃই দেখিতে পাই। এতদ্বারা আমরা দেখি যে, হিন্দু-আইনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেমন সমর্থিত হইয়াছে মিতাক্ষরাতে বংশগত সম্পত্তিতে কিন্তু গোষ্ঠীগত সম্পত্তিতে পিতাপুত্রের সমানাধিকার বলা হইয়াছে।

উপরোক্ত তিনটি রাজবংশের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করা হয় এবং ভারতবাসীর জীবনের সর্ব্ব বিষয়ে ব্রাহ্মণাধিপত্যের ছাপ দেওয়া হয়। এই যুগের পর ভারতে আবার বৈদেশিক আক্রমণ হয়। মধ্য-এশিয়া হইতে বর্ব্বর শকেরা উত্তর-ভারত আক্রমণ করে। শকেরা ইরাণী-ভাষী একই যাযাবর ইরাণীয় জাতি। কিন্তু এই জাতির যে অংশ ভারত আক্রমণ করে তাহা ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্ম গ্রহণ করে। শকদের পরে 'কুষাণ' (Kuishang) নামে আর একটি মধ্য-এশিয়ার যাযাবর জাতি শকদের স্থান অধিকার করে। কেহ কেহ কুষাণ ও চীন-তুর্কিস্থানের ইউ-চিদের অভিন্ন মনে করেন কিন্তু এই বিষয়ে এখনও মতভেদ আছে (১০)। ইহাদের নেতা কণিষ্ক উত্তর ও পশ্চিম ভারত জয় করেন। গান্ধার, কাশ্মীর হইতে পূর্ব্বে মগধ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে গুজরাট পর্য্যন্ত কুষাণদের

১০। সংস্কৃত পুস্তকে "ঋষিক" নামে একটি জাতি অভিহিত হইয়াছে। জয়চন্দ্র নারং-এর "ভারতীয় ইতিহাসকী রূপরেখা"—২য় ভাগ, দ্রষ্টব্য। ভারতে আফগানীস্থানের ঔপনিবেশিক কুই-সাঙ্গ বা কুষাণ ও পূর্ব্ব-তুর্কি-স্থানের (সিংকিয়াং) ইউচিদের জাতিতত্ত্ব লইয়া ভারতে গোল আছে। জার্ম্মাণ অনুসন্ধানকারীদের মতে উভয়ে বিভিন্ন জাতি, তাহাদের ভাষা বিভিন্ন। ইউচিরা আর্য্য বা ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষার centrum শাখার অন্তর্গত একটি ভাষা কহিত। তাহাদের শাসকবর্গকে "আর্য" (সংস্কৃত ঋষিক ?) বলা হইত। এই বিষয়ে Sieg এবং Siegling ; F. Mueller —'Toxri und Kuisan' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

শাসন বিস্তৃত ছিল। অনেকে অনুমান করেন, ইহার বাহিরে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত এক সময়ে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল (১১)।

তৃতীয় অধ্যায়

কুষাণ অন্ধ্র-যুগ

কুষাণ জাতিটি ভারতীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বৌদ্ধ হয়। কেহ কেহ বলেন, কণিষ্কের পৌত্র বাসুদেব বিষ্ণু-উপাসক হন। ইহাদের রাজত্ব যদিচ সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হয় নাই, তত্রাচ এক সময়ে বেশীর ভাগ ভারতে বিস্তৃত ছিল। এই যুগটি ভারতের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট যুগ। এই সময়ে ধর্ম্ম ও সমাজের অনেক উলটপালট সম্পাদিত হয়। এই সময়ে বিশেষভাবে সাহিত্য-চর্চ্চা হয়; অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি এই সময়েই আবির্ভূত হন। এই সময়ে শৈবধর্ম্ম, মহাযান, মিহির (সূর্য্য) পূজা ও বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের উপাসক-সম্প্রদায় উত্থিত হয় এবং ১৬২ খৃঃ কশ্যপ মাতঙ্গ চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। ইহা ব্যতীত এই যুগের প্রারম্ভে বিভিন্ন বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মত-সমূহকে সমীকরণের জন্য পঞ্জাবে কণিষ্ক একটি বৌদ্ধ-সঙ্গিতি (Council) আহ্বান করেন। এই যুগে কুষাণদের রাজ্যের মধ্যে বৌদ্ধ-প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়; তাহারই ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম-আন্দোলন নূতন তেজ প্রাপ্ত হয়। জাতীয়তাবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নিকট কুষাণেরা ভারতীয় নাম

১১। Jayaswal—History of India: Journal of Behar and Orissa Research Society, 1933.

ও সভ্যতা গ্রহণ করিলেও বিদেশী ছিল ; কিন্তু আন্তর্জাতিক বৌদ্ধদের নিকট বৌদ্ধ-কুষাণেরা পর ছিল না। ভারতীয় সমাজে কুষাণ রাজত্বের ছাপ কতটা অঙ্কিত হইয়াছিল তাহা কথঞ্চিৎ অনুমিত হইতেছে (১)। কুষাণেরা বিদেশী ও বৌদ্ধ বলিয়া চিরকাল ব্রাহ্মণ্য-বাদীয়দের নিকট হইতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে ; এমন কি গুজরাটের কুষাণ ক্ষত্রপেরা ভারতীয় নাম এবং ধর্ম্মগ্রহণ করিলেও পরবর্ত্তী যুগের গুপ্তসম্রাটদিগকর্ত্তৃক সমূলে উৎপাটিত হয়। বোধ হয়, পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ আমলাতন্ত্রের লোকদের এইজন্য অবিশ্বাস করিয়া কুষাণেরা শূদ্রজাতিসমূহ হইতে নিজেদের কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিত। জয়সওয়াল বলেন, কুষাণ ক্ষত্রপ বাণস্পর কৈবর্ত্ত ও অস্পৃশ্য পঞ্চকদের দ্বারা একটা নূতন রাজকর্ম্ম-চারীশ্রেণী সৃষ্টি করেন (২)। উত্তর-ভারতে শকসেনা নামক কায়স্থজাতীয় একটি কৌম বাস করে। ইঁহারা নাকি শক রাজাদের সৈন্যদলে কাজ করিত। এই শব্দের অর্থ—শকরাজাদের সৈন্যদল ; সেইজন্য ইহাদের এই নামকরণ হয়। এই শকসেনা কায়স্থদের যে শক বা কুষাণ রাজাদের সহিত কিছু সংযোগ ছিল তাহা তাহাদের নাম হইতেই প্রতীয়মান হয়। এতদ্দারা বুঝা যায় যে, নিজেদের স্বপক্ষীয় একটা পুরুষানুক্রমিক আমলাতন্ত্র ও অভিজাত দল সৃষ্টি করিয়া কুষাণেরা ভারতে কায়েমী হইবার জন্য চেষ্টা করে। তৎপর লক্ষণীয় যে, কুষাণদের সময়ে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় উদ্ভূত হয় ; কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোনটাই বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মমতাবলম্বী নয়। ইহার মধ্যে

১। নারং বলেন, শকদের যে পোষাক কণিষ্কের মূর্ত্তিতে পাওয়া যায়, তাহাই নানা রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া হিন্দুদের চোগা-চাপকানে দাঁড়াইয়াছে। নাগার্জ্জুনকোণ্ডা এবং অন্যান্য স্থানের শক-প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়।

২। **Jayaswal—Journal of Behar and Orissa Research Society, 1933, P 42.**

সূর্য্যোপাসনা বিদেশ হইতে আগত বলিয়া প্রবাদ আছে (৩)। কণিষ্কের সময়ে মহাযান বৌদ্ধমত উদ্ভূত হয়; ইহা ভারতীয় প্রচলিত কুসংস্কার, বিশ্বাস ও ঠাকুরপূজার সহিত একটা রফা করে। প্রাচীন বিষ্ণুপূজা ও শিবপূজা, যাহা জনসাধারণের মধ্যে অন্তঃসলিলাভাবে প্রচলিত ছিল তাহা, এই সময়ে পুনরুত্থিত হয় বলিয়া অনুমিত হয় (৪)। বর্ত্তমান সময়ে মহেন-জো-দাড়ো ও হারাপ্পায় যেসব মূর্ত্তি ও ধর্ম্মপূজার চিহ্নসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে ধ্যানযোগী শিবের ষাঁড় (Bos Indicus) যোনী ও লিঙ্গ মূর্ত্তি পাওয়া যায়; কেবল বিষ্ণুধর্ম্মের কোন চিহ্ন ইহার মধ্যে পাওয়া যায় না (৫)। এতদ্বারা আমাদের এই অনুমান হয় যে, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বৈদিক ব্রাহ্মণদের দ্বারা পতিত ও আর্য্যসমাজের অপাংক্তেয় বলিয়া গণ্য হইলে তাহারা প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকে। এই জন্যই জয়সওয়াল

৩। ভবিষ্য পুরাণে আছে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব বাহ্লিক দেশ হইতে সূর্য্যপূজা ভারতে আনয়ন করেন। কথিত আছে, ফার্সি 'মেহর' শব্দই সংস্কৃত 'মিহির' রূপ ধারণ করিয়াছে। এই 'মিহির' বা সূর্য্য ঠাকুরের পোষাক ও চেহারা মধ্য-এশিয়ার লোকের ন্যায়। ইহাদের সঙ্গে যে সব ইরাণী পুরোহিত ভারতে আগমন করিয়াছিল তাহাদের মগ (ফার্সি Magi) ব্রাহ্মণ বা শকদ্বীপী (Scythian) ব্রাহ্মণ বলা হইত। এই শকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা আজ নৈষ্ঠিক বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়া ভারতে গৃহীত হইয়াছে। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, তাহারা কয়েক পুরুষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ-সমাজে 'ঠেকো' ছিল। কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মত এই যে, কৃষ্ণপূজা খৃষ্টপূজা হইতে আগত। ইহা শকদের সময়ে বিদেশ হইতে আনীত হয় কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই।

৪। সাঁচীস্তূপের শিলা-লিপিসমূহে যেসব নাম পাওয়া যায় তাহার বিশ্লেষণ করিয়া ৺বুলার মহোদয় বলেন, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী বা তাহার অগ্রেও বর্ত্তমান ছিল। EP. Ind. vol. II. Votive Inscriptions from the Sanchi Stupas. P. 89.

৫। Marshall—Indus Valley Civilisation.

-বলেন যে, "বৌদ্ধ" ও "শূদ্র" একার্থবাচক হয়। এইযুগেই নাকি বৌদ্ধপণ্ডিত অশ্বঘোষ বলিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণদের আর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিবার কোন হেতু নাই; কারণ এখন শূদ্র ব্রাহ্মণের সমান পণ্ডিত হইয়াছে, এক্ষণে 'ব্রাহ্মণ' ও 'শূদ্র' এক (অশ্বঘোষ—"বজ্রচ্ছেদিকা")। এতদ্বারা তিনি এই বুঝাইয়াছিলেন যে, যখন ব্রাহ্মণ ও শূদ্র জ্ঞানে সমকক্ষ হইয়াছে তখন তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। এই সকল প্রমাণ হইতে এরূপ অনুমিত হয় যে, বৈদিকযুগের পর হইতে যেসব ভারতীয় তথাকথিত নিম্নশ্রেণীয়েরা সমাজের নিম্নস্তরে ছিল তাহারা সর্ব্ববিষয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করে এবং শেষে নিজেদের প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। মহাপদ্ম নন্দ এই আগত শূদ্র-প্রভুত্বের অগ্রগামী দূত ছিল, মৌর্য্যবংশে তাহা পূর্ণভাবে প্রকট হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণাধিপত্যে এই প্রভুত্ব বিনষ্ট হইলেও শেষে তাহা নানা প্রকারের অবৈদিক ও নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় দ্বারা সমাজে পুনঃ প্রকট হয়। যদি ব্রাহ্মণ-শ্রেণীকে তথাকথিত "শুক্র পিঙ্গল কপিশ কেশ" বৈদিক আর্য্যদের ধর্ম্মপদ্ধতির রক্ষক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এই সকল নূতন ধর্ম্মপন্থাকে বৈদিক ব্রাহ্মণ-ক্রিয়াকাণ্ড-সম্বলিত ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী-পদ্ধতি, যাহার অন্তর্গত হইয়া তাহারা অভিব্যক্ত হইতে পারে, তাহা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এইসব ব্রাহ্মণ্যবাদ-বিরোধী ধর্ম্ম জনসাধারণকে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে আহ্বান করিত এবং তাহাদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, বিশ্বাস প্রভৃতি স্বীয় অঙ্গীভূত করিত। এইজন্যই মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম, শৈবধর্ম্ম প্রভৃতি বৈদিক প্রভাব হইতে মুক্ত ও সমাজ-পদ্ধতি বিষয়ে উদার (৬)।

৬। অধ্যাপক ধর্ম্মানন্দ কোশাম্বীর মতে জিন তীর্থঙ্করদের অনেকেই গণ-শ্রেণীসম্ভূত ছিলেন। তাঁহার "ভারতীয় সংস্কৃতি অনি অহিংসা" (গুজরাটী) দ্রষ্টব্য।

হারাপ্পা ও মহেন-জো-দাড়োতে "সিন্ধু-উপত্যকা সভ্যতা" বিষয়ক নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার পর অনেক ভাবুকের মনেই এই প্রশ্ন উদয় হইতেছে যে, বর্ত্তমানের তথাকথিত হিন্দুধর্ম্ম, অর্থাৎ হিন্দুদের লৌকিক ধর্ম্ম, আচার ও পদ্ধতি এই সভ্যতার নিকট কি পরিমাণে ঋণী ? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, নরতত্ত্ববিদগণ মহেন-জো-দাড়োতে যে সব মূল জাতির (race) নিদর্শন পাইয়াছেন সেই সকল নিদর্শন বর্ত্তমান ভারতীয়দের মধ্যে পাওয়া যায়। আবার হারাপ্পাতে ও মহেন-জো-দাড়োতে আবিষ্কৃত জালায় বা কলসিতে মৃতদেহকে সমাহিত করার ব্যবস্থা বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় (৭)। অন্যদিকে যে জন্মান্তরবাদ, গো-জাতির প্রতি ভক্তি হিন্দুধর্ম্মের বিশিষ্ট খোঁটা, তাহার নিদর্শন বেদে নাই। যেসব ধর্ম্মের নিদর্শন "সিন্ধু-উপত্যকা সভ্যতা" মধ্যে পাওয়া গিয়াছে তাহা বিভিন্ন হিন্দুসম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ভিত্তির সঙ্গে মিলে। এইসব দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, সিন্ধু সভ্যতা মধ্যে বৈদিক আর্য্যদের অস্তিত্ব ছিল ; অন্যপক্ষে বৈদিক-সাহিত্যে শিশ্নোপাসক, অহিংসবাদী ও ভাগবতদের নিদর্শন পাওয়া যায়। এইজন্য কেহ কেহ মনে করেন যে, প্রাগৈতিহাসিক অনেক পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান নামান্তর গ্রহণ করিয়া হিন্দুর মধ্যে আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে !

এই প্রসঙ্গে আর একটি খট্‌কার কথা উঠে। বেদে আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখি। স্মৃতিসমূহেও ধন এবং জমি বিষয়ক সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকারের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু বিজ্ঞানেশ্বর কৃত যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির মিতাক্ষরা নামক টীকায় পিতামহের সম্পত্তিতে পিতা ও পুত্রের সমানাধিকারের কথাই প্রদত্ত

৭। Dr. B. N. Datta—"Vedic Funeral Customs and Indus Valley Civilization" in "Man in India," Vols. 16, 17; Swami Sankarananda-এর "Indus Valley Civilization" দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে! আর এই আইন বাঙ্গালা দেশ ছাড়া বাকী হিন্দু-ভারতে প্রচলিত আছে। আবার অনেকে মধ্যপ্রদেশের জমিরূপ সম্পত্তিতেও সংযুক্ত (Joint) অধিকার পরে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন (৮)। একদল পণ্ডিত মনে করেন যে, প্রথমে গ্রাম্য জমি কৌমের প্রত্যেক লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বিলি হইত। তখন communal ownership ছিল; পরে Joint-family inheritance (যৌথ গোষ্ঠীগত সম্পত্তি) যাহাতে কতকগুলি অভিজাত বা ক্ষমতাপন্ন গোষ্ঠী গ্রামের অন্যান্য লোকদের উপর ভু-স্বামীরূপে প্রভুত্ব করে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে সেই জমির co-sharer (বখরাদার) রূপে বর্ত্তমান থাকে—সেইরূপ পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয় (৯)। এই পদ্ধতি হয় একটি জাতি-দ্বারা সম্পূর্ণ বিজয়স্বরূপ নয়ত বা সম্পূর্ণ নূতন বন্দোবস্তরূপে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে (১০)।

বৈদিক ব্যক্তিগত অধিকারের পর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে পিতা ও পুত্রের যৌথ অধিকার family communism-এর চিহ্ন বলিয়াই কেহ কেহ অনুমান করেন। এই পদ্ধতি কি প্রকারে আসিল তাহা অবশ্য আজ অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু। ইহা কি ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদের পদ্ধতি হইতে গৃহীত হইয়াছে? আবার কাহারও কাহারও মতে পঞ্জাবের তিন প্রকারের জমি-বিলি পদ্ধতি কম্যুনিজম্ হইতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তিরই পরিচয় প্রদান করে (১১)। প্রাচীন অধিবাসীদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির

৮। B. H. Baden-Powel—Village Communities in India, Pp. 138-39.

৯। B. H. Baden-Powel—op. cit

১০। H. S. Maine—'Ancient Law'—Introduction by Sir F. Pollock. Pp. 315—317.

১১। Jolly—Recht und Sitte.

সঙ্গে লৌকিক প্রথারূপে এই যৌথপদ্ধতি বর্ত্তমান হিন্দুজাতির মধ্যে আনা অসম্ভব নয়। এই পদ্ধতির সম্যকরূপে মূল অন্বেষণ করা প্রয়োজন। বস্তুতঃ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রচারের সময় হইতে ভারতের ইতিহাসে পতিত শ্রেণীদের পুনরুত্থান হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

ইতিহাসের প্রাচীনযুগে ও মধ্যযুগে শ্রেণী-সংগ্রাম ধর্ম্ম-সংগ্রামের রূপ ধারণ করে। অন্যান্য দেশের ইতিহাস আলোচনাকালে আমরা ইহা দেখি। ভারতের ইতিহাসেরও প্রাচীন এবং মধ্যযুগে শ্রেণী সংগ্রাম ধর্ম্ম-সংগ্রামের রূপ ধারণ করিয়াছে। এইজন্যই এই সকল অবৈদিক ও ব্রাহ্মণ্যবাদ-বিরোধী ধর্ম্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণশ্রেণীর এত বিরোধ ছিল। সমাজের নিম্নস্তরের শ্রেণীসমূহ ও পতিতেরা এই নূতন ধর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিয়া উপরের স্তরের শোষণনীতির কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে। তখন শ্রেণী-সংগ্রামের সামাজিক সাম্যই ছিল লক্ষ্য এবং উহাকে উপলব্ধি করিবার জন্য ধর্ম্মপদ্ধতিই ছিল তাহার যুদ্ধক্ষেত্র।

আমাদের অনুমান হয় যে ক্লাসিক্যাল যুগে, বিশেষতঃ, বৌদ্ধযুগ হইতে ভারতীয় প্রাচীন জাতির লোকেরা যাহারা আজ পর্য্যন্ত অনেকস্থলে পতিত বলিয়া গণ্য হয় তাহারা নানা নূতন ধর্ম্মের আশ্রয় করে এবং পরে আর্য্য-সভ্যতাযুক্ত হইয়া আর্য্য সমাজে প্রবেশ করিয়া বর্ত্তমান হিন্দুজাতি সংগঠন করিয়াছে। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রচলিত তথাকথিত হিন্দুধর্ম্ম ; এই ধর্ম্মের সঙ্গে বৈদিকধর্ম্মের কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই! আমরা দেখিতে পাই যে, **Taboo** (ছুঁৎছাঁৎ), **Totemism** (জন্তু বা গাছ পালাকে পিতৃপুরুষ বলিয়া পূজা করা), **Pre-animalism** (জন্তুপূজা করিবার পূর্ব্বাবস্থা), **Magic and witchcraft** (তুক্‌তাক্, ঝাড়ন ফোড়ন ব্যবস্থা), **animalism** (জন্তুপূজা) (১২) প্রভৃতি প্রচলিত হিন্দু-

১২। এইগুলির কোন কোন ব্যাপার যে আর্য্যভাষীদের মধ্যে ছিল না

ধর্ম্মের ছায়ায় দাঁড়াইয়া আছে এবং এই সকল পূজা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম ও [illegible] বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সিন্ধুনদ-সভ্যতায় এই সকলের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই হেতুই স্বীকার করিতে হইবে যে, বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদ সনাতনী ও সঙ্কীর্ণ; তজ্জন্য আভিজাতিক রূপ ধারণ করিয়াছিল এবং জনসাধারণ তাহার বিপক্ষে নূতন উদার ধর্ম্মসমূহ উদ্ভব করিয়া নিজেদের প্রকট করিবার চেষ্টা করিতেছিল। ইতিহাসে ইহা সর্ব্বব্যাপী শ্রেণী-সংগ্রাম ছিল এবং ইহারই ফলে মিশ্রিত হিন্দুজাতির উদ্ভব হইয়াছে (১৩)।

চতুর্থ অধ্যায়

অন্ধ্র-শতবাহন যুগ (দক্ষিণ-ভারত)

এই যুগে উত্তরে শক, কুষাণ প্রভৃতির যখন রাজত্ব চলিতেছিল তখন দক্ষিণে একটি খাঁটি ভারতীয় রাজশক্তি উত্থিত হয়। ইহাদের 'অন্ধ্র' বলা হইত। আসলে ইহারা 'অন্ধ্রভৃত্য' নামধারী ছিল। মনুতে অন্ধ্রজাতিকে মেদ, চণ্ডালের ন্যায় পতিত বলিয়াছে, কিন্তু অন্ধ্রভৃত্য শতবাহন বংশ

তাহা বলা যায় না। Totemism, ছুঁৎ-ছাঁৎ, Magic প্রভৃতি তাহাদের মধ্যে ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়।

১৩। আলেকজান্দারের অভিযানের পর গ্রীক লেখক ম্যাগাস্থেনেস উত্তর-ভারতের লোকদের দীর্ঘাকৃতি ও গৌরবর্ণবিশিষ্ট সুপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই স্থানের সম্বন্ধে কি উক্ত বর্ণনা খাটে? একজন আমেরিকান লেখক দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "The noble Hindu is dead, he died in the white-yellow-"black quigmire"! Schulze—"Race or Mongrel" দ্রষ্টব্য।

নিজেদের ব্রাহ্মণ বলিত। অধ্যাপক রায় চৌধুরী বলেন, ইহাদের ধমনীতে কিঞ্চিৎ "নাগ" রক্ত ছিল। খৃঃ ২য় শতকে এই বংশের পুনর্প্রতিষ্ঠাতা হইতেছেন, সিরি সতকর্ণি গোতমিপুত্র। ইনি নিজেকে 'একবীর', ও 'একব্রাহ্মণ' বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছেন (১)। ইনি "ক্ষত্রিয়দের অহঙ্কার নষ্ট করেন, দ্বিজ ও কুটুবাদের (কৃষিজীবী) স্বার্থোন্নতি সাধন করেন এবং চাতুর্ব্বর্ণের মিশ্রণ বন্ধ করিয়াছেন" (২)। অন্যপক্ষে ইনি বৌদ্ধভিক্ষুদের গ্রামদান করেন (৩)। এই যুগের একটি বিশিষ্ট সংবাদ এই যে, শক জাতীয় লোকও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া বারাণসীর তীর্থসমূহে গো, অর্থ ও গ্রাম ব্রাহ্মণদের দান করিতেছে (৪)।

দক্ষিণে এই যুগে আমরা তৈলিক শ্রেণী (Guild of oil-millers), কুলরিকদের শ্রেণী, যান্ত্রিক ওডয়নত্রিকদের শ্রেণীগুলির (Workers fabricating hydraulic engines, water-clocks or others) সংবাদ নাসিকের শিলালিপিগুলির মধ্যে পাওয়া যায় (৫)।

খৃঃ ৩য় শতাব্দীর ভাষাতে, সাঁচিস্তূপে, খোদিত-লিপিসমূহে (৬) আমরা এই তথ্য পাই যে গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের ক্ষমতাশালী সভ্যেরা বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, মালবের কৃষিজীবীদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসারলাভ করিয়াছে ; একটি বোধগোষ্ঠীর (বৌদ্ধগোষ্ঠী) কথা উল্লিখিত হইয়াছে। গোষ্ঠী হইতেছে একটি মন্দির বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের অছিদের সমিতি

১। EP. Ind. Vol. VIII. No. 8
২। H. C. Roy Choudhury. P. 326-49.
৩। EP. Ind. vol op, cit No, 3-5
৪। EP. Ibid, op, cit No, 10
৫। Ibid op, cit No, 8,
৬। EP. Ind vol. II. No. 7,

(Committee of trustees)। তৎপর, বিদিশার দন্তকারদের (হস্তিদন্তের শিল্পী) সমবেত দান দ্বারা তাহাদের একটি শ্রেণীতে সংঘবদ্ধ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এই লিপিগুলিতে নগর (নিগম) সভার উল্লেখ কদাচিৎ হইয়াছে [ভারহুতের ১৬ সংখ্যক লিপিতে—করহ-কট নিগমস (করহকট নগরের) সমিতির উল্লেখ আছে]।

এই সময়ের শিল্পসমূহ যেমন সংঘবদ্ধ হইয়াছিল তেমন বিদেশের সহিত বাণিজ্যেরও লেনদেন হইত। পশ্চিম-ভারতের "ভুজ"(৭) নামক স্থান হইতে তিনখানি প্রস্তর-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে একখানি হিব্রু ভাষায় লিখিত আর বাকী দুইখানি দক্ষিণ-আরবের হিমারীয় ভাষায় লিখিত। হিব্রু-লিপির তারিখ ১২৫ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। এই লিপি দক্ষিণ-আরব হইতে আগত লোকদের কবরে স্থাপিত ছিল। আরব-লিপিগুলি তৎকালের দক্ষিণ-আরবের ভাষায় খোদিত হইয়াছে। এই লিপিগুলি প্রমাণিত করে যে, দক্ষিণ-আরবের সহিত পশ্চিম-ভারতের যোগাযোগ খৃঃ ১০০-২০০ শতাব্দীতে ছিল। অবশ্য বাণিজ্য সম্পর্কীয় ব্যাপারেই এই যোগসূত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। আবার, ঐতিহাসিকেরা ইসলামের পূর্ব্বের আরবে হিন্দু উপনিবেশের সংবাদও দেন।

এইসব সংবাদ দ্বারা আমরা হৃদয়ঙ্গম করি যে, ভারতে এই সময়ে শ্রমশিল্পসমূহ গিল্ডে সংঘবদ্ধ ছিল এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও প্রসার লাভ করিয়াছিল। খৃঃ ১ম শতাব্দীতে রোমান লেখক প্লিনি, ভারতীয় বণিকেরা রোমান-সাম্রাজ্যে রেশম বিক্রয় করিয়া বৎসরে দশ লক্ষ রোমান স্বর্ণমুদ্রা ভারতে লইয়া যায় বলিয়াও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

৭। Ep. Ind. vol. XXII, No. 14. "Three Semitic Inscriptions from Bhuj".

ইহার ফল সমাজে প্রতিফলিত হয়। এই যুগের লিখিত বাৎসায়নের 'কামসূত্র' নামক পুস্তকে তাহার কিঞ্চিৎ প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। আমরা দেখি যে, শিষ্টাচারকে বিশিষ্ট স্থান প্রদত্ত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, যে শুচি আচারযুক্ত (শুচ্যাপচার বিশিষ্ট) সেই আর্য্য। আবার, শিষ্টাচার তিনি প্রাচ্যদের মধ্যেই বেশী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই সঙ্গে বাৎসায়ন গৌড়ীয়দের রীতির কথার উল্লেখ করিয়াছেন। গৌড়ের লোকেরা (গৌড়ানাম্) লম্বা নখ রাখিত এবং স্ত্রীলোকেরা কোমল শরীরবিশিষ্ট ও মিষ্টভাষী ছিল (খৃঃ ১২৯)।

বাৎসায়ন বলিয়াছেন, আভীর রাজাদের অন্তঃপুর ক্ষত্রিয় রক্ষীদের দ্বারা পাহারা দেওয়া হইত (৫,৬,৩৪), রাজাদের বহু পত্নী থাকিত এবং অবরোধ মধ্যে প্রহরীবেষ্টিত করিয়া রাখা হইত। এই যুগের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে দেশে ধনাগম হওয়ায় সমাজে "নাগরক" নামে ধনী যুবকের দল উদ্ভূত হইয়াছিল। তাহাদের শিক্ষা-শিল্পকলার প্রতি সূক্ষ্ম ধারণা ছিল কিন্তু ইহারা ইন্দ্রিয়ভোগী ছিল। এই সময়ে পুরুষেরা একটা কাঠি (lip stick) দিয়া ওষ্ঠ রঙ্গ করিত। বাৎসায়নে সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট সংবাদ এই যে, দাক্ষিণাত্যে সুন্নতের ন্যায় ত্বকচ্ছেদ প্রথা (circumcision) প্রচলিত ছিল (৭, ২, ১৪-১৫)।

এই সময়েই ভারতে লোকায়ৎ মত উদ্ভূত হইয়াছিল। এই মতের লোকেরা বস্তুতান্ত্রিক ভোগবাদী ছিল। তাহারা বলিত, "একটা সুবর্ণ নিষ্ক অর্জ্জন চেষ্টা করা অপেক্ষা (যাহার ফল বিষয়ে সন্দেহ আছে) হাতে একটা তাম্র কার্ষাপণ থাকা ভাল।" আবার, "বনে দুইটা ময়ূরের সন্ধানাপেক্ষা হাতে একটা কপোত থাকা ভাল।" (লোকায়তিকা : সূত্র ২৪-৩০)। যখন দেশে এই প্রকারের বিলাসী ধনী যুবক দলের উদয় হইয়াছিল তখন তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তদুপযুক্ত গণিকা-শ্রেণীর আবির্ভাবও হইয়াছিল। তাহারা গৃহস্থ নারী অপেক্ষা শিক্ষিতা ও শিল্পকলা

জ্ঞানসমন্বিতা ছিল। এই যুগের নাগরিক ও গণিকার চিত্র ভাসের "চারুদত্ত" ও ইহার নামান্তর "মৃচ্ছকটিক" নাটকে দৃষ্ট হইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠে, দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরা কোথা হইতে 'সুন্নত'-রূপ প্রথা প্রাপ্ত হইল? কামসূত্রে চোল ও শাতকর্ণি শাতবাহন রাজাদের উল্লেখ আছে (৭,২৬-২৭)। শাতকর্ণির নামোল্লেখে এই পুস্তক খৃঃ দ্বিতীয় শতকের বলিয়া অনুমিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে খৃঃ তৃতীয় শতকের পুস্তক বলিতে চাহেন কিন্তু চোলবংশীয় রাজার উল্লেখে ইহাকে আরও অর্ব্বাচীন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

কোচিনের ইহুদীদের জনশ্রুতি এই যে, তাহারা জেরুসালেম ধ্বংসের পর (প্রথম শতক) ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করে। পুনঃ, রোম-সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এই সংবাদ পাওয়া যায় যে, সম্রাট আগসটুসের কাছে তিনটি ভারতীয় বাণিজ্য-সংক্রান্ত দৌত্য দল সাক্ষাৎ করিয়াছিল। এই সময়ে আলেকজান্দ্রিয়াতে ভারতীয় উপনিবেশ ছিল। সভ্যতার এতসব বিনিময়ের ফলে এই রীতি নিখিল ভারতের ভোগ-বিলাসীদের মধ্যে প্রচলিত হওয়া অসম্ভব নহে।

উপরোক্ত তথ্যসমূহ দ্বারা আমরা এই নির্দ্ধারণ করি যে, ভারতে তৎ-কালে শিল্পবাণিজ্য দ্বারা ধনাগম হওয়ায় একটা বুর্জ্জোয়াশ্রেণী উদ্ভূত হইয়াছিল যাহারা ভোগ-বিলাসী ছিল। তাহাদের কর্ম্মের সমর্থনের জন্য একটা বস্তুতান্ত্রিক দার্শনিক মতেরও উদয় হয়। অন্য দিকে, জনসাধারণ ও কৃষিজীবীরা সাম্যবাদীয় বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে বলিয়া খোদিত-লিপিতে দৃষ্ট হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

গুপ্ত-যুগ

কুষাণযুগের পর ভারতের বিশিষ্ট ঘটনা হইতেছে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের যুগ। অনেকের মতে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় বর্ত্তমানের হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ এইযুগে প্রথম বিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়া ইহার পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে। দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের ভারশীব ও ভাকাটাকা রাজাদের শাসনকালে শৈবধর্ম্মের প্রসার দেখা যায় এবং অশ্বমেধ ও অন্যান্য যাগযজ্ঞ এবং ব্রাহ্মণদের গ্রামদান প্রভৃতি যথেষ্টভাবে করা হয়। পৌরাণিক ধর্ম্ম এই সময় থেকেই আক্রমণশীল হয় অর্থাৎ এই সময়েই পুরাণ ও মহাকাব্যগুলি বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের শেষ সংকলন হয়। এই সময় ভারতে আবার জাতীয়তাবাদীয় যুগ আরম্ভ হয়। নিখিল ভারত আবার একজাতীয়তা প্রাপ্ত হয়। এইবার একজাতীয়তা ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবাধীন হয়।

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা সমুদ্রগুপ্ত একজন সামান্য রাজপুত্র, ইনি লিচ্ছবীদের দৌহিত্র এবং তাঁহার জাতি অজ্ঞাত কিন্তু তিনি নিজেকে "লিচ্ছবী তনয়াসূত" বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেন। জয়সওয়ালের প্রথম আবিষ্কার অনুযায়ী "গুপ্তেরা" কারস্কার জাতীয়। জয়সওয়ালের দ্বিতীয় আবিষ্কার হইতেছে যে, ইঁহারা জাঠ জাতীয় ছিলেন। গুপ্তদের কারস্কারজাতীয় উৎপত্তি বিষয়ে অধ্যাপক ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় সন্দিহান। তিনি বলেন যে, এই বিষয়ে প্রমাণের অভাব ;: কারণ, "কৌমুদিনী মহোৎসবে" (Aiyangar Com. Vol. P. 36).

উল্লিখিত চন্দ্রসেনকে ১ম চন্দ্রগুপ্তের সহিত এক বলিয়া সনাক্ত (identify) বিচারসহ নহে। (১)

'আর্য্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প' পুস্তক আবিষ্কারের পর দ্বিতীয়বার তিনি গুপ্তদের "জাঠ"-জাতীয় বলিয়া স্থির করেন এবং উভয় মতকে মিলাইবার জন্য তিনি বলেন যে, প্রাচীন কারকারেরা বর্ত্তমানের 'কাক্কর জাঠ'-এ পরিণত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত সংস্কৃত পুস্তকের দক্ষিণ-ভারতীয় পুঁথিতে উক্ত আছে—"মথুরায়াং জাত বংশাচ্যঃ বণিক" (৩৫১); পুনঃ, তিব্বতীয় পুঁথিতে বর্ণিত আছে—"মথুরাজাতো বৈশ্যাখ্যাঃ পূর্ব্বো"। তিনি বলিতেছেন, (আর্য্যমঞ্জুশ্রীর ইংরাজী অনুবাদ—An Imperial History of India, P. 53) "He is said to have been a Mathura Jata (Sanskrit, Jata-Vamsa). Jata-Vamsa, that is, Jata Dynasty stands for Jarta, that is Jata. That the Guptas were Jats, we already have good reasons to hold (Journal of Bihar-Orissa Research Society, Vol. XIV, P. 118)". কোন্ ভাষাতত্ত্ব বা কোটতত্ত্ব অনুসারে সংস্কৃত 'জাত' আধুনিক পঞ্জাবী বা হিন্দী 'জাট' বা "জাঠ'-এ পরিণত হইতে পারে তাহা বিশেষজ্ঞগণ স্থির করিবেন। কিন্তু জাঠেরা আজ পর্য্যন্ত শূদ্র বলিয়াই গণ্য হয়। লেখক শুনিয়াছেন যে, রাজপুতানায় কোন কোন স্থানে তাহারা ব্রাহ্মণ-বর্জ্জিত হইয়া সামাজিক জীবন যাপন করেন ও পঞ্জাবে অনেক স্থলে ব্রাহ্মণদের দ্বারা অনাচরণীয় বলিয়া গণ্য হয়। আর্য্যমঞ্জুশ্রী বলিতেছে যে, গুপ্তদের

১। Vide Prof. Dr. H. C. Rai Choudhuri, Political History of Ancient India, Foot note to P. 442, 1938; D. N. Sarkar—"Unhistoricity of the Kaumudini Mahat Sava" in J. A. H. R. S. Vol. XI, 1937-38.

পূর্ব্বজেরা মথুরার ধনী বৈশ্য বা ব্যবসায়ী ছিল। এইজন্যই কি এই বংশে বৈশ্যবর্ণবাচক "গুপ্ত" পদবী গৃহীত হয়? ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের তাহাই অনুমান; কিন্তু জয়সওয়াল এইটি এই বংশের আদি পুরুষের ব্যক্তিগত নাম শ্রীগুপ্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন।(২) যাহা হউক, তাহাদের হীন উৎপত্তি ছিল বলিয়াই বোধ হয়; কারণ, তাহারা বাঙ্গালার পালদের ন্যায় নিজেদের জাতির পরিচয় দেয় নাই। তাহাদের গোত্র ছিল "ধরণা", ইহা আর্ষেয় গোত্র নয়। (৩) ইহা দ্বারা তাহাদের উৎপত্তির মূল অনুমিত হইতে পারে।

আজকাল পুনর্জাগরণের যুগে হিন্দু ইতিহাস লেখকেরা পুরাতন প্রসিদ্ধ রাজাদের "জাতে তুলিবার" চেষ্টা করিতেছেন। এইজন্যই চন্দ্রগুপ্ত হইতেছেন মৌর্য্য-ক্ষত্রিয়, সমুদ্রগুপ্ত হইতেছেন "জাঠ" (এই জাতিও আজ ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেছে), শিবাজী 'ক্ষত্রিয়' ইত্যাদি, কিন্তু প্রাচীন মহাপদ্মনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া এই যুগের মাধোজী সিন্ধিয়া, রণজিৎ সিংহ পর্য্যন্ত অনেক বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী রাজা নীচ শূদ্রবংশীয় ছিলেন এবং অনেকে "জারজ"ও ছিলেন, একথা কি অস্বীকার করা যায়? কিন্তু মুলা পঞ্চাননের—"ভূমিপ হইলে হইতে চায় ক্ষত্র, রাজন্য বলিয়া বলায় যত্র তত্র"; পুনঃ "রাজায় রাজায় বিবাহ, সবাই ক্ষত্রিয়। পিতৃমাতৃ একপক্ষ, রাজন্য গোত্রীয়"—এই কথাই হইতেছে ভারতীয় রাজাদের সমাজতত্ত্বের চাবিকাঠি!

স্মৃতিতে কারস্কর জাতিকে একটি ব্রাহ্মণ-বর্জ্জিত অর্থাৎ অনাচরণীয় জাতির মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে এবং মহাভারতে (কর্ণপর্ব্ব) ইহাদের ব্রাহ্মণ-বর্জ্জিত ও ব্রাত্য বলা হইয়াছে। গুপ্তবংশ ব্রাহ্মণ্য-

২। J. B. O. R. S. Vol. XVIII Pt. I.

৩। EP. Ind. Vol. XV. No. 4. Pp. 40-42.

বাদীয় ছিল; ইহাদের শাসনকালেই ব্রাহ্মণগণ নিজেদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতঃ "ভূ-দেবতারূপে" নিজেদের পুনরায় জাহির করিতে থাকে বলিয়া কথিত হয়।

গুপ্তযুগে (৩২০-৫০০ খৃঃ) গিল্ডগুলি খুব প্রভাবশালী হইয়াছিল। তৎপর গুপ্তসম্রাটদের শাসনকালে বাঙ্গালায় যেসব তাম্র-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তদ্দারা স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, সেই সময়ে ভারতে বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প (Industry) বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে।* সেই হেতু শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ ও কুলীক (architecht) শ্রেণীর প্রধান ব্যক্তিদের প্রভাব শাসন-পদ্ধতি মধ্যে বিস্তারলাভ করিয়াছে। তাহারা রাজকর্ম্মে পরামর্শ প্রদান করিত। মৌর্য্যযুগের পূর্ব্ব থেকেই যে বাণিজ্য ও শ্রমশিল্পে অর্থনীতির বিবর্ত্তন হয় গুপ্তযুগে তাহার পূর্ণতাপ্রাপ্তি হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য, (২-৩১) নারদ ও বিষ্ণু-স্মৃতিসমূহ (৮।৮-৯; ৫।৩১) প্রমাণ করে যে, গিল্ডগুলি কেবল রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট অংশ হয় নাই, রাষ্ট্র তাহাদের নির্দেশ মানিত। রাষ্ট্র তাহাদের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিল (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৯৪—১৯৫)। এই গিল্ডগুলির নিজের নিজের সভ্যদের উপর আইন জারী করিবার ক্ষমতা ছিল, যে-সব ব্যাপার দ্বারা নিজেদের ব্যবসার আটক পড়িত সেই সকল স্থানে ইহারা হস্তক্ষেপ করিতে পারিত। শুক্রের নিম্নলিখিত বচন দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, গিল্ডরূপ প্রতিষ্ঠানটি দেশের সাধারণ আদালতেরও কার্য্য করিত; "কুল, শ্রেণী এবং গণ-সমূহ (সাধারণতন্ত্রীয় সমাজ) স্বায়ত্ত-শাসনের ধাপে ধাপে উচ্চ প্রতিষ্ঠান। যখন এবং যে-স্থলে ইহারা অকৃতকার্য্য হইবে, তখন রাজা ও তাহার কর্ম্মচারিগণ হস্তক্ষেপ করিবে" (৪, ৫, ৫৯—৬০)। এতদ্দারা আমরা এই বুঝিতে পারি যে, ব্যবসায়সংক্রান্ত ব্যাপারে গিল্ডগুলির "স্বায়ত্ত-শাসন"

* EP. Ind. Vol. XV. No. 7, Pp. 113-114.

ছিল এবং এই বিষয়ে তাহারা ইউরোপীয় গিল্ডগুলি হইতে অধিক অধিকার ভোগ করিত। এই সময়ে ব্যবসায় ও শ্রমশিল্প বিশিষ্ট-ভাবে সংঘবদ্ধ হইয়াছিল। এই যুগের "শ্রেণীদের" (গিল্ড) কথঞ্চিৎ সংবাদ খোদিত-লিপিসমূহে বিবৃত আছে; এতদ্বারা ইহাও দৃষ্ট হয় যে, শ্রেণীগুলি তখনও বর্ণগত হয় নাই।*

এই যুগের স্মৃতিকারদের মধ্যে নারদ ও বৃহস্পতি ছিলেন প্রধান। নারদ 'নিয়োগ-প্রথা' সমর্থন করিয়াছেন (৮০-৮৮); স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বার বিবাহেরও আদেশ দিয়াছেন (৯৭)। ইনি পনর প্রকার গোলামের (২৬—২৯) তালিকা দিয়াছেন (মনু সাত প্রকার গোলামের উল্লেখ করিয়াছেন)। নারদ রাজপদকে দেবত্ব হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন এবং দুর্ব্বল ও অযোগ্য রাজাকেও মান্য করিতে এবং তাঁহার আদেশ পালন করিতে জনসাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন (২০-২২)। নারদে "দিনার" মুদ্রার (৪) কথার উল্লেখ থাকায় জয়সওয়াল এই পুস্তক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে লিখিত বলিয়া মনে করেন। নারদের রাজার দেবতা হইতে জন্ম ও এত খোসামুদী করার জন্য ইনি অনুমান করেন যে, নারদ একটা নূতন রাজবংশের শাসনের ওকালতি করিয়াছেন এবং গুপ্ত-সম্রাটদের শাসন সময়েই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি হয় নারদের সমসাময়িক, না-হয় কিঞ্চিৎ পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অন্যদিকে পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণু-সংহিতাতে ব্রাহ্মণদের অবধ্য ও শারীরিক শাস্তিভোগের অতীত বলিয়াছেন (৫ ১— ২) এবং স্ত্রীলোকদের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য ক্লীবদের নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন (৩৯)।

---

* C. I. I Vol. III. No. 16 : No. 18.

৫। রোমান Dinarius মুদ্রা এক সময়ে ভারতে প্রচলিত ছিল।

লেখমালা পাঠে ইহা স্পষ্ট বোধগম্য হয় যে, গুপ্তযুগে ভারতীয় সামন্ত-তান্ত্রিক যুগ পূর্ণ রূপ ধারণ করে। এই সময়ে পুরোহিতশ্রেণী ভগবানের প্রতিনিধি, তজ্জন্য উহার সাত খুন মাপ—এই মত জাহির করা হয়। আবার রাজাও ভগবানের প্রতিনিধি বা দৈবশক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রচারিত হয়। এই সময়ে ব্যবসায় ও শিল্পকে গিল্ডের অধীন করিয়া সেই গিল্ডের কর্ম্মমধ্যে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তন করা হয়। শূদ্রের প্রতি শাসন ও বিচার-ব্যবস্থা অতি কঠোর হয়। বিষ্ণুসংহিতাতে নিম্নশ্রেণীর লোক উচ্চশ্রেণীর লোকের নিকট অপরাধ করিলে মনুর ব্যবস্থিত আইনের ন্যায় নিষ্ঠুর শাস্তি বিধান করা হইয়াছে: "নিম্নশ্রেণীর লোক উচ্চশ্রেণীর লোকের আসনে বসিলে তাহার নিতম্বে আগুনের ছাপ দিয়া নির্ব্বাসিত করিয়া দিবে" (৫,২০); সে যদি থুথু ফেলে তাহার ঠোঁট কাটিয়া দিবে (৫, ২১); কোন জাতচ্যুত ব্যক্তি সাক্ষীরূপে গৃহীত হইবে না (৭,২); নিম্নশ্রেণীর পুরুষ দ্বারা উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকের গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইলে, দ্বিজেরা তাহাকে ঘৃণা করে···সকলে নিজের সমাজের মধ্যে সামাজিকতা করিবে (৯,৩,১৫); দ্বিজেরা যদি আহাম্মকী করিয়া নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক বিবাহ করে তাহা হইলে তাহারা তাহাদের পুত্রদের ও বংশকে শূদ্রের স্তরে নামাইয়া দেয় (২৬,৬)। এই সময়কার স্মৃতিসমূহ পাঠ করিলে আমরা অন্যান্য দেশের সামন্ততান্ত্রিক যুগের মনোবৃত্তি এই দেশেও প্রকাশিত হইতে দেখি। সমাজে শ্রেণীসমূহ যত কূর্ম্মাবস্থা ধারণ করিতে থাকে, উপরের স্তরের লোকেরা তত নিম্নস্তরের লোকদের সহিত পৃথক হইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে।

ধর্ম্মোপাসনার জন্য রক্তের পবিত্রতা রক্ষার প্রয়োজন (৫)—এই অজুহাত তুলিয়া নিম্নশ্রেণীর সহিত বিবাহ ও আহারাদি বন্ধ করা হয়;

৫। রোমান Patrician-গণ এইপ্রকার অজুহাত তুলিয়া ধর্ম্মোপাসনা সম্বন্ধে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখিত।

প্রকৃতপক্ষে ইহা কিন্তু নিম্নশ্রেণী হইতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য আলাদা হইবার ফন্দি মাত্র। এই যুগে রাজা ও পুরোহিত উভয়েই ভগবানের সনদ-প্রাপ্ত লোক হয়। এই সময়েই গণ-সাধারণকে শোষণ ও লুণ্ঠনের জন্য ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র এক হয়। ব্রাহ্মণ-প্রতিক্রিয়ার সময় হইতে গুপ্তযুগ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রে এই লক্ষণ আমরা বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করি। রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক শূদ্র-তপস্বী শম্বুকের হত্যা এই লক্ষণের একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। এইযুগেই অজ্ঞ লোকদের মোহযুক্ত করিবার জন্য রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলির শেষ সঙ্কলন করিয়া তাহাতে 'ধান ভাঙ্গতে শিবের গীত' গাহিবার ন্যায় ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের কথা প্রক্ষিপ্ত করা হইয়াছে (৬) (বিষ্ণু কর্ত্তৃক ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করার কাহিনীটি ইহার একটি নমুনা)। এইযুগে ব্যবসায় শিল্পসমূহ যেমন সংঘবদ্ধ হয়, গোলামিত্ব ও অর্দ্ধ-গোলামিত্ব তেমন অনেক স্থলে বাড়ে। ভারতে এই সময়ে গোলামদের প্রকারভেদের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে—এই তথ্য আমরা ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছি। সামন্ততান্ত্রিক যুগের অপর একটা লক্ষণ হইতেছে রাষ্ট্রীয়-শাসন ব্যাপারে স্তর-বিভাগ (hierarcy) সৃষ্টি করা। রাষ্ট্রের শীর্ষোপরি রাজা থাকে, তাহার নিম্নে সামন্তরাজগণ, তন্নিম্নে ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী, সর্ব্বনিম্নে থাকে কৃষক। লেখমালাসমূহ পাঠে আমরা সামন্ততান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক স্তরসমূহের সংবাদ পাই।

একটা জাতির অর্থনীতিক বিবর্ত্তন তাহার সমাজে প্রকাশ পায় এবং তাহার ভাবরাজ্যেও (ideologies) তাহা প্রতিবিম্বিত হয়। ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, গ্রীস একটা একজাতীয়তাপূর্ণ রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে নাই; সহর-রাষ্ট্রগুলি নিজেদের 'হেলেনত্ব' জ্ঞাপনের জন্য

৬। পরশুরাম ভৃগুবংশীয় এবং "মানবধর্ম্মশাস্ত্র"-প্রণেতাও ভৃগুবংশীয়; সেইজন্যই কি পুরাণে বিষ্ণুকে ভৃগুদ্বারা লাথি খাওয়াইয়া ব্রাহ্মণশ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করা হইয়াছে?

Amphictyonic League স্থাপন করিয়া তথায় পরস্পরের সহিত নির্ব্বিবাদে মিলিত। এইজন্য তাহাদের ধর্ম্মেও একত্ব স্থাপিত হয় নাই। দেবতারা একটা আল্‌গা সংঘ (Loose federation) দ্বারা সংযুক্ত ছিল। ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রেও এই প্রকারে ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যা দেখা যায়। বৈদিকযুগে প্রত্যেক কৌমের একটি করিয়া পৃষ্ঠপোষক দেবতা থাকিত এবং প্রত্যেক কৌমের নিজের কৌমগত দেবতা অপর কৌমের দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বড়াই করিত (৭)। পরে কৌমগুলি ভাঙ্গিয়া যখন বড় বড় রাষ্ট্র উদ্ভূত হইতে লাগিল, তখন দেবতাগুলি ছোট হইয়া 'একব্রাহ্মণ' সৃষ্টি করা হয়। রামায়ণে অর্থাৎ ক্ল্যাসিকাল যুগে আমরা বৈদিক দেবতাদের মাথার উপরে ব্রহ্মাকে অধিষ্ঠিত দেখি এবং সর্ব্বোপরি বিষ্ণুকে দেখি। প্রাচীন ঈজিপ্টের সাম্রাজ্যবাদী একেশ্বরবাদীয় ধর্ম্মসংস্কারক ফেরো ইখনাটনকে (৮) কোন কোন ঐতিহাসিক জগতের প্রথম বড় বিপ্লবী বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। একমাত্র দেবতা 'রে' (Re) পূজার প্রবর্ত্তনের পশ্চাতে যেমন ঈজিপ্টের ইতিহাস প্রতিবিম্বিত হয়, প্যালেষ্টাইনের বারটি ইহুদী কৌমের পৃথক্ পৃথক্ জিহোভা উপাসনার পরবর্ত্তীকালীন একত্বের পশ্চাতে যেমন সেই দেশের একজাতীয়তা লাভের ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় তদ্রূপ ভারতের ধর্ম্মের অভিব্যক্তির মধ্যে এই দেশের রাষ্ট্রীয় বিবরণের প্রতিবিম্ব অনুসরণ করা যায় (৯)।

৭। Macdonell—Vedic Mythology.

৮। Vide P. H. Breasted, 'Development of Religion and Thought in Ancient Egypt; Moret and Davy, "From Tribes to Empire".

৯। ভারতীয় আর্য্যদের কৌমগত রাজারা কি প্রকারে দেবতাতে পরিবর্ত্তিত হইয়া শেষে পৌরাণিক দেবতা হইল, 'সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম'

এইস্থলে আমাদের অনুসন্ধানের বস্তু হইতেছে—সামন্ততন্ত্রপদ্ধতি। সামন্ততন্ত্রের প্রধান লক্ষণ হইতেছে—(i) Vassalage (প্রজারূপে আনুগত্য বা অধীনতা), (ii) enefice or Fief (তাঁবেদার লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাহাকে জমি প্রদান করা ; ইহার পরিবর্ত্তে এই লোক প্রয়োজন হইলে মনিব বা আশ্রয়দাতার কর্ম্ম করে); (iii) Immunities (কতগুলি রাজকর [dues] হইতে বা সাধারণ কর্ত্তব্য হইতে রেহাই পাওয়া কিম্বা রাজাদ্বারা আর্থিক এবং আইনের অধিকার প্রদান করা—এইগুলি ইউরোপে বেশীর ভাগ গির্জ্জা ও মঠগুলি উপভোগ করিত। রাজা সনদ দিয়া রাজকীয় অধিকার প্রদান করিত। এতদ্বারা প্রত্যেক সামন্ত স্বীয় জমিদারীতে প্রকৃত রাজা হয়। ইহারা পুরুষানুক্রমে সামন্ত হইলে ইহাদের তাঁবেদার তালুকদার বা জমির খাজনাকারীদের এইরূপ অধিকার প্রদান করিত) ; (iv) sub-feudination (রাজা তাঁবেদার একজন সামন্তকে জমি প্রজারূপে খাজানায় দিত, সামন্ত তাহার নীচে অপর একজন লোককে জমি খাজনায় দিত, সে আবার অপর একজনকে দিত, এইরূপে কৃষকের কাছে গিয়া জমি পৌঁছিত)। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় লক্ষণটি হইতে পরে Manorial system (জমিদার তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের জন্য কর্ম্মচারী বা ভৃত্যদের নগদ মাহিয়ানার বদলে নিষ্কর জমি প্রদান করে ; ইহাকে বঙ্গদেশে "চাকরান" এবং বিহারে "চাকরানা" জমি বলে) উদ্ভূত হয়। স্মৃতিতেও এই প্রকারের কর্ম্মের উল্লেখ আছে। বিষ্ণু বলিতেছেন : শিল্পী, কারু, শূদ্রগণ প্রতিমাসে রাজার এক একটি কর্ম্ম করিয়া দিবে (৩,৩২)। চতুর্থ লক্ষণটিও বোধ হয় কতকটা দ্বিতীয়টির অন্তর্গত ; কারণ সামন্ত ও তাহার ভূমির খাজানাকারীর প্রত্যেকেই তাহার উপরের ভূস্বামী হইতে জমি খাজনায় নিত এবং তাহার

ধারণা কি প্রকারে এবং কোন যুগে আসিল, এই সকলের স্তরের পর স্তর অভিব্যক্তির সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করা হয় নাই। হিন্দুধর্ম্মের অর্থ-নীতিক ব্যাখ্যার এখনও অনুসন্ধান হয় নাই।

বশ্যতা স্বীকার করিত। এই Feudal Tenure প্রথায় জমি ধাপে ধাপে নামিয়া ভোগদখলের অধিকার বিলি হইত।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই লক্ষণগুলি এইযুগের ভারতে বর্ত্তমান ছিল কিনা (১০)? এইস্থলে বক্তব্য যে, ইউরোপে সামন্ততন্ত্রপদ্ধতি যেমন অল্প অল্প করিয়া অনেকদিন ধরিয়া সংগঠিত হইয়াছে ভারতেও ইহার বিবর্ত্তন হইতে বহুদিন লাগিয়াছে। তবে রুশিয়ার সামন্ততন্ত্রপদ্ধতি যেমন ট্রটস্কির (১১) ব্যঙ্গভাষায় "দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিয়া বাহির করিতে হয়" ভারতেও প্রথমাবস্থায় কতকটা তদ্রূপ।

এক্ষণে দেখা যায়, উপরোক্ত লক্ষণগুলির কতটা আমরা প্রাচীন ভারতে পাই। জমি সম্বন্ধে জৈমিনীর (বোধ হয় খৃঃ চারি শতকের এবং মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের পরের লোক; কেহ বলেন তিনি খৃঃ দুই শতকের লোক) মত (মীমাংসা সূত্র) আলোচনাকালে কোলব্রুক জৈমিনীর মত ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—"The monarch has not property in the earth nor the sub-ordinate prince in the land." [রাজার পৃথিবীর উপর সম্পত্তির অধিকার নাই, এবং তাঁবেদার রাজার (সামন্ত) জমিতে অধিকার নাই]। এতদ্বারা আমরা দেখি যে, একজন রাজার অধীনে সামন্তরাজা বা রাজন্য থাকিত। জৈমিনীর মতে জমিতে রাজার অধিকার নাই; সেইজন্য জমি বিলি করিবার অধিকারও রাজার নাই কিন্তু আমরা সামন্তরাজার উল্লেখ এইস্থলে দেখি। উক্ত মত অনুসারে রাজা জমির মালিক না হইয়া উৎপন্ন শস্যের একটা নির্দ্দিষ্ট-

১০। K. S. Shelvanker তাঁহার "The Problem of India" নামক পুস্তকে বলিতেছেন—চাষীদের উপর বোদ্ধশ্রেণীর স্তরসমূহের অবস্থানরূপ অনুষ্ঠানটি ইউরোপ ও ভারতের Feudalism-এ সমানভাবে বর্ত্তমান ছিল; পৃঃ ১০২।

১১। L. Trotsky—Russian Revolution, Vol. I.

অংশের অধিকারী (১২), কিন্তু রাজার দ্বারা বিশ্বস্ত লোককে গ্রামদান করাও একটি পুরাতন প্রথা ছিল। যাজ্ঞিক পুরোহিত বা শ্রোত্রিয়েরা গ্রামদান পাইত। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪,২৪) শূদ্র রাজা জানশ্রুতি ব্রাহ্মণ রৈক্যকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য একটি গ্রাম প্রদান করে। এই প্রকারের দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা দেখি যে, এই সকল ব্রহ্মোত্তর জমি-প্রাপ্তি দ্বারাই "মহাশাল" ও "মহাশ্রোত্রীয়" একদল ধনিক ব্রাহ্মণ ভূস্বামী সৃষ্টি হয় (১৩)। ছান্দোগ্য উপনিষদে ও প্রাচীন বৌদ্ধসূত্রগুলিতে ইহাদের উল্লেখ আছে। এই প্রকারে বৈদিকযুগের শেষেই রাজার নিকট হইতে সুবিধা-ভোগকারী ভূ-স্বামীর দল দেখিতে পাই। তৎপর শেষের দিকের বৌদ্ধসাহিত্যে আমরা রাজন্যদের (princes) কিম্বা মূলধনীদের (capitalist) জন্য কৃষক দ্বারা জমি চাষ করার উল্লেখ দেখিতে পাই (জাতক নং ৩৩৯)। এই প্রথা ইউরোপের মধ্যযুগীয় এবং বর্ত্তমানের জমিদারী প্রথার ন্যায় ছিল বলিয়া মনে হয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মনুস্মৃতিতে একটি বুরোক্রাশী পোষণের ব্যবস্থা উল্লিখিত আছে (৭, ১১৪—১১৫) এবং ইহাদের ভরণ-পোষণের জন্য প্রজাদের নিকট রাজার যাহা প্রাপ্য তাহাই পদের উচ্চতানুসারে বর্দ্ধিত হারে এই বুরোক্রাশীর লোকেরা প্রাপ্ত হইত (৭, ১১৮—১১৯)। অবশ্য ইহা দ্বারা জমি-বিলি পদ্ধতির কোন পরিষ্কার আভাস পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহার দ্বারা কৃষক হইতে সহস্র গ্রামের অধিপতিরূপ স্তর-বিভাগ হইতে দেখি। হয়ত একটিই কালে Feudal tenure-রূপে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু জমি যে সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী

১২। Dwijadas Datta—*Peasant-Proprietorship in India*, P. 2.

১৩। Dr. Narayan Chandra Bandyopadhyaya—Economic Life and Progress in Ancient India, Vol. I. Pp. 215-216.

-খাপে বিলি হইয়া কৃষকে গিয়া পৌঁছিয়াছিল তৎসম্বন্ধে কোন সঠিক প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্যে এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা অনুসন্ধানে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রথমে জমি রাজার সম্পত্তি ছিল না, পরে মৌর্য্যযুগে কতকগুলি বিশিষ্ট জমি, বন, খনি, পতিত জমি রাজার সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হয় (১৪)। এইসব রাজা সম্পত্তিতে ইংলণ্ডের মধ্যযুগীয় আইনসমূহের ন্যায় Game-Law (রাজার জমিতে কেহ গাছ বা জন্তু, পক্ষী নষ্ট করিবার নিষেধাজ্ঞা) প্রচলিত ছিল (১৫)। এই সময়ে ব্যক্তিগত জমি, রাজজমি, ব্রহ্মোত্তর (ব্রহ্মদেয়) জমিভোগকারী ব্যতীত "অ-করদ" প্রজার দল ছিল (১৬)। ইহারা বোধ হয় রক্ষণাবেক্ষণের বিনিময়ে একটা কর প্রদান করিত। প্রথমটি ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্র প্রথার প্রজা স্থিতি করাইবার একটি সর্ত্তের সহিত মিলে। তবে শেষোক্তরা নিজেদের জমি বিক্রয় ও দান করিতে পারিত; কিন্তু ব্রহ্মদেয় জমির ভোগকারী ও অ-করদ জমির ভোগকারী কেবল নিজেদের ন্যায় সম সুবিধাভোগকারীর নিকট বিক্রয় করিতে পারিত। ইহাতে অনুমান হয় যে, অধিকার (privileges) ও রেহাই (immunity) যাহা এই প্রকারের জমিতে আছে তাহা কেবল এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বোধ হয় এই প্রকারে দুইটি বিশিষ্ট সুবিধাভোগকারী অর্থনীতিকশ্রেণী সৃষ্টি করা হয়। ভূমি বিষয়ের এই সব তথ্য সাহিত্য হইতে সংগৃহীত হয় কিন্তু খোদিত-লিপিসমূহে রাজাই জমির মালিক এই তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়!

ভারতীয় ইতিহাসের হিন্দুযুগে সামন্ততন্ত্র পরিপূর্ণভাবে উদ্ভূত

১৪—১৫। Dr. Narayan Chandra Bandopadhyaya—Kautilya, P. 88.

১৬। Dr. N. C. Bandyopadhyaya—op cit. P. 144.

হইয়াছিল কিনা তাহার প্রমাণাভাব পূর্ব্বেকার ঐতিহ্যের নিকট ছিল। স্যার হেন্‌রী মেইন বলিয়াছেন, "সামন্ততন্ত্রীয়তার (feudalization) ন্যায় একটা গতি এক সময়ে নিঃসন্দেহ ভারতে ছিল। ইংলণ্ড ও ইউরোপের জমিতে বর্দ্ধিষ্ণু পূর্ণ স্বত্বাধিকারের ঘটনার ন্যায় ভারতে সেইভাবে ঘটনা বা অনুষ্ঠানসমূহ ছিল; কিন্তু এই ভারতীয় ঘটনাগুলি একটির পর আর একটি না আসিয়া আজ পর্য্যন্ত একত্রে পাশাপাশি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভারতের সামন্ততন্ত্রীয়তা, যদি ধরা যায়, যথার্থভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই" (১৭)। তত্রাচ ভারতীয় সাহিত্যে এই সকল বিষয়ে যে-সকল লক্ষণ বর্ণিত হইতে দেখা যায় তাহা হইতে আমরা একটা অনুমান করিতে পারি। এই লক্ষণগুলি কি, তাহার একটু পুনরাবৃত্তি করিয়া উহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। শুক্রনীতিতে বলিতেছে, (১৮) "রাজা দেবতাদের স্থায়ী উপাদানে সৃষ্ট এবং স্থাবর ও অস্থাবর জগতদ্বয়ের প্রভু (১৪১—১৪৬), রাজা দেবতাদের ন্যায় বর্দ্ধিত হয়, আর কেহ নয় (৪, ৩, ৬); সেই শাসককে সামন্ত বলা হয়, যাহার রাজত্বে প্রজাদের উপর অত্যাচার না করিয়া একলক্ষ হইতে তিনলক্ষ কর্ষস মুদ্রা আয়স্বরূপ আদায় হয় (৩৬৫—৩৬৭), সেই শাসককে 'মণ্ডলিক' বলা হয় যাহার তিন লক্ষ হইতে দশ লক্ষ কর্ষস আয় আছে (৩৬৮—৩৭৪) ইত্যাদি। শাসকদের এই স্তর-বিভাগ আয় অনুপাতে সামন্ত, মণ্ডলিক, রাজা, মহারাজা, স্বরাট সম্রাট, বিরাট, সার্ব্বভৌম পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। এইস্থলে রাজা দেবাংশীয় এবং সর্ব্ববিষয়ের প্রভু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং প্রজাদের

১৭। Sir Henry Maine—Village Community in the East and West, Pp. 158—159,

১৮। B. K. Sarkar—"The Sukranity," Pp. 12—24.

উপর শা[illegible]ও স্তরভেদ বর্ণিত হইয়াছে। এইখানে স্পষ্টই তাঁবেদার সামন্তের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানগুলি সামন্ততন্ত্র পদ্ধতির লক্ষণ; তবে ইহারা পুরুষানুক্রমিকভাবে পদাভিষিক্ত থাকিত কিনা তাহা অনুসন্ধানের বস্তু। এই সকল লক্ষণ ব্যতীত অধিকার (Privilege)-, মকুব (মাপ) রূপ (Immunities) সুবিধাভোগকারী জমিদারদের কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু জমির subfeudination সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ অপেক্ষাকৃত হালের যুগের লেখমালাসমূহে প্রাপ্ত হওয়া যায়; ইহার মধ্যে আমরা সম্রাট হইতে স্তরে স্তরে নিম্নে গিয়ে ভাগচাষীতে এই পদ্ধতি শেষ হইতে দেখি। অন্যত্র এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। রাজার বাধ্য তাঁবেদার (vassal) থাকিত; তাহার অধীনে মহাসামন্ত, সামন্ত, ভুক্তিপতি, বিষয়পতি, গ্রামপতি প্রভৃতি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর তালুকদার প্রজা থাকিত। এতদ্ব্যতীত আরও দুইটি লক্ষণ আমরা সাহিত্যে পাই—noblesse oblige এবং chivalry রীতি। মহাভারতে এই রীতি আমরা বেশ ভালভাবেই পাই এবং ইহার চরম গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাই। প্রত্যেক পদের সহিত দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সংযোজিত আছে—ইহাই হইতেছে প্রথমোক্তটির ভাবার্থ। এই কর্ত্তব্যবোধ শেষে রাজপুতদের নিকট "স্বামীধর্ম্ম"রূপে আদৃত হয় এবং কর্ত্তব্যপালনের সঙ্গে যুদ্ধকালে শত্রুর প্রতি ভদ্রব্যবহার করা এবং স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা বীরের কর্ম্ম—এই ভাব chivalry-র ভিতর নিহিত থাকে। প্রত্যেক দেশের সামন্ততান্ত্রিক যুগে chivalry ভাবটির উদ্ভব হইয়া militarism (যুদ্ধপ্রিয়তা) সৃষ্টি করে। এই সময়ে প্রাচীন Heroic Age-এর যোদ্ধার ভাবগুলি সামন্ততান্ত্রিক বীরদের অনুপ্রাণিত করে। শুক্রনীতি এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বলিতেছে, "ক্ষত্রিয়দের বিছানায় মরা পাপ (৬০৪), যে-ক্ষত্রিয় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে পলায়ন করে তাহার

মরা উচিত” (৬১৪—৬১৫)। এই ভাবটি আমরা প্রাচীন স্পার্টানদের এবং জাপানের বুসিডো (Bushido) প্রথার মধ্যেও প্রাপ্ত হই। সামন্ততান্ত্রিক যুগে যুদ্ধপ্রিয়তা তৎসঙ্গে মনিবের প্রতি আনুগত্য (স্বামীধর্ম্ম) (১৯) সেই সময়কার বড় রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলিয়া গৃহীত হয়; Troubadour-রা (চারণেরা) তাহাই গাহিয়া বেড়ায়, আর সেই যুগের বীরেরা স্ত্রীজাতির সম্মান রক্ষার জন্য নিজেদের তরবারী সতত উন্মুক্ত রাখে। এই লক্ষণগুলি আমরা গুপ্তযুগের সাহিত্যে বিশেষ-ভাবে প্রকট হইতে দেখি। পুনঃ স্বামীধর্ম্ম ও বীরগাথার নিদর্শন লেখমালায় প্রাপ্ত হওয়া যায় (২০)। সংস্কৃত মহাকাব্যগুলিতে স্বামীধর্ম্ম ও স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে এবং বৈদিকযুগ হইতে আবহমানকাল চারণ ও ভাটেরা বীরদের গাথা গাহিয়া বেড়াইয়াছে। এইজন্যেই বলিতে হয়, ইউরোপের সামন্ততন্ত্র পদ্ধতির যেমন সঠিক সংবাদ আমরা সেই মহাদেশের ইতিহাসে পাই, কিন্তু এই দেশে ইতিহাসের অভাবে তাহার কোন সঠিক নিদর্শন না পাইলেও বলিতে হইবে সামন্ততন্ত্রীয়তা যে ভারতের ইতিহাসে শনৈঃ শনৈঃ বিবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করা বৃথা। ভারতের ইতিহাসে হিন্দুযুগের শেষে রাজপুতদের মধ্যে ও বঙ্গে তাহার নিদর্শন ভালভাবেই পাওয়া যায়।

গুপ্ত-সাম্রাজ্য ভারতে আবার একজাতীয়তা স্থাপন করে; কিন্তু এই রাষ্ট্র ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ছিল বলিয়া পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ৺জয়-

১৯। বাঙ্গালায় সামন্ততান্ত্রিক যুগের স্বামীধর্ম্মের নিদর্শন নিমদীঘি-লিপি দ্রষ্টব্য, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, মাসিক বসুমতী ১ম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৪৯।

২০। গোপরাজের স্মারকলিপি C. I. I. vol. 20. P 92;

ঈশ্বর ঘোষের রামগঞ্জ তাম্র-লিপিতে বালঘোষ সম্বন্ধে বীরগাথা উল্লেখযোগ্য (সুতো জগতি গীত মহাপ্রতাপ)—Inscriptions of Bengal, vol. III. p, 156.

সওয়ালের মতে (২১) গুপ্ত-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় নাগবংশীয় ও ব্রাহ্মণ ভাকাটাকা সাম্রাজ্য ছিল; গুপ্তেরা ইহাদের কর্ম্মের উত্তরাধিকারী হয়। কিন্তু ইহাদের ক্ষমতা যে গঙ্গার উত্তরে পৌছিয়াছিল তাহা বোধ হয় না। ইহারা শৈব ছিল। গুপ্ত-যুগের পূর্ব্বের সময়কে জয়সওয়াল ভারশীব ও ভাকাটাকা যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ভিনসেণ্ট স্মিথের মতে ভাকাটাকাবংশ ৩০০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন (J. R. A. S. 1914. P. 318)। তাহা হইলে শতবাহনবংশের রাজত্বের অবসানের পর (খৃঃ ২২৫) ইহারা দক্ষিণে (অমরাবতীর ৮ সংখ্যকলিপি) প্রথম প্রকট হয়। ইহারা দক্ষিণের কিয়দংশ ও মধ্যভারতে রাজত্ব করিয়াছিল। এই বংশের পৃথিবী সেনের একটি লিপিতে তাহার সামন্তের নামোল্লেখ আছে। তৎপর, ২য় প্রবর সেনের একটি লিপিতে তাহার বংশের সংবাদ পাওয়া যায় (C. I. I. vol. III. Nos. 53, 54, 55, 56)। ৫৫-সংখ্যক

২১। জয়সওয়াল তাঁহার History of India C. 150 A. D.—350A.D. (Journal of Behar and Orissa Research Society, Pp. 1—222) প্রবন্ধে Naga Vakataka Imperial Period বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে বিন্ধ্যশক্তি ও নবনাগ রাজারা উল্লিখিত হইয়াছে। এই নাগেরা 'ভারশীব' বলিয়া কথিত হইত। জয়সওয়ালের মতে ইঁহারাই শকদের তাড়াইয়া কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটে যজ্ঞ করে। তাহাতেই তথায় এই ঘাটের নামের সৃষ্টি। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায়ের মতে এই ভারশীবেরা Hinduised Nagas of Dravidian Stock। তিনি বলেন, উড়িষ্যা ও মধ্যভারতের অনেক আদিম-কৌমেরা (ভূঁইয়ারা) নাগকুল বা গোত্রীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া এই প্রাচীন নাগ-বংশের সহিত সম্বন্ধ টানে ('Man in India', vol. XIV, pp 305, Nos. III ও IV)। এইস্থানেই নাগবংশীয় রাজপুতেরা বাস করে। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত রায়ের, "The Hill Bhuiyas of Orissa." Pp. 146, 305—306. প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

লিপিতে তাহাদিগকে মহেশ্বরের ভক্ত বলা হইয়াছে এবং প্রথম রুদ্রসেন ভারশীব-ভবনাগের কন্যার পুত্র। আর নাগেরা ভাগিরথীতীর পর্য্যন্ত দখল করিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারা দশাশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়াছিল। এইসঙ্গে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রথম প্রবর সেন নানাবিধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং তিনি 'বিষ্ণুবৃদ্ধি' গোত্রজাত ছিলেন। ইহারা ব্রাহ্মণদের বহু গ্রাম দান করে।

এই দুই রাজবংশ পরস্পরের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ ছিল এবং পুনঃ তাহাদের সহিত গুপ্ত সম্রাটদের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। এতদ্বারা দৃষ্ট হয় যে, ইহারা গুপ্তদের সমসাময়িক ছিল। কিন্তু তাহাদের খোদিত-লিপিসমূহ পাঠে ৺জয়সওয়াল বর্ণিত সমগ্রভারতে সংযুক্ত রাষ্ট্র (Federation) স্থাপনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

আসলে, এই দুই রাজবংশের অভ্যুদয়কালে ব্রাহ্মণ্য-প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। এই সময় থেকে আমরা পুনঃ পুনঃ অশ্বমেধ ও নানাপ্রকার যাগযজ্ঞের সংবাদ ও বৈদিক ব্রাহ্মণদের গ্রামদানের সংবাদ পাই (২২)। পুনঃ সামন্ততন্ত্রের সংবাদও এইস্থলে পাওয়া যায়। এতদ্বারা সহজে বোধগম্য হয় যে, উত্তর-ভারতে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য কি প্রকারে দৃঢ়বদ্ধ হয়। আবার দক্ষিণ-ভারতে গুপ্ত-সার্ব্বভৌমিকত্বের পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রে খৃঃ দ্বিতীয় শতকে শতবাহন রাজ-শক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশ ব্রাহ্মণাভিমানী ছিল। (২৩) এই বংশের রাজা গোতমীপুত্র নিজেকে "একব্রাহ্মণ" বলিয়া অহঙ্কার করেন।

২২। D. C. Sircar—Select Inscriptions on Indian History—Ch, III c. 49 ; Basim Copperplate Inscription of Vichasakti II. No. 47 ; C. I. I vol, III. No. 55

২৩। Ep. Ind. vol. VIII No.8, Plate No. 2.

শতবাহনদের পর শিবদত্ত আভীরের পুত্র আভীর রাজা ঈশ্বর সেন মহারাষ্ট্রে রাজত্ব করেন (২৪)। এই আভীরদের পতঞ্জলির মহাভাষ্যে ও মহাভারতে শূদ্রদের সহিত সংযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; বাল্মিকীর রামায়ণে তাহাদের সমুদ্র কর্তৃক "দস্যু" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। দ্বিতীয় শতকের শেষাশেষি তাহারা পশ্চিম-ভারতের শক রাজাদের সেনাপতির পদাভিষিক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। ভারতের এই অংশে আবার শূদ্র-শাসন ক্ষণিকের মত প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখি; কিন্তু ইহার পর "পল্লব," (২৫) "কদম্ব" (২৬) নামক ব্রাহ্মণবংশীয় রাজারা ব্রাহ্মণ-শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। এই ব্রাহ্মণবংশীয় রাজা ককুস্থবর্ম্মণ বিবাহার্থ গুপ্তরাজাদের কন্যা প্রদান করে। ইতিহাসে অসবর্ণ বিবাহের ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই ভারতীয় সমাজ কি ভাবে পুনঃ সংগঠিত হইতেছিল তাহার কতকগুলি উদাহরণ এই সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে বেশ বোধগম্য হয়। উপরে আমরা ব্রাহ্মণ রাজকন্যার সহিত ব্রাহ্মণ-বর্জ্জিত কারস্কর জাতীয় (বৌধায়ন স্মৃতি ১,১;৩২) অথবা কোন অব্রাহ্মণ বংশীয় (২৭) গুপ্ত রাজবংশের বিবাহ উল্লেখ করিয়াছি। পশ্চিম-ভারতের ক্ষত্রপেরা

২৪। Ep. Ind, vol. VIII. No. 15. P, 89.

২৫। S. I. I. vol. 1, Pt, I. No, 24, P, 13.

২৬। Ep, vol. VIII. No. 5, 35—36.

২৭। আমরা লেখমালায় 'গণপক' বিধ্ববর্ম্মার মাতা এবং শক অগ্নিবর্ম্মণের কন্যা শকানী বিষ্ণুদত্তা, ধর্ম্মদেবের পুত্র যবন ইন্দ্রাগ্নিদত্ত, ক্ষত্রপ নহপনের জামাতা শক উসভদত্ত এবং তাহার স্ত্রী দখামিত্তা প্রভৃতির নাম পাই। উসভদত্ত ঘোর ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিলেন এবং তদনুযায়ী অনেক ক্রিয়া-কাণ্ড সম্পাদন করিতেন। পুন, শক দমচিকা ভূধিক একজন লেখক ছিলেন এবং বিষ্ণুদত্তের পুত্র। Ep. Ind. vol VIII. No. 15—18. দ্রষ্টব্য।

শেষে হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করে এবং হিন্দু নাম গ্রহণ করে ২৭(ক)। ক্ষত্রপ চ্যষ্টনের (খৃঃ ১৩০) পুত্র জয়দমন, তাহার পুত্র রুদ্রদমন। এইবংশের শেষ রাজা তৃতীয় রুদ্রসিংহ ৩৮৮ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল। এই বংশের রাজা রুদ্র দমনের (রুদ্রদাম) কন্যার সহিত ব্রাহ্মণ রাজা বশিষ্ট পুত্র শ্রীশতকর্ণীর (ইহার অপর এক নাম পুলুমায়ী) সহিত বিবাহ হয় (২৮)। এতদ্বারা আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, এই সময় পর্য্যন্ত অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন থাকায় শ্রেণীসমূহ (classes) জাতিতে (caste) পরিণত হয় নাই এবং বিদেশীয় 'অহিন্দু' জাতিসকলও হিন্দুসমাজভুক্ত হইতেছিল। কিন্তু পরে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ব্রাহ্মণ্যবাদীয় জাতীয়তাবাদের ঢেউ আসিয়া "সিংহ" উপাধিধারী এই ক্ষত্রপবংশকে ধ্বংস করে। হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ ও ব্রাহ্মণদের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন সত্ত্বেও তাহাদের ব্রাহ্মণ্য জাতীয়তাবাদের গোঁড়ামীর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই! কথা এই—ক্ষত্রপ রাজবংশ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহাদের স্বগোষ্ঠীয় বা স্বজাতীয় অন্যান্য লোকেরা কোথায় গেল? তাহারা কি ভবিষ্যতের সিংহ উপাধিধারী নব-ক্ষত্রিয় "রাজপুত"-রূপে ভারতের ইতিহাসে পুনঃ উদিত হয়? টড ও ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ তাহাই অনুমান করেন, যদিচ এই তথ্য আজ সর্ব্বজন-সম্মত নয় (২৮ক)।

গুপ্ত-সাম্রাজ্যাধীন উত্তর-ভারতের সভ্যতার অবস্থা ঐতিহাসিকদের নিকট ভারতীয় ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আজকালকার ভারতীয় লেখকেরা এইযুগের বর্ণনাকালে আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠেন।

২৭(ক)। K. P. Jayaswal. J. B. O. Pp, 114—116.

২৮। Ep. Ind. vol, VIII. No. 6.

২৮ (ক)। B. N. Datta "The Fise of the Rajputs" in J. B. O. R, S. vol. I. 1941 দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মণ্যবাদীয়দের নিকট এই যুগটা প্রাচীনকালের হিন্দু-সভ্যতার চরমাবস্থা। কিন্তু এই সভ্যতার ইতিহাস পড়িলে আমরা জানিতে পারি যে, ইহারা উচ্চশ্রেণীদেরই সুখ-সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করে। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রাধান্যকালে পতিতদের অবস্থা কি ছিল? ফাহিয়েন নামক এক বৌদ্ধ চীন-পরিব্রাজক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভারত পর্যাটনে আগমন করেন। তিনি দেশকে তৎকালে প্রচুর সমৃদ্ধিশালী এবং অধিবাসীদিগকে সুখী দেখিয়াছেন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আর পতিতদের দুঃখ দুরবস্থার কথাও সেই সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, নিম্নজাতীয় চণ্ডালেরা জাতিচ্যুত বলিয়া বিবেচিত হইত এবং তাহাদিগকে নগরের বাহিরে বাস করিতে হইত। মনুতে আমরা এই বিধানই দেখিয়াছি। যদি চণ্ডালদের অবস্থা উক্ত প্রকারের ছিল তাহা হইলে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় বিধান অনুযায়ী অন্যান্য শূদ্র ও পতিত শ্রেণীদের অবস্থা তখন কি ছিল তাহা অতি সহজেই অনুমেয়। হিন্দু-সভ্যতার চরম যুগেও তাহার class-character (শ্রেণী-লক্ষণ) বিদ্যমান ছিল।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে গুপ্ত-সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে; তৎস্থলে উত্তর-ভারতে বিভিন্ন রাষ্ট্র সমুদ্ভূত হয়। এই সময় মধ্য-এসিয়া হইতে 'হুন' নামে একটি নিষ্ঠুর ও বর্ব্বরজাতি ভারত আক্রমণ করে। ইহাদের বাধা প্রদান করিতে গিয়াই গুপ্তরাজগণ হীনবল হইয়া পড়েন। কিন্তু গুপ্তদের সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেলে হুনেরা মালব, রাজপুতনা ও পঞ্জাব অধিকার করে। অবশেষে ৫৩ খৃঃ যশোধর্ম্মন্ হুনরাজা মিহিরকুলকে (আসলে নামটি ছিল 'মেহেরগুল') পরাজিত করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করেন। হুনরাজা মিহিরকুল শেষ পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব স্থাপন করে; কিন্তু পরে পঞ্জাবে এবং মালবে তাহাদের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। জনশ্রুতি বলে যে, মিহিরকুল শিবোপাসক

ছিল। ইহার অর্থ এই যে, শক ও কুষাণদের ন্যায় হুনেরাও ভারতীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতীয় হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে কথা উঠে, তাহাদের ভারতীয় ধর্ম্ম গ্রহণকারী সন্ততিগণ গেল কোথায়? অবশ্য এই সকল কৌম অতি বৃহৎ সংখ্যায় ভারতে প্রবেশ করে নাই। ইহাদের মধ্যে পারদ ও কুষাণেরা আফগানীস্থানে বসবাস করিয়াছিল। প্রাচীনকালের শক, ইউচি হইতে মধ্যযুগের ওসমানলী-তুর্ক কৌমের ঐতিহাসিক সংবাদে এই উপলব্ধি হয় যে, এই রকম একটি কৌমের লোকসংখ্যা পঞ্চাশ হাজার হইতে দুই লক্ষ পর্য্যন্ত হইত। ইহারা সকলে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া লুণ্ঠন করিত এমং সুবিধামাফিক বিজিত দেশে বসবাস করিয়া তথায় রাজত্ব স্থাপন করিত। প্রাচীন চীনের "Han annals" (হান রাজাদের সময়ের ইতিহাস) হইতে জার্ম্মান পণ্ডিত ওটো ফ্রাঙ্ক (২৯) তথ্য সংগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন যে, অল্টাই পর্ব্বতের হুনজাতির নিকট পরাজিত হইয়া ইউচিরা যখন মধ্য-এশিয়ায় বসবাস করে তখন তাহাদের কৌম দুইভাগে বিভক্ত হয়। আবার ইহারা তোখারিদের পরাজিত করে। এই তোখারিয়া কুসি বা কুষাণদের পূর্ব্ব-তুর্কিস্থানের উত্তর হইতে তাড়াইয়া দেয় (৩০)। এই সব কৌম ক্ষুদ্র ছিল, তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী ছিল না। কিন্তু যেস্থলে পঞ্চাশ হাজার হইতে দুই লক্ষ সংখ্যার একটি কৌম বসবাস করে, তাহারা কালক্রমে সেইদেশে অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

২৯। Otto Francke—"Zur Geschichte der Turkvolker".

৩০। ইউচি ও কুষাণদের সম্পর্ক বিষয়ে জার্ম্মাণ পণ্ডিতেরা ও ভিনসেণ্ট স্মিথ এবং ষ্টেদ কনো একমত নন। ভারতীয় লেখকেরা শেষোক্তদের মত গ্রহণ করিয়াছেন এই বিষয়ে Fiest "Indo-germanan und Germanen, Pp. 119—122 এবং B. N. Datta—"The Ethnology of Central Asia and its Bearing on India" in 'Man in India' Dec. 1942 দ্রষ্টব্য।

হয় ; তাহারা সেই দেশে হয় একটা নূতন নরতাত্ত্বিক মূলজাতীয় উপাদান (racial element) না হয় একটা জাতিতাত্ত্বিক মূল উপাদান (ethnic element) অন্তর্নিবেশ করায়। এতদ্বারা সেই দেশের মূলজাতীয় একত্বের মধ্যে অন্যজাতীয় উপাদান প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে বিভক্ত করে। এইসব বর্ব্বর লোকসমূহ (hordes) যখন বিভিন্ন দেশে লুঠতরাজের অভিপ্রায়ে অভিযান করে তখন তাহাদের সঙ্গে নানাজাতীয় লোক জোটে। এইপ্রকারে হুনরাজা আটিলার পশ্চিম-ইউরোপ আক্রমণকালে অনেক পূর্ব্ব-ইউরোপের লোক জুটিয়াছিল! ভারতেও কি তাহা হয় নাই? কেহ কেহ অনুমান করেন উহা সংঘটিত হইয়াছিল (৩১)।

এই ঐতিহাসিক তথ্যের সূত্র ধরিয়া আমরা বলিতে পারি, এই সকল শক, কুষাণ, হুন, পারদ প্রভৃতি জাতির বংশধরেরা যাহারা, ভারতের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল তাহারা গেল কোথায়? তাহাদের যে সমূলে নির্ব্বংশ করা হইয়াছে তাহার কোন প্রমাণ নাই, বরং তাহারা একটা-না একটা ভারতীয় ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই ইতিহাসে প্রমাণিত হয়। এইসঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে হেলেনিষ্টিক গ্রীকজাতীয় লোকদেরও ভারতীয় ধর্ম্ম গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় (৩২)। এই সমস্ত তথ্য দেখিয়া আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ভারতীয় সমাজই তাহাদের পরিপাক করিয়াছে (৩৩)। তাহারা হয় বৌদ্ধ, না হয় ব্রাহ্মণ্য-বাদীয় হইয়া পরবর্ত্তীকালের হিন্দু হইয়াছে!

৩১। Vincent Smith বলেন, গুর্জ্জরেরা হুনদের সহিত ভারতে প্রবেশ করে ; কিন্তু এ-বিষয়ে প্রমাণাভাব।

৩২। মিনাণ্ডারের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ও হেলিওডোরুসের ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ধর্ম্মের দেবতার মন্দির নির্ম্মাণ ব্যাপার ইতিহাসে পাওয়া যায়।

৩৩। টড্ (Todd) বলেন,—রাজপুতকুলগুলির তালিকা মধ্যে 'হুন' বলিয়া একটা নাম পাওয়া যায় ; কিন্তু বৈদ্য বলেন,—চাঁদের

গুপ্তযুগের লেখমালা পাঠে বলা দৃষ্ট হয় যে, এই সময়ে পৌরাণিক দেবতাদের পূজার প্রসার লাভ করিয়াছে, গো এবং ব্রাহ্মণ বধ পাপ বলিয়া গণ্য হয় (৩৪)। সনাতনী ধর্ম্মগুলি যেন পশ্চাৎগামী হইয়াছে ; আবার পৌরাণিক দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণুমন্দির স্থাপনার সংখ্যা বেশী বলিয়াই মনে হয়। পুনঃ এই যুগের পূর্ব্ব-ভারতে আমরা শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও ধনী শ্রেণীর উত্থান দেখি। গুপ্ত যুগে শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ এবং শিল্পী প্রধানদের রাজকর্ম্মে সহযোগিতা এবং তজ্জন্য প্রভাব বিস্তার করিতে দৃষ্ট হয় (৩৫)। ইহার ফলে যে ভবিষ্যতে বৈশ্য বর্ণের শাসকের অভ্যুদয় হইবে তাহা অনিবার্য্য ছিল। যদিচ গুপ্তদের বর্ণ এখনও সংশয়স্থল কিন্তু পরের ঘটনা হইতেছে আর্য্যাবর্ত্তে বর্দ্ধন রাজবংশের উত্থান। বর্দ্ধনেরা নিঃসন্দেহ বৈশ্যবর্ণের লোক ছিল।

"রসাও" পুস্তকে "হুল" নামে একটি রাজপুত কৌমের নামোল্লেখ আছে। "হুন"—অশুদ্ধপাঠ। অথচ অন্যত্র ইনি বলিতেছেন, "কুমারপাল চরিতের তালিকাতে (১০৮০-১১০০ খৃঃ) ৩৬ ক্ষত্রিয় রাজবংশের মধ্যে "হুন" (Hun) নামটি আছে, রাসোতে ইহাকে "হুল' (Hula) বলা হইয়াছে" (vol. III. P. 379). মল্লিনাথ তাঁহার টীকায় হুনদের "ক্ষত্রিয় 'জাতি" বলিয়াছেন। ইহাদের সহিত ক্ষত্রিয় জাতীয় রাজাদের বিবাহ হইবারও প্রমাণ সাহিত্যে আছে (বিক্রমাঙ্কদেব চরিত দ্রষ্টব্য।

৩৪। C, I. I, Vol. III. No. 5. P. 34.

৩৫। EP. Ind. vol. XV. No. 7. "The Five Damodarpur plates Inscriptions,

দশম অধ্যায়

বর্দ্ধন ও পরবর্ত্তী যুগ

(ক) বর্দ্ধন কাল

উত্তর-ভারতের খণ্ডরাষ্ট্রগুলির মাৎস-ন্যায় ধ্বংস করিয়া হর্ষবর্দ্ধনের অধীনে আবার একজাতীয়তা সংগঠিত হয়। 'বর্দ্ধন' গোষ্ঠী বর্ণে বৈশ্য (বাণভট্ট ও হিউয়েন সাঙ্গ দ্রষ্টব্য) এবং থানেশ্বর তাহাদের পৈতৃক রাজত্ব। হুন ও গুজ্জ'রদের পরাজিত করিয়া প্রভাকরবর্দ্ধন নিজের ক্ষুদ্র রাজ্যকে শক্তিশালী করেন এবং তাহার পুত্র হর্ষবর্দ্ধন (৬০৬-৬৪৮ খৃঃ) উত্তর-ভারতে একটি বিশাল সাম্রাজ্য সংস্থাপন করেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারত বিজয়ের পর সমগ্র ভারতে পুনরায় নিখিল-ভারতীয় একজাতীয়তা স্থাপন প্রচেষ্টায় তিনি পরাভূত হন। এই প্রচেষ্টাকল্পে দক্ষিণ-পথ আক্রমণকালে তথাকার চালুক্য রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী কর্ত্তৃক তিনি বিজিত হন।

এই ঘটনার পূর্ব্বে উত্তর-ভারতেও হর্ষের একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল—ইনি হইতেছেন বাঙ্গালার শশাঙ্ক (১)। শশাঙ্ক শৈবধর্ম্মাবলম্বী

১। পূর্ব্বেকার ঐতিহাসিকেরা ইহার নাম শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত বলিয়া ধার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক অনুসন্ধান দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হয়, ইহারা দুইজন পৃথক ব্যক্তি। অন্ততঃ শশাঙ্ক এবং নরেন্দ্র গুপ্ত পৃথক ব্যক্তি। রোটাসগড় শিলমোহরে তাঁহার নাম 'মহাসামন্ত শশাঙ্কদেব' উল্লিখিত আছে (Fleet C. I. I. vol. III. P. 284) এবং গঞ্জামে প্রাপ্ত একটি তাম্রলিপিতে 'মহারাজাধিরাজ শশাঙ্করাজ' নামটি উল্লিখিত হইয়াছে। অনুমিত হয় যে, উভয়েই একই ব্যক্তি।

এবং বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন। আর্য্য-মঞ্জুশ্রীতে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। ইতিহাস ইঁহার অনেক অকীর্ত্তির মধ্যে বুদ্ধ-গয়ার বোধিদ্রুমকে কাটিয়া ফেলা ও মগধের বৌদ্ধদের উপর অগ্নি ও তরবারীর দ্বারা ভীষণ অত্যাচারের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু আজকালকার স্বদেশপ্রেমিক হিন্দু বাঙ্গালী লেখকেরা শশাঙ্ককে অতি বড় করিয়া তুলিয়াছেন এবং তাঁহার অকীর্ত্তি ও নিষ্ঠুরতার নানা ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদীয় শশাঙ্ক কর্ত্তৃক কেন হঠাৎ বৌদ্ধদের উপর এই ভীষণ অত্যাচার হইল তাহার কোন তথ্য কেহ আবিষ্কার করিতেছেন না। শশাঙ্ক অভিজাত ব্রাহ্মণ্য স্বার্থের প্রতিনিধি ছিলেন বলিয়াই বৌদ্ধ-বিদ্বেষী হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়।

হর্ষবর্দ্ধনের যুগ অল্পদিন স্থায়ী হইলেও আবার উত্তর-ভারতে সুখ-সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুগের কিঞ্চিৎ আভ্যন্তরীণ সংবাদ বৃহস্পতি-স্মৃতিতে পাওয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন (২)। এই সময়ে গিল্ডগুলির কার্য্যকরী সমিতি (Executive Council) একজন সভাপতি এবং দুই হইতে পাঁচ জন কর্ম্মচারী লইয়া গঠিত হইত। ইহারা বেদজ্ঞ এবং অভিজাত বংশ হইতে নির্ব্বাচিত হইত (বৃহস্পতি ১৭,৯১)। এই সময়ে উপরের দুই শ্রেণীর কর্ম্ম পূর্ব্বের মত ছিল, কিন্তু বৈশ্যদের পেশায় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। "কৃষি গো-রক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্"—এই কথা বৈশ্যদের প্রতি আর খাটে না! এই সময়ে কৃষি ও পশুপালন শূদ্রের পেশা হইয়াছিল, বৈশ্যেরা কেবল ব্যবসায়জীবী ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন জীবনের শেষভাগে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হন; তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম পুনরায় রাজানুগ্রহ লাভ করে। কেহ কেহ অনুমান করেন, 'জীব-হিংসা অধর্ম্ম'—এই বৌদ্ধমত ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিবার ফলেই বৈশ্যদের ব্যবসায়ে এই পার্থক্য সম্পাদিত হয়। বৈশ্য হর্ষবর্দ্ধন

২। S. K. Das—Pp. 283—290.

বৌদ্ধ হওয়ায় কি বৈশ্যশ্রেণীর মধ্যে পেশার এই পার্থক্য সংঘটিত হয় অথবা বৌদ্ধ-ভাব বৈশ্যদের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ এই পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল? কিন্তু পঞ্জাবে ও অন্যান্য স্থানে যেসব বৈশ্যেরা তাহাদের পুরুষানুক্রমিক পেশায় উক্ত পরিবর্ত্তন ঘটায় নাই, তাহারা শূদ্রশ্রেণীতে অবনমিত হইয়া যায়। এই সময়ের আর একটি বিশিষ্ট সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটে; চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং (৩) তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—রাজপদ অনেক পুরুষ ধরিয়া ক্ষত্রিয়দের একচেটিয়া ছিল। বিদ্রোহ এবং রাজহত্যাও মধ্যে মধ্যে হইয়াছে, অন্য জাতি (শ্রেণী) এই পদ গ্রহণ করিয়াছে। ইনি পূর্ব্বে (কামরূপ) ব্রাহ্মণ রাজা ও পশ্চিমে সিন্ধুকূলে শূদ্র রাজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং হর্ষবর্দ্ধন যে বৈশ্য ছিলেন তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আমরা বৃহস্পতিতে এই যুগের স্ত্রীলোকের অধিকার বিষয়ে নারদ অপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইতে দেখি (৪)।

এই সকল সংবাদ হইতে আমরা ইহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে, সমাজ এই যুগে একটা নূতন বিবর্ত্তনের ধাপে আসিয়াছে। প্রাচীন শাসকশ্রেণীসমূহ স্থানচ্যুত হইয়াছে; অধস্তন শ্রেণীসমূহ পেশার পরিবর্ত্তন দ্বারা পৃথক হইয়াছে; এখন বৈশ্য আর চাষী নয়, ব্যবসায়ী ধনীশ্রেণীতে গণ্ডীবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্য হইতে শাসকবংশও উদ্ভূত হইয়াছে। এই অর্থনীতিক পরিবর্ত্তনের সময় যে-সকল বৈশ্য পুরাতন পেশা পরিবর্ত্তন করে নাই তাহারা শূদ্ররূপে নামিয়া গেল

৩। Hieun Tsang's Travels in India; translated by Watters, Vol, I. P 170.

৪। Kane—P. 209.

(৫)। পক্ষান্তরে শূদ্ররাজবংশের সংবাদ আমরা এই সময়ে পাই। ইহার দ্বারা আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি যে, এই যুগে ভারতে একটা ঘোর অর্থনীতিক বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। গিল্ডগুলি অভিজাতবংশ দ্বারা অধিকৃত হইতে দেখা যায়; পূর্ব্বের প্রলেটারিয়েটের মধ্য হইতে একদল ব্যবসায়ীশ্রেণীতে উন্নীত হয়। এই বৈশ্যশ্রেণীই তৎকালীন বুর্জ্জোয়াশ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছিল। যে-সকল শূদ্র পূর্ব্বের পেশা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল তাহারা পতিত হইয়া রহিল। এই অর্থনীতিক বিপ্লবের ফলেই সামাজিক ওলট-পালট সংসাধন সম্ভব হইয়াছিল এবং এই বিপ্লবের ফলেই স্ত্রীলোকেরা আরও অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এই যুগের বিবর্ত্তনে আমরা একটা বুর্জোয়াশ্রেণীর অভিব্যক্তি দেখি। এই যুগে আমরা সেই পুরাতন কৌমগুলির খবর আর পাই না। এখন ধনীবংশ ও ধনীশ্রেণী এবং তাহাদের শাসনের কথা শুনিতে পাই। গিল্ডগুলি এখন ধনীদের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে; এই সব অভিজাতেরা নিশ্চয়ই সেই সকল প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজন্যবংশীয় ছিল না। সম্ভবতঃ ইহারা ধনী ব্যবসায়ী বংশীয় লোক (merchant princes) ছিল। বৈশ্য হর্ষের উত্থান ও ব্রাহ্মণ্যবাদীয় শশাঙ্কের বৌদ্ধ-দলন এবং আজীবন এই বৈশ্য রাজার প্রতিকূলাচরণের পশ্চাতে কি সামাজিক শক্তিসমূহ লীলা করিতেছিল, এই ব্যাপারের ভিতর কি শ্রেণী-সংগ্রাম ছিল তাহা ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু।

৫। Vaidya—History of Mediaeval Hindu India, vol. II. P. 260.

(খ) মাৎস্য-ন্যায় কাল

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাহার সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যায়; উত্তর-ভারতে আবার মাৎস্য-ন্যায় লীলার পুনরভিনয় আরম্ভ হয়। হর্ষের মৃত্যুর দুই শত বৎসর পর ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চের পর্দ্দা পুনঃ উত্তোলিত হয়, এবং পূর্ব্বে পালরাজবংশ ও পশ্চিমে গুর্জ্জর প্রতিহারবংশীয় ভিনমলের রাজাদের ও দক্ষিণে রাষ্ট্রকূট ধ্রুব এবং তৃতীয় গোবিন্দরাজের উত্থান অবলোকন করা যায়। নবাবিষ্কৃত আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে (৬) বাঙ্গালার এই সময়ের সংবাদ কিছু পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বিবিধ বিবর্ত্তনের পর একজন খঞ্জ শূদ্রবংশীয় বৌদ্ধ রাজা হন। ইনি কিন্তু বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই ঘৃণা করিতেন! ইহার পর প্রজাবিদ্রোহ হয় এবং একটা সাধারণতন্ত্র (Republic) সংস্থাপিত হয়। অতঃপর মাৎস্য-ন্যায় বিরাজ করিলে প্রকৃতিপুঞ্জ (public) দয়িতবিষ্ণুর বংশে ব্যপটের সন্তান গোপালকে রাজপদে বরণ করে (৭)। গোপাল শূদ্রবংশীয় ছিলেন। এই গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল একবার কান্যকুব্জ জয় করিয়া সমগ্র উত্তর-ভারতের সার্ব্বভৌম বলিয়া স্বীকৃত হন(৮), কিন্তু তিনি গুজরাটের অন্তর্গত ভিনমলের গুর্জ্জর-প্রতিহার রাজাদের নিকট বাধাপ্রাপ্ত হন (৯)। অবশেষে দক্ষিণের তৃতীয় গোবিন্দরাজ গুর্জ্জর-প্রতিহারদের

৬। আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে শশাঙ্কের নাম "সোম" বলিয়া উল্লেখ আছে।

৭। গৌড়লেখমালা খালিমপুর লিপি (৩—৪ শ্লোক)।

৮। ঐ-ঐ (১২ শ্লো); নারায়ণপালদেবের ভাগলপুরলিপি (৩শ্লো)। ইহাতে ইন্দ্ররাজকে পরাভূত করিয়া চক্রায়ুধকে সিংহাসন প্রদান করার কথা আছে।

৯। মিহিরভোজের আগরতাল-লিপি (Arch. Sur. of India Annual Report. 1934, P 281)। এই যুদ্ধ মুঙ্গেরে সংঘটিত হয়; এই যুদ্ধে নাগভট্টের পশ্চিমভারতের সামন্তেরা সমবেত হইয়া "গৌড়েন্দ্র বঙ্গপতিকে" পরাজিত করিয়াছিল। Ep. Ind. Vol. 18, No. 13.

পরাভূত করিয়া সমগ্র ভারতের সার্ব্বভৌমত্ব কিছুদিনের জন্য দখল করেন (১০)।

এই সময় হইতে আমরা ভারতের ইতিহাসের পট পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন ভারতের আবির্ভাবের আভাষ পাই। সেই পুরাতন ক্ষত্রিয়কুলের আর সংবাদ নাই; সেই বৈদিক যাগযজ্ঞের কথা নাই, রাজনীতিতে বৈশ্য প্রাধান্যের কথাও আর নাই। এখন শূদ্রের পুনরুত্থান দেখি! বাঙ্গালার পালবংশ যদি শূদ্র ছিল, ভিনমলের গুর্জ্জর-প্রতিহারেরা কি জাতীয় লোক ছিল? ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন, ইহারা মধ্য-এশিয়ার একটি বর্ব্বর জাতি। তাঁহার যুক্তির ভিত্তি এই যে, হুনদের সঙ্গে গুর্জ্জর-প্রতিহারের নাম সংযুক্ত হইতে দেখা যায়। এইজন্য তিনি অনুমান করেন যে, ইহারাও হুনদের সঙ্গে মধ্য-এসিয়া হইতে ভারতে আসে। কিন্তু এই যুক্তি সমীচীন নয় বলিয়াই মনে হয়। গুর্জ্জরদের বিদেশাগত বলিয়া কোন জনশ্রুতি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তাহারা নিজেদের "গো-চর" বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। এই 'গো-চর' হইতেই 'গুজার' (সংস্কৃত 'গুর্জ্জর' (১১) নামটি আসিয়াছে, প্রতিহারেরা এই গুজারদেরই একটি শাখা বিশেষ। (১২) রিসলীর নরতাত্ত্বিক অনুসন্ধানানুসারে গুজারেরা অন্যান্য স্থানীয় ভারতবাসী হইতে শারীরিক লক্ষণ বিষয়ে এক ও অভিন্ন। (১৩) বরং

১০। S. Bhandarkar—J. B. B. R. A S. No LXI P.1 .

১১। হর্ষবর্দ্ধনের 'মধুবন-লিপিতে উৎকীর্ণকারীর নাম 'গুর্জ্জর' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে—EP. Ind. Vol. I. No. 11. P. 4)। ইহা জাতিবাচক না ব্যক্তিগত নাম? প্রথমোক্তই সম্ভব বলিয়া অনুমিত হয়।

১২। সাগরতাললিপির ব্যাখ্যাদ্বারাই পণ্ডিতেরা এই তথ্যে উপনীত হইয়াছেন। (EP. Ind, Vol. XVII. No, 13. P. 102)। অন্যান্য রাজাদের লিপিতে প্রতিহার রাজাকে 'গুর্জ্জরনাথ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। রাজার লিপিতে কিন্তু ভোজরাজের পিতৃব্য মথনদেব নিজেকে গুর্জ্জর-প্রতিহার বংশীয় বলিয়াছেন।

১৩। Risely—People of India ; এই বিষয়ে রিসলি স্মিথের সঙ্গে একমত নন।

ইহাই অনুমিত হইতে পারে যে, আসলে ইহারা একটি ভারতীয় পশুপালক যাযাবর জাতি (Pastoral tribe) ছিল ; ভারতের এই যুগের অর্থনীতিক-সামাজিক বৈপ্লবিক কটাহ মধ্য হইতে এই নিম্নশ্রেণীর জাতিটি অস্ত্রবলে নিজেদের একটা রাষ্ট্র গড়িয়া তোলে, এবং কালে পশ্চিম ও উত্তর-ভারতের বেশীর ভাগ স্থান স্বীয় শাসনাধীন করে। গুর্জ্জরেরা যাহা করিয়াছে এসিয়াতে সকল সময়েই তদ্রূপ বিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। ভারতে এই প্রকারে শূদ্র মারাঠারা সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং জাঠেরা উনবিংশ শতাব্দীতে অস্ত্রবলে শাসকপদে উন্নীত হইয়াছে। ইহার পর তাহাদের আভিজাত্য জনশ্রুতি, সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী সৃষ্টি হইয়াছে।

এই নূতন যুগের বৈশিষ্ট্য এই যে, বৌদ্ধ হর্ষের সময় হইতে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের বিপক্ষে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল, বেশীর ভাগ ভারতে শূদ্রবংশীয় রাজ-শাসন স্থাপিত হইয়া তাহার পরিণতি হয়! বঙ্গ ও মগধে বৌদ্ধ পালবংশের ইতিহাস এই দুই দেশের ইতিহাস। কিন্তু পালদের সময়ের বৌদ্ধধর্ম্ম মহাযানপন্থীয় ছিল এবং উহা হইতে নিঃসৃত বহু সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছিল। এই ধর্ম্মমতগুলির সবই পতিতদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল এবং পতিত জাতিসমূহের লোকেরাই এইসকল সম্প্রদায়ের গুরু ছিল। বঙ্গে এই সময়ে পতিতেরা অন্ততঃ ধর্ম্মক্ষেত্রে সাম্য ভোগ করিত।

একটি মত প্রচলিত আছে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া একটা সাম্যবাদী সমাজ সংগঠন করিয়াছিল। যদি ইহা সত্য হইত তাহা হইলে বৌদ্ধ রাজশক্তির প্রাধান্যকালে আমরা ব্রাহ্মণ্যবাদীয় আইন হইতে বৌদ্ধ আইনকে পৃথক হইতে দেখিতাম, জাতি ও শ্রেণীভেদকে রদ করিবার আইন ঘোষিত হইতে দেখিতাম। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণদের সম্মান করিতে এবং পাল রাজাদের ব্রাহ্মণদের মন্ত্রীত্বপদ ও জমি প্রদান করিতে দেখি। পুনঃ পালদের উচ্চবর্ণের লোক বলিয়া উল্লিখিত হইতেও

দেখি (১৪)। পুনঃ, বৌদ্ধ পালগণকে তথাকথিত দাক্ষিণাত্যের ক্ষত্রিয় রাষ্ট্রকূট রাজাদের কন্যা বিবাহ করিতে দেখি। বাঙ্গালায় প্রবাদ আছে যে, ব্রাহ্মণেরা পালদের ব্যঙ্গ করিয়া বলিত—

"বলাইত সাম্যবাদী, বিবাহ করিত ছত্রিশ জাতি,
ভূমীপ হইলে হইতে চায় ক্ষত্র, রাজন্য বলিয়া বলায় যত্রতত্র॥"
—(নুলা পঞ্চানন)

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথমে বিপ্লবী ছিল। অশোকের অধীনে একটা রাজনীতিক সাম্যবাদীয় রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টাও হইয়াছিল। কিন্তু তারপর তাহাদের সেই শক্তি প্রয়োগ করিতে আর দেখা যায় না। মহাযান শাখা প্রচলিত সংস্কারসমূহ স্বীয় শরীরগত করিয়া ব্রাহ্মণ্যবাদীয় পদ্ধতির বিশিষ্ট বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কৌটিল্য যে গোলামদের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, বৌদ্ধেরা সেই সকল গোলামদের নিজেদের সংঘ মধ্যে গ্রহণ করিত না; কারণ গোলামেরা অপরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি (১৫)।

বোধ হয়, এই সময়ের বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম মধ্যে একটা মেলামেশার চেষ্টা চলিতেছিল। এইজন্যই পারিপার্শ্বিক রীতি-নীতিকে বৌদ্ধেরা অস্বীকার করিতে পারে নাই; এইজন্যই অর্থ হইলে তাহাদেরও 'চন্দ্রবংশীয়' বা 'সূর্য্যবংশীয়' হইতে উদ্ভূত হইবার ইচ্ছা ও আগ্রহ হইত। বোধ হয় নূতন ধনী বৌদ্ধেরা বা শূদ্রেরা এই ইচ্ছা-প্রসূত মনস্তত্ত্বানুসারে খুঁড়াইয়া বড় হইবার চেষ্টা করিত। এইজন্যই যদি পালদের শেষে সূর্য্য "বংশীয়" ক্ষত্রিয়

১৪। বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে তাহাদের সূর্য্যদেবের বংশ (মিহিরস্য জাতবান পূর্ব্বং—২ শ্লোক) প্রভৃত বলা হইয়াছে। বহু পরের আনন্দভট্টের বল্লালচরিতে তাহাদের নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

১৫। Dr. Narayan Chandra Bandyopadhyay—Economic Life of Peoples in Ancient India. Vol. I. Pp. 270-71.

বলিয়া উল্লিখিত হইতে দেখি, গুর্জ্জর-প্রতিহারদেরও সেইরূপ ক্ষত্রিয় হইতে দেখি! কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, প্রতিহার শাখাটি নব-ক্ষত্রিয় "রাজপুত" জাতি-মধ্যে স্থান পাইল, আর গুর্জ্জরেরা শূদ্র 'গুজার' হইয়া আজ পর্য্যন্ত নিম্নজাতির লোক হইয়া রহিয়াছে (১৬)।

উত্তর-ভারতের অবস্থা যখন এই প্রকার, দক্ষিণ-ভারতেও সেই সময় বিভিন্ন বংশের রাজত্বের উত্থান ও পতন হইতেছে। ইহাদের মধ্যে রাজেন্দ্র চোল (১০১২—১০৪২ খৃঃ) বিশেষ প্রতাপশালী হন; এমন কি, তিনি বঙ্গ পর্য্যন্ত অভিযান করেন। এই সময়ে তামিলভাষীরা বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে; কিন্তু এই বংশগুলির মধ্যে কোনটিই শূদ্রবংশীয় ছিল না,—শূদ্র এবং পতিতেরা তথায় চিরকাল পদদলিত হইয়াছে। দক্ষিণে চিরকালই উচ্চবর্ণের প্রাধান্য হইয়াছে বলিয়াই তথায় ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ব্রাহ্মণ প্রাধান্য আজ পর্য্যন্ত এত প্রবল!

আমরা এখন এমন এক যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছি যখন ভারতের একাংশ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী আরবদের দ্বারা বিজিত ও অধিকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রথম আরবদের আক্রমণ হয় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে। যে আরব সৈন্য পারস্য বিজয় করে তাহা ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তীয় অংশ, যাহা আজকাল "আফগানীস্থান" নামে অভিহিত হয়, তথায় অভিযান করে। কিন্তু আরব সৈন্য স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে স্থানীয় রাজারা আবার বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিত। অবশেষে খলিফা হারুণ-উল-রসিদের সময় আরবেরা 'শকস্থান' (একদল 'শক' এইস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল)

১৬। গুজার, জাঠ, ও রাজপুতের জাতিতাত্ত্বিক সম্পর্ক বিষয়ে ৮ ইবট্‌সনের পঞ্জাব জাতিদের তথ্য দ্রষ্টব্য। তিনি এই তিন জাতির একই উৎপত্তি বলেন, এবং ইহাদের শক উৎপত্তি না বলিয়া আর্য্য উৎপত্তি ধার্য্য করিয়াছেন। তিনি ইহাদের বিদেশ হইতে আগমনের প্রমাণের অত্যন্ত অভাব বলেন। Vide "A Glossary of the Tribes & Castes of the Punjab"—Ibbetsons. Vol. III.

যাহা আজকাল 'সিস্তান' বলিয়া অভিহিত হয়, সেই স্থানটি অধিকার করতঃ আফগানীস্থানে ক্রমে ক্রমে স্থানীয় অধিবাসীদের জয় ও নূতনধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে লাগিল। এই প্রকারে দেশ জয় ও মুসলমানকরণ চারি শতাব্দী পর্য্যন্ত চলে। কাবুলের বৌদ্ধ (তুর্কি 'সাহি' বংশ) ও হিন্দু (ব্রাহ্মণ 'সাহি' বংশ) রাজারা মুসলমান আক্রমণ চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত হটাইয়া রাখিয়াছিল কিন্তু দশম শতাব্দীর শেষে তুর্কি সবকতেগীন হিন্দুর নিকট হইতে কাবুল জয় করে এবং তাহার পুত্র মামুদ পঞ্জাব জয় করিয়া উহা স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। এই প্রকারে এই অঞ্চলে মুসলমানকরণ চলে। ফার্শি ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে আফগানেরা পঞ্চদশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণভাবে মুসলমান হয়।

সিন্ধুপ্রদেশে আরবেরা অষ্টম শতাব্দীতেই হানা দিয়াছিল। ৭১২ খৃঃ সিন্ধুদেশের (তৎকালে বর্ত্তমান বেলুচিস্থান সিন্ধের অন্তর্ভুক্ত ছিল) রাজা দাহিরের সহিত আরবদের কলহ উপস্থিত হয়; এবং শেষে মহম্মদ-বিন-কাসেম মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া পারস্য হইতে আসিয়া মূলতান পর্য্যন্ত সিন্ধু জয় করে এবং উহা আরব সাম্রাজ্যভুক্ত করে। কাসেমের এই অভিযানে হিন্দু ব্রাহ্মণ, ঠাকুর (ক্ষত্রিয়), বৌদ্ধ মোহান্ত, রাজার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদেশীয়দের সহিত যোগদান করিয়াছিল (১৭)! এমন কি 'নেরুন' (বর্ত্তমান 'হাইদারাবাদ') (১৮) নামক দুর্গের বৌদ্ধ-শ্রমণ-নেতা পূর্ব্ব হইতেই দক্ষিণ পারস্যের আরব শাসন-কর্ত্তা আল-হেজাজের সঙ্গে গোপন সন্ধিতে (চুক্তি) আবদ্ধ ছিল এবং আরবদের সেই কেল্লা সমর্পণ করে!

১৭। Chhach-Nama—Translated into English by Gidumal.

১৮। Dr. R. C. Mazumdar—The Arab Invasion of ndia, Pp. 27—28. Vide Dacca University Supplement. Bulletin No. XV.

এই বিধর্মী ও বৈদেশিক অভিযান যখন ভারতের পশ্চিম দ্বারে হানা দিতেছিল তখন ভারতের অভ্যন্তরে মাৎস্য-ন্যায়ের এক আশ্চর্য্য লীলাভিনয় চলিতেছিল। বিভিন্ন রাজারা পরস্পর হানাহানি করিতেছিল। ভারতের একজাতীয়তা পুনর্গঠনে কেহই দৃষ্টি দেয় নাই, কারণ একচ্ছত্র রাষ্ট্র কেহই সংস্থাপন করিতে পারে নাই।

এই সময়ে শ্রেণীসমূহ বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় জাতিতে পরিণত হইয়াছে; কারণ দশম শতাব্দীর পর হইতে অসবর্ণ বিবাহের কোন সংবাদ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। পুনঃ খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে লিখিত আনহালওয়াড়ার চালুক্য রাজাদের প্রদত্ত লিপিগুলিতে পুরুষানুক্রমিক কায়স্থ বংশের উল্লেখ আছে (কায়স্থান্বয় প্রসূত ঠাকুর সাতিকুমার সুত সোমসিহেন)। এই সময়ে আমরা জাতিগত বংশপরম্পরার সন্ধান পাই। (১৯) এই সময়ের ব্রাহ্মণ্যবাদীয় মনোবৃত্তি দেখিয়া সমাজের অবস্থা বুঝা যায়। 'সংত্রিমিসাং-মাতা' নামক স্মৃতিতে (ইহা মিতাক্ষরা, হরদত্তের পুস্তকে গ্রাহ্য হইয়াছে) উল্লিখিত আছে যে, "বৌদ্ধ, পাশুপত্য, জৈন, নাস্তিক এবং কপিলের শিষ্যদের গাত্র স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়" (২০)। কানে (Kane) অনুমান করেন যে, উক্ত স্মৃতিপুস্তক খৃষ্টীয় ৭০০—৯০০ শতকে লিখিত হয়। আবার "বিষ্ণু ধর্ম্মসূত্র" গ্রন্থে হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্র পরিহিত সাধুদের (বৌদ্ধ) ও কাপালিকদের দর্শন মঙ্গলজনক নহে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (৬৩, ৩৬)। এই স্মৃতিতে ম্লেচ্ছ অন্ত্যজদের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে (৭১, ৫৯); এবং ম্লেচ্ছদেশে পর্য্যটনও নিষেধ করা হইয়াছে (৮২,২)। ইনি বলেন, "চাতুর্ব্বর্ণব্যবস্থানং যস্মিনদেশে ন বিদ্যতে। সম্লেচ্ছদেশাবিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্ত্ত অতঃপরঃ" (৬, ৮৪, ৪)। আর্য্যাবর্ত্তের সংজ্ঞা তিনি এতই

১৯। Ind. Antiquary, Eleven Land Grants of the Chalukyas of Anhilvad. Pp. 142—45.

২০। Kane—P, 239.

ছোট করিয়া দিয়াছেন! পুনঃ, অপরার্ক (বৃহৎ যাজ্ঞবল্ক্যে উদ্ধৃত) বলেন; "পারসীকের অঙ্গস্পর্শ চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ ও ভিলের স্পর্শতুল্য" (২১)। অথচ সপ্তম শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি দ্বিতীয় পুলকেশী পারস্ত সম্রাট দ্বিতীয় খস্রুর সহিত রাজদূত প্রেরণ কার্য্য বিনিময় করিয়াছিলেন (২২)। আর একখানা পুস্তক, যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতির উপর বিশ্বরূপের "বাল-ক্রীড়া" নামক টীকায় "ম্লেচ্ছ" অর্থে 'পুলিন্দ' ও 'তাজিক' (আরবদের মধ্য-এসিয়ার মুসলমান আক্রমণের প্রথমে তাহাদের 'তাজিক' বলা হইত; এক্ষণে সেই স্থানের ফার্সীভাষী কৃষকদের এই নামে অভিহিত করা হয়; মহম্মদঘোরীর ভারত-আক্রমণকারী সৈন্যদলে 'তাজিকেরা' ছিল) বলা হইয়াছে (২৩)। আর একটি নিষেধাজ্ঞা দেখিয়া মুসলমান আক্রমণ যুগের মনোভাব বুঝা যায়। হরদত্ত (গৌতমসূত্রের টীকা, ১৭, ৩৩) হিঙ্গ খাওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তৎপর পদ্মপুরাণেও তুরস্কদের সহিত বাক্যালাপ নিষেধ করা হইয়াছে।

এই সকল নিষেধাজ্ঞা দেখিয়া মনে হয়, বিদেশী মুসলমানদের সহিত সংঘর্ষের সময় এইসব পুস্তক লিখিত হয়; হিন্দুরাও তখন সঙ্কীর্ণমনা হইয়া ক্রমশঃ কূর্ম্মাবস্থা প্রাপ্ত হইতে সুরু করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত 'সৎত্রিমি-সাংম্মাতা' পুস্তকে নানা প্রকার পাপ ও স্পর্শদোষজনিত অপবিত্রতা হইতে পবিত্র হওয়ার ব্যবস্থা প্রদান করা হইয়াছে (২৪)। ইতিপূর্ব্বেই মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বৌদ্ধপ্রধান দেশসমূহ ব্রাহ্মণবর্জ্জিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

২১। Kane—P. 188.

২২। অজন্তা গুহায় আবিষ্কৃত Fresco Painting দ্বারা পারস্ত রাজদূতকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবার ব্যাপারটি চিরস্মরণীয় করিয়া রাখা হইয়াছে।

২৩। Dr. R. C. Mazumdar—The Arab Invasion of India, Dacca University Suppl. Bulletin No XV. P.27—28.

২৪। Kane—236, 259.

অত্রি বলিয়াছেন, মগধ, মথুরা অন্য তিন স্থানের ব্রাহ্মণেরা বৃহস্পতির ন্যায় পণ্ডিত হইলেও শ্রাদ্ধতে সম্মানিত হন না (৪৫)। এক্ষণে বৌদ্ধদের সঙ্গে ম্লেচ্ছদের সংযোগ সংস্থাপন করা হইল! এমন করিয়া ব্রাহ্মণেরা চারিদিকে, প্রাচীর দ্বারা নিজেদের বেষ্টন করিতে লাগিল। এই সময়ে জাতিভেদ, স্পর্শদোষ, বিধর্ম্মীর প্রতি ঘৃণা, ব্রাহ্মণদের দ্বারা অত্যন্ত বাড়াইয়া তোলা হইল! এমতাবস্থায় পতিতদের ভাগ্যে অতীব দুর্দ্দশা ভিন্ন আর কি জুটিবে? ব্রাহ্মণ্যবাদী ছুঁৎমার্গীয় জাতিভেদের ভীষণ কড়াকড়ি ও বিধি-নিষেধ সম্বলিত বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের গোড়াপত্তন এই সময় হইতেই সুরু হয়।

ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সমাজের এই অবস্থা। এক্ষণে বৌদ্ধদের বিষয় অনুসন্ধান করা যাউক। গুপ্ত-যুগের পর যেসব ধর্ম্মমত ভারতে বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে তাহাদের মধ্যে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সম্প্রদায়গুলি এবং বৌদ্ধ মহাযান ও তাঁহার শাখাগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমোক্ত-দের বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। বৌদ্ধ মহাযানেও পারিপার্শ্বিক সামাজিক পরিস্থিতি বিশেষভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। সমাজে তখন সামন্ততন্ত্র পুরাদমে চলিতেছে। কাজেই তাহা বৌদ্ধধর্ম্মে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। মহাযান ধর্ম্মমণ্ডলীতে স্তর-বিভাগ উদ্ভূত হয় এবং দেবতাদের মধ্যেও তদ্রূপ। এই ধর্ম্মেও সর্ব্বোপরি বুদ্ধ আদর্শরূপে বিরাজ-মান, আর তাহার নিম্নে অনেক বিভিন্ন স্তরের দেব ও দেবীর দল। বৌদ্ধ দেবতারা সগুণ, তাঁহারা ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তাঁহাদের বরে অভাবনীয় ও অলৌকিক ঘটনা ঘটে। এই ধর্ম্মে গুরুবাদে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। সামন্ততান্ত্রিক প্রভু বা মনিবের স্থান গ্রহণ করেন গুরু; অনেক স্থলে স্থানীয় সামন্তের স্থান গুরু বা মোহান্ত গ্রহণ করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলির "গুরুপ্রসাদ"-প্রথা (গুরুর

কাছে শিষ্যের স্ত্রীর প্রথম বিবাহিত রজনী যাপন) এই প্রকারে উদ্ভূত হয়। উড়িষ্যার অনেক স্থলে এই অনুষ্ঠানে মোহান্তের পরিবর্তে স্থানীয় রাজা দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। ভারতে এই সামন্ততান্ত্রিক প্রথাটির উৎপত্তির মূল অজ্ঞাত, কিন্তু স্থানভেদে এই কদর্য্য প্রথাটি জমিদার বা গুরু দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। (২৫) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী মধ্যে মহাযান ধর্ম্মের বিভিন্ন শাখার প্রসার লাভ হয়। (২৬) এই ধর্ম্মপ্রসারে শ্রেণী-লক্ষণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

এই যুগে তান্ত্রিক মত উদ্ভূত হয়। মহাযানী "মন্ত্রযান" শাখা এই মত প্রচার করে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মধ্যেও এই মত বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু বৌদ্ধ লেখকেরা বলিয়াছেন, তীর্থিক (অ-বৌদ্ধ) তান্ত্রিক সিদ্ধাপেক্ষা তাঁহাদের সিদ্ধদের অলৌকিক ক্রিয়াশক্তি (Magic) বেশী। (২৭)। সেই সময়ে "অষ্টসিদ্ধি" লাভ করাই সিদ্ধদের কার্য্য ছিল। ইহার মধ্যে, চক্ষু রোগের ঔষধ, সোনার রঙ্গ (Gold Tincture) প্রস্তুত করা, অমৃত লাভ, পারা সিদ্ধি প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধির অন্তর্গত ছিল। নাগার্জ্জুন এই অষ্টসিদ্ধিলাভ করেন। এই মতের স্ত্রীলোক-সিদ্ধাদের "ডাকিনী," বলা হইত। ইহা স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, এই সিদ্ধেরা "আল-কেমী" চর্চ্চা করিতেন এবং তদ্বারা লোকদের মুগ্ধ করিতেন। পূর্ণ সিদ্ধেরা শেষে সশরীরে স্বর্গে আরোহণ বা অন্তর্ধান করিতেন। লামা তারানাথ বলেন, সম্রাট ধর্ম্মপালের সময় হইতে সিদ্ধেরা ভারতে বেশীভাবে আবির্ভূত হন; ইহার অর্থ, পাল রাজাদের সময়ে মহাযান ধর্ম্ম বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়; তখন সামন্ততন্ত্র পুরাদমে চলিতেছে। এই প্রকারে অজ্ঞ গণসমূহ আল-কেমীর তুকতাক ও তান্ত্রিক মারণ উচাটনের প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া থাকিত।

২৫। এই প্রথা এক সময়ে ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক যুগে ছিল। এ বিষয়ে Westermarck in "History of Human Marriage" দ্রষ্টব্য

২৬। H. P. Shastri—Introduction to N. N. Vasu's "The Modern Buddhism in Orissa দ্রষ্টব্য।

২৭। Taranatha—মাণিকের খনি দ্রষ্টব্য।

এই যুগের সংস্কৃত সাহিত্যে ইহা প্রতিফলিত হইয়াছে। তৎপর, মহাযানীয় আদর্শ ছিল—ভাব ও অভাব অন্তর্হিত হইয়া মন নিরালম্ব হইলে নির্ব্বাণ পাওয়া যায়, (সরোরুহ পাদের 'অদ্বজবজ্র' টীকা দ্রষ্টব্য) (২৮)। ব্রাহ্মণ্যবাদে নাকি ইহাকেই "কৈবল্য" প্রাপ্তি বলে। এতদ্বারা মনকে সর্ব্বপ্রকারের চিন্তাবিমুক্ত (Tabula Rasa) করা হয়। এই প্রকারের মন "দ্বন্দ্বভাব" (Antithesis) বিরহিত হইয়া নিশ্চেষ্ট হইবেই। তদুপরি, গুরুবাদের প্রকোপ, কাজেই তৎকালে মানব স্থানুবৎ অসাড় হইয়া নিজের কর্ম্মফল, গুরু এবং তাহার অলৌকিক কর্ম্মের উপর ইহলোকের ও পরলোকের সমস্ত আশাভরসা ন্যস্ত করিত! তাহার আর উপায়ই বা কি ছিল? ভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বাধীন গণরাষ্ট্রসমূহ বিধ্বংস হয়, সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণ লোকদের নানাপ্রকারে নিষ্পিষ্ট করিতে ছিল। রাজশক্তি ক্রমাগত যথেচ্ছাচারী হইতেছিল, তদ্বারা স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিধ্বনিগুলিও অন্তর্হিত করায়। তৎপর খণ্ডরাষ্ট্রসমূহ উদ্ভূত হয়, তখন তাহাদের যুদ্ধে দেশ ছারেখারে গিয়াছিল। কাজেই নিজের কর্ম্মফল ও ব্যবহারিক দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার জন্য গুরুর অলৌকিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিতে হইত। ইহারই ফলে আরব ও তুর্কি আক্রমণ এত সুগম হয়। তৎকালে মানবের না ছিল স্বাধীন চিন্তাশক্তি, না ছিল স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি। মুসলমান আক্রমণের প্রাকালে সমাজে ঘোর অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। লোকে এত কুসংস্কারাপন্ন ও অন্ধবিশ্বাসী হইয়াছিল যে তাহার বিবরণ পাঠ করিলে তাহাদেরই বংশধর আমরা আজ আশ্চর্য্যান্বিত হই। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা এই ব্যাপারের সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

২৮। শাস্ত্রী—"বৌদ্ধ গান ও দোঁহা"

চতুর্থ অধ্যায়

অন্ধ্র-শতবাহন যুগ (দক্ষিণ-ভারত)

যখন বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে বিশেষভাবে প্রবল হইয়া উঠে, যখন বৌদ্ধ-রাজারা বৈদিক দেবদেবী ও ক্রিয়াকাণ্ডে অনাস্থা প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন পুরোহিতশ্রেণীর মাথায় বাজ পড়িল! ক্ষত্রিয়েরা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, বৈশ্য এবং শূদ্রগণও সাম্যবাদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল, পুরোহিতদের বনিয়াদী স্বার্থে আঘাত পড়ে; এই সময় শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণ প্রবৃত্তির দ্বারা প্ররোচিত হইয়া ব্রাহ্মণেরা অবৈদিক ও অসংস্কৃত-ভাষী লোকদের নিজেদের শিষ্য করিতে লাগিল। একদিকে বৌদ্ধেরা যেমন ভারতীয় ও অ-ভারতীয় স্ত্রীলোক ও বালক সকলকে নিজেদের সংঘে আকর্ষণ করিতে লাগিল, অন্যদিকে ব্রাহ্মণেরা বৈদিক সভ্যতার বাহিরের লোকদের মন্ত্র প্রদান করিতে লাগিল! স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, উভয় দলই দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া শিষ্য বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই বিষয়ে ব্রাহ্মণেরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হইয়াই দক্ষিণের দ্রাবিড়-ভাষী জাতিদের মন্ত্রশিষ্য করিতে লাগিল। এই বিষয়ে ব্রাহ্মণদের লাভ বেশী; একটা গ্রাম একজন ব্রাহ্মণের মন্ত্রশিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে সেই ব্রাহ্মণের কয়েক পুরুষের যজমানী করিয়া বসিয়া খাওয়া চলে। যদি উত্তরের আর্য্য-নামধারী শিষ্যেরা হস্তচ্যুত হয় তাহা হইলে দক্ষিণের ও অন্যান্য স্থানের লোকদের শিষ্য করিলে বিশিষ্ট সুবিধা হইবে—এই মনোভাব লইয়া তাহারা অনার্য্যভাষী ও আর্য্যসভ্যতার বহির্ভূত লোকদের "হিন্দু" করিতে লাগিল (১)। ইহার ফলে দক্ষিণ-ভারত ধর্ম্মে আজ "হিন্দু" হইয়াছে। কিন্তু

১। ব্রাহ্মণদের উক্ত প্রচেষ্টা যুগে যুগে হইয়াছে; মুসলমান যুগে ইহা বন্ধ হয় নাই। বর্ত্তমানেও এই প্রচেষ্টা সতেজে চলিতেছে।

বোধ হয় উত্তর-ভারতীয় লোকদের উপনিবেশ কম হওয়ায় তথাকার ভাষা পরিবর্ত্তিত হয় নাই, যদিচ তাহা সংস্কৃত শব্দবহুল হইয়াছে।

অন্যদিকে যে-সকল বিদেশীজাতি ভারতে প্রবেশ করে আমরা তাহাদের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে দেখি। জগতের ইতিহাসে দেখা যায়—যে-সব বর্ব্বর জাতি সভ্য জাতিসমূহের সংস্পর্শে আসে তাহারা নিজেদের সুবিধানুযায়ী একটা সভ্যতা ও তৎসংক্রান্ত ধর্ম্ম পছন্দ করিয়া নেয়। এই পছন্দ বিষয়ে কোন্ ধর্ম্মটা অভ্রান্ত সত্য অথবা কোন্‌টা যুক্তিসম্মত—এই তর্ক উঠে না। বোধ হয়, প্রথমে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদ অপেক্ষা উদার এবং আন্তর্জ্জাতিক ভাবাপন্ন বুদ্ধের মতবাদ এইসব বৈদেশিকদের অধিক সুবিধা প্রদান করিয়াছিল; সেইজন্যই আমরা কণিষ্ককে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে দেখি। কিন্তু কালে আবার এই বৈদেশিকজাতি-সম্ভূত কোন কোন রাজাকে পৌরাণিক দেবতার ভক্ত হইতে ইতিহাসে উল্লিখিত হইতে দেখি। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু ঠাকুরের ভক্ত হইলেও যে, তাহারা ব্রাহ্মণ্যবাদীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। বরং আমরা ইতিহাসে দেখিয়াছি যে, গুজরাট অথবা পশ্চিম ভারতের ক্ষত্রপবংশ ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ ও 'সিংহ' উপাধি ধারণ করতঃ ব্রাহ্মণ রাজবংশে কন্যার বিবাহ দিয়াও ব্রাহ্মণ্যবাদীয় গুপ্তরাজাদের নিকট বিদেশী বলিয়া অভিহিত হয় এবং তজ্জন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কালে ব্রাহ্মণেরা ম্লেচ্ছ, যবন পহ্লব, পারদ, শক, হুন প্রভৃতি জাতিদের দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধবৃত্তি নিজেদের কাজে লাগাইতে আরম্ভ করে (২)। "গরজ বড় বালাই" জানিয়া ব্রাহ্মণেরা

২। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর বলেন—শক, গুজর প্রভৃতি বিদেশী জাতিগুলি হিন্দুসমাজে স্থানলাভ করিয়াছে। কিন্তু বৈদ্য প্রভৃতি ইহার প্রতিবাদ করেন এবং অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তিও আবার বৈদ্যের মতের বিরোধিতা করেন। হুনেরা প্রাচীন কালে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। মল্লীনাথের রঘুবংশের টীকা, জৈন প্রবন্ধগুলি, "বিক্রমাঙ্কদেব চরিত", দ্রষ্টব্য ।

ভারতে পুনঃ পুনঃ যাহা করিয়াছে, অর্থাৎ অন্যান্য মূলজাতীয় লোকদের আর্য্যসভ্যতাপন্ন সমাজে গ্রহণ করিয়াছে, আর একবার এইসকল বিদেশী-বংশসম্ভূত লোকদের জন্য সেই ব্যবস্থা করে। জনশ্রুতি অনুসারে (ভবিষ্যপুরাণ, প্রতিসর্গ পর্ব্ব, ৬।৪৫-৪৯ শ্লোক) গুজরাটের আবু পাহাড়ের উপর ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ বা জৈনদের বিরুদ্ধে যোদ্ধা সৃষ্টি করিবার জন্য এক যজ্ঞ করে(৩)। এই যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড হইতে চারজন লোক উত্থিত হয় ; তাহারা অগ্নি হইতে উৎপন্ন বলিয়া "অগ্নিকুল" (৪) আখ্যা প্রাপ্ত হয় (ভবিষ্য-পুরাণ মতে তাহাদের দিব্য শস্ত্রে চারিলক্ষ বৌদ্ধ প্রহৃত হইয়াছিল—ঐ)। এই চারিজন জাতিতে বর্ণাশ্রমান্তর্গত ক্ষত্রিয় জাতি মধ্যে গণ্য হয় এবং রাজপুত বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিল। পরে এই চারিজন লোক হইতে বহুসংখ্যক "অগ্নিকুল রাজপুত" কৌমের উদ্ভব হয়। এই সময় হইতে ভারতের চারিদিকে "সিংহ" উপাধিধারী রাজপুত বলিয়া একটা জাতির নাম উল্লিখিত হইতে থাকে। বোধ হয় হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণ প্রতিক্রিয়ার যুগে কোন সময়ে ব্রাহ্মণেরা, জৈন ও বৌদ্ধ দলনের জন্য স্বদেশীয় লোকদের না পাইয়া এইসব ভারতীয় ভাবাপন্ন বিদেশী বংশোদ্ভব লোকদের হিন্দুত্ব প্রদান করে। এইজন্য তাহাদের শুদ্ধি করিয়া লইবার জন্য একটা বড় চমকপ্রদ নামধারী ঘটা (যজ্ঞ) করিয়া তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রদান করিয়া "জাতে" উঠাইয়া নেয়। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, পশ্চিম ভারতের যে-অংশে শক ক্ষত্রপেরা রাজত্ব করিত, সেইস্থানেই এই শুদ্ধি-

---

৩। E.-P. Ind vol. IX. No. 2. Vasantgarh Inscription of Purnapala. ইহাতে উক্ত হইয়াছে, বশিষ্ঠের ক্রোধে পরমার বলিয়া এক কুমার সৃষ্ট হয়। পুনঃ নেমীনাথের মন্দিরের জৈন লিপিতে বশিষ্ঠের যজ্ঞকুণ্ড হইতে পরমারদের আদিপুরুষের উদ্ভবের কথা আছে। Vide EP, Vol VIII. No. 21 P. 201.

৪। এই 'অগ্নিকুলের' কাহিনীটি কেবল রাজপুতদের মধ্যে আবদ্ধ নয়।

ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহার অর্থ কি ক্ষত্রপ চষ্টনের "সিংহ" উপাধিধারী বংশধরেরাই শুদ্ধিক্রিয়া দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয় এবং "অগ্নিকুল রাজপুত" নাম ধারণ করে? ইহাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয় (৫)।

হর্ষবর্দ্ধনের যুগের পর থেকে খোদিত লিপিসমূহে আমরা 'রাজপুত্র', 'কায়স্থ' শব্দদ্বয় রাজকর্ম্মচারীদের তালিকার মধ্যে পাই, কিন্তু সেই স্থলেও তাহা জাতিবাচক ছিল না। কিন্তু এই নামে দুইটি জাতি ভবিষ্যতে গড়িয়া উঠে। "রাজপুত" কথাটা সংস্কৃত "রাজপুত্র" শব্দের অপভ্রংশ; পূর্ব্বের "রাজন্য" শব্দের সহিত সম অর্থবাচক। এইযুগে দেখা যায়, "সিংহ" উপাধিধারী রাজপুত জাতি উত্তর, পশ্চিম ও মধ্যভারতের সর্ব্বত্র গজাইয়া উঠিতেছে! উত্তর ভারতের মধ্যে সম্ভবতঃ বাঙ্গালা এবং দক্ষিণ-ভারত এই বিষয়ে বাদ পড়ে (৬), যদিচ এই সব স্থানে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীকারী লোকদের অভাব ছিল না। ইহার অর্থ কি এই যে, যে-সব স্থানে ব্রাহ্মণদের দ্বারা নূতনভাবে ক্ষত্রিয় জাতির সংগঠন" হইয়াছে তথায়ই "সিংহ" উপাধিধারী রাজপুতের বাস দেখিতে পাওয়া যায়? ইহার অর্থ কি কেবল কতকগুলি যোদ্ধবৃত্তিসম্পন্ন জাতি হইতেই এই রাজপুত জাতির সৃষ্টি করা হয়? অথবা যে-সব লোক ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্বীকার করিল তাহারাই রাজপুত হইল? শবর স্বামী মীমাংসাসূত্রের টীকায় (২য় অধ্যায়) লিখিয়াছেন যে, "রাজ" শব্দ ক্ষত্রিয়বাচী। আর্য্যাবর্ত্তে রাজকর্ম্মচারী বা যোদ্ধৃবৃত্তিধারী ক্ষত্রিয় 'রাজা'; কিন্তু অন্ধ্র দেশে এই কর্ম্মে ব্যাপৃত অন্য জাতীয় লোকও 'রাজা'। অন্ধ্র দেশের রাজুরা ক্ষত্রিত্বের দাবী করেন। হয়ত এই প্রকারে

বাঙ্গালার কায়স্থদের যাহারা পশ্চিমাগত বলিয়া দাবী করে তাহাদের জন্য কান্যকুব্জ হইতে আগমনের বৃত্তান্ত মধ্যে 'অগ্নিকুলের' নাম উল্লেখ দেখা যায়।

৫। Dr. B.N. Dutta—"The Rise of the Rajputs in Journal of Bihar & Orissa Research Society, March, 1941.

৬। সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিতে" "সিংহ" নামধারী সামন্ত রাজাদের নাম পাওয়া যায়।

যোদ্ধবৃত্তিধারীদের 'রাজপুত্র' অতএব ক্ষত্রিয় সংজ্ঞা হয়।

বোধ হয় বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতির বিপক্ষে নিজেদের স্বার্থের champion (রক্ষাকর্ত্তা) অনুসন্ধানকালে ব্রাহ্মণেরা যাহাদের নিজেদের দলে পাইয়াছিল তাহাদিগকেই নব ক্ষত্রিয়ত্ব পদ প্রদান করে এবং ইহাদের সকলেই "সিংহ" উপাধিধারী রাজপুত নাম গ্রহণ করে (৭)। এতদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এক সময়ে নূতন ক্ষত্রিয়শ্রেণী সৃষ্টি করিবার জন্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা একটা ভারতব্যাপী আন্দোলন করা হইয়াছিল। কথিত আছে এই অনুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া বৌদ্ধাচার্য্য আর্যদেব লিখিয়া গিয়াছেন—ইদানীং অক্ষত্রিয়েরাও ক্ষত্রিয় হইতেছেন। এই ঘটনা নূতন নহে, পুরাণোক্ত রাজা বিশ্বস্ফাণিও একটা নূতন ক্ষত্রিয়শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছিল। এইবারও একটা আন্দোলন হইয়াছিল যদ্বারা নানাশ্রেণীর লোকদ্বারা একটা নূতন জাতি সংগঠিত হয়, ইহাদের প্রাচীন "রাজন্য" নাম না দিয়া 'রাজপুত্র' বা 'রাজ-পুত' নাম প্রদত্ত হয় (৮)। খোদিত লিপিসমূহ পাঠে ইহা অবগত হওয়া যায় যে, মৌর্য্যযুগ থেকে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবাকারী লোকেরও অভাব ছিল না। এই জন্য এই রাজপুত জাতি-সংঘ মধ্যে হয়ত অনেক লোক ছিল যাহারা পূর্ব্ব হইতে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিত। এতদ্ব্যতীত বিদেশীয় বংশোদ্ভব এবং নিম্নতর শ্রেণীর লোকও ছিল (৯); রিসলী প্রদত্ত রাজপুতজাতির

৭। শিখধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা বাবা নানক হইতে গুরুগোবিন্দ সিংহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিখেরা সাধারণতঃ "হিন্দু" নাম ধারণ করিত। কিন্তু গুরু গোবিন্দ তাঁহার শিষ্যদের যোদ্ধৃশ্রেণীতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সিংহ উপাধি প্রদান করেন। এই "সিংহ" উপাধি—সিংহের ন্যায় তেজোব্যঞ্জক এই অর্থে ব্যবহৃত। বোধ হয় উক্ত উপাধি রাজপুতদের অনুকরণে গৃহীত হয়।

৮। উত্তর বঙ্গের কোচেরা হিন্দু হইয়া 'রাজবংশী' নাম ধারণ করতঃ এখন "ক্ষত্রিয়" নাম জাতিবাচক বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন।

৯। অধ্যাপক জয়চন্দ্র নারং তৎপ্রণীত "ইতিহাস প্রবেশ" নামক হিন্দী পুস্তকে রাজপুতদের প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের বংশধর বলিয়াছেন। কিন্তু

শারীরিক মাপের বিশ্লেষণ করিলে তাহাদের মিশ্রিত উপাদানসমূহ বাহির হয়। রিসলী প্রদত্ত রাজপুতদের নাসিকার গঠন (nasal index) গুজার ও জাঠ হইতে নিকৃষ্ট, অর্থাৎ চওড়া এবং অস্পৃশ্য "মিনা" ও "চুড়ার" উপর (১০)। আবার রাজপুতদের আদিস্থল যুক্তপ্রদেশের ছত্রিদের যে মাপ রিসলী দিয়াছেন তাহারও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ লোক সাধারণ ভারতীয়ের ন্যায় লক্ষণযুক্ত (Dolichoid-mesorrhin) এবং তাহার পরের ভাগ আদিম অধিবাসীদের নাসিকার ন্যায় লক্ষণাক্রান্ত (Dolichoid chamoerrhin) এবং রিসলীর ইণ্ডো-আর্য্য ও ডেনিকানের ইণ্ডো-আফগান' (Dolicocephal leptorrhine) নামক জাতির লক্ষণ রিসলী দ্বারা মাপ নেওয়া (somatological measurements) লোকদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যায় পাওয়া গিয়াছে। পুনঃ, খৃঃ ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে ডাঃ গুহ বাঙ্গালার অনাচরণীয় পোদ জাতির সহিত রাজপুত ও মারাঠাদের নিকট-সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন। (১১) এই সকল লক্ষণ দ্বারা এই বোধগম্য হয় যে, এই নব-ক্ষত্রিয়ের দল নানা মূল উপাদানে (Racial elements) সৃষ্ট—ইহারা একটি মিশ্রিত জাতি। এখন হইতে আমরা "শ্রেণীর পরিবর্ত্তে "জাতি" (caste) শব্দ ব্যবহার করিব; কারণ দশম শতাব্দীর পর হইতে অসবর্ণ বিবাহের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না (১২)। এখন আমাদের লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উক্ত অনুষ্ঠান মধ্যে

ইহা অসম্ভব; কারণ এখনও রাজপুত সৃষ্ট হইতেছে।

১০। Dr. B. N. Datta—"Das Indische Kasten System" in "Anthropos" Bd. 22, 1927; "Racial Elements in Caste" in "Studies in Indian Social Polity". Ch. iv,

১১। Census of India, 1934, vol, I, pt. III, Ethnographical, P, vii.

১২। Dr, R. C. Mazumder—Corporate Life in Ancient India, Pp. 372—374.

শ্রেণী-সংগ্রামের কি পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত অনুষ্ঠানটি দেশের যে যুগে সংগঠিত হইয়াছিল সেই সময়ের সামাজিক ইতিহাস নাই। এই সময়কে ভারতের "অন্ধকার যুগ" (Dark Age) বলিতে হইবে। হর্ষবর্দ্ধনের পরে ভারতে বৌদ্ধদের রাজনীতিক প্রাধান্য হয় নাই; পূর্ব্ব-ভারতে (মগধ ও বঙ্গ) তাহার দুইশত বৎসর পরে বৌদ্ধ পালরাজাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিন্তু তাহারা প্রজাবর্গ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া কিম্বা স্বভাবতঃ উদারতার জন্য পক্ষপাতশূন্য হইয়া সকল ধর্ম্মের লোকদের সহিত সমান ব্যবহার করিত। গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদীয় লোক এবং ব্রাহ্মণেরাও তাহাদের রাষ্ট্রে উচ্চপদ পাইত। তত্রাচ এই "শুদ্ধি" আন্দোলন দ্বারা ব্রাহ্মণদের "রাজপুত" সৃষ্টি করিবার চেষ্টা বাঙ্গালায় হয় নাই বলিয়াই প্রতীত হয়। বাঙ্গালায় যদি খাটি "ক্ষত্রিয়" জাতির অভাব ছিল তথাপি মনুক্ত "ব্রাত্য" ক্ষত্রিয়ের অভাব ছিল না! মনুর সেই বিখ্যাত শ্লোকে, "পৌণ্ড্রকা খশাঃ" (১০,৪৩—৪৪) বাঙ্গালার পৌণ্ড্রদের বৃষলত্ব প্রাপ্ত (জাতিচ্যুত বা ব্রাত্য) ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুরে সোমপুরী বিহারের ভগ্নাবশেষ মধ্যে মৌর্য্যদের যে তাম্রফলক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তদ্দারা জয়সওয়াল বলেন যে, মৌর্য্যযুগের উত্তর-বঙ্গীয় "সামবঙ্গীয়ের (১৩) উত্তর-বিহারের ভজ্জিদের ন্যায় ব্রাহ্মণ বিরহিত ক্ষত্রিয় জাতি ছিল। ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিবার এইসব উপাদান বঙ্গে থাকিতেও সেইযুগে এই প্রদেশে কেন "রাজপুত" (১৪) সৃষ্ট হইল না তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

১৩। Vide Bhandarkar—Epigraphica Indica. April, 1931, 88 ff. এই বিষয়ে আরও আলোচনা অধ্যাপক এইচ, সি, রায় চৌধুরীর History of Ancient India, ফুটনোট্ দ্রষ্টব্য, ২২৪ পৃঃ, Ed. 1938; K. P. Jayaswal in "Journal of Bihar and Orrissa Research Society," 1936, ff, এবং Presidential speech at Indore Oriental Conference দ্রষ্টব্য।

১৪। "সেখ শুভোদয়া" নামক আবিষ্কৃত সংস্কৃত গ্রন্থে বাঙ্গালায়

ঐতিহাসিক টড (Todd) বলেন, ব্রাহ্মণদের দ্বারা সৃষ্ট রাজপুতেরা তাহাদের রক্ষাকর্ত্তা সাজিয়া বৌদ্ধদলন করে (১৫)। বাঙ্গালা বৌদ্ধ-প্রধান দেশ এবং বঙ্গ ও মগধের রাজশক্তি বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়ে ছিল বলিয়া

"রাজপুত" নামক ক্ষত্রিয় জাতির উল্লেখ আছে। কিন্তু পণ্ডিতদের মতে ইহা মোগল আধিপত্যের প্রারম্ভে লেখা হয় এবং ইহা প্রামাণিক গ্রন্থ নয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে লিখিত "বল্লালচরিতে" ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় ও রাজপুত্র জাতিদের উল্লেখ আছে।

১৫। এই সামাজিক অনুষ্ঠান যাহার আংশিক সংবাদ পূর্ব্বোক্ত আবু পর্ব্বতের যজ্ঞ ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যায় না, তাহা একটা বিরাট সংঘবদ্ধ আন্দোলন দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল, নতুবা সর্ব্বত্রই নব-ক্ষত্রিয়েরা এক নাম গ্রহণ কি প্রকারে করে! প্রাচীন সংস্কৃত "ক্ষত্রিয়" শব্দের প্রাকৃত অপভ্রংশ "ছত্রি" নাম ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীকারী সকল প্রকার লোকই নিজের জাতিবাচক সংজ্ঞা বলিয়া ব্যবহার করে কিন্তু সকল "ছত্রিই" "রাজপুত" বলিয়া পরিচয় প্রদান করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মিথিলায় "ছত্রি" ও "রাজপুত" পৃথক জাতি (তথায় ছত্রি অপর জাতিটি হইতে উচ্চ ও বিশুদ্ধ বর্ণের বলিয়া দাবী করে)। বাঁকুড়া জেলার মল্লেরা নিজেদের 'ছত্রি' বলে এবং উপবীত ধারণ করে; কিন্তু তথাকার ঔপনিবেশিক রাজপুত হইতে তাহারা বিভিন্ন! যাহারা দক্ষিণ ভারতে (রাজু, ভেল্লেলা জাতিরা) ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করে তাহারা ক্ষত্রিয় হইলেও রাজপুত বলিয়া পরিচয় প্রদান করে না এবং তাহাদের মধ্যে কুল-প্রথা (clan-ship) নাই। অন্ধ্রদেশের ক্ষত্রিয়ত্ব দাবীদারেরা তেলেগু সমাজের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ; তাহারা নিজেদের "রাজু" নামে অভিহিত করে—তাহারা "রাজপুত" বলিয়া পরিচয় দেয় না। এতদ্বারা আমাদের এই অনুমান হয় যে, ভারতের একটি বিশিষ্ট অংশে সুবিধানুযায়ী একটা আন্দোলন হইয়াছিল; উহার উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধবাদীয় দলকে ধ্বংস করা। এই সংঘবদ্ধ আন্দোলনের

কি বৌদ্ধদলন জন্য পূর্ব্ব-ভারতে "শুদ্ধি" বা "সংগঠন" দ্বারা "রাজপুত" সৃষ্টি করিবার সুযোগ ব্রাহ্মণেরা পায় নাই (১৬)। এইজন্যই কি বাঙ্গালায় "নব-ক্ষত্রিয়" উদ্ভূত হয় নাই?—আর যাহা হইয়াছে তাহাও কি বৌদ্ধশাসনের অবসানের পর হইয়াছিল?

এই সময় হইতে ভারতীয় শ্রেণী-সংগ্রাম আর একটি রূপ পরিগ্রহ করে। ব্রাহ্মণ ও তাহাদের নূতন champion দল মিলিত হইয়া একটি বনিয়াদীস্বার্থের দল গঠন করে। এই নব-ক্ষত্রিয়েরা সেই প্রাচীন ক্ষত্রিয়-দের ন্যায় নিজেদের "প্রথম বর্ণ" বলিয়া দাবী করে নাই; নিজেরাই ব্রহ্ম-বিদ্যার অধিকারী এবং নিজের ও উপাস্যের মধ্যে পুরোহিতের মধ্যবর্ত্তিতা প্রয়োজন নাই বলিয়া কোন দাবী করে নাই। ইহারা বরং neophyte's zeal (নূতনধর্ম্মগ্রহণকারীর আগ্রহ) দ্বারা উত্তেজিত হইয়া গোঁড়া

ফলে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদীয় একটি শ্রেণী সৃষ্ট হয়, যাহা উচ্চশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইয়া ব্রাহ্মণদের বনিয়াদী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কৃতসংকল্প হয়। এই রাজপুতেরা সব ভূ-স্বামীর দলে পরিণত হয়, সকলেই কমবেশী জমি ভোগ-দখল করিত; এই জন্যই ইহাদের অপর একটি নাম "ঠাকুর" (Lord)! এই ভূম্যধিকারীর দল ভারতে পুনঃ পুরাদস্তুর কুল-প্রথা ও উহার আনু-ষঙ্গিক অন্যান্য অনুষ্ঠান—যথা, বদলী-প্রথা বা বৈরী, (blood-feud) 'বৈরীদায়' (Wer-geld) ও সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। শ্রীযুক্ত বৈদ্য তাঁহার History of Mediaeval India, vols II. and III, গ্রন্থে "অগ্নি-কুল রাজপুত" সৃষ্টির কথা অস্বীকার করেন। তিনি রাজপুত ও মারাঠাদের প্রাচীন বৈদিক ক্ষত্রিয়দের বংশোদ্ভব বলিতে চাহেন, কারণ উভয়দলের গোত্র ও প্রবর এক! কিন্তু ইহা অযৌক্তিক—এবিষয় অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে।

১৬। বিহারের রাজপুতেরা পশ্চিম হইতে আসিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। ভোজপুরীয়ারা হিন্দুযুগের পর বিহারে আসিয়াছে; এই বিষয়ে Hunter's Imperial Gazetteer দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মণ্যবাদী হয়। (১৭) প্রাচীন ইতিহাসের শিক্ষার ফল ইহারা পায় নাই; বরং সর্ব্বত্র নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিতেরা যেমন নবধর্ম্মের জনশ্রুতিকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করে তদ্রূপই ইহারা করিয়াছিল। প্রাচীন ইতিহাসের সহিত ইহাদের সম্পর্ক কেবল "সূর্য্যবংশ" বা "চন্দ্রবংশ" হইতে নিজের বংশ-তালিকা আবিষ্কার করা।

এই স্থলে একটি কথা উঠিবে যে, যদি এইসব ক্ষত্রিয়দের অনেকে পুরাতন নিম্নশ্রেণী ও বিদেশীয় জাতির লোক হইতে সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে তাহারা কেন শ্রেণী-জ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় নাই? শ্রেণী-চেতনার অভাব কেন তাহাদের মধ্যে হয়? ইহার উত্তরে ইহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা গোলামের মনোবৃত্তি এবং ক্ষুদে-বুর্জোয়া মনোবৃত্তি (petty-bourgeois mentality) এবং মনোবিজ্ঞানানুযায়ী আত্মদর্শনজ্ঞানের (Self and class Cognition) অভাব বিষয়ে আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে। এ বিষয়ের অনুসন্ধানকালে বর্ত্তমানের এবম্বিধ অনুষ্ঠানের মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান করিতে হইবে। আজকাল যাহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে চাহিতেছেন তাহাদের কেহই সাম্য চান না; এমন কি, তথাকথিত অস্পৃশ্যেরও ইচ্ছা নাই যে সমাজে সকলে সমান হউক। কেবল সে সমাজের উপরের স্তরে উঠিয়া একটু বড় হইবে—ইহাই তাহার দাবী! যে "জলচল" নয় সে উপরের স্তরের লোকের সহিত "জলচল" হইতে চায়, কিন্তু নিম্নস্তরের লোকের হাতে জল পান করিতে স্বীকার পায় না (১৮)। ইহার অর্থ সাধারণতঃ পারিপার্শ্বিক

১৭। ডাঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম তাহাদের পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়াই রাজপুত বংশগুলি এই ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিল। (History of Mediaeval India, P. 29) আবার বোধগয়া শিলা-লিপিতে উক্ত হইয়াছে, কান্যকুব্জের রাজা জয়চন্দ্রের বৌদ্ধ গুরু ছিল।—vide EP Ind. vol. V. Appendix. P. 261, March, 1929, PP, 14-30.

১৮। লেখক অনুসন্ধান করিয়া এই [illegible] পরিচয় পাইয়াছেন।

অবস্থা সমাজকে যে-পদ্ধতির মধ্যে রাখিয়াছে তাহারই ভিতর লোকে ঢুকিয়া একটা স্থান গ্রহণ করিতে চায়। বৌদ্ধ-বিপ্লব সমাজে কতটা সাম্য আনয়ন করিয়াছিল তাহা এখনও তর্কের বিষয়বস্তু হইয়া রহিয়াছে। সকলেই আর্য্য জন-শ্রুতি, আচার ও আইন গ্রহণ করিয়া এক জনসংঘ (People) গঠন করিয়াছিল। এইজন্যই বিদেশীয় মুসলমানেরা ভারতে আসিয়া সর্ব্বধর্ম্মের লোকদের "বুদপরস্ত" (মূর্ত্তি-উপাসক) ও "হিন্দু" এই আখ্যা প্রদান করে। (১৯) অনুমান হয়, বৌদ্ধেরা ভারতীয় মুসলমানদের ন্যায় একটা সম্পূণ পৃথক সমাজ গঠন করে নাই বলিয়া বৌদ্ধদের হাত হইতে রাজশক্তি অপসৃত হইলে, নিম্নশ্রেণীর লোকদের বা ব্রাত্যদের [পূর্ব্বোক্ত মনুশ্লোকে (১০, ৪৩—৪৪) দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, চীন, কিরাত, দরদ, খস প্রভৃতিদেরও বৃষল বলা হইয়াছে] বৌদ্ধ হইয়া "জাত হারাইয়া বষ্টুমে"র ন্যায় সমাজের এক কোণে থাকিবার কোন ইচ্ছা ছিল না; বরং ব্রাহ্মণ্য-প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধির সঙ্গে এই স্রোতে যোগদান করিয়া ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণ্য সমাজের দ্বিতীয় স্তরের লোক হইয়া আভিজাত্য সম্মান পাইবার লিপ্সা অত্যধিক হইয়াছিল। আর ইহারা যখন নিজেদের "ঠাকুর" (ভূস্বামী) বলিয়া নিজেদের পরিচয় প্রদান করে তখন ইহারা নিশ্চয়ই পতিতশ্রেণীয় ছিল না। কাজেই ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যানুসারে "ভূমীপ হইলে হইতে চায় ক্ষত্র, রাজন্য বলিয়া বেড়ায় যত্রতত্র" বলিয়া যাহারা জমি দখল করিয়াছিল, সেই ভূমীপেরা "রাজপুত"

১৯। আলবেরুনী বলিয়াছেন, তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও ভারতে বৌদ্ধদের সন্ধান পাননি, যদিচ তিনি ব্রাহ্মণদের সহিত তাহাদের কলহের কথা শুনিয়াছেন। তিনি অনুমান করিয়াছেন যে, হয়ত মুসলমানদের সহিত একীভূত হইয়া তাহারা মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ করে, সেইজন্য বিদেশীর নিকট তাহাদের পার্থক্য প্রকাশ পায় নাই।

নামধারী নবক্ষত্রিয় জাতিতে পরিণত হয় (২০)। ক্ষুদে-বুর্জোয়া' (petty-bourgeois) মনস্তত্ত্বানুযায়ী লোক উপরের স্তরের লোককে আদর্শ করে, গরীব মধ্যবিত্তশ্রেণীয় লোক, ধনীর পদ ও মর্য্যাদাকে অভিলষিত বস্তু বলিয়া আদর্শ করে। পুরাণের কাহিনীতেই ইহার ব্যাখ্যা আছে যে, ইহ জগতের রাজা স্বর্গের ইন্দ্রত্ব চাহিয়াছে, ইন্দ্র ব্রহ্মত্ব চাহিয়াছে। আর গোলামের মনস্তত্ত্বানুযায়ী গোলামেরা মনিবের আজ্ঞাবহ হয়, মনিবকে সর্ব্ববিষয়ে অনুকরণ করে। তজ্জন্য এই নব-ক্ষত্রিয়েরা বৈদিক ক্ষত্রিয়দের পদ গ্রহণ করিবার জন্য এবং তাহাদের শরীরগত বংশধর বলিয়া ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বীকৃত হইয়া সমাজে সম্মানিত হইবার জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিততন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণ পুরোহিততন্ত্রের আজ্ঞাধীন হয়। পুনঃ ক্ষুদে-বুর্জোয়া মনস্তত্ত্বানুযায়ী আত্মদর্শনের অভাব ছিল। সেইজন্য তাহারা সাম্যবাদী না হইয়া ব্রাহ্মণ্যবাদী হইয়াছিল।

কিন্তু এই ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রদান বিষয়ে class-character বিশেষভাবে লীলা করিয়াছে। গুর্জ্জরপ্রতিহার কৌমের মধ্যে প্রতিহারেরাই শাসকশ্রেণী ছিল বলিয়া তাহারা "পরিহার" রাজপুতরূপে বিবর্ত্তিত হয়; কিন্তু গুর্জ্জরেরা শূদ্র গুজার হইল, তদ্রূপ জাঠেরা এতদিন ধরিয়া শূদ্র ছিল এবং কোন কোন রাজপুত রাষ্ট্রসমূহ মধ্যে ব্রাহ্মণবর্জিত পতিত জাতির মধ্যে গণ্য হয় বলিয়া শ্রুত হয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাকালে জাঠেরা যখন কয়েকটি রাষ্ট্র স্থাপন করে, তখন জাঠ জাতির একাংশ অন্ততঃ "ছত্রি" বলিয়া দাবী করিতেছে! অনেকে সন্দেহ করেন যে, পশ্চিমের 'বৈশ রাজপুত' (Bais Rajput) ও আহির-রাজপুত জাতিরা বৈশ্য ও শূদ্র আহির হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এইরূপে ভারতের সামাজিক

২০। মুসলমানযুগেও এই প্রকারে ডোগরা, গুর্খা, মণিপুরী, টিপরা প্রভৃতি নব-ক্ষত্রিয় হইয়াছে। মধ্যভারতের "গো-বংশীয়" ও 'নাগবংশীয়রাও' এই প্রকারে উদ্ভূত বলিয়া সন্দেহ হয়।

ইতিহাসে দেখা যায় যে, একটা জাতির শাসক-স্তরই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু সেই জাতির সাধারণ লোকেরা শূদ্র অথবা পতিত হইয়া রহিয়াছে (কোচ, তিপ্রা প্রভৃতি জাতির অভিজাত স্তর এই প্রকারে সাধারণ হইতে পৃথক হইয়াছে)। একটা জাতির (caste) সমাজে উত্থান এবং পতনের মূলে থাকে উহার অর্থ-নীতিক অবস্থা, তজ্জন্য ধনীরাই উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়।

এই নূতন সমাজ-সংগঠনের সময় পুরোহিতশ্রেণী ও ভূম্যধিকারিশ্রেণীর স্বার্থ এক হয়। বোধ হয়, এই সময় হইতে শ্রেণী-সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক ভাব ধারণ করিতে আরম্ভ করে। বঙ্গ ও মগধের বাহিরের ভারতে বৌদ্ধ রাজশক্তি বিনষ্ট হওয়ায় বৌদ্ধ ও শূদ্রেরা শোষিত ও পদদলিত শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে লাগিল এবং যাহারা ব্রাহ্মণ্যবাদ গ্রহণ করিল না ও তৎসঙ্গে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্বীকার করিল না, তাহারা অস্পৃশ্য ও পতিতরূপে পরিগণিত হইতে লাগিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

অষ্টম অধ্যায়

গৌড়ের কথা

পূর্ব্ব-ভারতের গৌড়, মগধ, মিথিলা, অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, কলিঙ্গ, কামরূপ প্রভৃতি প্রদেশগুলিকে নবাবিষ্কৃত "আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে" 'গৌড়চক্র' বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ জাতিতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও কৃষ্টির দিক দিয়া এদেশ-গুলির সম্পর্ক অতি নিকট। বৈদিক সাহিত্যের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।৬) পুণ্ড্রকজাতির এবং উক্ত পুস্তকের আরণ্যকে (২।১।১) 'বঙ্গবগধচের' জনপদের উল্লেখ আছে এবং ঐ সকল স্থানের লোকদের প্রতি কটাক্ষ-পাতও করা হইয়াছে। পুনঃ, অথর্ব্ববেদে অঙ্গ ও মগধের নামোল্লেখ আছে (৫।২২।১৪); এবং উপনিষদেও আমরা মিথিলার নামোল্লেখ দেখিতে পাই। কিন্তু কবে পূর্ব্বভারত আর্য্যীভূত হইল তাহা সঠিক বলা যায় না। বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী কালের বৌধায়ন স্মৃতিতে (১।২।১৪)

এই সকল প্রদেশসমূহে এক তীর্থযাত্রা উপলক্ষ ব্যতীত গমন ও ভ্রমণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, বৈদিক মতের বিরুদ্ধবাদিগণ বাঙ্গালায় প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। জৈন ধর্ম্মপুস্তকে মগধ, অঙ্গ ও তাম্রলিপ্তের লোকদিগকে উচ্চদরের ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে(১)। পুনঃ, "অঙ্গ" নামক পুস্তকে মহাবীরের রাঢ়ে ভ্রমণ উপলক্ষে চোয়াড় নামক জাতির উল্লেখ আছে। আবার এই সময়ে যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে কীকট (মগধ) দেশকে 'অনার্য্য নিবাস' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (২)।

এতদ্বারা ইহা অনুমিত হয় যে, আর্য্য ও অনার্য্য শব্দদ্বয় ধর্ম্মের বিভিন্নতার জন্য দলাদলির পরিচায়ক মাত্র। এতদ্বারা হালের প্যান-জার্ম্মানীয় অর্থ সূচিত হয়না। পুনঃ, পুরাণে বঙ্গকে 'ঐল' সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করা হইয়াছে। পার্জিটার 'ঐল' শব্দকে আর্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন (৩)। উত্তর-বাঙ্গালা ও কামরূপে রাজা নরক ও তদ্বংশজাত ভগদত্তের সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে। পাণিনি (৬।২।১০০) 'গৌরপুর' নামক একটি জনপদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পাহাড়পুরের (সোমপুরী) বিহারের ভগ্নাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত একটি প্রস্তর ফলকে (খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী) হইতে আমরা এই তথ্য অবগত হই যে, বাঙ্গালা মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল (৪)। এই প্রস্তরলিপিতে ইহাও উল্লিখিত আছে যে, উত্তরবঙ্গে 'সামবঙ্গীয়' নামে সংযুক্ত জাতিদের বাস ছিল। ইহাদের নেতার নাম ছিল গলদন। ইহা অসংস্কৃত নাম বলিয়া বোধ

১। S. Levy—Pre-Aryans and Pre-Dravidians in India—Translated by Dr. P. C. Bagchi.

২। মগধ যে 'কীকট' তাহা সঠিকভাবে নির্দ্ধারিত হয় নাই।

৩। Pargiter—Ancient Indian Traditions. Pp. 305-306.

৪। EP. Ind, Vol, XXI, No. 14, P, 91.

হয় (৫)। কৌটিল্যে গৌড়ের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার পর বাৎসায়নের (খৃঃ দ্বিতীয়—তৃতীয় শতাব্দী) 'কামসূত্র' নামক পুস্তকেও আমরা অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের নামোল্লেখ দেখিতে পাই। বাৎসায়ন গৌড়ীয়দের (গৌড়াণাম্) রীতির বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন। বাৎসায়নের গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধেও কটাক্ষপাত আছে (৬)। পাহাড়পুরে নবাবিষ্কৃত একটী তাম্রশাসনে ব্রাহ্মণদের (৭) নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এই তাম্রশাসন গুপ্তযুগে (৪৭৮-৪৭৯ খৃঃ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই তাম্রফলক হইতে আমরা নিশ্চিত প্রমাণ পাই যে, আর্য্যসভ্যতা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বেই বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে (৮)। আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে বর্দ্ধমানে "লোক" রাজবংশের নাম উল্লেখ আছে। জয়সওয়াল এই বংশের তারিখ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলেন যে এই সময়ের কাছাকাছি 'বর্দ্ধন' নামে একটি রাজবংশ বাঙ্গালায় বর্ত্তমান

৫। Jayaswal—Presidential address in Oriental Conference, held at Indore. এই নাম বিষয়ের আলোচনা H. C. RaiChaudhuri—Political History of Ancient India, Footnote, P. 524. দ্রষ্টব্য।

৬। কামসূত্রে "পুষ্পদান নিয়োগন্নগর ব্রাহ্মণ্যরাজবিদতমস্তঃ পুরাণি গচ্ছন্তি" (৬।৪১) শ্লোকটি দেখিয়া কেহ কেহ এতদ্বারা 'নাগর ব্রাহ্মণ' জাতিকে বুঝিয়াছেন ; কিন্তু ইহার অনুবাদ 'নগরবাসী ব্রাহ্মণ' হইবে। পঞ্চানন তর্করত্ন ও মহেশ পালের সম্পাদিত "কামসূত্র" দ্রষ্টব্য।

৭। Epigraphica Indica.—Vol. XX. No 5. P 59.

৮। পাহাড়পুরের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন—শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক, সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা—৩৯ ভাগ, ৩য় সংখ্যা ; EP. Ind. vol. XXI, No 13.

ছিল (৯)। আর্য্যমঞ্জুশ্রীর মতে এই সময় (খৃঃ ১৪০—৩২০) নাগবংশীয়েরা বাঙ্গালায় রাজত্ব করিয়াছিল। তাহারা সনাতন ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরভ্যুদয়ের জন্য বিশেষ যত্নবান হন। ইঁহারা বৈশ্যবর্ণের ছিলেন। তাহাদের রাজা ছিল প্রভাবিষ্ণু; ইনি ক্ষত্রিয়পদ (status) গ্রহণ করেন (১০)। ইহার পর বাঙ্গালা গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। উপরোক্ত এবং দামোদরপুর তাম্রশাসনগুলি দ্বারা আমরা তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছি এবং তৎকালের শ্যসনতন্ত্রের বিষয় কিঞ্চিৎ অবগত হইয়াছি।

গুপ্তযুগে আমরা বাঙ্গালাকে সম্পূর্ণভাবে আর্য্যীভূতরূপে দেখি। বৈগ্রাম (১১) ও দামোদরপুর তাম্রলিপিসমূহে (১২) ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণ্যবাদীয় মন্দির-প্রতিষ্ঠা ও পূজাদি সম্পাদন করিতে দেখি, লোকদের উত্তর-ভারতের ন্যায় সংস্কৃত নাম ধারণ করিতে দেখি; আবার তাহাদের নাম ও পদবীগুলি হালের বাঙ্গালার হিন্দুদের ন্যায় দৃষ্ট হয়, আর দেখি রাজাই ভূমির মালিক, কৌমের সংবাদ নাই। কেহ ভূমি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইলে স্থানীয় অধিকরণ বা পরিষদে (Council of Board of administration) দরখাস্ত করিতে হইত। এই অধিকরণগুলিতে নগর শ্রেষ্ঠী-প্রধান, প্রথম- সার্থবাহ, প্রথম কুলীক ও প্রথম কায়স্থ পদযুক্ত চারিজন সভ্য থাকিতেন। ইহারা বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন। দরখাস্তের ফলে, পুস্তপালেরা (নথীপত্রের পুস্তক রক্ষাকারী) অনুসন্ধান করিলে উপরোক্ত পরিষদ ভূমি ক্রয়ের অনুমতি প্রদান করিতেন। আবার দামোদর-লিপিগুলির একটিতে (৫ম সংখ্যা) দৃষ্ট হয় অযোধ্যা হইতে আগত কুলপুত্রক (অভিজাত) অমৃতদেব শ্বেতবরাহস্বামীর মন্দিরের পুনঃ-সংস্কারকল্পে ভূমি ক্রয়ের জন্য দরখাস্ত করিলে, স্থানীয় বিষয়পতির সহিত

৯। Jayaswal—An Imperial History of India, p 47.
১০। Jayaswal—op. cit. Pp. 51-57.
১১। EP. Ind XXI. No 13 (Baigram Ins.)
১২। „ XV. No 7 (Damodarpur Ins.)

কিঞ্চিৎ বিরোধ হয়। কিন্তু নরনন্দী, গোপদত্ত ও ভেটনন্দী নামক পুস্তপালেরা উপরে রিপোর্ট পাঠান যে, ধর্ম্মভাব প্রণোদিত হইয়া এই দরখাস্ত করা হইয়াছে। পরম ভট্টারক (সম্রাট) এই দরখাস্তকে জয়যুক্ত করেন। তৎপর, রাজা গ্রামের ব্রাহ্মণোত্তর মহত্তর (গ্রাম্য মাতব্বর), কুটুম্বি (গৃহপতি বা কৃষিজীবী) প্রভৃতিকে জানাইয়া দিনারের মূল্যে ভূমি বিক্রয় করেন।

এই সব সংবাদ দ্বারা আমরা দেখি, বাঙ্গালা তখন আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বিবর্ত্তনের সমস্তরে অবস্থিত। সামন্ততান্ত্রিক জমিদার আছে, আমলাতন্ত্র আছে, ব্রাহ্মণ আছে, কৃষিজীবী আছে, গিল্ড ও তাহার শ্রেষ্ঠী আছে, ব্যবসায়ী আছে, শিল্পী আছে, গ্রামের মহোত্তর ও অষ্ট কুলাধিকরণ আছে। আর গুপ্ত সাম্রাজ্যাধীন অন্যান্য স্থানের ন্যায় রোমান সুবর্ণ মুদ্রার নকলে 'দিনার' (Dinarius) বাজারে চলিতেছে। এতদ্বারা আমরা কৃষিঅর্থনীতির সঙ্গে বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প অর্থনীতির বিশেষ উন্নতি অবলোকন করি। সামন্ততান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির সঙ্গে বিভিন্ন বনিয়াদী স্বার্থের (Vested Interests) প্রতিনিধিদের সহিত শাসন-বিভাগকে সহযোগিতা করিয়া কার্য্য করিতে দেখি।

গুপ্তপর-যুগের ইতিহাস স্পষ্টরূপে এখনও পরিষ্কৃত হয় নাই কিন্তু পাল বংশের উত্থানের পূর্ব্বের সময়ের কতকগুলি তাম্র-লিপির আবিষ্কার দ্বারা আমরা নূতন ঐতিহাসিক তথ্য পাই। পঞ্চম বা ষষ্ঠ খৃষ্টীয় শতাব্দীতে কর্ণসুবর্ণের মহারাজাধিরাজ জয়নাগের ও তাহার সামন্ত নারায়ণ ভদ্রের সংবাদ পাওয়া যায় (১৩)। এই লিপিদ্বারা ভট্ট ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবীরস্বামীকে ভূমিদান করা হইতেছে। আবার জয়নাগের মুদ্রায় "কমলে কামিনী" মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে! নাগ বংশের উল্লেখ আর্য্যমঞ্জুশ্রীতে আছে।

এই লিপিদ্বারা বাঙ্গালায় একজন স্বাধীন নরপতি ও সামন্ততন্ত্রের

১৩। EP. Ind. XVIII. No 7 (Vappaghosa grant)

সংবাদ আমরা পাই। ইহার পর ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে সমাচারদেবের তাম্র-লিপিতে (১৪) আমরা আর এক স্বাধীন রাজার সংবাদ পাই। এই সময়ে একটি মণ্ডলের (জেলা) সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী তাঁহার শাসন বিষয়ের কন্মে একটি জেলা কোর্ট থেকে সহযোগিতা প্রাপ্ত হইতেন। এই কোর্টের শীর্ষে একজন জ্যেষ্ঠাধিকরণিক (জজ) থাকিতেন। গ্রাম জনকতক মাতব্বরের (বিষয়-মহত্তরা) তত্ত্বাবধানাধীন থাকিত। কুলভারাগেরা সাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিতেন। আইনে অভিজ্ঞ গ্রামের অন্যান্য লোকদের গ্রাম সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার থাকিত। ইহারাই গ্রামের প্রতিনিধিত্ব করিত এবং সাধারণ সিভিল ও ফৌজদারী ব্যাপার নিষ্পন্ন করিত। এই সময়েব গ্রামের মাতব্বরদের নামের শেষাংশ আজকালকার ন্যায়, যথা কুণ্ডু, পালিত, ঘোষ, দত্ত, দাস—এই নামগুলি আজকালকার কায়স্থ ও নব শায়কদের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সমাচারচন্দ্রের মুদ্রায় রাজার পোষাক গুপ্ত রাজাদের পোষাকের ন্যায় এবং তিনি ঘোর শৈব ছিলেন।

পুনঃ, এই যুগে আমরা ধর্ম্মাদিত্য, (১৫) গোপচন্দ্র নামক স্বাধীন রাজাদের অস্তিত্ব ফরিদপুরে প্রাপ্ত তাম্র-লিপিদ্বারা অবগত হই। ধর্ম্মাদিত্যের লিপিতে বিষয়পতি ও মহত্তরদের উল্লেখ আছে। গোপ চন্দ্রের (১৬) সংবাদ এই সঙ্গে পাওয়া যায়। পার্জিটারের মতে তিনি ধর্ম্মাদিত্যের পরবর্ত্তীকালের লোক। আর্য্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্পে গোপচন্দ্রের নামোল্লেখ আছে এবং লামা তারানাথ তাঁহার ইতিহাসে একটি "চন্দ্র" বংশের উল্লেখ করিয়াছেন।

১৪। „ XVIII. No 11 (Ghugrahati Ins.)

১৫। Ind. Ant. July 1910 (Plates of Dharmaditya)

১৬। Faridpur Plate of Gopachandra, No 45. "Selected Ins".

আবার, আস্রাফপুর-লিপি হইতে আমরা পূর্ব্ববঙ্গে খড়্গ রাজবংশের সংবাদ পাই, (১৭)। ইহাদের নাম খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ, দেবখড়্গ, যুবরাজ রাজা রাজভট্ট। ইনিই সম্ভবতঃ সমতটের রাজা রাজভট্ট ছিলেন। ইহাকেই সেঙচি নামক চীন পরিব্রাজক সপ্তম শতাব্দীর শেষে রাজত্ব করিতে দেখেন। পুনঃ ৬৫০ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার সামন্ত রাজা লোকনাথের লিপিতে (১৮) তাহার ব্রাহ্মণ মহাসামন্ত প্রদোষশর্ম্মণের নাম, সামন্ত-তন্ত্রের সংবাদ, অনন্তনারায়ণের মন্দির স্থাপনা, চারিবেদে পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের স্থাপনা এবং রাজবংশে অসবর্ণ বিবাহের সংবাদ পাওয়া যায়।

এই সংবাদ দ্বারা আমরা এই তথ্য পাই যে, বাঙ্গালা বহু পূর্ব্বে কৌমগত সভ্যতার স্তর উত্তীর্ণ হইয়া বাণিজ্য ও শিল্পগত সভ্যতায় উপনীত হইয়া একজাতিত্ব গঠনপ্রয়াসী হইয়াছে। বাঙ্গালা এই সময়ে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মপ্রধান। গুপ্ত রাষ্ট্রের জগদ্দল প্রস্তর বাঙ্গালার মাথার উপর হইতে অপসারিত হইয়াছে। বাঙ্গালার বনিয়াদি স্বার্থসমূহ উত্তর-ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এখন নিজেদের পৃথক রাজনীতিক সত্তা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই সুযোগ চেষ্টার মধ্যে শশাঙ্কের উদয় হয়।

শশাঙ্কের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক আছে। আর্য্যমঞ্জুশ্রী-মূলকল্প অনুসারে শশাঙ্ক (সোম) ব্রাহ্মণ ছিলেন। শশাঙ্ক হর্ষবর্দ্ধন কর্তৃক বিজিত হন। জয়সওয়ালের মতে শশাঙ্ক পতনশীল বৌদ্ধ মহাযান ধর্ম্মের বিপক্ষে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানকারী ছিলেন। (১৯) আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প হইতে আমরা এই তথ্য অবগত হই যে, শশাঙ্ক ব্রাহ্মণ

১৭। Dacca Univ. Studies—D. Sarkar. Vol. 1, Nov. 1935 By P. L. Pal দ্রষ্টব্য।

১৮। EP. Ind. Vol XV, No 19, Plate of Lokenath.

১৯। Jayaswal—An Imperial History of India, P. 51.

ছিলেন, এবং সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে সবিশেষ নিষ্ঠাবান ছিলেন। তজ্জন্যই তিনি জনগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত বৌদ্ধধর্ম্মের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠান দ্বারাই আমরা শশাঙ্কের জৈন (২০) ও বৌদ্ধদলন ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইয়া থাকি। ইহা বাঙ্গালায় একটি শ্রেণী-সংগ্রামেরই পরিচায়ক।

শশাঙ্কের পর আর্য্যমঞ্জুশ্রী অনুসারে বাঙ্গালায় একটা সাধারণতন্ত্র কিছু দিনের জন্য স্থাপিত হয়। ইহার পর একজন জনপ্রিয় শূদ্রবংশীয় বাঙ্গালী নেতা "ভ" বা "স্ব' নরপতিরূপে (৭৩৫ খৃঃ কিম্বা ৭৪০ খৃঃ) নির্ব্বাচিত হন। ইনি ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ উভয়কে ভণ্ড বলিতেন এবং ব্রাহ্মণ ভূস্বামী ও অন্যান্যদের ধ্বংস করেন। তাঁহার বড় কড়া শাসন ছিল। ইহার মৃত্যুর পর "মাৎস ন্যায়" আরম্ভ হয় (২১)। তৎপর জনসাধারণ নীচ শূদ্র বংশীয় (দাসজীবিনঃ) গোপালকে (৭৪০—৭৫৭ খৃঃ) রাজপদে নির্ব্বাচিত ও অভিষিক্ত করেন। জয়সওয়াল উক্ত শূদ্ররাজা ও তাহার নির্ব্বাচনের তারিফ করিয়া বলিয়াছেন যে, সেই সময়েই বাঙ্গালা জাতি-ভেদের বিধান ও জন্মগত শ্রেষ্ঠত্বরূপ বৈদিক মত হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। আর্য্যমঞ্জুশ্রীর মতানুসারে এই সময়ে গৌড়দেশ সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত সনাতনী ব্রাহ্মণ্যবাদীদের (heretic) দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

গোপালের জাতি বংশপরিচয় লইয়া বাঙ্গালার ইতিহাসে বহু বিতর্ক

২০। হিয়ান সাঙ্গের বর্ণানুসারে বাঙ্গালায় জৈন মত সেই যুগে প্রবল ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি অঙ্গ (মুঙ্গের, চম্পা) হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালার সর্ব্বত্র বৌদ্ধ মঠ অপেক্ষা দেবালয় ও জৈনদের (নির্গ্রন্থ, দিগম্বর) ধর্ম্মালয়ের সংখ্যার আধিক্য লক্ষ্য করিয়াছেন। কামরূপের লোকদের তিনি দেবোপাসক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, বৌদ্ধ মঠ কখনও সে দেশে ছিল না বলিয়াই তিনি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং যে দুই চার জন বৌদ্ধ তথায় থাকিত তাহারা লুকায়িত-ভাবেই থাকিত বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন—**Watters—On Yuan Chuang, Vol. II.** দ্রষ্টব্য।

২১। খালিমপুর অনুশাসন দ্রষ্টব্য।

আছে। শিলালিপিতে তাহাকে 'বাপ্যটের' বংশধর বলা হইয়াছে (২২)। তিব্বতের লামা তারানাথ 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' নামক পুস্তকে নিম্নোক্ত বিবরণ দিতেছেন (২৩) :—

মধ্যদেশ ও পুণ্ড্রবর্দ্ধনের পূর্ব্বদিকস্থ বন-মধ্যস্থিত কোনও একস্থানে এক সুন্দরী ক্ষত্রিয়া কুমারী এক বৃক্ষদেবতার সহিত উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েন এবং বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। পরে এই বালক চুণ্ডাদেবীকে আরাধনা করিবার জন্য জনৈক আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হয়। একবার এই দেবী স্বপ্নে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন। এই বালক দেবী-প্রদত্ত একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত গদা (কবচস্বরূপ) লুকায়িতভাবে শরীরে ধারণ করে। অতঃপর বালক আর্য্য খাসার্পণ বিহারে আগমনপূর্ব্বক রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা (উপাসনা) করে। তাহাকে পূর্ব্বদিকে যাইতে বলা হয়। সেই সময় বাঙ্গালাদেশে বহুদিন ব্যাপী অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। প্রজাবর্গ অতীব দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়া পড়ে। সেখানে সর্দ্দারেরা সকলে সমবেত হইয়া তদ্দেশীয় আইনানুসারে দেশ-শাসনের জন্য রাজা নির্ব্বাচন করিত। কিন্তু এই রাজা রাত্রিতে এক ভীষণাকৃতি 'নাগরমণী' কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইত। এই নাগরমণী পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার রাণীর আকৃতি ধারণ করিত। কেহ কেহ বলেন—এই নাগকন্যা রাজা গোবিন্দচন্দ্রের স্ত্রীর রূপ ধারণ করিত। আবার কেহ কেহ বলেন, রাজা ললিতচন্দ্রের স্ত্রীর রূপ ধারণ করিত। এই রূপে উক্ত 'নাগরমণী' সকল নির্ব্বাচিত রাজাদের ধ্বংস করিত। চুণ্ডাদেবীর আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত বালক তথায় আগমন করে। উক্ত বালক তথায় রাজপদের প্রার্থী হয়। মধ্য রাত্রিতে সেই নাগরমণী রাক্ষসীরূপে তথায় পুনরাগমন করে। এই বালক তাঁহার ইষ্টদেবতার ক্ষুদ্র কাষ্ঠনির্ম্মিত গদারূপ অস্ত্র দ্বারা তাহাকে আঘাত করে; এই আঘাতেই ঐ নাগরমণী

২২। গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৯ দ্রষ্টব্য।

২৩। Taranatha—"Geschichte des Buddhismus in Indian"—translated into German by A. Schiefner, Pp, 202-04.

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। পর দিবস উক্ত বালককে জীবিত অবস্থায় দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হয়; এবং তাহাকে অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ মনে করিয়া পর পর সাতবার রাজপদে নির্ব্বাচিত করা হয়। সকলে তাহার নামকরণ করেন 'গোপাল'। প্রথমে তিনি বাঙ্গালায় রাজত্ব করেন। জীবনের শেষভাগে মগধ বিজয় করেন এবং 'ওটন্ত পুরীর' (২৪) নিকট নালন্দা বিহার স্থাপন করেন। (২৫) ইন্দ্রদত্ত বলেন, আচার্য মীমাংসকের মৃত্যুর এক বৎসর পরে 'গোপাল' রাজা হন। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র ভদ্র বলেন, তিনি (গোপাল) ইহার সাত বৎসর পরে নির্ব্বাচিত হন।

পক্ষান্তরে আর্যমঞ্জুশ্রীতে উল্লেখ আছে যে, শশাঙ্কের (সোম) মৃত্যুর পর গৌড়ে অশান্তি ও বিপ্লব উপস্থিত হয়—এক সপ্তাহ কালের জন্য একজন রাজা হয়, পুনঃ এক মাসের জন্য অপর একজন রাজা হয়। অতঃপর একটি সাধারণ-তন্ত্র (Republic) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রকম ক্রমাগত একটা বিশৃঙ্খলা চলিতে থাকে। এই সময় মঠসমূহের ধ্বংসাবশেষ লইয়া গৃহাদি নির্ম্মিত হইতে থাকে। আর্য্যমঞ্জুশ্রী অনুসারে জয়সওয়াল মনে করেন যে,গুপ্তবংশের দ্বাদশাদিত্যের মৃত্যুর পর এই অরাজকতা সুরু হয়। আর্যমঞ্জুশ্রী ইহাও বলে যে, রাজা 'দ্বদাস্থব' (দ্বাদশাদিত্য) মৃত্যুর পর গুপ্তদের মধ্যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়। তজ্জন্যই গৌড়ে একজনকে রাজপদে অভিষিক্ত করা প্রয়োজন হইযাছিল (২৬)। এই পুস্তকে উক্ত হইযাছে যে, দাসজাতীয 'গোপালরা' (Gopalas) রাজা হইলে জনসাধারণ ব্রাহ্মণদের দ্বারা ক্লিষ্ট হয়, বুদ্ধের ধর্ম্ম বিনষ্ট হওযায় ধর্ম্মবিহীন সময় উপস্থিত হয়: The people will be miserable with Brahmins. The Buddha's doctrine having been lost, the time will be irreligious, (২৭)। খালিমপুর অনুশাসনে যে সংবাদ

২৪। তারানাথের পুস্তকসমূহে ও 'বুষ্টন' নামক তিব্বতী ভাষার পুস্তকে 'ওটন্টপুরী' বানান প্রদত্ত হইয়াছে।

২৫। Taranatha—Geschichte. ch-XXVIII P.p 208—210.

২৬। Jayaswal—Imperial History of India p. 43.

২৭। Jayaswal—Ibid op cit. p. 74.

পাওয়া যায় তাহাই আর্য্যমঞ্জুশ্রী ও তারানাথে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। আর্য্যমঞ্জুশ্রীতে অরাজকতা সম্বন্ধে আমরা যে সংবাদ পাইতেছি তাহাই বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ধারানুসারে অলৌকিক গল্পের আকারে তারানাথে পাইতেছি। কেহই গোপালের জাতি ও জন্ম সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ দিতেছেন না। তবে আমরা এইটুকু ধরিয়া লইতে পারি যে, তিনি তথা:-কথিত উচ্চকুলোদ্ভব ছিলেন না। তাঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন অপ্রিয় সংবাদ ছিল, যেজন্য তদ্বিষয়ে কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। বরং তারানাথের অলৌকিক জন্মের সংবাদটি সহজ কথায় গ্রহণ করিলে তাঁহাকে জারজ বা টটেম পূজাকারী আদিম জাতি উদ্ভূত লোক বলিতে হইবে। গোপালের অভিষেকের সময় হইতে বাঙ্গালা ভারতের ইতিহাসে নিজের ব্যক্তিত্ব লইয়া স্বাধীন রাজনীতিক জীবনযাত্রা আরম্ভ করে। পালবংশীয়েরা পরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হয় বলিয়া ইতিহাসে সংবাদ পাওয়া যায়। পালদের লেখমালা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। দেবপালদেবের সময় হইতে বাঙ্গালা সর্ব্বোচ্চ রাজনীতিক শিখরে আরোহণ করে (২৮) তারানাথের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে পাওয়া যায় যে, গোপালের পর দেবপাল রাজা হন। তারানাথের মতে ইনি একজন নাগের পুত্র। তিনি পরে বরেন্দ্রভূমি বিজয় করেন এবং সোমপুরী বিহার প্রতিষ্ঠা করেন (২৯)। তাঁহার সময় উড়িষ্যা এবং অন্যান্য প্রদেশে যেখানে পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল সেখানে তীর্থিকদের (ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার হয়। সেইজন্য ইনি তীর্থিকদের যুদ্ধে পরাজিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তারানাথ দেবপালদেবের জন্মসম্বন্ধে নিম্নোক্ত অলৌকিক কাহিনীটি বিবৃত করিয়াছেন। অবশ্য উক্ত গল্পটিকে তিনি জনরব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

২৮। দেবপালদেবের মুঙ্গের লিপি অনুসারে তাহার সাম্রাজ্য একদিকে হিমালয়, অপরদিকে সেতুবন্ধ; একদিকে বরুণ নিকেতন অপরদিকে লক্ষ্মীর নিকেতন (ক্ষীরোদ সমুদ্র) সেই রাজা সপত্নভাবে উপভোগ করিয়াছিলেন। (১৩ শ্লোক)।

২৯। Taranath—Geschichte ch. XXIX, P. 208, 10.

রাণী এক ব্রাহ্মণের কাছে স্বামী বশ করিবার জন্ত ঔষধ চায়। ব্রাহ্মণ হিমাবন্ত হইতে ঔষধ লইয়া আসেন। তাহা এক দাসীকে দিবার পর সে জলে পড়িয়া যায় এবং তথাকার নাগরাজা সাগরপাল তাহা খাইয়া ফেলে। এই ঔষধের গুণে নাগটি রাজার স্তায় আকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং রাণীর সহিত সহবাস করে। ফলে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুত্রটি জন্মগ্রহণ করিবার কালে সর্পটি তাহার মস্তকে ফণা বিস্তার করিয়া থাকে। শিশুর হাতে একটি আংটি দেখিয়া এবং তাহার অঙ্গে এই ঘৃণ্য নাগটিকে দেখিয়া লোকে বুঝিতে পারে ইহা নাগরাজের পুত্র (৩০)।

গোপালের মৃত্যুর পর দেবপাল নামক এই পুত্র সিংহাসনে নির্ব্বাচিত হন। ইনি ৪৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রসপাল ১২ বৎসর রাজত্ব করেন। এই বংশের নয়জন রাজা বৌদ্ধধর্ম্মের বিশিষ্ট উন্নতি সাধন করেন। আর যেসব রাজারা বিশেষভাবে ধর্ম্মের সেবা করেন নাই তারানাথ তাঁহাদের নাম গণনা করেন নাই। কারণ তাঁহারা তদ্রূপ মাননীয় নন।

ইহার পর ধর্ম্মপাল ৬৪ বছর রাজত্ব করেন। তিনি কামরূপ, তিরহুতি, গৌড় প্রভৃতি জয় করেন। তাঁহার রাজ্য পূর্ব্বে সমুদ্র পর্য্যন্ত, পশ্চিমে দিল্লী পর্য্যন্ত, উত্তরে জলন্ধর পর্য্যন্ত, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত-মালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (৩১) ইনি বিক্রমশিলা বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। তারানাথ তাঁহার অন্ত এক পুস্তকে ধর্ম্মপালের বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগ প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। হিমালয়ের স্তায় উচ্চ ও ধবলাকৃতিবর্ণ বলিয়া তাঁহার রূপ বর্ণনা আছে। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকেরা মূর্ত্তিপূজা প্রচলন করিয়াছিল কিন্তু সৈন্ধব এবং সিংহলের

৩০—৩১। Taranatha, Geschichte pp. 208—217.

ভিক্ষুরা ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধ বলিয়া মন্ত্রাদিদের হেরুকার রৌপ্য মূর্ত্তি কাটিয়া ফেলে, ও তাহা গালাইয়া দেয় এবং তাঁহারা তান্ত্রিক গালা-গালি করেন। সংবাদ শুনিয়া ধর্ম্মপাল ক্রোধে অন্ধ হইয়া অনেক ভিক্ষুকে স্বহস্তে হত্যা করেন। এই বিপদের সময়ে তথাকার মঠাধ্যক্ষ অনেককে আশ্রয় দান করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। তারানাথ ইহাও বলেন, ভারতে কখনও সিদ্ধপুরুষের অভাব হয় নাই; কিন্তু ধর্ম্মপালের সময় হইতে সিদ্ধদের ঘনঘন আবির্ভাব হইতে থাকে (৩২)। ইহার অর্থ, রাজশক্তির সহায়তায় মহাযান ধর্ম্মান্তর্গত বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সিদ্ধদের প্রাচুর্য্য বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এতদ্বারা মহাযান সম্প্রদায় প্রবল হয় বলিয়া অনুমিত হয়। এই সিদ্ধদের মধ্যে কতিপয় শূদ্রবর্ণের লোকও ছিলেন।

তৎপর রামপালের রাজত্বের কথা তারানাথ উল্লেখ করেন। ইনি ৪৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পুত্র যক্ষপাল রাজপদে নির্ব্বাচিত হন। ইনি কেবল একবৎসর রাজত্ব করেন। মন্ত্রী লব সেন (৩৩) তাঁহার হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লন। (৩৪) তারানাথ রামপাল বিষয়ে একটা সংবাদ দিতেছেন: এই সময়ে সিরো নামক জনৈক বৌদ্ধ সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। এই সিদ্ধপুরুষের পদধৌত জল পানান্তে যুদ্ধে গেলে রামপাল একশত ম্লেচ্ছের উপর বিজয়ী হন।

তারানাথ বলেন, পালেরা সূর্য্যবংশীয় ছিলেন, আর চন্দ্র এবং সেনেরা চন্দ্রবংশীয় ছিলেন। (৩৫) তৎপর তিনি সেন রাজাদের

৩২। B. N. Datta: Mystic Tales of Lama Taranatha ("মাসিকের খনি") দ্রষ্টব্য।

৩৩। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের বীর রাণী রঞ্জাবতীর পুত্র বীর লাউসেনের নামোল্লেখ আছে। এই কাব্যে তাঁহাকে সম্রাট ধর্ম্মপালের ভাগিনাপুত্র এবং সেনাপতি বলিয়া বর্ণিত

তালিকা দিতেছেন : লব সেনের পুত্র কল সেন ; তৎপুত্র মনিত সেন ; তৎপুত্র রথিক সেন। তাঁহারা সর্ব্বশুদ্ধ ৮০ বৎসর রাজত্ব করেন।

তারানাথের মতে এই চারিজন সেন রাজার রাজত্ব সময়ে মগধে তীর্থিকদল ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইসঙ্গে তাজিকদের ম্লেচ্ছধর্ম্মের লোকেরও আবির্ভাব হইতে থাকে। ইহার অর্থ, তথায় মুসলমান ধর্মীয় লোকের সঞ্চার হয়। তারানাথ এইস্থলে লব সেন সম্বন্ধে এক নূতন আলোকসম্পাত করেন। বাঙ্গলার পুরাতন পঞ্জিকাসমূহে কলিযুগের রাজাদের নামের তালিকায় "লাউসেন" নামক রাজার নামোল্লেখ হইত। কিন্তু তাঁহার নামে কোন অনুশাসন আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কেবল ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যেই তাঁহাকে ধর্ম্মঠাকুরের ভক্ত এবং সম্রাট ধর্ম্মপালের সেনাপতিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এইজন্যই তাঁহার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকে সন্দিহান। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার Social History of Kamrupa নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, "Some of the Doma Soldiers who went to Kamrupa with Lousena settled there. Their descendants still sing of the achievements of Kalu Doma, the General of Lousena" * অর্থাৎ যেসব ডোমসৈন্য লাউসেনের সহিত কামরূপ গমন করিয়াছিলেন (ধর্ম্মমঙ্গলের "কেঁউর যাত্রা") তাঁহারা তথায় বাস করেন। তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও লাউসেনের

হইয়াছে। পুরাতন পঞ্জিকাসমূহে কলিযুগের রাজাদের তালিকায় কতিপয় পাল রাজা ও লাউসেনের নামোল্লেখ থাকিত। বর্ত্তমান পাঁজিসমূহে তাহা অদৃশ্য হইয়াছে। এই লাউসেনই কি তারানাথ বর্ণিত লবসেন ?

* N. N. Vasu—The Social History of Kamrupa, vol. I, P. 211. ৺বসু মহাশয় লেখককে ব্যক্তিগতভাবেও এইকথা বলিয়াছিলেন। কামরূপস্থ ডোমদের ভিতর এই জনশ্রুতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন।

সেনাপতি কালুডোমের কীর্ত্তিগাথা গাহিয়া থাকে। তিব্বতীয় P. al Jor-এর পুস্তকেও লবসেন ও তাঁহার বংশের কথা উল্লিখিত আছে। ধর্ম্মমঙ্গলের লাউসেনকে তারানাথ বর্ণিত লবসেন ঐতিহ্যের সময়ের গোলমাল হইয়াছে বলিয়াই এই বিড়ম্বনা। †

পুনঃ তিনি বলেন, যখন থেকে লব সেন রাষ্ট্র রক্ষা করিতে থাকেন তখন দেশে শান্তি বিরাজ করিত। তৎপর রাজা রথিকের মৃত্যুর পর গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থিত "অন্তর্ব্বেদী" প্রদেশে তুরস্ক রাজা চন্দ্র (?) আবির্ভূত হন। বিদেশীয় নামগুলি তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া রূপান্তর গ্রহণ করে। এই প্রকারেই কি নামের গোলমাল হইয়াছে? অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু তাঁহার সঙ্গে জুটে এবং তাঁহার সন্দেশবাহী হইয়া বাঙ্গলা এবং নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের ক্ষুদ্র তুরস্ক রাজাদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া দেয়। কাশীরাজ জয়চন্দ্রের পিতামহ গোবিন্দ চন্দ্র "তুরস্ক দণ্ড" আদায় করিতেন। ইহা অনুমিত হয় যে, মামুদ-গজনভীর পর অনেক তুরস্ক গঙ্গা ও যমুনা উপত্যকায় বসবাস করেন। তাহাদের নিকট উক্ত প্রকারের জিজিয়া ধার্য্য করা হইত (Ep. Ind. V. II, no 3 এবং Vol. 9, P. 321 দ্রষ্টব্য)। এই ঔপনিবেশিকদের সর্দ্দারদের ("প্রিন্স" এই কথা তারানাথ ব্যবহার করেছেন) সহিত বোধহয় ভিক্ষুরা বক্তিয়ারের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া দিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এতদ্বারা দৃষ্ট হয়, ভারতীয় হিন্দু স্বদেশদ্রোহী ব্যতীত আর একদল দেশের মধ্যে ছিল, যাহারা "পঞ্চম-বাহিনী" হইয়া তুরস্ক আক্রমণকে এত সহজসাধ্য করিয়াছিল!

তৎপর তিনি সমগ্র মগধ লুঠ করিয়া বেড়ান, এবং ওটন্তপুরীয়

---

† P al, Jor Edited with a list of contents and an analytical index in English. by S. C. Das. P.120

(তীব্বতীয় উচ্চারণ) অনেক ভিক্ষুকে হত্যা করেন। তিনি ওটন্তপুরী ও বিক্রমশীলা ধ্বংস করেন; পূর্ব্বোক্তস্থানে তাজিকদের একটি কেল্লা নির্ম্মাণ করেন। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে ভীত হইয়া অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত তীব্বত, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণে পলায়ন করেন। (৩৬) পণ্ডিত শাক্যশ্রী ওডিভিসার (উড়িষ্যা) নিকটবর্ত্তী, পূর্ব্বে অবস্থিত জগদ্দল বিহারে আশ্রয় লন। জ্যেষ্ঠ রত্নরক্ষিত নেপাল যান, মহাপণ্ডিত জ্ঞানকর গুপ্ত এবং তাঁহার সঙ্গে অনেক ছোট ও বড় পণ্ডিতেরা দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে পলায়ন করেন। মহাপণ্ডিত বুদ্ধমিত্র এবং দশবলের ছাত্র বজ্রশ্রী এবং অনেক পণ্ডিত দক্ষিণে যান। পণ্ডিত সঙ্গম শ্রীজ্ঞান, রতিশ্রী ভদ্র, চন্দ্রকরগুপ্ত এবং বাকী মহন্তরা এবং দুইশত ক্ষুদ্র পণ্ডিত পূর্ব্বদিকে পুখন, মুনজন, কাম্বোজ এবং অন্য সব দেশে পলায়ন করেন। মগধে বৌদ্ধধর্ম্মের নির্বাণ প্রাপ্তি হয় (৩৭)।

এই সময় থেকে গোরক্ষনাথের সরল প্রকৃতির "যোগী" শিষ্যেরা তীর্থিক রাজাদের কাছ হইতে সম্মান পাইবার জন্য "ঈশ্বরোপাসক" অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে থাকে। তাঁহারা বলেন, এতদ্বারা তাঁহারা তুরকের হাত হইতে প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবেন। কেবল নটেশ্বরের ক্ষুদ্র সম্প্রদায়টি বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া থাকেন। লবসেন ও তাঁহার পুত্র বুদ্ধসেন, তাঁহার পুত্র হারিত সেন, তাঁহার পুত্র প্রতিত সেন প্রভৃতি অতি অল্প ক্ষমতার লোক ছিলেন; তজ্জন্য তাঁহারা তুরকের আজ্ঞাবাহী হন। এইজন্য তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মে অতি অল্পই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। এইস্থলে দৃষ্ট হয় যে, সেন রাজবংশের নামের তালিকাতে ওলটপালট আছে; আর তারানাথ কর্ণাটকাগত বিজয় সেনের বংশের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু অধ্যাপক হেমরায় বলেন, এই সময়ে 'সেন' নামধারী

৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭। তারানাথ—Geschichte : pp 252,252,255,255.

"পিঠী"পতি রাজবংশের অস্তিত্ব ছিল। তাহাদের সঙ্গেই কি তারানাথ কর্ণাটকাগত সেন বংশের নামের ভুল করিয়াছেন ?

পণ্ডিত সেনের মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসর পরে বাঙ্গলায় ক্ষমতাশালী "চঙ্গল রাজা" * উত্থিত হন। তিনি দিল্লী হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত হেন্দু [তারানাথ হিন্দু শব্দের পরিবর্ত্তে "হেন্দু" (Hendu) শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন ;] ও তুরস্কের উপর রাজত্ব করেন। যদিচ তিনি প্রথমে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসী রাণীর দ্বারা তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হয় এবং ধর্ম্মোদ্দেশ্যে অনেক উৎসর্গ করেন। সমস্ত বিনষ্ট মন্দিরকে তিনি পুনঃ নির্ম্মাণ করেন। তুরস্কদ্বারা ধ্বংসীকৃত গন্ধোলার† সুন্দর চারিতলাসমূহ পুনঃ নির্ম্মিত করেন। পণ্ডিত শারিপুত্র তথায় বাস করিতেন বলিয়া তৎস্থানে শিক্ষায়তন স্থাপন করেন। নালন্দার বড় মন্দিরগুলির প্রতি তিনি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিতেন ; কিন্তু বড় শিক্ষায়তনসমূহ তিনি পুনঃ-স্থাপিত করেন নাই। এই রাজা দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দু ও তুরস্ক উভয়েই তাঁহার আজ্ঞা পালন করিত। ‡

"তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় একশত ষাট বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, আমি আর শুনি নাই যে মগধে এমন রাজারা ছিলেন যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মে শ্রদ্ধা করিতেন। এইজন্য আমি আরও শুনি নাই যে, দীক্ষাগ্রহণকারী ছাত্র ও পিটকধারী লোকও তথায় বাস করিয়াছেন" বলিয়া তারানাথ উক্তি করিতেছেন (৩৭ক)। এই "হেন্দু" রাজা কে ? বাঙ্গলার ইতিহাসে ইহার কোন নাম নাই। ইনি কি স্বাধীন রাজা গণেশ বা চণ্ডীপরায়ণ

* অন্য তিব্বতীয় পুস্তকে ইঁহাকে "সগল রাজা" বলা হইয়াছে।

† গন্ধোলা বা গন্ধালয়। বজ্রাসন অর্থাৎ বৌদ্ধ গয়ার বড় বৌদ্ধমন্দির।

‡ P. al Jor. P. 122.

৩৭ক। তারানাথ—ঐ।

বসুজমর্দ্দনদেব? অথবা বসুজমাধবদেব? জার্মাণ পণ্ডিত কার্ণ (Kern) ইঁহাকে পশ্চিম বাঙলায় এক "প্রিন্স" বলেন (Manual of Buddhism দ্রষ্টব্য)।

তীব্বতীয় বৌদ্ধসাধু তারানাথের প্রদত্ত পালরাজাদের ইতিহাস এইস্থানে উদ্ধৃত করা হইল; কারণ ইহা পালবংশের উত্থান হইতে তুরুক আক্রমণ পর্য্যন্ত ভারতীয়-বৌদ্ধ বিবরণ। তারানাথ বলেন, তাঁহার ঐতিহাসিক তথ্য তিনি ক্ষেমেন্দ্রভদ্র, ইন্দ্রদত্ত এবং ভটঘটি বা ভটঘটি নামক তিনজন মাগধী পণ্ডিতের পুস্তক হইতে সংগৃহীত করিয়াছেন। আসল কথা এই যে, আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পের ন্যায় তারানাথের পুস্তক ভারতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের বিবর্ত্তন ও বিলয়ের লিপিবদ্ধ সংবাদ বলিয়া ইহাতে মহাযানী তান্ত্রিক ধর্ম্মের অলৌকিক ও অনৈসর্গিক গল্পসমূহ মূলকথার সহিত বিজড়িত হইয়া স্থান পাইয়াছে। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকদের অলৌকিক গল্পগুলি ভক্তদের কাছে সত্য ঘটনা বলিয়া প্রতিভাত হয়। কালে তাহা তাহাদের সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য (tradition) বলিয়া গণ্য হয়। ইহা তাঁহাদের "পুরাণ"। এই প্রকারেই ব্রাহ্মণদের পুস্তকে নানা অলৌকিক ব্রাহ্মণ্যবাদীয় গল্প ঐতিহ্য বলিয়া পুরাতন কথা ও ইতিহাসরূপে পুরাণ ও মহাকাব্যসমূহে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু এইসব গল্প (folklore) এবং ঐতিহ্য আজকালকার বৈজ্ঞানিক সমালোচনায় বিচারসহ নয়। নব্যাবিষ্কৃত খোদিত-লিপিসমূহ হইতে পণ্ডিতেরা পাঠোদ্ধার করিয়া সূক্ষ্ম তথ্যসমূহ আবিষ্কার করিতেছেন। তবে মোটামুটিভাবে বৌদ্ধধর্ম্মীয় পুস্তকসমূহের রাজনীতিক সংবাদের সহিত বর্ত্তমান ইতিহাসের ভিত্তিগত মিল আছে।

পাল বংশের উত্থান

গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপাল (৭৭০-৮১০ খৃঃ) উত্তর-ভারত জয় করিয়া স্বীয় তাঁবেদার চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত

করেন। তথায় উত্তর-ভারতের সমগ্র রাজারা তাঁহাকে "সার্ব্বভৌম" বলিয়া মানিয়া লন। (৩৮) তিনি প্রথমে "পঞ্চগৌড়েশ্বর" (৩৯) উপাধি ধারণ করেন। কিন্তু অনুমান হয়, গুর্জ্জর-প্রতিহার রাজ নাগভট্ট দ্বারা মুঙ্গের যুদ্ধে পরাজিত হইলে এই উপাধি লুপ্ত হয়। কারণ নাগভট্ট চক্রায়ুধকে তাড়াইয়া তাঁহার খুল্লতাত ইন্দ্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন। এই যুদ্ধ বাঙ্গালার ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। পঞ্জাব হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত গুর্জ্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্যের সমস্ত সামন্তদের লইয়া নাগভট্ট ধর্ম্মপালকে যুদ্ধ প্রদান করেন। লেখক ছয়খানি বিভিন্ন তাম্রলিপি পড়িয়াছেন, যাহাতে এই যুদ্ধের উল্লেখ আছে। এই সব লিপিতে ধর্ম্মপালকে "গৌড়েন্দ্র-বঙ্গপতি" বলা হইয়াছে (৪০) এবং তাঁহার সৈন্যদের "বৃহৎ বঙ্গাল" বলিয়া উল্লিখিত করা হইয়াছে (রাজা ভোজের 'সাগর-তাল লিপি) (৪১)। উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই, মধ্যযুগীয় চিতোরের মহারাণার পূর্ব্বপুরুষ গুহিলোট রাজ শঙ্করগণও নাগভট্টের সহিত বাঙ্গলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (৪২) তিনি নাগভট্টের সামন্ত ছিলেন বলিয়া প্রতীত হয়।

৩৮। খালিমপুর লিপি—গৌড়লেখমালা দ্রষ্টব্য।

৩৯। ভবিষ্যপুরাণে পঞ্জাব হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত ভারতীয় ভূখণ্ডকে "পঞ্চগৌড়" এবং সমগ্র দ্রাবিড়-ভাষী অংশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটকে "পঞ্চ দ্রাবিড়" বলিয়া অভিহিত কর হইয়াছে।

৪০। Baroda Plates of Karkaraja in Ind. Ant. vol 12. P, 160.

৪১। Vide Sanjan Copper Plates in J. BO. M. R. A. S. vol. 22.

৪২। Vide Chatsu inc. of Baladitya. Ep. Ind Vol. XII. p. 10.

খালিমপুর লিপিতে (৪৩) ধর্ম্মপাল নিজেকে "পরমসুগত" অর্থাৎ বৌদ্ধ বলিতেছেন। এই লিপিতে ইহাও উল্লিখিত আছে যে, তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন: "সীমান্তদেশে গোপগণ কর্ত্তৃক, বনে বনচরগণ কর্ত্তৃক, গ্রাম সমীপে জনসাধারণ কর্ত্তৃক, (গৃহ-) চত্বরে ক্রীড়াশীল শিশুগণ কর্ত্তৃক, প্রত্যেক ক্রয়-বিক্রয় স্থানে বণিকগণ কর্ত্তৃক...... আত্মস্তব শ্রবণ করিয়া (এই নরপতির) বদনমণ্ডল লজ্জাবশে নিয়ত ঈষৎ বক্রভাবে বিনম্র হইয়া রহিয়াছে" (শ্লোক—১৩)। পুনঃ, ইহাতে উল্লিখিত আছে, তিনি লাট (গুজরাট) দেশীয় দেবগৃহরক্ষক ব্রাহ্মণকে নারায়ণদেবের পূজোপস্থানাদি কর্ম্মের জন্ত চারিটি গ্রাম দান করিতেছেন। এতদ্বারা কি ইহাই সূচিত হয় যে, বাহিরের ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গলায় "দেবল" ব্রাহ্মণরূপে তখন পৌরহিত্য করিতেন?

এই লিপিদ্বারা আমরা একটা সামন্ততন্ত্রীয় ব্যবস্থা ও বৃহৎ আমলা-তান্ত্রিক পদসমূহের সংবাদ পাই। পুনঃ ইহাতে অশ্বারোহী সৈন্তদের "নাসীর" এবং যুদ্ধ-হস্তীকে "ঘনাঘন" নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন (খৃঃ ৮১০)। ইঁহার প্রদত্ত "মুঙ্গের-লিপি" দ্বারা আমরা নিম্নলিখিত সংবাদ পাই: "যে সর্ব্বার্থ ভূমীশ্বর সুগত (বুদ্ধদেব)......ভগবান সিদ্ধার্থদেবের সিদ্ধি প্রজাবর্গের সর্ব্বোত্তম সিদ্ধি বিধান করুক" (১ শ্লোক)। "যে রাজা শাস্ত্রার্থের অনুবর্ত্তী শাসন-কৌশলে (শাস্ত্র-শাসন হইতে) বিচলিত ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহকে স্ব স্ব (শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট) ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন (শাস্ত্রার্থভাজা চলতোহ্নুশাস্য বর্ণান্ প্রতিষ্ঠাপয়তা স্বধর্ম্মে) ধর্ম্মপাল নামক সেই রাজাকে পুত্ররূপে লাভ

৪৩-৪৪। গৌড়লেখমালা দ্রষ্টব্য।

করেন। তথায় উত্তর-ভারতের সমগ্র রাজারা তাঁহাকে "সার্ব্বভৌম" বলিয়া মানিয়া লন। (৩৮) তিনি প্রথমে "পঞ্চগৌড়েশ্বর" (৩৯) উপাধি ধারণ করেন। কিন্তু অনুমান হয়, গুর্জ্জর-প্রতিহার রাজ নাগভট্ট দ্বারা মুঙ্গের যুদ্ধে পরাজিত হইলে এই উপাধি ক্ষুণ্ণ হয়। কারণ নাগভট্ট চক্রায়ুধকে তাড়াইয়া তাঁহার খুল্লতাত ইন্দ্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন। এই যুদ্ধ বাঙ্গালার ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। পঞ্জাব হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত গুর্জ্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্যের সমস্ত সামন্তদের লইয়া নাগভট্ট ধর্ম্মপালকে যুদ্ধ প্রদান করেন। লেখক ছয়খানি বিভিন্ন তাম্রলিপি পড়িয়াছেন, যাহাতে এই যুদ্ধের উল্লেখ আছে। এই সব লিপিতে ধর্ম্মপালকে "গৌড়েন্দ্র-বঙ্গপতি" বলা হইয়াছে (৪০) এবং তাঁহার সৈন্যদের "বৃহৎ বঙ্গান" বলিয়া উল্লিখিত করা হইয়াছে (রাজা ভোজের "সাগর-তাল লিপি) (৪১)। উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই, মধ্যযুগীয় চিতোরের মহারাণার পূর্ব্বপুরুষ গুহিলোট রাজ শঙ্করগণও নাগভট্টের সহিত বাঙ্গলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (৪২) তিনি নাগভট্টের সামন্ত ছিলেন বলিয়া প্রতীত হয়।

৩৮। খালিমপুর লিপি—গৌড়লেখমালা দ্রষ্টব্য।

৩৯। ভবিষ্যপুরাণে পঞ্জাব হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত ভারতীয় ভূখণ্ডকে "পঞ্চগৌড়" এবং সমগ্র দ্রাবিড়-ভাষী অংশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটকে "পঞ্চ দ্রাবিড়" বলিয়া অভিহিত কর হইয়াছে।

৪০। Baroda Plates of Karkaraja in Ind. Ant. vol 12. P, 160.

৪১। Vide Sanjan Copper Plates in J. BO. M. R. A. S. vol. 22.

৪২। Vide Chatsu inc. of Baladitya. Ep. Ind. Vol. XII. p. 1 0.

খালিমপুর লিপিতে (৪৩) ধর্ম্মপাল নিজেকে "পরমসুগত" অর্থাৎ বৌদ্ধ বলিতেছেন। এই লিপিতে ইহাও উল্লিখিত আছে যে, তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন: "সীমান্তদেশে গোপগণ কর্ত্তৃক, বনে বনচরগণ কর্ত্তৃক, গ্রাম সমীপে জনসাধারণ কর্ত্তৃক, (গৃহ-) চত্বরে ক্রীড়াশীল শিশুগণ কর্ত্তৃক, প্রত্যেক ক্রয়-বিক্রয় স্থানে বণিকগণ কর্ত্তৃক...... আত্মস্তব শ্রবণ করিয়া (এই নরপতির) বদনমণ্ডল লজ্জাবশে নিয়ত ঈষৎ বক্রভাবে বিনম্র হইয়া রহিয়াছে" (শ্লোক—১৩)। পুনঃ, ইহাতে উল্লিখিত আছে, তিনি লাট (গুজরাট) দেশীয় দেবগৃহরক্ষক ব্রাহ্মণকে নারায়ণদেবের পূজোপস্থানাদি কর্ম্মের জন্ত চারিটি গ্রাম দান করিতেছেন। এতদ্বারা কি ইহাই সূচিত হয় যে, বাহিরের ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গলায় "দেবল" ব্রাহ্মণরূপে তখন পৌরহিত্য করিতেন?

এই লিপিদ্বারা আমরা একটা সামন্ততন্ত্রীয় ব্যবস্থা ও বৃহৎ আমলা-তান্ত্রিক পদসমূহের সংবাদ পাই। পুনঃ ইহাতে অশ্বারোহী সৈন্তদের "নাসীর" এবং যুদ্ধ-হস্তীকে "ঘনাঘন" নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন (খৃঃ ৮১০)। ইঁহার প্রদত্ত "মুঙ্গের-লিপি" দ্বারা আমরা নিম্নলিখিত সংবাদ পাই: "যে সর্ব্বার্থ ভূমীশ্বর সুগত (বুদ্ধদেব)......ভগবান সিদ্ধার্থদেবের সিদ্ধি প্রজাবর্গের সর্ব্বোত্তম সিদ্ধি বিধান করুক" (১ শ্লোক)। "যে রাজা শাস্ত্রার্থের অনুবর্ত্তী শাসন-কৌশলে (শাস্ত্র-শাসন হইতে) বিচলিত ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহকে স্ব স্ব (শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট) ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন (শাস্ত্রার্থভাজা চলতোহ্নুশাস্যবর্ণান্ প্রতিষ্ঠাপয়তা স্বধর্ম্মে) ধর্ম্মপাল নামক সেই রাজাকে পুত্ররূপে লাভ

৪৩-৪৪। গৌড়লেখমালা দ্রষ্টব্য।

করিয়া গোপাল পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের ঋণজাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন" (৫ শ্লোক)।

এতদ্বারা আমরা বৌদ্ধরাজাকে চাতুর্ব্বর্ণের পরিচালকরূপে বর্ণিত হইতে দেখি। পুনঃ, পিতৃপুরুষদের ঋণরূপ ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সংস্কারও ইহাতে দৃষ্ট হয়। এই সময়ে মহাযানীয় বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম অত্যন্ত কাছাকাছি আসিয়াছে বলিয়াই প্রতীত হয়। "দিক্‌বিজয়ে প্রবৃত্ত সেই নরপতির ভৃত্যবর্গ কেদারতীর্থে যথাবিধি জলক্রিয়া (স্নান-তর্পণাদি) সম্পন্ন করিয়াছেন এবং গঙ্গাসাগর সঙ্গমে তথা গোকর্ণ (দক্ষিণ মহারাষ্ট্র) প্রভৃতি তীর্থেও ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন" (৭ শ্লোক)। এতদ্বারা আমরা ধর্ম্মপালদেবের সাম্রাজ্যের পরিসীমার সম্বাদ পাই। পুনঃ এই সংবাদদ্বারা আমরা উপলব্ধি করি যে, অষ্টম শতাব্দীতেই (খৃষ্টাব্দে) বাঙ্গলার মোহানায় "গঙ্গাসাগর" তীর্থযাত্রার প্রথা ছিল। এই অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই অনুষ্ঠিত হইত। পরে "দিগ্‌বিজয় ব্যাপারের অবসানে পরাজিত ভূপতিবৃন্দকে পরাজয়জনিত চিত্তক্ষোভ বিদূরিত করিবার জন্য উৎকৃষ্ট পুরস্কার বিতরণ করেন" (৮ শ্লোক)। এতদ্বারা ধর্ম্মপালের রাজনীতি কৌশল প্রকাশ করা হইয়াছে। পুনঃ "গার্হস্থ্য-ধর্ম্মাবলম্বী সেই নরপাল রাষ্ট্রকূটভূষণ শ্রীপরবল নামক নরপালের কন্যা রন্নাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন" (৯ শ্লোক)। এইস্থলে ধর্ম্মপাল যে, অশোকের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের "উপাসক" ছিলেন তাহারই ইঙ্গিত করা হইতেছে। উপাসকেরা গার্হস্থ্যাশ্রমাবলম্বী হইতেন। যাঁহারা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদীয়দের পৃথক সমাজভুক্ত বলিয়া ধারণা করেন এই উক্তি তাঁহাদের প্রণিধানযোগ্য। পুনঃ, হিন্দুরাজার যে "জাতি" নাই তাহা এই বিবাহই সাক্ষ্যপ্রদান করে। পুনঃ, দেবপালদেবের দিক্‌বিজয়

কালে "তাঁহার রণকুঞ্জরগণ ভ্রমণ করিতে করিতে বিন্ধ্যগিরিতে উপনীত হইয়া......বন্ধুগণকে পুনরায় দর্শনলাভ করিয়াছিল এবং যুবক অশ্বগণও কাম্বোজদেশে উপনীত হইয়া প্রিয়তমবৃন্দের দর্শনলাভ করিয়াছিল" (১৩ শ্লোক)।

শেষে এই লিপি বলিতেছে, "একদিকে হিমালয় অপরদিকে শ্রীরামচন্দ্রের কীর্তিচিহ্ন সেতুবন্ধ—একদিকে বরুণ নিকেতন, অপরদিকে লক্ষ্মীর জন্ম-নিকেতন (ক্ষীরোদ সমুদ্র) এই চতুঃসীমাচ্ছিন্ন সমগ্র ভূমণ্ডল সেই রাজা নিঃসপত্নভাবে উপভোগ করিয়াছিলেন" (১৫ শ্লোক)। গৌড়ীয় রীতি অনুযায়ী অলঙ্কারের ঝংকার মধ্যে আমরা এই বোধগম্য করি যে, ধর্ম্মপাল সমগ্র ভারতের সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা কতটা সত্য তাহা প্রশ্নের বিষয়। অন্ততঃ পক্ষে এই কথা দেবপালদেবের বিষয়ে খাটিতে পারে।

এই দাবী ঐতিহাসিক বিচারসহ কিনা তাহা সমালোচকেরাই নির্দ্ধারিত করিবেন। লামা তারানাথ দেবপালদেবের রাজ্যসীমার বিষয় বলিতেছেন: উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, পশ্চিমে জলন্ধর এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত উহা বিস্তীর্ণ ছিল। উপরোক্ত তাম্রলিপির ভাষায় গোল থাকিলেও দেবপালের রাজ্য-বিস্তৃতি বিষয়ে তারানাথের সহিত তাহার মিল আছে। পাল-বংশের প্রথম যুগে তাহারা কিছুদিনের জন্য "গুপ্ত-সাম্রাজ্য" পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল অর্থাৎ সেই পরিসর পায়। এই বংশ বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ সহায়ক হইলেও তাম্র-অনুশাসনগুলি হইতে আমরা নিদর্শন পাই যে, তাঁহারা ব্রাহ্মণদেরও ভূমিদান করিতেন এবং তাহাদের দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন। ধর্ম্মপাল ওদন্তপুরী বিহার (বর্ত্তমান বিহার সরিফ) ব্যতীত বিক্রমশিলার বিহার (ভাগলপুর) স্থাপন করেন এবং তাঁহার বৃদ্ধকায়স্থ টঙ্কদাস তথাকার

প্রধানাধ্যক্ষ হন। এই বংশ পুনঃ সোমপুরী বিহার (বর্ত্তমান পাহাড়-পুরের ভগ্নস্তূপ) এবং দক্ষিণে (?) * জগদ্দল বিহার নির্ম্মাণ করেন।

দেবপালদেবের রাজ্যকালে চন্দ্রবংশীয় শৈলেন্দ্র বংশীয় সম্রাট বালপুত্রদেব তাঁহার কাছে রাজদূত পাঠাইয়া বৌদ্ধযাত্রীগণের জন্য বৌদ্ধতীর্থস্থানসমূহে গ্রাম ভিক্ষা করেন। দেবপাল সেই অভিলাষপূর্ণ করেন। এই পুণ্যকর্ম্মের দ্যোতক ছিলেন ব্যাঘ্রতটি মণ্ডলের (রাজসাহী জেলা) সামন্ত বলবর্ম্মণ :—যিনি একাকী সর্ব্বদাই তাঁহার শত্রুদের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত ছিলেন। (৪৫) এইস্থলে বক্তব্য এই যে—তৎকালে বর্ত্তমানের Indonesia এবং Phillippine Islands লইয়া ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের দ্বারা এই বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়।(৪৬) এই হিন্দু ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ আজ হিন্দুধর্ম্মীয় বলিদ্বীপ!

ভ্রাতা জয়পাল (ভাগলপুর-লিপি) ও মন্ত্রী দর্ভপাণির নীতি-কৌশলে দেবপালদেব (৮১০—৮৫০) এত বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দর্ভপাণির পুত্র কেদার মিশ্র। গরুড়-স্তম্ভ-লিপি বলিতেছে, "তাঁহার হোমকুণ্ডোত্থিত অবক্রভাবে বিরাজিত সুপুষ্ট হোমাগ্নিশিখাকে চুম্বন করিয়া দিকচক্রবাল যেন সন্নিহিত হইয়া পড়িত" (১১ শ্লোক)। "এই মন্ত্রীবরের বুদ্ধিবলের উপাসনা করিয়া গৌড়েশ্বর (দেবপালদেব), উৎকুল-কুল উৎকিলিত করিয়া, হূন-গর্ব্ব (৪৭) খর্ব্ব করিয়া এবং দ্রাবিড়-গুর্জ্জরনাথকে চূর্ণীকৃত

---

* কেহ কেহ বলেন, ইহা অন্যত্র অবস্থিত ছিল।

৪৫। EP. Ind. vol. 17, No 17, P. 311

৪৬। Wigmore : "Legal Theories of the World".

৪৭। EP. Ind, Vol. 2.

করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্র-মেখলা-ভরণাবসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন" (১৩ শ্লোক)। "সেই বৃহস্পতি প্রতিকৃতি (কেদার মিশ্রের,) যজ্ঞস্থলে, শ্রীশূরপাল (১ম বিগ্রহপাল নামক) নরপাল, স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অনেকবার নতশিরে পবিত্র (শান্তি) বারি গ্রহণ করিয়াছিলেন" (১৪ শ্লোক)।

তৎপর দৃষ্ট হয় (বাণগড়-লিপি),১ম মহীপালদেব (৯৯৮—১০৩৮ খৃঃ) এক গ্রাম "গঙ্গা স্নানান্তে" (৫০ শ্লোক) ভট্টপুত্র কৃষ্ণাদিত্য শর্ম্মাকে বিষুব-সংক্রান্তি শুভদিনে দান করিয়াছিলেন।

পুনঃ, উক্তলিপি বলিতেছে: নারায়ণদেবের (৮৫৭—৯১১ খৃঃ) শ্রীরাজ্যপাল নামক পুত্র "গভীর গর্ভ-সংযুক্ত জলাশয়ের এবং সমুচ্চ কক্ষ সংযুক্ত দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন" (৭ শ্লোক)। "তাঁহার (ঔরসে) এবং রাষ্ট্রকুট কুলচন্দ্র তুঙ্গদেবের দুহিতা ভাগ্যদেবীর (গর্ভে)...গোপালদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন" (৮ শ্লোক)। তাঁহার পুত্র শ্রীমহীপালদেব......বিপক্ষপক্ষ নিহত করিয়া অনধিকৃত—বিলুপ্ত (কীলহর্ণের অনুবাদ—Having obtained his father's Kingdom which had been snatched awa, by people, who had no claim to it") পিতৃরাজ্যের উদ্ধারসাধন করিয়া রাজগণের মস্তকে চরণ-পদ্ম সংস্থাপিত করিয়া অবনীপাল হইয়াছিলেন।" (১২ শ্লোক)।

এই লিপিতে অবাঙ্গালী কাম্বোজদের দ্বারা বঙ্গদেশের রাজদণ্ড পালবংশের হস্তচ্যুত হওয়ার ইঙ্গিত করিতেছে। কাম্বোজেরা কোন জাতীয় বা কোথা হইতে আসে তাহা আজও অজ্ঞাত। অবশ্য তাহারা বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত "কাম্বোজ" (ইরাণী কম্বুজিয়া) যাহা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমানার বাহিরে অবস্থিত ছিল, সেই দেশের

লোক নয়। ইহারা পূর্ব্ব-হিমালয়স্থিত কোন পার্ব্বত্য জাতি হইতে পারে। পার্ব্বত্য জাতি বলিয়া হয়ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ইহাদের "কাম্বোজ" বলিয়া ভুল করিয়াছেন, যদ্রূপ পরের যুগের তুর্কী-মুসলমানদের "যবন" (Ionian) বলিয়া ভুল করা হইয়াছিল।

এই কাম্বোজবংশীয় নয়পালদেবের তাম্রশাসন দ্বারা আমরা অবগত হই যে, তাঁহারা আর্য্য সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই লিপিটি সংস্কৃত ভাষায় এবং বাঙ্গালা অক্ষরের পূর্ব্বরূপ অক্ষর দ্বারা (৪৮) উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই লিপি "প্রিয়ঙ্গু" নামক তাঁহার রাজধানী হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে দাতার বংশ-পরিচয় বিবৃত আছে। প্রথম রাজা ছিলেন, কাম্বোজ-বংশীয় রাজ্যপাল; তাঁহার রাণীর নাম ভাগ্য দেবী (৬-৮ শ্লোক)। তাঁহাদের পুত্র নারায়ণ পাল বাসুদেব ভক্ত ছিলেন (১৩ শ্লোক)। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নয়পাল তাঁহার পর সিংহাসনারোহণ করেন (১৪-১৫ শ্লোক)। রাজ্যপাল "পরম সৌগত" অর্থাৎ বৌদ্ধ ছিলেন; নয়পালের সম্রাট উপাধি ছিল যথা: পরমেশ্বর, পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ (১৪-২০ শ্লোক)। এই লিপি দ্বারা রাজা বর্দ্ধমান-ভুক্তির অন্তর্গত দণ্ডভুক্তি মণ্ডলস্থিত বৃহৎ-ছট্টিবন্ন নামক গ্রাম এক ব্রাহ্মণকে ভূমি—চ্ছিদ্র ন্যায়ানুসারে দান করিতেছেন (১৭ শ্লোক)। গ্রামস্থ ব্যবসায়ী, কেরাণী, ক্ষেত্রকর, গৃহস্থ প্রভৃতিদের সম্বোধন করিয়া শঙ্কর ভট্টারকের (শিব) নামে তাম্রশাসন দ্বারা নবমী দিবসে তিনি এই গ্রাম দান করিতেছেন।

এই তাম্রলিপি দ্বারা আমরা দেখি যে, এই কাম্বোজ রাজ-বংশ সম্পূর্ণভাবে আর্য্যকৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছেন এবং সমগ্র বাঙ্গলার সম্রাট হইয়া

৪৮। EP. Ind. Vol. 22. No. 25

ছিলেন। পুনঃ, এই ঘটনার দ্বারা দৃষ্ট হয় যে, কাম্বোজদের দ্বারা বাঙ্গলায় একটি নূতন মূলজাতির আমদানী হয় (৪৯)

মহীপাল বিষয়ে আরও সংবাদ আমরা লিপি মধ্য হইতে সংগ্রহ করি। বালাদিত্য প্রস্তরলিপি (নালন্দা লিপি) হইতে আমরা অবগত হই, মহীপালদেব "তাঁহার রাজত্বের একাদশ সম্বৎসরে অগ্নিদাহের পর বালাদিত্য মন্দিরটি তিনি জীর্ণোদ্ধার করেন।" এতদ্বারা নালন্দার একবার অগ্নিদাহের ইঙ্গিত আছে। তীব্বতীয় পুস্তক "প্যাগ-সাম জন জাঙ্গ" পুস্তকে ইহার উল্লেখ আছে।" (৫০)

তৎপর মহীপাল কাশীতে মন্দিরসমূহ স্থাপন করিয়াছিলেন। "সরসী সদৃশ বারাণসী ধামে .....গুরুদেবের পাদপদ্ম আরাধনা করিয়া (১ম শ্লোক) গৌড়াধিপ মহীপাল ঈশান-চিত্রঘণ্টাদি শতঃকীৰ্ত্তিরত্ন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন (২য় শ্লোক)......তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্য সকল হইয়াছে।......সেই শ্রীমান স্থিরপাল ও শ্রীমান বসন্তপাল (নামক) অনুজ ধর্ম্মরাজিকার সঙ্গে ধর্ম্মচক্রের (৩ শ্লোক) জীর্ণ সংস্কারে এবং অষ্ট মহাস্থান শৈল-বিনির্ম্মিত গন্ধকুটী নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (৪ শ্লোক)—(সারনাথলিপি—১০২৬খৃঃ)।

৪৯। কেহ কেহ উত্তর বঙ্গের ও কামরূপের বর্ত্তমানের কোচ বা রাজবংশীয় জাতিকে এই কাম্বোজদের বংশ বলিয়া অনুমান করেন।

৫০। তীব্বতীয় পুস্তকসমূহে তুর্কীদ্বারা নালন্দা ধ্বংসের কথা নাই। তারানাথ বলেন, তুর্কীরা ওটন্টপুরী ও বিক্রমশীলায় দুর্গ স্থাপন করিয়াছিল (পৃঃ ২৫৪)। P. al. Jor. "History of the Rise, Progress & Downfall of Buddism in India, edited by S K. Das, P, 92. পুস্তকে বলা হইয়াছে যে নলন্দার লাইব্রেরী যাহাকে ধর্ম্মগঞ্জ বলা হইত তাহা তীর্থিক (ব্রাহ্মণ) ভিক্ষুকদের দ্বারা অগ্নি-সংযোগে. বিধ্বংসীকৃত হয়। 'রত্ন সাগর', 'রঞ্জক' 'রত্ন দধি' নামক ৩টি মন্দির লাইব্রেরী... ..থাকিত। এই তিনটি মন্দির লইয়া ধর্ম্মগঞ্জ সংগঠিত হয়।

গৌড়লেখমালা প্রণেতা বলেন, "কাশী খণ্ড" নামক পুস্তকে ৬৩।৭৫ এই মূর্ত্তিদ্বয়ের উল্লেখ আছে। বোধহয় পরে ব্রাহ্মণ্যবাদ ঈশানকে "শিব" এবং চিত্রঘণ্টাকে "নবদুর্গা" রূপে আত্মস্থ করিয়াছেন।

এই সময়েই উত্তরে মামুদ-গজনবীর অভিযান হইতেছে। মামুদ একবার বারাণসীও লুণ্ঠন করিয়াছিল। মহীপাল বোধহয় তাহার পরে, কাশীধামে মন্দিরসমূহ নির্ম্মাণ করেন।

পালবংশের তৃতীয় বিগ্রহ পালের জীবনকালে কিংবা তাঁহার মৃত্যুর ঠিক পরে, কৈবর্ত্তগণ উত্তরবঙ্গে বিদ্রোহী হয় এবং স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠিত করে। ইহা কথিত আছে যে, জেলে কৈবর্ত্তগণ মৎস্যজীবী ছিল বলিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের "শীল" গ্রহণ করিতে পারিত না, যেহেতু বৌদ্ধশাস্ত্রে জীব-হন্তাদের বুদ্ধের ধর্ম্মে স্থান প্রদান করা নিষিদ্ধ আছে। (৫১) তদানীন্তনের পালরাজা এই আইন কৈবর্তদের উপর জারী করেন, ইহাতেই উত্তর-বঙ্গের কৈবর্ত্তেরা ক্ষিপ্ত হইয়া বিদ্রোহ করে। এই কারণ পর্য্যাপ্ত হেতু বলিয়া মনে হয় না; আরও যথার্থ কারণ নিশ্চয়ই ছিল যাহা ইতিহাসে উল্লিখিত হয় নাই। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন, "কৈবর্ত্তনায়ক সম্ভবতঃ প্রথমে পালরাজগণের ভৃত্য ছিলেন।" (৫২) আবার বর্ত্তমানের কোন কোন লেখক অনুমান করেন ইহা "কৈবর্ত বিদ্রোহ" নয়। ইহা প্রজাসাধারণেরই (অনন্ত সামন্ত চক্র) বিদ্রোহ। এক্ষণে প্রশ্ন এই, কেন বৌদ্ধ বা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বনে ইচ্ছুক প্রজারা বৌদ্ধ রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া একটা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন? আবার কৈবর্ত্ত বিদ্রোহকালে অথবা তাহার পূর্ব্বে পীঠিপতি

৫১। "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" রাজন্য কাণ্ডে লিখিত আছে, "এই সময়ে 'আদি কর্ম্মবিধি' (ভভকর গুপ্ত রচিত) নামক বৌদ্ধধর্ম্মীয় পুস্তক রচিত হয়। এই পুস্তকে মৎস্যঘাতী কৈবর্ত্তগণ কখনও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না—এই ব্যবস্থা দেওয়া হয়, ১৯৩ পৃঃ।

৫২। বাঙ্গালার ইতিহাস—২৫৩—৫৮ পৃঃ।

(গয়া জেলার সামন্ত) রামপালের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। (৫৩) এই কারণবশতঃ অনুমান করিতে হইবে, রাজশক্তি এমন কিছু অন্যায় বা অত্যাচার করিতেছিল যাহার বিরুদ্ধে অভিজাতসম্প্রদায় এবং প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়াছিল। বরেন্দ্রের তথাকথিত কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহীদের অধিনায়ক ছিলেন দিব্বোক; "দিব্বোকের পরে বোধহয় তাঁহার ভ্রাতা রুদ্রোক নব-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের অধিকার পাইয়াছিলেন। রুদ্রোকের পুত্র ভীম উত্তরাধিকারীসূত্রে উত্তরবঙ্গের সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন।" (৫৪) অবশেষে মগধ হইতে রাষ্ট্রকূটবংশীয় সামন্তরাজ মাতুল মথনদেবের সাহায্য লইয়া রামপাল ভীমকে পরাজিত করেন এবং উঁহাকে হস্তীপৃষ্ঠে ধৃত করেন। পরাজিত কৈবর্ত্তসেনা হরি নামধেয় জনৈক নায়ক কর্তৃক একত্রিত হইয়াছিল। (৫৫) যুদ্ধান্তে হরি ধৃত হইয়া ভীমের সহিত নিহত হইয়াছিলেন; আর "রামপাল যুদ্ধান্তে ভীমের রাজধানী ডমর নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন।" (৫৬) শ্রেণী-বিদ্বেষ আর কত নৃশংস হইবে! ইহার পর এই ধর্ম্মভীরু বুদ্ধদেবের রাজা শিষ্য রামাবতী নামক একটি নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে জগদ্দল মহাবিহার স্থাপন করিয়াছিলেন। (৫৭)

বাঙ্গলার পতিত ও নিপীড়িতদের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং দুই পুরুষ ধরিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্র সংস্থাপনের চেষ্টাকে পাল-বংশের স্তুতিগায়ক সন্ধ্যাকর নন্দী "রাজার বিপক্ষে কৈবর্ত্ত প্রজাদের বিদ্রোহ" বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। রাজকর্ম্মচারী বৈদ্যদেব তাঁহার

৫৩—৪) বাঙ্গালার ইতিহাস—পৃঃ ২৫৩; ৫৮; ২৫৩।

৫৫। Memoirs of A. Soc. of Bengal. Vol. III. P. 14

৫৬। রামচরিত—১।২৭ টীকা

৫৭। Memoirs of A. Soc, of Bengal. Vol. III. P. 14

তাম্রলিপিতে (কমৌলী-লিপি) উল্লেখ করিয়াছেন : "তিনি (রামপাল) ভীম নামক ক্ষৌণী নায়কের বধ সাধন করিয়া, জনকভূমি (বরেন্দ্র) লাভে (জনকভূলাভন্) ত্রিজগতে (শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায়) আত্মযশঃ বিস্তৃত করিয়াছিলেন" (৪ শ্লোক)। আজকালকার ঐতিহাসিকগণও ইহার বেশী যান না।

জেলে ও চাষীর দল রাজাকে তাড়াইয়া গৌড় এবং বরেন্দ্র অধিকার করিয়া কিছুদিন রাজত্ব করেন ; শেষে দেশের সমস্ত অভিজাতসম্প্রদায় দ্বারা রাষ্ট্রকূটদের সাহায্য লইয়া পতিতদের এই রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া তাহার রাজধানী পর্য্যন্ত ধ্বংস করার ব্যাপার সাধারণ "কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ" "নয়। ইহার পশ্চাতে ইতিহাসের কি অর্থনীতিক ব্যাখ্যা ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে এইটুকু বোঝা যায়. এই পতিত বিদ্রোহীরা রাজার বিপক্ষে অভিজাতদের নিকট কোন সাহায্য পায় নাই। সন্ধ্যাকর নন্দী, যিনি স্বয়ং পালবংশের অধীন একজন কর্ম্মচারী ছিলেন তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, সিংহাসনচ্যুত রামপাল গৌড়চক্রের (বঙ্গ, মগধ, উড়িষ্যা) বাইশজন সামন্তের কাছে গিয়া সাহায্যভিক্ষা চান। তাঁহাদের সাহায্যেই রামপালের যুদ্ধের প্রস্তুতি হয় ("রাম চরিত।") । এতদ্বারা দৃষ্ট হয়, অভিজাতেরা শ্রেণী-স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হইয়া রাজবংশেরই সাহায্য করিয়াছিল। তাহারা কি এই প্রজাবিদ্রোহকে ভয় করিতেছিল, পাছে ইহা সমস্ত বঙ্গ ও মগধব্যাপী হয়? তথা-কথিত এই বিদ্রোহ বাঙ্গলার শ্রেণী-সংগ্রামের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। (৫৮)

৫৮। আজকালকার মত এই যে, বরেন্দ্রের অনন্ত "সামন্ত চক্র" দিব্যোকের অধিনায়কত্বে বিদ্রোহ করিয়াছিল। রাঢ়ভূমি ইহাতে যোগদান করে.নাই। বারেন্দ্রে ইহা জনসাধারণের বিদ্রোহে পরিণত হইয়াছিল। আজকাল people বলিলে যাহা বুঝায় তৎকালে বাঙ্গলায় এই প্রকার ছিল না। একজন মাতব্বর বা সর্দ্দার বা গ্রাম্য কর্ত্তা বা স্থানীয় সামন্তের অধীনে তাঁবেদার থাকিত। এই মাতব্বরেরাই সর্ব্বকর্ম্মে

পাল বংশের পতন

পঞ্চগৌড়েশ্বর পালরাজবংশ প্রায় চারিশত বৎসর ব্যাপী রাজত্ব করিয়াছিল। ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন, এতদীর্ঘকাল কোন বংশ ভারতে রাজত্ব করে নাই। তদ্রূপ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, বাঙ্গলার পালেরা এবং পরের কালের "কর" আখ্যাধারী উড়িষ্যার রাজারা বরাবরই বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন। (৫৯) পালেরা যেমন "পরম সৌগত" উপাধি ধারণ করিতেন, করেরা তেমন "পরম তথাগত" উপাধি ধারণ করিতেন। ভারতে মৌর্য্য, গুপ্ত বাঙ্গলার সেনবংশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্ম্মের উপাসক হন। মৌর্য্যাদির মধ্যে কেহ জৈন, কেহ বৌদ্ধ; প্রথম গুপ্তেরা বৈষ্ণব, শেষের গুপ্তেরা বৌদ্ধ; সেন বংশের কেহ শৈব কেহ বৈষ্ণব; কেহ সৌরোপাসক ছিলেন। কিন্তু পাল ও করেরা নিরবচ্ছিন্নভাবে বুদ্ধের শিষ্য ছিলেন।

কিন্তু বহির্শত্রু ও অন্তর্শত্রুর আক্রমণে পাল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিতে থাকে। ইহার সীমানা ক্রমাগত সঙ্কোচিত হইতে থাকে। দক্ষিণ হইতে রাজেন্দ্র চোল (১০১৪-১০৪৪ খৃঃ) দিগ্বীজয়কালে বাঙ্গলা আক্রমণ করেন। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় পাহাড়ে উৎকীর্ণ তামিল ভাষার লিপিতে নিম্নলিখিত বর্ণনা আছে: (৬০) "সকল দিকে প্রসিদ্ধ তক্কন লাড়ম্ (দক্ষিণ রাঢ়) সবেগে রণশূরকে আক্রমণ করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, বঙ্গাল (Vangala-Desa) দেশ, যেখানে ঝড়-বৃষ্টির কখন বিরাম নাই এবং গজপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যেখান হইতে গোবিন্দ

অগ্রসর হইত। বিদ্রোহ বিষয়ে "দিব্বোক উৎসব" উপলক্ষে অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের সভাপতির অভিভাষণ দ্রষ্টব্য।

৫৯। EP. Ind. Vol. XV. No 1, P. 2.

৬০। „ „ „ „ IX, PP. 232—33

চন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন, কর্ণভূষণ, চর্ম্মপাদুকা এবং বলয়-বিভূষিত মহীপালকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া......রমণীগণকে হস্তগত করিয়াছিলেন।" (৫১) এই তিরুমাল্লাই-লিপি ১০২৪ খৃঃ উৎকীর্ণ হয়।

পুনঃ, খজুরাহোতে প্রাপ্ত ১০০২ খৃঃ উৎকীর্ণ একখানা শিলা-লিপিতে চন্দেলরাজ ধঙ্গের দিক্‌বিজয় সম্বন্ধে এই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে: "তুমি কে? কাঞ্চী রাজপত্নী! তুমি কে? অন্ধ্রাধিপত্নী! তুমি কে? রাঢ়ারাজপত্নী! তুমি কে? অঙ্গরাজপত্নী! সমরবিজয়ী রাজা ধঙ্গের কারাগারে সজল নয়নে শত্রুপত্নীগণের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল" (৫২)। এতদ্বারা পালযুগের বাঙ্গলার উপর আর একটি রাজনীতিক ঝড় বহিয়া গিয়াছিল বলিয়া প্রতীত হয়। এই দুই লিপি দ্বারা আমরা বোধগম্য করি যে, পরাজিত শত্রুরাজার রাণীকে কয়েদ করিয়া লইয়া যাওয়া এই মধ্যযুগ হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। পুনঃ, এই সব অ-বাঙ্গালী লিপি হইতে আমরা বুঝিতে পারি, পাল-সাম্রাজ্য আর অটুট নাই। রাঢ়ে শূরবংশ, অঙ্গদেশে আর একটি বংশ, উড়িষ্যায় করবংশ প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজবংশ মস্তকোত্তলন করিয়া সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ভঙ্গ করিতেছে। পরে দৃষ্ট হয়, বঙ্গে অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে বর্ম্মণ রাজারা উত্থিত হইয়াছেন। ইঁহারা যদুবংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন। কেহ ইঁহাদের পঞ্জাবাগত, কেহ-বা কলিঙ্গাগত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে চাহেন। দশম বা একাদশ শতাব্দীতে বর্ম্মণ বংশ বোধহয় বাঙ্গলার অধিকাংশ স্থানে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেন।

তৎপর অপ্রত্যাশিতভাবে সুদূর কর্ণাটক হইতে সেনবংশ আসিয়া প্রথমে রাঢ় দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। পরে তাঁহারা ধীরে ধীরে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হন। ১১৪০ খৃঃ উত্তরবঙ্গের নিমদীঘি নামক

৫১। রমাপ্রসাদ চন্দ: গৌড়রাজমালা।

৫২। EP. Ind. Vol. I. P.145.

স্থানে বিজয় সেন বাঙ্গলার শেষ পালরাজা ৩য় গোপালদেবকে পরাজিত করেন। গোপালদেব এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। নিমদীঘি লিপির পাঠোদ্ধারক ৺নলিনী ভট্টশালী বলিতেছেন, "এই যুদ্ধে ৩য় গোপাল হত হন এবং পালবংশের গৌরবরবি অস্তমিত হয়। (৫৩) এই যুদ্ধে মৃতদের শব যেখানে দাহ করা হইয়াছিল সেই মহাশ্মশানে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই মন্দিরের দ্বারে এই সকল ঘটনার বিবরণ সম্বলিত এই লিপিখানি সংলগ্ন করা হয়। উক্ত লিপিটির অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া এখানে দেওয়া গেল: "শ্রীমদ্ গোপালদেব স্বেচ্ছায় শরীর ত্যাগ করিয়া স্বর্গগত হইয়াছেন এবং তাঁহার পদধূলি মিজং নামে প্রথিত আমি (হায়!) এখনও বাঁচিয়া আছি। পিতৃ আজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ (রাজার প্রতি) অসীম কৃতজ্ঞতাসম্পন্ন ঐড়দেব সেন শত্রুকে একশত তীক্ষ্ণ শর দ্বারা পুরিত করিয়া আটজন সহচর সহ রাজার সহিত স্বর্গে গিয়াছেন (২ শ্লোক)। যুদ্ধ দ্বারা নিজের (জীবিতাবস্থা) অতিক্রম করিয়া চন্দ্রকিরণের মত অমল যশ অর্জ্জন পূর্ব্বক শুভদেবনন্দন (ঐড়দেব) দেবতাগণের মত ত্রিদশ সুন্দরী-গণের দৃষ্টি লইয়া খেলা করিতেছেন (৩ শ্লোক)। (৫৪) তাঁহার (ঐড়দেব) "বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্রীমান ভাবক যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্য (শ্রাদ্ধ) সম্পাদন করেন (৫ শ্লোক)। শরশল্য পূরিত বহু প্রাণীকে (সৈন্য) যেস্থানে দগ্ধ করা হইয়াছিল, সেইস্থানে ভাবকদাস কৃত এই কীর্ত্তি (মন্দির) বিরাজ করিতেছে (রাতকদ্বারা লিখিত)" (৫ শ্লোক)।

এই দগ্ধ কার্য নিশ্চয়ই বিজয়ীদলের অনুমতিক্রমে সম্পাদিত হইয়া

৫৩। মাসিক বসুমতী: বাঙ্গলার মহাশ্মশান—নিমদীঘি, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৪৯ সাল।

৫৪। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম রণক্ষেত্রে মৃত যোদ্ধার এইরকম গতির কথাই বলিয়াছেন। ইহা সামন্তযুগীয় ভাবধারার অন্তর্গত।

ছিল। ইতিহাসে এবম্প্রকারের কার্য্যের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ইহা বিজয়সেনের বীরত্বপ্রসূত উদারতার পরিচয় প্রদান করে। যেদেশেই সামন্ত-তন্ত্র উত্থিত হইয়াছে সেই দেশেই "স্বামীধর্ম্ম" উদ্ভূত হইয়াছে।

রাজপুতানার হলদিঘাটের যুদ্ধে "ঝালা স্বামীধর্ম্ম ভুলেনা" এই উক্তি চারণের গাথা দ্বারা অমর হইয়াছে। কিন্তু ঐড়দেবের "স্বামীধর্ম্ম" পালনের কথা আজ আটশত বৎসর চাপা পড়িয়া আছে।

কিন্তু নিমদীঘিতে বাঙলায় পালদের অধিকার শেষ হয় নাই। গৌড় ও উত্তর-বঙ্গ তাঁহাদের অধীন ছিল। ইহার পর দৃষ্ট হয়, "রামপাল আত্মজন্মা মদনদেবী-গর্ভসম্ভূত মদনপালদেব উত্তর-বঙ্গে রাজত্ব করেন এবং তাঁহার পট্টমহিষী চিত্রমতিকা দেবী বটেশ্বর স্বামী শর্ম্মণকে বেদব্যাস-প্রোক্ত মহাভারত পাঠের জন্য ভগবান বুদ্ধ ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির কোটিবর্ষ বিষয়ে হলাবর্ত্তমণ্ডলে কোটগিরিতে বিংশতি কায়া ভূমি" দান করিতেছেন। বাজা রামাবতী নগর-পরিসর-সমাবাসিত জয়স্কন্দাবার হইতে এই দান মঞ্জুর করিয়াছেন (মনহলি-লিপি)। (৫৫)

এই লিপিতে প্রথম পাল সম্রাটদের লিপির আলঙ্কারিক ঝঙ্কার বজায় আছে। রাজার অগণিত কর্ম্মচারীবৃন্দ ও প্রাচীন প্রথামত তাহাদের উপাধির বহর এবং পুরাতন "গৌড়-মালব-চোড়-খস হূন-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চাটভাট" প্রভৃতি সেবকদের দলের উল্লেখও আছে। এতদ্বারা দৃষ্ট হয় পালবংশ তখনও পদ্মানদীর উত্তরাংশ এবং মগধ ভোগ করিতেছিলেন। বহুপরে বিজয়সেনের পৌত্র লক্ষ্মণসেন আকস্মিক আক্রমণ দ্বারা গৌড় করায়ত্ত করেন (আসীদ্ গৌড়েশ্বরশ্রীহটহরণকলা—১৯ শ্লোক) (৫৬)।

৫৫। গৌড়লেখমালা।

৫৬। N. G, Mazumder: Inscriptions of Bengal, Vol. III, Madhainagar plates.

এতদিনে পালবংশের সহিত বাঙ্গলার রাজনীতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল; কিন্তু বোধহয় সামাজিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই; কারণ 'বল্লালচরিত' গ্রন্থে উল্লেখিত আছে, পূর্ব্ববঙ্গের সুবর্ণ বণিকদের দলপতি ধনী বল্লভের কন্যার সহিত মগধের বৌদ্ধরাজার বিবাহ হইয়াছিল।

পালবংশের শেষ রাজা গোবিন্দপালদেব। ১১৬১ খৃঃ তাঁহার রাজত্ব শেষ হয়। ইনি মগধেই থাকিতেন। ঐতিহাসিকদের মতে বক্তিয়ার পুত্র মহম্মদ খিলিজির আক্রমণকালে মগধে কোন রাষ্ট্র ছিলনা; কাশীর রাজা জয়চন্দ্র ও বাঙ্গলার রাজা লক্ষ্মণ সেনের যুদ্ধে মগধ বিধ্বংস হইয়া ছিল। সেনরাজগণ মিথিলা জয় করিয়া মগধ বিজয়ে সচেষ্ট ছিলেন। লক্ষ্মণ সেন কতিপয় লিপিতে গর্ব্বভরে উক্তি করিয়াছেন, তিনি কাশীরাজকে পরাজিত করিয়াছেন এবং তাঁহার একপুত্রের লিপিতে উক্ত হইয়াছে, তিনি প্রয়াগেও জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন।

পরলোকগত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, তুর্কী আক্রমণের সময় মগধে কোন রাজা ছিল না। কেবল একজন "পীঠিপতি" ছিল। এই সময়ে বঙ্গে ও মগধে একমাত্র বুদ্ধগয়ার পীঠিপতিই বৌদ্ধধর্ম্ম আঁকড়াইয়া ছিল।(৫৭) কিন্তু এখনকার ঐতিহাসিকদের মত এই, মগধে তৎকালে রাষ্ট্র বলিয়া কিছুই ছিল না; ছোট ছোট জমিদারগণই ছিল। "বিহারকী ইতিহাস" লেখক বলেন, বিহারের আজকালকার একজন জমিদারের যে ক্ষমতা আছে, গোবিন্দপালের তাহাও ছিল না। নেপালে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ পুস্তকে গোবিন্দপালের "বিগত রাজ্যের" উল্লেখ দেখিয়া অনুমিত হয়, তিনি তুর্কী আক্রমণের বহু পূর্ব্বেই হয়ত বল্লাল সেনের সময়ে

৫৭। Vide Majumdar's, Indian Antiquary. 1919 p, 43.

মৃত হন (নগেন্দ্রনাথ বসু : রাজন্যকাণ্ড)। কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন তুর্কী দ্বারা ওটণ্টপুরীর উপর আক্রমণ হইলে তিনি ভিক্ষুদের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। ওটণ্টপুরীতেই নালন্দার পুস্তকালয় থাকিত। বোধ হয় তুর্কীদের আক্রমণে ইহার শেষ ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটে। কারণ তাহারা ইহাকে দুর্গ মনে করিয়া আক্রমণ করে। দুর্গ জয়ের পরে দৃষ্ট হয় যে ইহা একটি শিক্ষায়তন, আর অনেক পুস্তকও রক্ষিত রহিয়াছে এবং মুণ্ডিত-মস্তক ব্রাহ্মণেরা তথায় * নিহত হইয়াছে। তুর্কীরা এমনিভাবে বিজয়-কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিল যে একজন লোকও তথায় পাওয়া যায় নাই যে এই পুস্তকগুলি বিষয়ে কেহ কোন সংবাদ তাহাদের প্রদান করিবে। এই প্রকারে বাঙ্গলার মাটিসম্ভূত পালরাজবংশের উপর শেষ যবনিকা পতন হয়। অবাঙ্গালীরাই স্বদেশ হইতে এই বংশকে উৎপাদিত করে। আজ পালবংশের জাতি ও প্রাদেশিকতা লইয়া বিতণ্ডা উঠে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীয় শিক্ষায় আপ্লুত বাঙ্গালী ভাবুক তাহার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তির কথা ভাবিতেই ভয় পায়। (৫৮) কিন্তু সন্ধ্যাকর নন্দী "রামচরিত" গ্রন্থে বরেন্দ্রভূমিকেই পালদের "জনক-ভূ" (পিতৃভূমি) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈদ্যদেবের লিপিতে আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, তিনিও উত্তর-বঙ্গকে পালদের "জনকভূ" বলিয়াছেন। ১ম মহীপালদেবের বাণগড়-লিপিতেও বরেন্দ্র বা উত্তর-বঙ্গকে তাঁহার "অনধিকৃত বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তারানাথ বলিয়াছেন, গোপাল প্রথমে বঙ্গ, তৎপরে মগধ জয় করেন। ধর্ম্মপালদেবকে গৌড়েন্দ্রপতি বলা হইয়াছে।

* ভিক্ষুদের ব্রাহ্মণ মনে করা হইয়াছিল।

৫৮। Stewart ও Macaulay-র গালাগালি ব্যতীত Sydney Lowe বলিয়াছেন, "The Bengalees are a creation of the English (বাঙ্গালী জাতি ইংরেজশাসনপ্রসূত)।

আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পের ইংরেজী অনুবাদক ৺কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল গোপালদেবকে "বাঙ্গালী" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতি-পুঞ্জ দ্বারা রাজপদে গোপালের নির্ব্বাচন বিষয়ে বলিয়াছেন :

"It shows that Bengalees had freed their mind; emancipated themselves from the vedic theoy of caste superiority. The election of a Sudra King to Kingship was as big a thing as the doctrine of *egalite* in 1789 A.D. Here the Gaudas went beyond, their country, law and civilisation. They were innovators and emancipated ; and Sudras added a chapter of glory to the history of India." (৫৯)। পুণঃ, "বিহার কী ইতিহাস" পুস্তকে পালবংশকে বরেন্দ্র দেশজাত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। পালরাজবংশ মগধে ওটন্ট-পুরীবিহার ও অঙ্গদেশে বিক্রমশীলাবিহার যেমন স্থাপন করিয়াছিলেন, খাস বাঙ্গলায় তেমন সোমপুরীবিহার, জগদ্দল বিহার প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানের প্রাদেশিকতাভাবাপন্ন ব্যক্তিরা ভুলিয়া যান, তৎকালে "বাঙ্গালী" ও "বিহারী" বলিয়া বিভিন্ন "প্রাদেশিক জাতি' উদ্ভূত হয় নাই। বিহারের উপরোক্ত বিহারগুলির অধ্যক্ষ অনেক সময় বাঙ্গলার লোকই হইতেন, যথা : শীলভদ্র, অতীশ, দিপঙ্কর, টঙ্কদাস। তৎকালে বিহারের ভাষাও বর্ত্তমানের "খড়িবোলী-হিন্দি" হয় নাই। বিহারের ভাষাগুলি মাগধী প্রাকৃত প্রসূত এবং বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার মাসতুত ভগ্নী। পূর্ব্বভারতের ভাষাগুলির উৎপত্তি একই। গৌড়চক্রের ইতিহাস অবিচ্ছিন্ন।

৫৯। K. P. Jayaswal : An Imperial History of India; p p. 44-45.

জাতিতাত্ত্বিক হিসাবেও তাহাই। এই জন্যই পুরাণ-সমূহে অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র, মগধ, ওড্র প্রভৃতি জাতিদের বৈদিক ঋষি কক্ষিবন্তের সন্তান বলিয়াছে। ইতিহাসে এইসব প্রদেশগুলি বেশিরভাগ সময়েই অবিচ্ছিন্নভাবে ছিল। (৬০)

পালবংশের জাতি

তারপর উঠে জাতির কথা। গুপ্ত-সম্রাটবংশ এবং পাল রাজ-বংশ নিজেদের জাতির পরিচয় সংগোপন করিয়াছেন। ২য় চন্দ্র-গুপ্তের কন্যা ভাকাটাকা-রাণী প্রভাবতী দেবী তাঁহার তাম্রলিপিতে পিতৃগোত্র 'ধরণা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (৬১) ইহা অবৈদিক এবং আর্যেয় গোত্র নয়। এতদ্বারা তাঁহাদের 'শূদ্র' বলিয়াই অনুমান করা হয়। বৈদ্যদেব তাঁহার অনুশাসনে পালদের "সূর্য্যবংশীয়" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু বহু পরের বল্লালচরিতে তাঁহাদের "নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়" বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আর মুলা পঞ্চানন বলিয়াছেন, ইহারা ভূস্বামী হইয়া রাজন্য হইয়াছে। ইহাই হইতেছে ভারতের ইতিহাসে গতিশীলতার (Dynamism) পরিচয়। বৈদিকযুগ হইতে আমরা ইহার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি। এই কারণেই জৈমিনি ও তাঁহার টীকাকার কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন, রাজশব্দ ক্ষত্রিয়বাচী। ইহার

৬০। মুসলমান যুগে ও ইংরেজ আমলে পশ্চিমের হিন্দীভাষীরা বর্ত্তমানের বিহারে বাস করিয়া "খড়িবোলী-হিন্দি প্রচলন করিয়া বিহারের স্থানীয় ভাষার জীবন সংহার করিতেছেন এবং "বাঙ্গালী" ও "বিহারী' রূপ প্রাদেশিকতার হলাহল উদ্গার করিতেছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন এক সময়ে কোন প্রকারের প্লেগ বা মড়কে মগধ লোকশূন্য হইয়াছিল। তাহার পর পশ্চিম হইতে লোক আসিয়া খালি স্থানে বাস করে। এই জন্যই পালবংশের ও সেনবংশের কোন ঐতিহ্য বিহারে আজ লোক-পরিচিত নয়। ৺শরৎচন্দ্র দাস বলিয়াছেন, মগধের জাতিসমূহে পুরাকালে বাঙ্গলায় চলিয়া আসে (Indian Pandits in the land of snow দ্রষ্টব্য)। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও লেখকের কাছে এই অভিমত প্রকাশ করেন।

৬১। EP. Ind. Vol. XV. No. 4.

অর্থ, যে রাজা, সেই ক্ষত্রপদে উন্নীত হয়। তাহার নরতাত্ত্বিক বা জাতিতাত্ত্বিক উৎপত্তির বিচার নাই। এই প্রকারেই বিদেশাগত বেদে উল্লিখিত "দাস" যদুবংশ, মহাভারতে ও হরিবংশে যযাতির পুত্র ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় হয়। এই প্রকারেই মধ্যযুগে নাগর ব্রাহ্মণ গুহদত্তের সন্তান গুহিল বা গুহিলোটবংশীয় চিতোরের মহারাণারা প্রথমে "ব্রহ্মক্ষত্রান্বীত" (চাটসু-লিপি) পরে "সূর্য্যবংশীয় রঘুর" সন্তান হন। এই প্রকারেই উনবিংশ শতাব্দীতে নীচ সানসী জাতীয় রণজিৎ সিংহ মহারাজা হইয়া মহারাজ সানসীর বংশধর যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় হন (ইবেটসন-প্রদত্ত বংশ-তালিকা দ্রষ্টব্য)।

ভারতীয় আর্য্যসংস্কৃতি ও সমাজতত্ত্বের বিবর্ত্তনের ধারার সহিত পরিচয় না থাকায় বর্ত্তমানের লোকদের মধ্যে হিন্দু রাজবংশসমূহের জাতি লইয়া বিতণ্ডা হয়। এই বিবর্ত্তনের ধারা ধরিয়াই পালবংশ আর্যমঞ্জুশ্রীর "দাসজীবিন"—তারানাথের টটেমজাত সন্তান গোপাল—সন্ধ্যাকর নন্দীর সমুদ্রকুলজাত—বৈদ্যদেবের সূর্য্যকুল জাত—পালদের প্রবল শত্রু সেনপক্ষীয় ব্রাহ্মণের নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পরিচয়, ভারতের সমাজতত্ত্বের অভিব্যক্তির ধারার নির্দ্দেশক। এই প্রকারেই দাসীপুত্র (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ) জুয়াড়ী ঐলুস কবস বৈদিক ঋষি (১০ম মণ্ডল) হয়। এই প্রকারেই কানাড়ী ব্রাহ্মণ সেনবংশ বাঙ্গলায় রাজা হইয়া কখন "চন্দ্রবংশীয়", কখন "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। এই প্রকারেই ব্রাহ্মণ ময়ূরশর্ম্মণ দক্ষিণের কদম্ব রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইবার পর তাহার বংশধর কাকুস্থবর্ম্মণ ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। (৬২) রাজার জাতি নাই, যে সর্ব্ব বর্ণকে স্বধর্ম্মে স্থাপিত করিবে সে যে সর্ব্ববর্ণের উপর।

৬২। EP. Ind. Vol. VIII. No. S.

পালযুগের সামন্ততন্ত্র

পালযুগে তৎকালীন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় একটি অবরবত্ত সামন্ততন্ত্র ছিল। তাম্রলিপিসমূহ দ্বারা আমরা তাহা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করি। পুনঃ, "রাম-চরিত" গ্রন্থে পাল-সাম্রাজ্যের সামন্তদের তালিকা-প্রদত্ত হইয়াছে। এই সামন্ততন্ত্রের পর্য্যায় ধাপে ধাপে নীচে নামিয়া যায়, যথা; সম্রাটের নীচে মহাসামন্ত বা স্থলভেদে মহামাণ্ডলিক (ঈশ্বর ঘোষের রামগঞ্জ-লিপি). তাহার নিম্নে ছিল ভুক্তিপতি (ঐ) ভোগপতি (ঐ), তাহার নিম্নে ছিল বিষয়পতি (যথা: গয়া বিষয় ঐ এবং খালিমপুর লিপি); তাহার নিম্নে ছিল গ্রামপতি (বাণগড-লিপি); তাহার নিম্নে ছিল ক্ষেত্রকর বা কর্ষক (সর্ব্ব পাল ও সেন-লিপি)। এই প্রকারে তৎকালে বাঙ্গলার ভূমির Sub-infeudation অর্থাৎ জমির ভোগাধিকার রাজা হইতে ধাপে ধাপে নীচে নামিয়া আসিত। এই পদগুলি আমলাতান্ত্রিক পদের বাহিরে। এইগুলি সামন্ততান্ত্রিক পদ। অবশ্য পৃথিবীর সর্ব্ব সামন্ততান্ত্রিক দেশের ন্যায় এই পদধারীর উপরে Civil, Judicial, and Military duties একাধারে ন্যস্ত থাকিত। এই মর্য্যাদার লোকদের কর আদায় করা, আইনের মীমাংসা করা, আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করা এবং যুদ্ধকালে সম্রাটকে সাহায্য করা দায় ছিল। বহু পরের গৌড়ের সুলতানদেব যুগেও তাহাই হইত। এই কারণ বশতঃ রাজাগণ কাহাকেও ভূমিদান করিতে হইলে সকলকে জানাইয়া দিতেন। এক্ষণে কথা উঠে, ভূমির মালিক কে ছিল?

অশোকের সময় হইতে শেষ বিজয়নগর সম্রাট সদাশিব রায়ের (১৬ শতাব্দী) ভূমি-বিষয়ক অনুশাসন পাঠ করিলে এই ধারণাই হয় যে, ভূমিতে রাজার স্বামিত্ব ছিল। প্রজার কেবল occupancy right অর্থাৎ বাস করিবার অধিকার ছিল। পুনঃ, পালযুগের পূর্ব্বের গুপ্ত-

সাম্রাজ্যকালীন দামোদরপুর-লিপিগুলিতে এবং পরবর্ত্তী কালের ফরিদপুর লিপিগুলি ও জয়নাগের লিপিতে ভূমিতে রাজার স্বামিত্বই স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

ভূমি-বিলি-আইন

পালযুগ-পূর্ব্ব ও পালযুগের পর খোদিত-লিপিগুলি হইতে নিম্নলিখিত ভূমিবিলি বিষয়ক ব্যবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১) "ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়" (কমৌলি লিপি); (২) নীবী-ধর্ম্ম (দামোদর লিপি, সংখ্যা ৭)—ইউরোপীয় "fief"-এর ন্যায়; (৩) "অপ্রদা" (দামোদরপুর লিপি, সংখ্যা ৫)—ইহা perpetual endowment; "অপ্রদাক্ষয়" (দামোদর লিপি, সংখ্যা ২) অর্থাৎ চিরন্তন ভোগাধিকারের অধিকার রহিত হওয়া (nullification of permanent endowment); (৪) অক্ষয়-নীবি—ইহা নীবিধর্ম্ম ন্যায় (গুপ্তযুগের বাইগ্রাম লিপি); ইহা চিরন্তনের দান কিন্তু মূলধন বিনষ্ট করিবার অধিকার নাই। (৫) "নীবিধর্ম্ম ক্ষয়" (কুমার গুপ্তের ধানাইদহ-লিপি); ইহার অর্থ ব্রাহ্মণ বা দেবতাকে দান করিলে তাহা হস্তান্তর কবিবার অধিকার থাকিবে। (৬) ইহার পর আছে "নিষ্কর" ভোগাধিকার প্রাপ্তভূমি বিলিব্যবস্থা—ইহা ইউরোপীয় benefice ন্যায় (ধর্ম্মপালের খালিমপুর-লিপি)। এই প্রকারের ব্যবস্থা হয়ত সেন রাজত্বের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল।

সামন্ততান্ত্রিক আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান

এতদ্ব্যতীত সামন্ততন্ত্রের সহিত বিজড়িত থাকে বীরধর্ম্ম (chivalry) ও বীরগাথা (ballad)। বাঙ্গলার ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

দেবপালদেবের সামন্ত বলবর্ম্মদেবের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে

ঈশ্বর ঘোষের লিপিতেও বীরধর্ম্ম ও বীর-গাথার উল্লেখ আছে (৬৩)। তাঁহার উত্তরপুরুষ বালঘোষ যোদ্ধ-ব্যবসায়ী ছিলেন (১০ম শ্লোক)। তাঁহার পুত্র ধবল ঘোষের গৌরব গাথার গীত হইত (সুতো জগতি গীতঃ মহাপ্রতাপঃ)। পালযুগেরই ঐতিহ্য লইয়া রচিত ধর্ম্মমঙ্গলে আমরা স্ত্রী ও পুরুষ যোদ্ধার সংবাদ পাই। লাউসেনের রাণীরা অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতেছেন এবং শত্রুহস্তে পড়িবার ভয়ে প্রথমা রাণী "হারিকিরি" (পেটে ছুরিকাঘাত) করিয়া আত্মহত্যা করিতেছেন। এই কথা আজকাল অবিশ্বাস্য কিন্তু এই তথ্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে বৌদ্ধ সোমপুরী বিহারের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে (পাহাড়পুর) প্রাপ্ত মাটির পোড়ান চিত্রতে (plaques)। তথায় জাঙ্গিয়া (shorts) পরা, অস্ত্রহস্তে নারী ও পুরুষ যোদ্ধার চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা সেন যুগের আগের অনুষ্ঠান। গুপ্তযুগের পরে, অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্বিক অভিব্যক্তির পূর্ণতা লাভ করিয়াই বাঙ্গলা স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করে। শশাঙ্ক এই প্রচেষ্টার অগ্রগামী দূত। তিনিই উত্তর-ভারতে বাঙ্গলার সার্ব্বভৌমত্ব স্থাপন-প্রয়াসী হন। ধর্ম্মপাল তাহা বাস্তবে পরিণত করেন।

পালযুগের ধর্ম্ম

যখন হইতে ভারতে বিভিন্ন ধর্ম্মের উদয় হইয়াছে, তখন হইতেই রাজা সর্ব্বধর্ম্মের লোকদের নিরপেক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকত্ব করিয়াছেন। ভারতে কখন দেবতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Theocracy) উদ্ভূত হয় নাই। অশোক হইতে আমরা এই সত্য অবলোকন করি। মৌর্য্য, গুপ্ত প্রভৃতি সম্রাটেরা ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ উভয়েরই পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। বাঙ্গলার পালরাজারা তাহার অন্যথা করে নাই। আমরা পূর্ব্বোক্ত তাম্রলিপিগুলি হইতে তাহার প্রমাণ পাই। তাহারা যেমন বৌদ্ধ বিহার স্থাপন করিয়াছেন, তেমনি

ব্রাহ্মণদের মন্দির স্থাপন করিয়াছেন, ব্রাহ্মণকে গ্রামদান করিয়াছেন, ব্রাহ্মণের যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া শান্তিবারি গ্রহণ করিয়াছেন, মহাভারত পাঠ করাইয়াছেন। পুরুষানুক্রমে এক ব্রাহ্মণবংশই পালরাজাদের মন্ত্রীত্ব পদাভিষিক্ত হইতেন। তৎকালে বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের পরিচয় তাম্রলিপিতে পাওয়া যায়। তদ্রূপ বৌদ্ধ পণ্ডিতের সংবাদও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্যই পালরাজারা এত জনপ্রিয় ছিল। এইজন্যই পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের সময়েও "যোগীপাল, ভোগীপাল মহীপাল গীত শুনিয়া সব লোকে আনন্দিত" (চৈতন্য ভাগবত) হওয়ার কথা আমরা শুনিতে পাই। এই নিরপেক্ষতার জন্যই ধর্মপাল (মুঙ্গের লিপি) ও তৃতীয় বিগ্রহপালকে (আমগাছি লিপি) ব্রাহ্মণেরা "বর্ণাশ্রমের আশ্রয়স্থল" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা, ব্রাহ্মণ্য-বাদীয় ও বৌদ্ধেরা বর্ত্তমানের হিন্দু ও মুসলমানের ন্যায় বিভিন্ন পৃথক সমাজ সংগঠিত করিয়া হানাহানি করিতেন বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের মৌর্য্য, গুপ্ত ও বিশেষতঃ, পালযুগের তাম্রলিপিগুলি পাঠ করিলে সেই ভ্রমের নিরসন হইবে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে শেষ কথা এই, যাঁহাদের ধারণা সেনযুগের পূর্ব্বে বাঙ্গলা বৌদ্ধপ্রধান ছিল ইতিহাস পাঠে তাহা সঠিক বলিয়া বিবেচিত হয় না। বৌদ্ধপুস্তকসমূহ তাহার বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করে। চৈনিক পর্য্যটক হুয়েন স্যাং, আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প ও পালযুগের তাম্রশাসনগুলি এবং তীব্বতীয় পুস্তকগুলি দ্বারা আমাদের এই বোধগম্য হয় যে, বাঙ্গলা তীর্থিক অর্থাৎ অবৌদ্ধপ্রধান ছিল।

পুনঃ, ভারতে বৌদ্ধ ও "হিন্দু" কখন পৃথক সমাজ সংগঠিত করে নাই। গৃহস্থেরা বৌদ্ধ সাধুর নিকট "শীল" গ্রহণ করিয়া ঘরে বসিয়া উপাসক হইতেন। যাঁহারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেন তাঁহারা বিহারের

ভিক্ষু হইতেন। উপাসক ও ঈশ্বরপূজক বা দেবোপাসক ব্রাহ্মণ্যবাদীর লোকেরা একই বর্ণাশ্রমীয় সমাজ মধ্যে বাস করিতেন। সকলেই মনুসংহিতার আইন দ্বারা শাসিত হইতেন। (৬৪)

সাধারণের ধর্ম্ম

ইতিহাস পাঠে বাঙলায় আমরা আর্য্যধর্ম্মপ্রসূত জৈনধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ও সনাতনীয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেরই সংবাদ পাই। পালী, প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যসমূহ পাঠে উক্ত ধর্ম্মের সম্প্রদায় সকলেরই সংবাদ আমরা পাই কিন্তু তাম্রলিপিসমূহ পাঠে ইহা স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, এইসব ধর্ম্ম আভিজাতীয় ও উচ্চস্তরের শ্রেণীসমূহ মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সমাজ শরীরে অন্তঃশীলাভাবে যাহা প্রবাহিত ছিল তাহা জনশ্রুতি, পরবর্ত্তী-কালের সাহিত্য মধ্যে পাওয়া যায়। লামা তারানাথ। (৬৫) সিদ্ধদের বর্ণনা করিতে যাইয়া এই বিষয়ে সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। এতদ্বারা আমরা দেখি, বাঙলা ও ভারতের জনসাধারণ বৌদ্ধধর্ম্মের বিভিন্ন শাখার মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার স্ফুরণও আত্ম-বিকাশের চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রকারে পূর্ব্ববঙ্গের একজন নৃত্যশিক্ষক এবং যোগী এবং গুণী নামে তাঁহার দুই শিষ্যা সিদ্ধ নাগার্জ্জুনের সংস্পর্শে আসিয়া মহাসিদ্ধ শবরী এবং কঙ্কাদ্বয় বিখ্যাত ডাকিনী। (৬৬) পদ্মাবতী (যোগী) ও জ্ঞানবতী (গুণী) নামে প্রসিদ্ধ হন।

৬৪। ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে মনুর আইন এখানো প্রচলিত।

৬৫। তারানাথঃ "বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস" এবং (মাণিকের খনি" লেখকের দ্বারা ভাষান্তরিত) Mystic Tales of Lama Taranatha") দ্রষ্টব্য।

৬৬। বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থে ডাকিনী অর্থে অলৌকিক কর্ম্মসম্পন্না সিদ্ধা যোগিনী। এই থেকেই বাঙলায় ডাইনি (witch) শব্দ আসিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

শবরীকে পুনঃ ছোট শবরোহ বলিয়া ডাকা হইত। তাঁহার শিষ্য-ধারার মধ্যে ছিল তিল্লি। তাঁহার প্রশিষ্য ছিল ছোট ডোম্বি। তিনি চাটিগাবো (চট্টগ্রাম) নগরের ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও ঢেঁকি দিয়া তেল বাহির করিতেন। তাঁহার ক্ষেত্রের চণ্ডালবংশীয়া এক কুমারী যোগিনী তাঁহার "প্রকৃতি" ছিলেন। ইনি তিল ভাজিয়া তেল বাহির করিতেন। শ্রীডোম্বি প্রথমে একজন রাজার পশুপালক ছিলেন; তাঁহার কোন বিদ্যাশিক্ষা লাভ হয় নাই। আরেকজন বড় সিদ্ধ ছিলেন ত্রিপুরার জ্ঞান মিত্র। ইনি নীচ শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি লামা তারানাথের তীর্ব্বতীয় গুরু লামা বুদ্ধগুপ্তনাথের গুরু ছিলেন। বাঙ্গলায় মোগল-পাঠানের যুদ্ধের সময় ই'নি জীবিত ছিলেন। ইনি জগদ্দল বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন।

তারানাথের মতে, "নাথ-ধর্ম্ম" মহাযান ধর্ম্মেরই একটি শাখা। ইহার প্রথম গুরু ছিলেন মীননাথ। তারানাথের মতে তিনি কামরূপের একজন জেলে ছিলেন। ইহার পুত্র ছিলেন মৎস্যেন্দ্র নাথ। মীননাথের জীবনের একটি গল্পের সহিত বাইবেলের পয়গম্বর জোনার সাদৃশ্য আছে। মীননাথ মৎস্য ধরিতে গিয়া জলে পড়িয়া যান। মৎস্যটি কাটিবার পর তাঁহাকে পেট হইতে বাহির করা হয়। মীননাথের শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন: "হালি" (একজন কৃষক); "মালি" (উদ্যান রক্ষক); তাম্বুলি (দস্ত-রংকারক) (৬৭)—এই তিনজনই সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন চৌরঙ্গীনাথ এবং গোরক্ষ-নাথ।

গোরক্ষনাথ একজন গোপালক ছিলেন। সিদ্ধ জলন্ধরী সিদ্ধ

৬৭। বোধ হয় তারানাথ এই স্থলে ভুল করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাম্বুলিদের পান-বিক্রেতা বলিয়া উৎপত্তি নির্দ্ধারিত হয়।

প্রদেশের টাটানগরীতে নিম্নজাতীয় শূদ্র লোক ছিলেন। জলন্ধরে বাস করিতেন বলিয়াই উক্ত নগরের নামে তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন। তারানাথের মতে, ইনিই একজন হাড়ীর রূপ ধরিয়া 'চাটিগ্রামে' কার্য্য করিতেন। রাজা গোপীচন্দ্রের মাতা তাঁহাকে সিদ্ধ বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং পুত্রকে পরকালের পরিত্রাণের জন্য এই হাড়ীর শরণাপন্ন হইতে বলেন। গোপীচন্দ্র পরে জলন্ধরীকে প্রতারক মনে করিয়া মাটিতে জীবন্ত প্রোথিত করেন। পরে অলৌকিকভাবে জলন্ধরীর শিষ্য কৃষ্ণসারী তাঁহাকে উদ্ধার করেন।

এই লোকধর্ম্ম সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়। অবশ্য সকল গুরু ও সিদ্ধেরা নিম্নজাতীয় ছিলেন না। অনেকেই উচ্চবর্ণের ছিলেন। কিন্তু সকলেই লোকমধ্যে প্রচার করিতেন এবং অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন। ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিকদের সহিত তাঁহাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তীর্থিকদের অলৌকিক বা যোগশক্তি অপেক্ষা তাহাদের যোগশক্তি প্রবল ছিল বলিয়া তাঁহারা দাবী করিতেন। সহজযানী বৌদ্ধ দোঁহা ও গানের পুস্তকসমূহে ব্রাহ্মণদের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাদের সিদ্ধেরা "কিমিয়া-বিদ্যা" (Alchemy) চর্চা করিতেন। তদ্বারা তাঁহারা পিত্তলকে সোনা করিতে (gold tincture—সিদ্ধি), পারা সিদ্ধি, নাগার্জ্জুন দ্বারা আবিষ্কৃত মকরধ্বজ ঔষধ, আর একজন চক্ষুরোগের ঔষধ আবিষ্কার (ইনি চীনে গিয়া তথায় অনেককে আরোগ্য করেন) ইত্যাদি দ্বারা লোকের মন বিমুগ্ধ করিতেন। এই সিদ্ধদের অনেকেই সশরীরে স্বর্গ আরোহণ করেন।

ইহাদের কথা ব্রাহ্মণ পুস্তকে নাই ; বৌদ্ধ পুস্তকগুলি ভারতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। তুর্কী-আক্রমণের পর এই সব সম্প্রদায়ের লোক হয় মুসলমান হইয়াছে নয় নব-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কোন কোন শাখার আশ্রয়ে

আত্মগোপন করিয়া আছেন। তীর্ব্বতীয় পুস্তকসমূহ পাঠে এই সিদ্ধের কার্য্যের বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি চক্ষুগোচর হয়: (১) এই যুগে ভারতের সহিত বহির্জগতের সম্বন্ধ ছিল; (২) ভারতীয় ও ইউরোপীয় তুকতাক বা যাদুবিদ্যা (Sorcery) এক প্রকার রূপেরই ছিল; (৩) উভয় দেশেই ম্যাজিক আয়না (magic mirror) দ্বারা সুদূর দেখার গল্প একই প্রকারের ছিল; (৪) কোন কোন বৌদ্ধ সিদ্ধ মস্তকে জটা ধারণ করিতেন; (৫) এই যুগে "নাগরিক সংঘ" (citizens' guild) বিদ্যমান ছিল বলিয়া তারানাথ উল্লেখ করিয়াছেন; (৬) এই যুগে সময় নির্দ্ধারণ করিবার "সূর্য্য ঘড়ি" (sun dial) ব্যবহৃত হইত; (৭) এই সময়ে স্ত্রীলোকেরা মদ্য বিক্রেতা ছিল (৬৮); (৮) এই সময়ে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ হইত, (৯) কৃষকদের অবস্থা বিশেষ শোচনীয় ছিল; (১০) এই সময় পর্য্যন্ত টাকার নাম ছিল "দিনার" (Roman Dinarius); (১১) বৈদিক যুগের ন্যায় এক রাজার ক্ষত্রিয়-পণ্ডিত দ্বারা পৌরহিত্য করা হইত; (১২) কতিপয় সিদ্ধ অতি নিম্নশ্রেণীর লোক ছিলেন; (১৩) "গুরুবাদ" অতি প্রবল ছিল। "একমাত্র গুরুই সত্য" এই তথ্য সরোরুহ-পাদের "অদ্বয় বজ্র" টীকায় ব্যক্ত হইয়াছে (৬৯)। তীর্ব্বতীয় পণ্ডিতদের এই বিবরণ ধর্ম্মপালের অগ্র হইতে মোগল যুগের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সময়ব্যাপী ঐতিহাসিক তথ্য। ইহা কত বিচারসহ তাহা ঐতিহাসিক বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু এতদ্বারা হিন্দুযুগের শেষকালে সমাজের একটা চিত্রের আভাষ পাই যাহা ব্রাহ্মণ্য নিবন্ধগুলি (নব্যস্মৃতি) এবং ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য কোন সংবাদ প্রদান করেনা। এক্ষণে দেখা যাউক, বাঙ্গলার পুরাতন সাহিত্যে এ বিষয়ে কি সাক্ষ্য প্রদান করে।

৬৮। নেপালে এখনও তাহাই হয়। ৬৯। "বৌদ্ধদোহা ও গান" দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মণ্যবাদীয় যুগের প্রারম্ভ

পুরাতন বাঙ্গালার ধর্ম্ম-সংক্রান্ত সাহিত্য মধ্যে আমরা মীননাথ, হাড়িপ্পা, কানফা প্রভৃতি অতি নীচজাতীয় লোকদের ধর্ম্মগুরুরূপে দেখিতে পাই। এই কারণবশতঃ ডোম পণ্ডিতদের ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করিতে দেখিতে পাই। সম্রাট ধর্ম্মপালের সময়ে রাঢ়দেশে রামাই পণ্ডিত "ধর্ম্ম পূজার" ব্যবস্থা প্রচার করেন। ইহা প্রথমে একটি নিরাকারবাদীয় সম্প্রদায় ছিল।(৭০) ইহাতে মূর্ত্তি পূজা নাই। পরে ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে আছে। তৎপরে মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাবে আছে। শেষে আজকাল অনেকস্থলে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের অন্তর্গত হইয়াছে। ইহা একটি পতিতদের ধর্ম্ম। আজও তাহাই আছে।

এইস্থলে বক্তব্য এই যে, আমরা যে-যুগে প্রবেশ করিয়াছি তৎকালে পালবংশের শাসন সমগ্র বাঙ্গলার উপর শিথিল হইয়াছে। চারিদিকে খণ্ডভাবে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বী স্বাধীন রাজাদের অভ্যুত্থান হইতেছে। শাসক ও শাসিতদের শ্রেণী-সংগ্রাম এই যুগে ধর্ম্মসংগ্রাম রূপ ধারণ করিয়াছে। দশম শতকে যখন চারিদিকে স্বাধীন ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ক্ষুদ্ররাজ্যসমূহের অভ্যুত্থান হইয়াছে এবং এইসব রাজারা ব্রাহ্মণ্য আদর্শে সমাজকে পুনর্গঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, (৭১) তখন দশম-শতকে অভিজাত ব্রাহ্মণ্যবাদীয়দের সহিত এইসব পতিত ও গরীব বৌদ্ধ, নাথধর্ম্ম, ধর্ম্ম-পূজাকারকদের সংঘর্ষ ধর্ম্মসংগ্রামাকার ধারণ করে। কিন্তু যেটুকু ঐতিহাসিক নষ্টকোষ্টির উদ্ধার হইয়াছে, পর্য্যবেক্ষণ, করিয়া তাহার একটা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, এই ধর্ম্মদ্বন্দ্বের পশ্চাতে ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যানুযায়ী শ্রেণী-স্বার্থ

৭০। ঢাকা হইতে প্রকাশিত "ধর্ম্মমঙ্গল" গ্রন্থে ডাঃ সহীদুল্লার মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৭১। ভবদেব ভট্টের ভুবনেশ্বর লিপি দ্রষ্টব্য: Inscription of Bengal. vol, III দ্রষ্টব্য।

রহিয়াছে। এইযুগের ব্রাহ্মণ্যবাদীয়দের ও বৌদ্ধদের কলহের পশ্চাতে ব্রাহ্মণজাতির (শ্রেণীর) প্রাধান্য স্থাপন, অন্যপক্ষে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শূদ্র ও পতিতদের স্থানচ্যুত করিয়া তাহাদের অবনমিত করিবার চেষ্টা আছে। একটা প্রাচীন জনশ্রুতি:

"আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে।
ডাল মৃগর গাগর বাজে॥
বাজতে বাজতে পড়ল সাড়া।
সাড়া গেল বামন পাড়া॥"

এই যুগের শ্রেণী-সংগ্রামের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়।

প্রাচীনকাল হইতে পূর্ব্বভারতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, বৈদিকধর্ম্ম মগধ ও বঙ্গে স্থান পায় নাই। এই অংশে জৈন তীর্থঙ্করেরা ও বৌদ্ধ প্রচারকেরা তাঁহাদের ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল করিয়াছিলেন। এইস্থানের অ-বৈদিক জনের (Tribe) লোকেরা নিজেদের "নর-তাত্ত্বিকধর্ম্ম" (Anthropological religion) (৭২) অর্থাৎ জাতির উৎপত্তির সঙ্গে আদিমাবস্থা হইতে যে বিশ্বাস, সংস্কার ও রীতি বিবর্ত্তিত হয় তাহাকে ভিত্তি করিয়া একটা লৌকিক ধর্ম্ম ও আচার উদ্ভূত করিয়াছিল; তাহাদের এই নরতাত্ত্বিক অর্থাৎ জাতিগত ধর্ম্মে আদিমাবস্থাসুলভ Totemism (জন্তু, গাছকে পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস), Magic and Witchcraft (যাদু ও ডাইনিতে বিশ্বাস), Tree and Serpent worship (গাছ ও সর্পপূজা) প্রভৃতি অনুষ্ঠান ও তদনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠান অভিব্যক্ত হইয়াছিল। এই লৌকিক ধর্ম্মক্ষেত্রে আর্য্য-সভ্যতা কতটা কার্য্যকরী হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "যে সময়ে ঐতরেয়

৭২। Maxmueller—Gifford Lectures দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মণে অথবা আরণ্যকে আমরা বঙ্গ অথবা পুণ্ড্র জাতির উল্লেখ দেখিতে পাই, সে সময়ে অঙ্গে, বঙ্গে অথবা মগধে আর্য্যজাতির বাস ছিলনা... প্রাচীন সাহিত্যে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক মগধ ও বঙ্গ অধিকারের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং কোন্ সময়ে আর্য্যজাতি বঙ্গ ও মগধ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। (৭৩) ইনি অনুমান করেন, খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে মগধে ও বঙ্গে আর্য্য-সভ্যতা প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আমাদের অনুমান, ইহার বহু পূর্ব্বেই তাহা সংসাধিত হইয়াছিল। গুপ্তযুগে বরেন্দ্রে চন্দ্রগোমীন নামক মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ উদয় হইয়াছিলেন। ইনি এক "চান্দ্র" ব্যাকরণ রচনা করেন। ইঁহার নামেই বর্ত্তমানের বাখরগঞ্জ জেলার নাম "চন্দ্রদ্বীপ" বলিয়া পরিচিত হয়।

বাঙ্গলার ভাষা আর্য্যজাতীয় সংস্কৃতভাষাপ্রসূত। এইজন্য স্বীকার করিতে হইবে, এই ভাষা নিশ্চয়ই আর্য্যভাষী লোকদের দ্বারা বঙ্গে প্রচারিত হইয়াছিল।(৭৪) যদি বৈদিক বঙ্গ, বগদ, পৌণ্ড্রদের স্বতন্ত্র কোন ভাষা ছিল, তাহা আর্য্যভাষার প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই ঔপনিবেশিকেরা উদীচ্য বা পশ্চিমের সামাজিক পদ্ধতি বঙ্গে সম্পূর্ণ-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন কিনা তাহার নিদর্শন গুপ্তযুগের আগে দুর্লভ। আমরা মৌর্য্যযুগে ব্রাত্য সামবঙ্গীয়দের সংবাদ পাই, পরের যুগের মনুস্মৃতিতে ব্রাত্যক্ষত্রিয় পৌণ্ড্রদের (১০,৪৩—৪৪) উল্লেখ আছে। এতদ্বারা আমরা এই অনুমান করিতে পারি যে, বঙ্গ-প্রদেশে বৈদিকধর্ম্ম অথবা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সর্ব্বজনীনভাবে স্থান পায় নাই;

৭৩। "বাঙ্গালার ইতিহাস," ১ম ভাগ, ২য় পরিচ্ছেদ।

৭৪। তারানাথের ইতিহাস দ্রষ্টব্য। তারিখ সম্বন্ধে Sylvoin Leviর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তবে ব্যক্তিগতভাবে অনেক ব্রাহ্মণ এই প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন; কারণ, "গৌড় ব্রাহ্মণ" বলিয়া একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ এই স্থানে বরাবর ছিল।

এই ক্ষেত্রে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম আসিয়া লৌকিক ধর্ম্মের সহিত একটা রফা করিয়া দৃঢ়মূল হয়। যখন বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্ম আসে তখন এই প্রদেশের পণ্ডিতেরা এই সাম্যবাদীয় ধর্ম্ম ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। (৭৫) মহাযান সম্প্রদায় বাঙ্গলায় বদ্ধমূল হইয়া নানা শাখা ও প্রশাখায় বিস্তৃত" হয়। এই ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহ মধ্যে বাঙ্গলার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা নিজেদের আত্মার স্ফূর্ত্তিসাধন করিতে পারিতেন, নিজেদের জীবনকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিতে পারিতেন। এইজন্যই আমরা একজন চন্দ্রদ্বীপের (৭৬) মৎস্যজীবী জাতির লোক মীননাথকে নাথ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতারূপে দেখিতে পাই, আবার হাড়ীজাতীয় হাড়িপ্পাকে যখন রাণী ময়নামতী তাহার পুত্র গোপীচাঁদকে গুরুরূপে বরণ করিতে বলে, তখন রাজার হাড়িকে গুরু করিতে ঘৃণা করায় ময়নামতী বলে:

হাড়ী নহে হাড়ি নহে জ্ঞান পবিত্তর।
সেথায় ডাঙ্গর হাড়ি ষোল শত (নফর)। (৭৭)

এই "হাড়িপ্পার উপদেশগুলির অনেকগুলি মাধ্যমিক (বৌদ্ধ) সম্প্রদায়ের নীতিপ্রসূত"।(৭৮) আবার "ধর্ম্মপূজা" পদ্ধতিতে আমরা ডোম

৭৫। "থেরীগাথার" রাঢ দেশীয় ব্যাধ কন্যা চাপী ও তাহার স্বামী বড় থেরী ও থের হইয়াছিল। ইঁহারা বুদ্ধের সময়ের লোক ছিলেন।

৭৬। তারানাথ কামরূপ জন্মস্থান বলেন।

৭৭। নলিনী ভট্টশালী: "মীন চেতন", পৃঃ ৵০ দ্রষ্টব্য। তারানাথ ইহাকে জলন্ধরীর সহিত সনাক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও নীচজাতীয় লোক ছিলেন।

৭৮। দীনেশচন্দ্র সেন। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য", পৃঃ ৬১

পণ্ডিতদের পৌরহিত্য করিতে দেখি। বাঙ্গলা তৎকালে বৈদিকক্রিয়া-কাণ্ড বা ব্রাহ্মণ্যবাদীয় বর্ণাশ্রমের ধর্ম্মকে গ্রহণ করে নাই বলিয়াই আমরা বাঙ্গলায় শূদ্র, ব্রাত্য ও আজকাল যাহাদের "পতিত" বলে তাহাদের মধ্যে একটা প্রবল আন্দোলন দেখিতে পাই। এই যুগে বাঙ্গলার লোকসমূহের কার্য্যের সর্ব্বদিক দিয়াই জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায়। এই সময়ে শূদ্রেরা সম্রাট ও সামন্ত রাজার পদাভিষিক্ত হইয়াছে, আজকালকার অন্ত্যজদের পূর্ব্বপুরুষেরা তখন সামন্ত রাজা (৭৯), সেনাপতি, সহর-কোটাল ("ধর্ম্মমঙ্গল" কাব্য দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি হইয়াছে, বাঙ্গলার নাবিকেরা দেশ-বিদেশে জাহাজে করিয়া গিয়াছে, (৮০) বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠীরা তখন সমুদ্র বাহিয়া বাণিজ্য করিয়া "শুক্তার বদলে মুক্তা, "জীরার বদলে হীরা" লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। এই শিল্প-বাণিজ্য সভ্যতার কল্পিত বীর (Hero eponym) হইতেছেন, চাঁদসদাগর এবং ধনপতি ও তৎপুত্র শ্রীমন্ত সদাগর। শীতের প্রাক্কালে সিংহলাভিমুখে জাহাজ ভাসাইয়া সমুদ্রযাত্রার কথা আজও লৌকিক ধর্ম্মের একটি অঙ্গ হইয়া আছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই, এই সব লোক কি সমাজে পতিত ছিল? তাহারা কি নিম্নজাতীয় ছিল? কিন্তু তাহাদের বংশধরেরা আজ হয় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, না হয় হিন্দু সমাজে পতিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার কারণ কি তাহার অনুসন্ধান প্রয়োজন। ১৯৩১ খৃঃ লোকসংখ্যা গণনার তালিকায় দেখা যায়, বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের প্রায় অর্দ্ধেক

৭৯। জনশ্রুতি বলে, প্রাচীনকালে ঢাকার ভাওয়ালে একটি চণ্ডালবংশীয় রাজা ছিল। এই বিষয় ঢাকার ইতিহাস দ্রষ্টব্য। হাড়ী রাজার কথাও বাঙ্গলার জনশ্রুতিতে পাওয়া যায়। ৺নগেন্দ্র বসুর "কায়স্থ কাণ্ড" দ্রষ্টব্য।

৮০। সুমাত্রায় রক্তমৃত্তিকা (বর্ত্তমানের রাঙ্গামাটী) হইতে একজন বাঙ্গালী নাবিকের প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

লোক উচ্চ জাতিদের নিকট পতিত রহিয়াছে, তাহাদের জল পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য। এই যে সমাজের অর্দ্ধেকাংশ কুষ্ঠ-ব্যাধির ন্যায় রোগগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে তাহার কারণ নির্দ্ধারণ প্রয়োজন। ইহা কি গোঁড়া ব্রাহ্মণদের খেয়াল মাফিক হইয়াছে? যাহারা বিশ্বাস করেন, মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারদের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বাঙ্গলার ব্রাহ্মণেরা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের দোহাই দিয়া সমাজের অর্দ্ধেক লোকদের পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহারা ইতিহাসের যথার্থ অর্থ বুঝেন নাই। আমরা ইতিহাসের তুলনামূলক পাঠে এই তথ্য পাই যে রাজশক্তি ব্যতীত কোন শ্রেণী উত্থিত বা পতিত হইতে পারে না। একটা পুরোহিতশ্রেণীর হস্তে এমন শক্তি নাই যে, সমাজের অর্দ্ধেক লোক তাহাদের নির্দ্দেশ বা ফতোয়াকে মানিয়া লইয়া ধন্য ধন্য বলিয়া নিম্নস্তরে নামিয়া যাইবে! আবার অব্রাহ্মণবাদীয় দেশে বা সমাজে ব্রাহ্মণদেব ফতোয়া মানিবেই বা কে? এই অনুষ্ঠানের পশ্চাতে একটা ভীষণ শ্রেণী-সংঘর্ষেয় ইতিহাস লুকায়িত আছে, তাহা আমরা তৎসময়ের সামাজিক ইতিহাস পাঠ করিলেই উপলব্ধি করিতে পারি। এই সামাজিক দ্বন্দ্ব ক্রমে রাজনীতিক দ্বন্দ্বে শেষ হয়।

অর্থনীতিক-সংবাদ

এক্ষণে এই যুগেব অর্থনীতিক অবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধান প্রয়োজন। প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়, রাজারা সোনার খাটে বসিয়া রূপার খাটে পদ স্থাপন করিত ("মানিক চাঁদের গান") এবং স্বর্ণ থালে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সহিত অন্নাহার (৪৭১ শ্লোক) করিত। তখন "ইন্দ্র কম্বল" (৫৫৫), "দণ্ডপাখা" (২৫৪) ও "পাটের সাড়ী" (৫০০) বিলাসের দ্রব্য ছিল। লোকে "ইন্দ্র মিঠা" (২২৫) খাইত এবং "বংশগুয়া" (২৫০) খাইয়া মুখশুদ্ধি করিত। আবার "একতন বেকতন

করি খাইচত দুয়ারত ঘোড়া" (৮১) ("মানিক চাঁদের গান") ছিল অর্থাৎ যেমন তেমন করিয়া খায় অথচ তাহার দ্বারেও ঘোড়া বাঁধা থাকে (৮২)। ধনী লোকেরা "বাঙ্গলা" ঘরে থাকিত ও শীতল পাটি বিছাইত (গোপীচাঁদের স্ত্রীর গাথা) (৮৩)।

উপরোক্ত বচনে আমরা ধনীদের ভোগ-বিলাসের সন্ধান পাইলাম; কিন্তু গরীব সাধারণের অবস্থা তখন কি প্রকারের ছিল? গরীবের সংবাদ রাখে কে? কিন্তু খনা ও ডাকের বচনে দৃষ্ট হয়, কৃষকরা রৌদ্র-বৃষ্টি সহ্য করিয়া হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম দ্বারা কৃষি-বিজ্ঞানের কতকগুলি তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিল; ইহাদ্বারা কৃষকেরা আজীবন দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্য থেকে পরিশ্রম করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন করিত। আর অত্যাচার, শোষণ ও দারিদ্র্যের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কি করিত? এই প্রশ্নের কোন উত্তর ইতিহাসে পাইনা। বৌদ্ধ ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও পুনর্জন্ম মত দ্বারা তাহার ভক্তদের ঠাণ্ডা করিয়া রাখিত, তারপর টিকটিকির ভয়ে, হাঁচির ভয়ে, আঁকার ভয়ে, বাঁকার ভয়ে, কুঁজোর ভয়ে, স্বীয় কুটিরে থাকিয়া জড়সড় হইয়া থাকিত। পা বাড়াইতে, হাঁ করিতে বঙ্গীয় বীর পাঁজির দোহাই দিত। তাহারা কাক মুখে জ্যোতিষের বার্ত্তা শুনিয়া কার্য্যের ফলাফল নিরূপণ করিত।(৮৪) কৃষিপ্রধান জলমাতৃক এবং বনানীপূর্ণ দেশে অশিক্ষিত লোকেরা ইহার বেশী আর কি ভাবিতে পারে। যে দেশের জলে কুমীর,

---

৮১। "মানিক চাঁদের গান।"

৮২। এই বচনটা কবির অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হয়; বাঙ্গলা দেশ কখনও ঘোড়া (Stock breeding) উৎপাদনকারী দেশ ছিলনা। সেইজন্য অশ্বের প্রাচুর্য্য থাকা সম্ভব নহে।

৮৩। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পৃঃ ৬১,

৮৪। ঐ—পৃঃ ৮৫।

ডাঙ্গায় সাপ, বনে বাঘ, আকাশে "ঝড় ও বৃষ্টির বিরাম নাই", মাথার উপর অশনির ভীষণ শব্দ, তথাকার অজ্ঞ মানবের তাহার প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের উপর উঠিবার শক্তি কোথায়; বিশেষতঃ যেখানে একদিকে তাহার এক শ্রেণীর পুরোহিত এবং প্রকৃতিকে তাহার উপাস্য বলিয়া বুঝাইতেছে। তাহার আদিম-জাতিগত বিশ্বাসকে (নরতাত্ত্বিক ধর্ম) মহাযানী-বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্যগণ আসিয়া তাহার ধর্ম্মরূপে সুদৃঢ় করিল। এইজন্য সংসার-ক্লিষ্ট বাঙ্গালী আদিমজাতীয় পশুচরিত্র ও ভবিষ্যৎ কথন (Augury and divination) বিশ্বাস করিয়া দৈবের উপর নিজের জীবন যাপনের জন্য নির্ভর করিত।

এই সামাজিকক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ্যবাদ "দৈব" বা "নিয়তি"রূপ মতবাদ উদ্ভূত করিয়া লোককে ব্যবহারিক জগতের সহিত আপোষ-রক্ষা করিতে উপদেশ দিতে থাকে (৮৫)। অন্যদিকে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকেরা, প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ নানাপ্রকারের তথাকথিত অনৈসর্গিক ও অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা এবং কিমিয়া-বিদ্যার দ্বারা লোককে বিমুগ্ধ করিতে লাগিল। এই কারণবশতঃই ভারতের সাধারণের মধ্যে অলৌকিকত্বে বিশ্বাস এত প্রবল ছিল এবং এখনও আছে। এইসব উপায়েই ভারতীয় জনগণের গলায় ও পায়ে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের শৃঙ্খল পরান হইয়াছিল। ইহার ফলও বিষম হয়।

ইতিহাস পাঠে আমরা দেখি, বৌদ্ধমত ধর্ম্মে সাম্য আনয়ন করিলেও অর্থনীতিক্ষেত্রে ও সমাজে সাম্য আনিতে পারে নাই। এই জন্যই বৌদ্ধদের মধ্যেও সামাজিক বৈষম্য ছিল। বৌদ্ধ পালরাজাদের রাজত্বকালে বাঙ্গলায় সামন্ততন্ত্র ছিল; "বারভূঁইয়া বলে আছে বুকে দিয়ে ঢাল", ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি পুস্তকের এই উক্তি একটি প্রাচীন

৮৫। মহাভারত ও রামায়ণে দৈবই সর্ব্বোপরি বলবৎ বলা হইয়াছে।

পদ্ধতির স্মৃতি বহন করে। পালরাজাদের অধীনে সামন্তগণের উল্লেখ ইতিহাসে আছে (৮৬)। পূর্ব্বোক্ত সন্ধ্যাকর নন্দীর "রাম-চরিত" গ্রন্থে রাজা রামপালের "সামন্তচক্র" বিষয়ে উল্লেখ আছে এবং তাহার তালিকাও আছে। (৮৭) শেষে ইহা পরিষ্কার যে, পালযুগে সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতা ছিল। দেশ কৃষিপ্রধান, কিন্তু শিল্প ও বাণিজ্য ছিল। বিদেশের সহিত কৃষ্টি ও বাণিজ্যের সংযোগ ছিল।

পালযুগের কৃষ্টি

নীচ শূদ্রবংশীয় পালরাজাদের শাসনকাল বাঙ্গলার গৌরবময় যুগ ছিল বলিয়া আজকালকার ঐতিহাসিকগণ বলেন। ইহা সেইকাল যখন ৺শাস্ত্রীর কথায়, "বাঙ্গলার সব ছিল। বাঙ্গলার হাতী ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসায় ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্পী ছিল, কলা ছিল।" তখন "ঘনাঘন" নামক রণহস্তী বাঙ্গলার ছিল, আর নৌ-সেনাগণ "হী-হী" রবে যুদ্ধে রণধ্বনি করিত। (৮৮) এই সময় নানাবিষয়েই অনেক মনীষী জন্মগ্রহণ করেন। ধীমান ও তাঁহার পুত্র বীটপাল ভাস্কর্য্যে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেন।(৮৯) পুনঃ মহীপাল কর্ত্তৃক কাশীতে মন্দির নির্ম্মাণ উপলক্ষে আমরা স্থিরপাল এবং বসন্তপাল নামক দুইজন বড় ভাস্করের নাম পাই। সম্রাট ধর্ম্মপালের জামাতা মন্থুরক্ষিত—যিনি মগধে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন—তিনি, অর্থশাস্ত্র ও নীতি (Political Economy and Ethics)

৮৬। "বাঙ্গালার ইতিহাস", ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪—২৫৫।

৮৭। „ পৃঃ ২৫৩

৮৮। গৌড়-লেখমালা দ্রষ্টব্য।

৮৯। তারানাথের ইতিহাসে ইঁহাদের বরেন্দ্রভূমির লোক বলা হইয়াছে (পৃঃ ২৭৯—২৮০)। কিন্তু P. al Jor এর পুস্তকে ইঁহাদের মগধবাসী বলা হইয়াছে (পৃঃ ১৩৭)।

বিষয়ে পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁহার রচিত কিছু লেখা তীর্ব্বতীয় "তাংযুর" মধ্যে সংরক্ষিত হইয়াছে। শান্তরক্ষিত জহোরে জন্মগ্রহণ করেন। রত্নরক্ষিত বিক্রমশীলার প্রধানমন্ত্রাচার্য্য ছিলেন। তিনি ভবিষ্যবাণী করিয়াছিলেন, দুইবৎসর পরে তুরক কর্ত্তৃক মগধের দুইটি বিহার বিধ্বংস হইবে, অতএব তিনি তীর্ব্বতে চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। এইকালেই শীলভদ্র, অতীশ, দিপঙ্কর, টঙ্কদাস প্রভৃতির পণ্ডিত উদয় হইয়াছিলেন। পুনঃ, কুকুরী, বিকীর্ত্তি দেব (ইনি অনেক কাশ্মিরী পণ্ডিতদের শিক্ষাপ্রদান করেন), ব্যালী, সবরী আরও অনেক বৌদ্ধ সিদ্ধপুরুষ বাঙ্গলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান ও ঔষধ বিতরণ করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে কিমিয়া-বিদ্যার অনুশীলন বিশেষভাবে ছিল। ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বৌদ্ধ ও বৌদ্ধ সিদ্ধদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। চক্রপাণী পালবংশের নরপালের রন্ধনাগারের চিকিৎসক ছিলেন। মাধবও বাঙ্গলার লোক ছিলেন বলিয়া কথিত হয়।

কিন্তু ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদের নাম বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। কেবল তীর্ব্বতীয় পুস্তকসমূহে তাঁহাদের নামোল্লেখ আছে (৯০)। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধ সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, অলঙ্কার, ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই ব্রাহ্মণেরা পরিবর্ত্তিত করিয়া নিজেদের অনুযায়ী করিয়া লইয়াছে। (৯১) বাঙ্গলার শূদ্র ও পতিতদের অভ্যুত্থানের সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন বর্ত্তমান সাহিত্য ও ইতিহাস মধ্য হইতে বিলুপ্ত করা

৯০। তীর্ব্বতীয় "বুস্তন" গ্রন্থে এবং চৈনিক ত্রিপিটকে সংস্কৃতভাষাতে মানবের চর্চ্চায়ত্ত সর্ব্ববিষয়ের পুস্তকসমূহের তালিকা পড়িলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইবে। ভারতে এইসব পুস্তক একেবারে অজ্ঞাত।

৯১। শাস্ত্রী: সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১০ম সংখ্যা, ১৩৩৩ সাল।

হইয়াছে। এইসকল বিষয় এখন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ও বাঙ্গলার প্রাগৈতিহাসিকগণের অনুসন্ধানের বিষয়-বস্তু হইয়াছে। শ্রেণী-সংগ্রাম বঙ্গে এক ভীষণভাবে তাহার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে যে, হিন্দু বাঙ্গলার ইতিহাস আমরা কর্ণাটকাগত সেনবংশীয়দের সময় হইতে গণনা করিতাম (৯২)।

এই শূদ্রযুগের একটা গল্প অবলম্বন করিয়াই বাঙ্গলা ভাষার মহাকাব্য "ধর্ম্মমঙ্গল" (৯৩) লিখিত হইয়াছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। এই কাব্য "ধর্ম্মঠাকুর" পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য; ইহাব প্রধান নায়ক, লাউ সেনের যুদ্ধ লইয়া লিখিত হয়। এই কাব্যে লাউ সেনের জাতির কথার ইঙ্গিত নাই, কেবল তিনি সম্রাট ধর্ম্মপালের শ্যালিকা রাণী রঞ্জাবতীর পুত্র বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহার সেনাপতি কালুডোম, গৌড়ের মেটে জাতীয় সহর-কোটাল, ঢাকুরের ইছাই ঘোষেব চণ্ডাল কোটাল, বাগদী, ডোম প্রভৃতি সৈন্যের কথা আছে। আর আছে বর্ত্তমানকালের এই সব তথাকথিত অস্পৃশ্যজাতিদের পূর্ব্বপুরুষের বীরত্বের কথা :

"রণে অকাতর হয়ে শত্রু শির সংহারিয়ে।
নিশীথে সমরে শাকা মলো" ॥

কালুডোমের পুত্র রণক্ষেত্রে মৃত্যুকালে ভ্রাতা দ্বারা উপরোক্ত কথা পিতাকে সংবাদ পাঠাইতেছে। এই মৃতপুত্রের মস্তক ছিন্ন করিয়া গামছায় বাঁধিয়া কালুর স্ত্রী নেশায় বিভোর স্বামীকে উপহার দিতেছেন, উদ্দেশ্য -প্রতিহিংসা। লাউ সেনের রাণীরা অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতেছেন।

৯২। জার্ম্মাণীতে লেখকের কোন ইণ্ডোলোজিষ্ট অধ্যাপক বন্ধু একবার বলিয়াছিলেন : হিন্দুরা ধর্ম্মান্ধ নহে। তাহারা বৌদ্ধদের কোনচিহ্ন ভারতে রাখে নাই।

৯৩। ঘনরামের "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।"

যাঁহারা ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিকল্পনা বলিয়া নিজেদের "বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির" পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহাদের পাহাড়পুরের মাটির চিত্রগুলি (Plaques) দেখিতে অনুরোধ করা হইতেছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে একটা জাতির উত্থান ও পতন হয়, এই সমাজতাত্ত্বিক তথ্য ই হারা ভুলিয়া যান।

এই সময়ে লোকে গোমাংস ভক্ষণ করিত না। বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও ইহাতে আপত্তি ছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের উমা, হিঙ্গালক্ষ্মী উমা, চণ্ডিকা, বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু, লিঙ্গকালীদেবী, মহেশ্বর, দেবেশ্বর, ভৈরব, যম, বসুন্ধরা, বিশ্বনাথ প্রভৃতি দেবদেবী পূজিত হইত। অন্যপক্ষে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকদের হেবজ্র, চক্রসম্বর, চণ্ডিকা, বজ্রবারাহী, বজ্রযোগিনী, ভট্টারিকা-আর্য্য-তারা, মঞ্জুবজ্র, কর্ম্মবজ্র, হুঙ্কার, মারিচি, মহামায়ূরী, জম্ভলা, শ্রীবজ্রভৈরব, হয়গ্রীব, বজ্রধর, বজ্রসত্ত্ব, হেরুকা, শ্রীহেরুকা, কুরুকুল্লা মহাকাল প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি পূজিত হইত।

ইহার মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের কতকগুলি দেবদেবী সাধারণ ছিল। উভয় সম্প্রদায় তখন অতি নৈকট্য প্রাপ্ত হইতেছে। এক বৌদ্ধসিদ্ধের নাম ছিল ওঙ্কারনাথ। তারানাথের পুস্তক পাঠে অনুমিত হয় যে, তৎকালে বারটি জাতি ছিল যাহাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল না। অনেক বৌদ্ধ-সিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব। তিল্লি তাঁহার শক্তিকে লইয়া প্রকাশ্যেই বলিতেন—"ব্রাহ্মণ হই বা না হই, আমি এক শূদ্রাণীর সহিত থাকি"। তৎকালে ভিক্ষুদের জন্য অনেক বড় এবং বিখ্যাত সংঘারাম ছিল যথা: বিক্রমশীলা, নালন্দা, এড়পুরা; আভু, সুবর্ণধ্বজ, সোমপুরী, তক্ষশীলা, বজ্রাসন, ওটন্টপুরী, ধর্ম্মাসঙ্কুরাণ, জগদ্দল এবং দেবীকোট। এইগুলির মধ্যে কতগুলি বাঙ্গলায় অবস্থিত ছিল তাহাই অনুসন্ধানের বস্তু।

এইযুগে ভক্তদের জন্ত প্রস্তরের এবং অন্ত উপাদানের মূর্তিসমূহ নির্ম্মিত হইত। চন্দনের তারামূর্ত্তি, পিত্তলের ও রৌপ্যের হেরুকা ও অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তির সংবাদ তারানাথ হইতে আমরা পাই।

ধর্ম্মাচরণের দিকে কোন কোন ব্রাহ্মণ মদ্যপান করিতেন। স্ত্রীলোকেরাই মদ্য বিক্রয় করিত। বৌদ্ধ সিদ্ধরা ব্রাহ্মণদের গালি দিতেন, উভয় দলের ভাব ছিল না। সহজযানীদের জাতি বা বর্ণভেদ ছিল না। সিদ্ধদের নানাজাতির "শক্তি" থাকিত। ইহাদেরই ডাকিণী বজ্র-যোগিণী, যোগিণী প্রভৃতি বলা হইত। গণচক্রে চণ্ডালী স্ত্রীলোক থাকিত। "বাঙ্গালী-সাধনা" বলিয়া সহজযানীদের এক সাধনা ছিল, তাহাতে চণ্ডালী শক্তিরূপে গ্রহণ করা হইত যথা: রে ভূসু তু চণ্ডালী লেলি তু বঙ্গালি ভেলি ("বৌদ্ধ দোহা ও গান")। বৌদ্ধেরা জাতি-ভেদের প্রবলভাবে বিপক্ষে ছিলেন। যে স্ত্রীলোক গাত্রে চন্দন মালিস করিয়া দিত তাহাকে "পদ্মিনী" বলা হইত।

তৎকালে তন্ত্রের আচার ভারতে বিপুলভাবে বিস্তৃত হওয়ায়, তন্ত্রোক্ত-অলৌকিক ক্রিয়াতে (magic) লোকের অসম্ভবভাবে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। পারস্যের সীমা সীস্তান (প্রাচীন শকস্তান) হইতে চাটিগাভ (চট্টগ্রাম) পর্য্যন্ত মহাযানী বৌদ্ধদের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তান্ত্রিক সিদ্ধগণ অলৌকিক ক্রিয়া বা ম্যাজিক দেখাইয়া লোকের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতেন।(৯৪) ভিক্ষুদের অস্থি স্তূপ মধ্যে সমাহিত করিয়া তাহা পূজা করা প্রথা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।(৯৫) বৌদ্ধ তীর্থিকদের অপেক্ষা যোগবলে তান্ত্রিকেরা বেশী সিদ্ধ ছিলেন বলিয়া তাঁহারা দাবী করিতেন; সেইজন্ত

৯৪। আজ এই সব স্থানের যেসব লোক মুসলমান হইয়াছেন, তাঁহাদের শ্রদ্ধা এক্ষণে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পীরদের জন্ত হইয়াছে।

৯৫। বৌদ্ধভিক্ষু স্তূপগুলিই 'পীরস্তান হইয়াছে, এবং পরে তাহারও অনুকরণ হইয়াছে।

তাঁহারা শক্তিমান ম্যাজিক দ্বারা প্রতিপক্ষকে জয় করিতেন বলিয়া তারানাথ বলেন। এই প্রকার সাধুর অস্থি পূজা বৌদ্ধজগতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং বৌদ্ধ-তান্ত্রিকদের দ্বারা অলৌকিকত্বে বিশ্বাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পরে ইহার ফলও বিষময় হইয়াছিল। পুনঃ, তান্ত্রিকদের আচার-ব্যবহার আজকালকার মাপকাঠিতে অতি ঘৃণ্য ছিল। ব্রাহ্মণ্য "মহাচীনাচার তন্ত্র" তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। যে দেশে "সদাচার" আর্য্যত্বের লক্ষণ, সেই দেশে তিল্লি ও সবরী প্রভৃতির "শক্তিদের" সহিত জীবন যাপন, ব্রাহ্মণদের কাছে অতি নিন্দনীয় হইয়াছিল। পরের যুগে ইহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই জন্যই পরের যুগে যক্ষ, জঙ্গলা ব্রাহ্মণদের দ্বারা রাক্ষসীতে পরিণত হন, ডাকিনীরা ডাইনীতে (Witch) বিবর্ত্তিত হন।

এই সময়ে ভারতে কিমিয়া-বিত্তার বিশেষ প্রচলন ছিল। ভারতীয় কিমিয়া-বিত্তার সহিত ইউরোপীয় আলকেমীর অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে। ম্যাজিক আয়না দ্বারা দূরদৃষ্টি লাভ করা, পাতার জুতা পরিয়া আকাশে উড্ডীন হওয়া, পিত্তলকে সোনা করা প্রভৃতি কর্ম্মের মূল এক হইতে পারে। কৃষ্ণবর্ণ সিদ্ধ তিল্লির রন্ধনাগারে মাছভাজার বর্ণনার সহিত আরব্য উপন্যাসের উক্তরূপ গল্পের সৌসাদৃশ্য আছে। হয়ত উভয় দেশেই আলকেমী চর্চ্চার উৎপত্তি এক। আলকেমীর চর্চ্চা ইউরোপে অগ্রে আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের এক রাজপুত্র তাহার বিমাতার ষড়যন্ত্রে হস্তপদ-বিহীন হন। ইনিই সিদ্ধ চৌরঙ্গীনাথ। অধ্যাপক গ্রূনভেডেল এই পুরষের বর্ণনার সহিত ইউরোপের মধ্যযুগীয় "Schameler"-এ উল্লিখিত 'Spielmanus epos' সহিত তুলনা করেন। ফউসবল, জাতক ৬, ৪, ১৪, ৫, ১২ সহিত তুলনা করেন। এতদ্বারা দৃষ্ট হয়, গল্পগুলি কি প্রকারে বিভিন্নযুগে ভিন্নাকার ধারণ করে এবং বিদেশেও যায়। নালন্দার অক্ষর লিখন পদ্ধতি এবং কলাবিত্তা

যবদ্বীপ প্রভৃতিতে যায়। গৌড়চক্রের সহিত সুবর্ণদ্বীপের যোগাযোগ ছিল তাহা শেষোক্ত দেশের রাজার দেবপালদেবের নিকট আবেদন এবং নালন্দা হইতে পণ্ডিত ধর্ম্মপালের তথায় গমন দ্বারাই প্রমাণিত হয়। নালন্দা হইতে বৌদ্ধতন্ত্র যবদ্বীপ যায় এবং তাহার প্রচার হয়। পুনঃ পূর্ব্ব-ভারতের কৃষ্টি কাম্বুজিয়া প্রভৃতি গঙ্গোত্তর দেশ-সমূহকে প্রভাবান্বিত করে।

পাল যুগের অর্থনীতিক অবস্থা

ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ পুস্তকসমূহ পাঠে পাল রাষ্ট্র সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল বলিয়াই আমাদের ধারণা হয়। আজ যদিচ, ব্রাহ্মণদের দ্বারা পালযুগের বৌদ্ধকৃষ্টি গৌড়চক্র হইতে মুছিয়া দেওয়া হইয়াছে তত্রাচ, হিন্দুর আচার ব্যবহার এবং জনশ্রুতি ও গল্প দ্বারা যাহা রক্ষিত হইয়াছে, তদ্বারা আমরা একটা ধারণা করিতে পারি।

মধ্যযুগীয় শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য (ইণ্ডোনেশিয়া) মধ্যস্থিত স্থানসমূহ হইতে যে শিলালেখসমূহ বিদেশে গমনাগমনের সাক্ষ্য প্রদান করে আমরা তাহা পূর্ব্বেই উক্ত করিয়াছি। তারানাথের পুস্তকে দৃষ্ট হয় সমুদ্রপথে এই গমনাগমন পঞ্চদশ শতাব্দীতেও ছিল; কারণ এই সময়ে জ্ঞান মিত্র এবং তাঁহার শিষ্য শান্তিগুপ্তরা রা-কিন (আরাকান?) দেশে জাহাজে যান এবং বাঙ্গলায় সেই উপায়েই প্রত্যাবর্ত্তন করেন।(৯৬)

বিদেশে গমনাগমনের অনেক যাতায়াতের চিহ্নস্বরূপ হিন্দুর একটা ধর্ম্মানুষ্ঠান আছে যাহা বর্ষাঋতুর অবসানের পর শীতকালে সম্পাদিত হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম "সোদো পূজা।" এই সময়ে একটা কলার নৌকা নির্ম্মিত করিয়া কিছুদিন পূজাগৃহে রাখিয়া পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া একদিন জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। যে বাড়ীর লোক বিদেশে

৯৬। B. N. Datta : Mystic Tales of Taranatha, P 64,

আছেন, তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হয়, "পিতা গেছেন সিংহলে, তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া আইস"। ৺রমেশচন্দ্র দত্ত সত্যই বলিয়াছেন, ইহা এককালে বাঙ্গালীর সমুদ্রগমনের স্মৃতি বহন করে (৯৭)। বণিক "চাঁদ সওদাগর" যিনি বাণিজ্য বিষয়ে বাঙ্গলার হিন্দু ও মুসলমানের উভয়েরই hero eponym অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ের কল্পিত বণিকের প্রতীক, "ধনপতি সওদাগব" প্রভৃতি উক্ত কালের ঐতিহ্যের স্মৃতি আজও বহন করিতেছে। সুমাত্রায় বাঙ্গালী বুদ্ধগুপ্ত নামক নাবিকের ৪০০ খৃঃ খোদিত-লিপিই এই ঐতিহ্যের বস্তুতান্ত্রিক সাক্ষ্য প্রদান করে (৯৮)।

অতি প্রাচীনকালে বুদ্ধের সময়ে যখন মহাবীর রাঢ় দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন তখন সমগ্র রাঢ়দেশ "বজ্রভূমি" ও "পুণ্যভূমি" নামে দুই অংশে বিভক্ত ছিল। শেষোক্ত স্থানে ঐ নামে একটি বন্দর ছিল।(৯৯) এই পুণ্যভূমিরই একটি ব্যাধের কন্যা চাপা একজন বড় বৌদ্ধ ভিক্ষুণী এবং "থেরী" পদে উন্নীত হন। বোধ হয় এই স্থান পূর্ব্ব-সমুদ্রগামী ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিল। এই সঙ্গে তাম্রলিপ্তের নামও জৈন ধর্ম্মগ্রন্থে পাওয়া যায়। তথাকার অধিবাসীরা উচ্চদরের ক্ষত্রিয় ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তৎপর, গুপ্তযুগে "দশকুমার চরিত" গ্রন্থে দাম্রলিপ্ত (তাম্রলিপ্ত) নগর সমুদ্রবাহী বাণিজ্যের স্থান বলা হইয়াছে। ৮০০ খৃঃ যখন মগধে আদিসিংহ রাজা ছিলেন তখন, উদয়মন, শ্রীধান্তমন এবং অজিতমন নামে তিনজন বণিক অযোধ্যা হইতে "তাম্রলিপ্ত" নগরে

৯৭। R. C. Dutt: History of Bengalee Literature.

৯৮। Bijon Raj Chatterjee: "India and Java" Pt. 1 1933. 2. Inscriptions of N. Wellesly Province.

৯৯। B. M Barua: "History of the Ajivakas. Pt. 1933

আসিয়া প্রচুর ধনোপার্জ্জন করেন।(১০০) এতদ্দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় প্রাচীন খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে খৃঃ অষ্টমশতাব্দী পর্য্যন্ত পূর্ব্বের বাণিজ্যের বন্দর স্থান ছিল তাম্রলিপ্ত। পালযুগে, বিদেশের সহিত যে ব্যবসায় বাণিজ্য ছিল তাহা এইসব প্রমাণ দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়।

এতদূর পর্য্যন্ত আমরা সামন্ত ও বণিকদের সংবাদ সংগ্রহ করিতেছি কিন্তু অন্য শ্রেণীদের বিষয় কি? মৌর্য্য যুগের মহাস্থানে প্রাপ্ত লিপিতে দৃষ্ট হয়, অকাল হইলে হাহাকার পড়িয়া যায়। সম্রাটকে রাজকোষের শস্য-ভাণ্ডার হইতে ধান্য ধার দেওয়া হইত। (১০১) সম্রাট কুমারগুপ্তের সময়ের দামোদরপুর লিপিসমূহে দৃষ্ট হয় ভূমির মালিক ছিল রাজা। (১০২)

ভূমি ক্রয় একটা সমিতির মধ্য দিয়া সম্পন্ন হইত যথা:—নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলীক এবং জ্যেষ্ঠ বা প্রথম কায়স্থ। কৃষিজীবী তখন ভূমিতে স্বত্ব হারাইয়াছে। বৈদিক যুগের গ্রাম্য-সমিতি আর নাই।

গুপ্ত-যুগের পরে কর্ণসুবর্ণ হইতে প্রদত্ত সম্রাট জয়নাগের লিপিতে (পঞ্চম-ষষ্ঠ খৃঃ) দৃষ্ট হয়, রাজাই ভূমির স্বামী। (১০৩) কৃষিজীবীর কোন সংবাদ ইহাতে নাই। পুনঃ, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে সমাচারদেবের লিপিতে (১০৪) দৃষ্ট হয় সুপ্রতিক স্বামী নামে একজন ব্রাহ্মণ ভূমি ক্রয়ার্থে স্থানীয় সরকারী আদালতে (District court) দরখাস্ত করেন।

১০০। EP. Ind. Vol. II. No. 27. "Dudpani rock insc. of Udayamana."

১০১। Ep. Ind. Vol. xx. No. 14.

১০২। Ep. Ind. Vol. xv. No. 7.

১০৩। EP. Ind. Vol. XVIII. No 7. Vappaghoshavata grant of Jayanaga.

১০৪। ঐ No. XI. The Gugrahati Copperplate of Samacharadeva.

ইহার সভাপতিত্ব করিতেন দামুক এবং তাঁহার সঙ্গে স্থানীয় জ্যেষ্ঠরা। এই জ্যেষ্ঠদের পদবী ছিল কুণ্ডু, পালিত, ঘোষ, দত্ত, দাস। এই আদালতের প্রধান জজ (জ্যেষ্ঠাধিকরণ) ছিলেন দামুক, এবং মহোত্তরেরা ছিলেন কুণ্ডু, দত্ত, দাস প্রভৃতি। দান নির্দ্ধারিত হইলে সাধারণদের প্রতিনিধিরা (কুলভারাণ) একটি তাম্রফলক দ্বারা এই দান সিদ্ধ করিলেন। এই স্থলের গ্রামের মোড়লদের (মহোত্তর) সংবাদ পাওয়া গেল কিন্তু তৎনিম্নের শ্রেণীদের সংবাদ নাই। গ্রাম্য-সমিতিরও সংবাদ নাই।

তৎপর আসে ভাস্করবর্ম্মণ প্রদত্ত (৬—৭ খৃঃ) নিধানপুর লিপি। ইহাতে একদল ব্রাহ্মণকে রাজা ভূতি বর্ম্মণ কর্ত্তৃক "অগ্রহার" (Manor) স্বরূপ একটি গ্রামদানের উল্লেখ আছে। (১০৫) কিন্তু এই দানের পট্টোলি হারাইয়া যাওয়াতে ইহা করদেয় হয়; সেইজন্য রাজা ভাস্কর বর্ম্মণ তাহা পুনরায় লিখিয়া দেন।

পুনঃ এই লিপি, রাজা লোকনাথের লিপি ও উড়িষ্যার শুভকরের লিপিতে ব্রাহ্মণদের নামের পূর্ব্বে "স্বামী" উপাধি এবং পদবী যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা বর্ত্তমানের কায়স্থদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে এবং কিয়দংশভাবে নব-শায়কদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। ইহাতে রাজকর্ম্মচারীদের উল্লেখ আছে। এই লিপি দ্বারা অনুমিত হয়, রাজাই তখন ভূমির স্বামী ছিল। গ্রামের মহোত্তরাদির কোন সংবাদ নাই।

তৎপর আসে পাল যুগ। এই যুগের প্রথম লিপি খালিমপুর শাসনে (১০৬) (অষ্টম শতাব্দী) গ্রামদান কালে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীদের উল্লেখ করিয়া একটি বিস্তৃত তালিকা প্রদানকালে সর্ব্বশেষে প্রতিবাসী "ক্ষেত্রকর" সকলকে জানান হইতেছে। এতক্ষণে আমরা কৃষিজীবিশ্রেণীর সংবাদ

১০৫। EP. Ind. vol. XXI. No. 19.

১০৬। "গৌড়লেখমালা"।

পাইলাম। পুনঃ, ১ম মহীপালদেবের বাণগড়-লিপিতে "মহত্ত মোত্তম-কুটুম্বি-পুরোগমেদান্ধ্র-চণ্ডাল পর্য্যন্তান যথার্হং মানয়তি বোধয়তি" বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহাতে এক গ্রাম দানকালে সর্ব্ব রাজপুরুষদের জানাইয়া দিবার কালে গ্রামের মোড়ল, কৃষক, অস্পৃশ্য মেদ ও চণ্ডাল পর্য্যন্তকে মাননা করিয়া সংবাদ দেওয়া হইতেছে যে, মহারাজ গঙ্গাস্নানান্তে কুবট পল্লিকাগ্রাম কৃষ্ণাদিত্যশর্ম্মাকে দান করিয়াছেন। রাজপুরুষদের একটা লম্বা তালিকা ব্যতীত ইহাতে বিষয়পতি, গ্রাম-পতিরও সংবাদ পাই। এতদ্বারা আমরা জেলার মালিক, গ্রামের মালিক, মোড়ল, কৃষক এবং গ্রামস্থ অস্পৃশ্যদের সংবাদ পাইলাম। আর, গৌড়, মালব, খস, হুন, কুলিক, কর্ণাট, লাট, চাট, ভাট প্রভৃতি সেবকদের তালিকা পাই। রাজসেবক অর্থে হর্ফকিন্‌স্ "সিপাহী" বলিয়াছেন। তাহা যদি সত্য হয়, এতদ্বারা আমরা এই সংবাদ পাই যে, পালরাজাদের সৈন্যদলে, গৌড়, মালব, খস, হুন, কর্ণাট, লাট প্রভৃতি দেশের লোক থাকিত। আশ্চর্য্যের কথা এই, এই সিপাহী তালিকা মধ্যে উত্তর-ভারতের লোকের উল্লেখ নাই। অথচ মনু আর্য্যাবর্ত্তের মথুরা ও কুরুক্ষেত্র অঞ্চলের লোকদের পলটনে ভর্ত্তি করিবার পরামর্শ দিয়াছেন; কারণ তাহারা "অতি উচ্চ নয়, অতি খর্ব্ব নয়, অতি স্থূল নয়, অতি অস্থূলও নয়।"

শেষাশেষিকালে মদনপালদের প্রদত্ত মনহলি-লিপিতে আমরা দেখি সেবকদের তালিকাতে "চোড়"শব্দ সংযুক্ত হইয়াছে, আর বলা হইতেছে, "ব্রাহ্মণোত্তরান্ মহত্তমোত্তম কুটুম্বী-পুরোগম চণ্ডাল পর্য্যন্তান্ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি বিদিতমস্তু ভবতাং"। গ্রামের অস্পৃশ্যদের লইয়া সকলকে ঘোষণা করার শিষ্টাচার আমরা পালযুগেই প্রথম লক্ষ্য করি। অবশ্য বাঙ্গলায় মেদ ও অন্ধ্রজাতিরা কখন বাস করে নাই। ইহা

ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি প্রভাবান্বিত একটি সামন্তাতান্ত্রিক বাক্যবিন্যাসের ধারা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। পালযুগেও আমরা গ্রাম্য-সভার নিদর্শন পাইনা, তবে গ্রামস্থ সকলের প্রতি এই অনুরোধ কেন? কেহ কেহ ইহা বিধ্বংস গ্রাম্য-সভার প্রেতস্বরূপ গ্রামস্থ সকলকে এই বিনয় করা হয় বলিয়া মনে করেন। আগের যুগেও এই প্রকার ভাষার নজির আছে : হর্ষবর্দ্ধনের মধুবাণ-লিপিতে (৬৩২ খৃঃ) আমরা নিম্নোক্ত শ্লোক পাই, "মহাসামন্ত......বিষয়পতি ভটচাট সেবকাদীন্ প্রতিবাসিজনপদাশ্চ সমাজ্ঞাপয়ত্যস্তবঃ ॥" (১০৭)

ভারতে যখন রাজার স্বেচ্ছাচারিতা (Absolutism) প্রতিষ্ঠিত হয় তখন হইতেই গ্রামের সাধারণের নির্ব্বাচিত "সভা" বিনষ্ট হয়। এই বিনাশ কি প্রকারে ক্রমশঃ বিবর্ত্তিত হয় তাহা লেখক অন্যত্র বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন (১০৮)। বাঙ্গলায় আমরা যাহা পাইতেছি তাহা উপরে উদ্ধৃত হইল। গ্রাম্য-সভার কোন উল্লেখ আমরা মৌর্য্য-যুগ হইতে পাই না। পরের যুগে তাহা বিলুপ্ত হয়; রাজার গ্রামদানকালে গ্রামের "কুলাভারাণেরা" ক্রয় সিদ্ধ করিত। তখনও গ্রামের লোকের কিঞ্চিৎ ক্ষমতা ছিল। কিন্তু পালযুগে তাহারও অভাব, কেবল বিনয়পূর্ণ বচন দ্বারা তাহাদের জানান হইত। ভূমি ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে রাজাই সর্ব্বেসর্ব্বা। তবে পালেরা চাতুর্ব্বর্ণের নিয়ামক সত্বেও সাম্যবাদী বৌদ্ধ বলিয়া এই বিনয় অস্পৃশ্যদের পর্য্যন্ত উপনীত হইতেছে। রাষ্ট্র-শাসকের দৃষ্টিকোণ এইটুকু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এতদ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কৃষকশ্রেণী আকস্মিক শক্তিশালী হইয়া

১০৭। EP. Ind. vol. 1, No. XI. P. 74.

১০৮। B. N. Datta : Dialectics of Land-economics of India দ্রষ্টব্য।

উঠিয়াছে। তারানাথ এই বিষয়ে নীরব। কিন্তু অনুমান করা চলে, পালবংশ জনপ্রিয়তার বশবর্ত্তী হইয়াই এই বিনয় দেখাইয়াছেন। রাজনীতিক বা অর্থনীতিক কোন অর্থ ইহার পশ্চাতে নাই বলিয়াই বোধ হয়।

শেষের কথা, বাঙ্গলার আর্থিক মান স্বরূপ মুদ্রার কি প্রচলন ছিল? বৈদিক সাহিত্যে আমরা "নিষ্ক" মুদ্রার উল্লেখ পাই। ইহা সুবর্ণের ছিল, তজ্জন্য লোকে গলায় ইহা হাররূপেও ব্যবহার করিত। স্বয়ং বরুণ ঠাকুর তাহা পরিতেন। পরের যুগে আমরা ছাপমারা (Punch-marked) টাকা প্রচলন হইবার নিদর্শন পাই। মৌর্য্য-যুগে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে আকাল হইলে রাজসরকার হইতে "গণ্ডকী" নামক মুদ্রা দুর্গতদের ধার দেওয়া হয়। ইহা কোন্ ধাতু নির্ম্মিত তাহার কোন উল্লেখ নাই। পরের যুগসমূহ হইতে নানা রাজার মুদ্রা (Coins) আমরা পাই। অবশ্য ইহা সুবর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা। গুপ্তযুগে আমরা রোমান Dinarius প্রচলনের প্রমাণ পাই (১০৯)। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সমসাময়িক নারদস্মৃতিতে এইমুদ্রার নাম পাওয়া যায়। ভারত এবং পশ্চিম-এশিয়াতে ইহাকে "দিনার" বলা হইত (ফার্সী ভাষায় এই মুদ্রার উল্লেখ আছে)। নিশ্চয়ই এই মুদ্রা ইহার বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতে প্রচলন ছিল ; কারণ খৃষ্টীয় প্রথম শতকের শেষাংশে প্লিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, ভারতীয়েরা রেশমী কাপড় বেচিয়া প্রতি বৎসর এক মিলিয়ন সুবর্ণ মুদ্রা (Gold species) রোম হইতে লইয়া যায়।

এই সুবর্ণ "দিনার" পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতে প্রচলন ছিল তাহা আমরা তারানাথের "মাণিকের খনি" (১১০) । পুস্তকে উল্লিখিত হইতে

১০৯। C. I. I. vol. III. No. 5.

১১০। B. N. Datta : Mystic Tales of Lama Taranatha.

দেখি। তিনি বলিতেছেন, শান্তিগুপ্ত সিদ্ধিলাভ করিবার জন্ত ত্রিপুরাতে জ্ঞান মিত্রের কাছে আসেন; তখন আচার্য্য প্রত্যেক দিনের জন্ত এক দিনার চাহেন। শান্তিগুপ্ত তজ্জন্ত একবৎসর কৃষকের কর্ম্ম করেন। এইকর্ম্ম উপলক্ষে তারানাথ বলিতেছেন, "লোকে বলে, ভারতে কৃষির শ্রমিক (Field-worker) বিশিষ্ট দুর্দ্দশার সহিত ব্যবহৃত হয়" (১১১)। এই ঘটনা অনুষ্ঠিত হয় যখন উড়িষ্যাতে মুকুন্দদেব রাজা ছিলেন, কারণ পরে তিনি শান্তিগুপ্তকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা হইলে, বাঙ্গলার গৌড়ীয় সুলতানদের যুগেও স্বর্ণ দিনার প্রচলিত ছিল।

দিনার প্রচলনাপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা এই যে, সম্রাট ধর্ম্মপালদেবের সময়ে পূর্ব্বভারতে "দ্রম্ম" মুদ্রার প্রচলন নিরীক্ষণ করি। মহাবোধি-লিপির (১১২) "কেশব প্রশস্তি" মধ্যে আমরা এই উল্লেখ পাই: "ধর্ম্মপালের রাজাঙ্কের ষড়বিংশতিতম বর্ষে...ভাস্করের পুত্র কেশব কর্ত্তৃক একটি চতুর্ম্মুখ মহাদেব প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। এবং (তৎকাল প্রচলিত 'দ্রম্ম' নামক মুদ্রায়) তিনসহস্র মুদ্রাব্যয়ে একটি 'অতি অগাধ' "পুষ্করিণী খনিত হইয়াছিল।" (ত্রিতয়েন সহস্রেণ দ্রম্মাণাং খানতা সতাং।" ৩ শ্লোঃ)।

এক্ষণে বিচার্য্য, এই "দ্রম্ম" মুদ্রাটি কি? ইহা গ্রীক Drachma শব্দের ভারতীয় অনুকরণ। আজও গ্রীসে "দ্রাখমা" মুদ্রার প্রচলন আছে। ইহা আন্তর্জ্জাতিক ব্যবস্থানুসারে মুদ্রার ডেসিমেল প্রথানুযায়ী $\frac{5}{100}$ অংশ। এইজন্ত ইহা মুদ্রার সর্ব্বনিম্নাংশ এবং আমেরিকার ৫সেণ্ট মূল্যের অনুরূপ। বর্ত্তমান গ্রীকভাষায় ইহাকে এক "লেপিডারা" বলা হয়। প্রাচীনকালে পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে গ্রীক-সভ্যতা

১১১। B. N. Datta, op. cit. P. 64.

১১২। গৌড়লেখমালা।

বিস্তারের সঙ্গে এই মুদ্রা বোধ হয় নিকটবর্ত্তী প্রাচ্যে প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানের এই মুদ্রা আমাদের পয়সার ন্যায় ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত হয়। নিশ্চয়ই ভারতীয় বণিকেরা তথা হইতে ইহা ভারতে আনয়ন করেন। ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভারতীয় মুদ্রা বলিয়া অনুমান হয়। 'দ্রম্ম' মুদ্রা বাঙ্গলার বাহিরেও প্রচলিত হইয়াছিল। "ভোজদেবের মৃত্যুর পর বিগ্রহপাল কান্যকুব্জ পুনঃ জয় করিয়া নিজ নামে 'বিগ্রহপাল দ্রম্ম' প্রচার করিয়া নিজপ্রভুত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন" (১১৩)। পুনঃ, লিপিদ্বারা প্রমাণিত হয়, ৯০৮ খৃঃ কান্যকুব্জে রাষ্ট্রকূট প্রভাব বিজ্ঞাপক "তুঙ্গ দ্রম্ম" ও "বিগ্রহপাল দ্রম্ম" প্রচলিত ছিল (১১৪)। বাঙ্গলার ব্যবসায়ীরা বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের কাছ হইতে দ্রাখমা গ্রহণ করিয়া নিশ্চয়ই বাঙ্গলায় প্রচলিত করেন। এতদ্বারা পালযুগে, বহির্দেশের সহিত বাঙ্গলার বাণিজ্যের যোগাযোগের আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায়।

শেষে আমরা পালযুগের এই সংবাদ পাই: সামন্ত, বণিক, আমলা-তন্ত্র ভাল অবস্থায় থাকিত, কিন্তু কৃষকের অবস্থা অতি কষ্টকর ছিল। অন্ত্র-মেদ-চণ্ডালের ব্যবহারিক দুঃখ ছিল, তজ্জন্যই তাহারা নাথধর্ম্ম ও তান্ত্রিকসিদ্ধদের বা অন্য গণশ্রেণীয় সম্প্রদায়ের ভক্ত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদ ও রাজকীয় মহাযান ধর্ম্ম তাহাদের ব্যবহারিক দুঃখ ঘুচায় নাই।

১১৩। নগেন্দ্র বসু: "রাজন্য কাণ্ড", পৃ ১৬৫

১১৪। EP. Ind. vol. 1, P. 174.

নবম অধ্যায়

নব-ব্রাহ্মণ্য যুগ

বাঙ্গলাদেশে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম কোনদিনই বিলুপ্ত হয় নাই, বরং বৌদ্ধ পুস্তকসমূহ দ্বারা আমরা প্রমাণ পাইয়াছি যে, এই প্রদেশে তীর্থিকদের সংখ্যাধিক্য ছিল। পালরাজারা বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম উভয়ের সঙ্গেই মিতালী করিয়া চলিতেন। তাঁহাদের বংশগত ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের তাম্র-লিপিসমূহে আমরা পাঠ করি যে, তাঁহারা বেদাধ্যায়ী ও যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বৌদ্ধ সামন্ত চন্দ্রবংশও এইনীতি দ্বারা নিজেদের পরিচালিত করিতেন। ইঁহাদের শীলমোহর ছিল 'ধর্ম্মচক্র' প্রতীক।

তত্রাচ আমরা দেখি পরমসৌগত রাজবংশকে ধ্বংস করিবার জন্য এবং এই দেশে ব্রাহ্মণ্য রাজশক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে ধীরে ধীরে সমিধ্ সংগ্রহ হইতেছে। উত্তরে "কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ" সময়ের ঘটনা লইয়া লিখিত "রামচরিত" গ্রন্থে সন্ধ্যাকর নন্দী রাঢ়ে লক্ষ্মীশূর নামক এক সামন্তরাজার উল্লেখ করিয়াছেন। পরের যুগে, রাজেন্দ্রচোলের লিপিতে আমরা দক্ষিণ রাঢ়ে রণশূর রাজার নাম পাই। ব্রাহ্মণদের কুলজী গ্রন্থে "আদিশূর" রাজার নাম বিশেষভাবে পাই এবং এই বংশের অন্যান্য রাজাদের নামও উল্লিখিত আছে। ইনিই নাকি কোলাঞ্চ দেশ হইতে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ করিয়া আনেন। এই শূর-বংশের বিষয়ে ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার "গৌড়ের ইতিহাস" (পৃঃ ৬৯) নামক পুস্তকের প্রথমখণ্ডে বলিয়াছেন: "ধ্রুবানন্দ মিশ্রের গ্রন্থে লিখিত আছে, শূর-বংশীয় কাশ্মীরের নিকটবর্ত্তী 'দরদ' দেশ হইতে গৌড়ে আগমন করিয়াছেন; যথা:

আগমাৎ, ভারতবর্ষং দারদাৎ সরবিপ্রভঃ।
জিত্বাচ বৌদ্ধরাজানং তথা গৌড়াধিপংবলান্" ॥

আদিশূর এই বংশীয় সর্ব্বপ্রধান নরপতি।(১) এতদ্বারা আমরা এই সংবাদ পাইলাম যে, শূরেরা সুদূর 'দরদিস্তান' হইতে আসিয়াছিল। যে দরদদের মনু "ব্রাত্য" বলিয়াছেন, বৈয়াকরণিকেরা "পৈষাচী" প্রাকৃতভাষী বলিয়াছেন, এবং হিন্দুরা সাধারণতঃ "ম্লেচ্ছ" বলিয়াছেন, এবং এখনও বলেন, সেইজাতীয় লোকেরা বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মী ও উচ্চবর্ণের লোক হইল। এই দরদেরা যে কাশ্মীরের ইতিহাস "রাজতরঙ্গিণী" পুস্তকে "হিন্দু" বলিয়া গণ্য হইত না, আর আজও ভারতবর্ষীয় বলিয়া গণ্য হয় না, তাহা ধ্রুবানন্দের কথার ভঙ্গিমাতে ব্যক্ত হইয়াছে। অথচ এইবংশ ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকৃত হয় এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা হইল। এই শূর-বংশের সহিত "সপ্তশতী" ব্রাহ্মণদের বিশেষ সংযোগ ছিল বলিয়া কুলজী গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। (২) ইতিহাসের দ্বন্দ্বনীতিপ্রসূত বস্তুতন্ত্রবাদ এই প্রকারেই নিজের কার্য্য করিয়া লয়।

৺নগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন: "যে শূরবংশের উৎসাহে রাঢ় দেশে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান, ব্রাহ্মণ সমাজের অভিনব শক্তিসঞ্চার ও আপামর সাধারণের হৃদয়ে নবভাবের উদ্দীপন হইয়াছিল, কালের কঠোর নিয়মে সেই মহা শূরবংশের গৌরব ভাস্কর নিবিড় তমোজালে আবৃত হইল" (৩)। এই শূরবংশের বিষয় আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। শেষে পশ্চিমবঙ্গে সেন বংশের অভ্যুদয় দেখি। বল্লাল সেন শূরবংশীয়

১। মিহিরভোজ ৮৬০খৃঃ কান্যকুব্জ জয় করিয়া "আদিবরাহ" উপাধি ধারণ করেন। (নগেন্দ্র বসু ব্রাহ্মণকাণ্ড,) এই প্রকারের উদাহরণ আরও আছে। যেমন মগধের "আদি সিংহ" রাজা (দুধপানি লিপি)। শঙ্করাচার্য্যকে বলা হয় "আদি শঙ্কর" ইত্যাদি।

২। নগেন্দ্র বসু, ব্রাহ্মণ কাণ্ড'।

৩। নগেন্দ্রনাথ বসু, 'ব্রাহ্মণ কাণ্ড', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩।

বিলাস দেবীর গর্ভজাত সন্তান বলিয়া খোদিত লিপিতে উল্লিখিত আছে। (৪) আর ঘটক-কারিকাতে উল্লিখিত আছে :

"আদিশূরেরবংশ ধ্বংস সেনবংশ তাজা।

বিষক সেনের ক্ষেত্রজপুত্র বল্লালসেন রাজা"।

এতদ্বারা আমরা উপলব্ধি করি সেন বংশের প্রাদুর্ভাবে শূরবংশ নিষ্প্রভ হয়, আর এই বংশের দৌহিত্র বল্লাল সেন বাঙ্গলায় একছত্র শাসক হন।

কিন্তু শূরবংশের সহিত বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের সামাজিক জীবনের ইতিহাস বিশেষভাবেই বিজড়িত বলিয়া বাঙ্গলা জাতিগত গ্রন্থ বা কুলজীগ্রন্থসমূহ দাবী করেন। ইহা ভবিষ্যতে আলোচনা করা হইবে।

ইহা সুবিদিত যে, ব্রাহ্মণ্যবাদীয় প্রতিক্রিয়ার ফলে পালরাজত্বের পতন হয়। খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে পাল শাসন ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। পূর্ব্ব-বঙ্গে চন্দ্রবংশ ও বর্ম্ম বংশ নামে দুইটি রাজ্য স্থাপিত হয়। চন্দ্রবংশ রোহিত গিরি হইতে আগত বলেন। (৫) কেহ ইহা দ্বারা বিহারের রোটাসগড় বলিয়া অনুমান করেন, কেহবা ত্রিপুরা জেলার পার্ব্বত্য অঞ্চলের একটি স্থানের সহিত সনাক্ত করিতে চান। এ লিপিগুলি দশম শতাব্দীর শেষকালে এবং একাদশ শতাব্দীর প্রথমে লিখিত লিপি, "ওঁ স্বস্তি! বন্দ্যোজিনঃ" বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে। এতদ্বারা দৃষ্ট হয় তৎকালে বৌদ্ধেরাও "ওঁ" শব্দ ব্যবহার করিতেন। ইহাদের লিপিতেও কর্ম্মচারীদের বড় তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। রাজা শ্রীচন্দ্র শান্তিবারিক (৬) পীতবাসগুপ্তশর্ম্মণকে চারি হোমের সময় অদ্ভুত শান্তিক্রিয়া সম্পাদন

৪। "Ins. of "Bengal". III. Barrackpur plate of Vijayasena

৫। Inscriptions of Bengal. Vol. III. pp. 79

৬। ঐ ; শব্দের অর্থ : The priest in charge of profitiatory rites.

হেতু ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ানুসারে ভূমিদান করিতেছেন। এই বংশ চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন এবং সুগত ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ইহার পর "বর্ম্মা" বংশ উত্থিত হইয়া বোধ হয় শক্তিশালী হইয়া চন্দ্র ও পাল বংশীয় রাজাদের বিতাড়িত করেন। "বর্ম্ম" উপাধিধারী রাজাদের আবিষ্কৃত লিপিসমূহ বলিতেছে, এই বংশ সিংহগিরি হইতে আগত এবং চন্দ্রবংশীয় বলিয়া দাবী করিয়াছেন। বর্ম্মণ-লিপি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর উত্তর—নাগরী অক্ষরে লিখিত। এই অক্ষরের সহিত সেন-লিপির অক্ষরের সাদৃশ্য আছে। কেহ কেহ বলেন "সিংহপুর" কলিঙ্গে অবস্থিত ছিল। এই স্থলের রাজগণ যাদববংশীয় ছিলেন। পঞ্জাবেও সিংহপুরাগত যাদববংশীয় এক রাজার নাম পাওয়া যায়। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গলার বর্ম্মণদের পঞ্জাবাগত বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু ইহা সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই বংশ বিষ্ণুভক্ত ছিল। বর্ম্মণবংশ বাঙ্গলার নব-ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। বহু শতাব্দী পরে বাঙ্গলার একাংশে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় রাজশক্তি স্থাপিত হয়। এই বংশ প্রথমে হয়ত পালরাজাদের সামন্ত ছিল, কারণ এই বংশের জাতবর্ম্মণ দিব্যকে (দিব্বোক) পরাজিত করিয়াছিলেন, অঙ্গদেশে রাজ্যবিস্তার করেন এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের ধন প্রদান করিয়াছিলেন। এইজন্য মনে হয় পালশাসন শিথিল হইলে এই বংশ বাঙ্গলায় প্রবল হইয়া "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্বারা নিজেদের স্বাধীনতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ভোজ বর্ম্মণের পিতার নাম ছিল শ্যামল বর্ম্মণ; ইহার নামের সহিত কান্যকুব্জাগত বৈদিক ব্রাহ্মণদের শকুন-সত্র যজ্ঞ করিবার কিংবদন্তি বিজড়িত আছে। ইঁহার সময়ে তুরস্ক ভয়ে ভীত হইয়া কতিপয় ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে পলাইয়া কোটালীপাড়া গ্রামে বসবাস করেন (৭)। বিক্রমপুর হইতে প্রদত্ত ভোজ

৭। নগেন্দ্র বসু: বাঙ্গলার জাতীয় ইতিহাস, পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কাণ্ড।

বর্ম্মণের লিপি বলিতেছে, (৮) রাজা মধ্যদেশীয় পীতাম্বর শর্ম্মণের প্রপৌত্র শান্ত্যাগারাধিকৃত (যে পুরোহিত যজ্ঞগৃহ রক্ষা করে) রামদেবশর্ম্মণকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির উপ্যলিকা গ্রামে ভূমিদান করেন। এই পীতাম্বর সাবর্ণ গোত্রীয় এবং মধ্যদেশ হইতে (বর্ত্তমানের উত্তর প্রদেশ) আগমন পূর্ব্বক (মধ্যদেশ বিনির্গত) উত্তর রাঢ়ের সিদ্ধল গ্রামে (বর্ত্তমানে বীরভূমের "সিধলা" গ্রামে) বাস করেন। ভোজ বর্ম্মণ হয় একাদশ শতাব্দীর শেষ কালে অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজত্ব করেন। ইহারা চন্দ্রবংশকে অপসারিত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে রাজা হন।

এই সময়ের ভবদেব ভট্টের ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত লিপিটি (৯) অনেক সংবাদ প্রদান করে। এই লিপিটি ভবদেবের বন্ধু বাচস্পতি কর্ত্তৃক লিখিত একটি প্রশস্তি। এই লিপি অনুসারে অনুমান করা যায় যে, ভবদেব উপরোক্ত রামদেবের জ্ঞাতি। এই প্রশস্তি "ওঁ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহাতে উক্ত হইয়াছে সাবর্ণ ঋষির বংশোদ্ভব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের জন্মস্থান স্বরূপ শত ব্রাহ্মণদের গ্রাম থাকিতে পারে। কিন্তু একমাত্র যাহা ইহজগতে খ্যাত হইয়া আর্য্যাবর্ত্ত ভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়াছে তাহা হইতেছে রাঢ় লক্ষ্মীর অগ্রগণ্য এবং অলঙ্কার "সিদ্ধল" গ্রাম (৩ শ্লোক)। বাঙ্গালী chauvinism-এর প্রথম নিদর্শন এই শ্লোকটি। এই স্থলে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ নিজের জনপদকে অতি বড় করিয়া দেখিয়াছেন। কোথায় বেদ-পর যুগের বৌধায়নের বঙ্গের প্রতি সেই কটাক্ষ, আর বাঙ্গলার প্রতি এই শ্রদ্ধাপ্লুত গর্ব্ব ও স্পর্দ্ধা! ইতিহাসের দ্বন্দ্বভাবজন্য সময়ের এই ব্যবধান মধ্যে জাতিতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে। এই বংশের গোবর্দ্ধন বন্দ্য-ঘাটীয়-

---

৮। Inscriptions of Bengal. Vol. III. pp. 15-17

৯। ঐ; পৃঃ ৩৬—৫৩

ব্রাহ্মণ কন্যা সঙ্গোকে বিবাহ করেন। তাহাদের পুত্র এই ভবদেব। ইনি রাজা হরিবর্ম্মদেবের সন্ধিবিগ্রহিক (Minister of War and Peace) ছিলেন। এই স্থলে আমরা এই সংবাদ পাই যে, ভবদেবের পূর্ব্ব-পুরুষেরা মধ্যদেশ হইতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার মাতা রাঢ়-দেশের বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠীর কন্যা। ইনি সিদ্ধান্ত, গণিত, ফল সংহিতা (Astrology) জানিতেন এবং হোরা বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা নূতন পুস্তক প্রণয়ন করেন (২১ শ্লোঃ)। তিনি পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বিধানসমূহ বর্জ্জন করিয়া নিজে একটা নূতন বিধান লিখেন (২২ শ্লোক)। বর্ত্তমান বাঙ্গলার হিন্দুদের বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পূজাদি ভবদেব পাঠ দ্বারাই সংসাধিত হয়। (১০) তিনি কুমারিল ভট্টের পুস্তক অনুসরণ করিয়া "মীমাংসা উপায়" রচনা করেন। তিনি বৈদিক সূক্ত, কবিতা, আগম, অর্থশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন (৩ শ্লোক)। তাঁহার উপাধি ছিল "বালবলভীভুজঙ্গ" (২৪ শ্লোঃ)। ইহার অর্থ এখনও অজ্ঞাত। রাঢ়ের জলবারিহীন সীমান্তের গ্রামে জলাশয় খনন করিয়াছেন (২৬ শ্লোক) ; বিষ্ণুমন্দিরে একশত মৃগাক্ষী দেবদাসী নিযুক্ত করিয়াছেন (৩০ শ্লোক)। ভবদেব বৌদ্ধদের ঘোর বিপক্ষে ছিলেন এবং তাঁহাদের মত খণ্ডন করেন (২০ শ্লোক)। তাহাদের বিপক্ষে অগস্ত্য স্বরূপ ছিলেন।

এই প্রশস্তিতে একজন বাঙ্গলার ব্রাহ্মণের রাজমন্ত্রী হইয়া অনেক কর্ম্মের মধ্যে দক্ষিণ দেশের ন্যায় মন্দিরে দেবদাসী নিয়োগের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুনঃ ইহাতে রাঢ়ী ব্রাহ্মণের একটি গাঁইয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভবদেবের কাল ১০২৫—১১৫০ খৃঃ মধ্যে নিরূপিত

১০। "হিন্দু সৎকর্ম্মমালা" দ্রষ্টব্য।

হয়। এতদ্বারা দৃষ্ট হয় যে, একাদশ শতাব্দীতেই রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের "গাঁই" পদ্ধতি বিবর্ত্তিত হইয়াছে।

বর্ম্মণ বংশ হইতে আমরা রাজ সভাসদদের তালিকায় বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাই। কর্ম্মচারীদের তালিকার মধ্যে "মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ" রূপ একটি পদ এবং "পুরোহিত" নামক অন্য একটি পদ নিরীক্ষণ করি। (১১)

বাঙ্গলার একটি নূতন যুগে এক্ষণে আমরা প্রবেশ করিয়াছি। ধর্ম্ম-যাজক রাজসভার কর্ম্মচারী হইল। ভবদেব ভট্টের, স্মৃতি এবং পূজাপদ্ধতি দ্বারা নূতনভাবে ব্যবস্থা প্রদান করায় আমরা বুঝিতেছি, নব-ব্রাহ্মণ্যবাদ এক্ষণে রাজশক্তি অর্জ্জন করিয়া সামাজিক আমূল পরিবর্ত্তন সাধনে তৎপর।

ইহার পর, রাঢ়ের কোন একস্থান হইতে কর্ণাটকাগত সেন বংশের অভ্যুত্থান আমরা নিরীক্ষণ করি। উত্তর-ভারতে কর্ণাটী লোকদের উপনিবেশ করা বিষয়টি গবেষণার বস্তু হইয়াছে। কর্ণাটী সেনদের বাঙ্গলায় আসা একটা আকস্মিক ঘটনা নয়, রাজেন্দ্রচোলের সৈন্য বাহিনীর সহিত সম্বন্ধ নাও থাকিতে পারে। বাঙ্গালার সেন রাজত্বের বহু পূর্ব্বে, মধ্যযুগীয় সংস্কৃত নাটকসমূহে 'কর্ণাটক' সিপাহীর কথা উল্লেখ আছে। পাল-লিপিসমূহেও আমরা তাহা পাই। বল্লালসেনের সময়ে মিথিলাতেও (১২) এক কর্ণাটীকে রাজাসনে আসীন দৃষ্ট হয়। উত্তর-ভারতে আহির ও হূনদের ন্যায় নানাস্থানে তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় (১৩)। এইজন্য, সেনদের বাঙ্গলায় আবির্ভাব আকস্মিক না হইতেও পারে। রাজশক্তি গ্রহণের জন্য তাহারাও সমিধ সংগ্রহ করিতেছিল।

১১। Insc. of Bengal. III. Belava plate of Bhojavarman.
১২। N. N. Vasu, "History Kamarupa."
১৩। EP. Ind. Vol 11. PP. 185—186.

দশম অধ্যায়

সেনযুগ

সেনরাজাদের জাতি ও বংশ-পরিচয় লইয়া এক সময়ে বাঙ্গলায় বহু বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। কতিপয় জাতি সেনদের স্বজাতীয় বলিয়া দাবী করিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্য-দেবের সময়ে নবদ্বীপের জমিদার বুদ্ধিমন্ত খানের সভায় লেখা সম্পূর্ণকৃত "বল্লাল চরিত" নামক গ্রন্থে তাঁহাদিগকে দক্ষিণাগত "ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়" বলা হইয়াছে। অবশ্য এই শব্দের অর্থ করা হইয়াছে, ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে এই বর্ণসঙ্কর জাতির উদ্ভব! বোধ হয়, তৎকালে বাঙ্গলায় কেহ অথবা গ্রন্থকার স্বয়ং সংস্কৃত পুরাণাদির সহিত পরিচিত ছিলেন না, সেইজন্য এই শব্দের এইরূপ অদ্ভুত অর্থ করিয়াছেন। আবার, এই গ্রন্থেই বল্লাল-গুরু সিংহগিরি বল্লালকে চন্দ্রবংশীয় এবং মহাভারতের কর্ণের পুত্র বৃষসেনের বংশোদ্ভব বলিয়াছেন; বোধ হয়, রাজাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই 'সেন'এর সহিত 'সেন' মিলাইয়া একটা কল্পিত বংশ-তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। কিন্তু খোদিত-লিপিসমূহ আবিষ্কৃত হওয়ায় এখন সঠিক সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। স্বয়ং বল্লালসেন স্বলিখিত "দানসাগর" গ্রন্থে নিজেকে "ক্ষত্র চারিত্র-চর্য্যা মর্য্যাদা রক্ষণ" বলিয়াছেন। ইহার অর্থ তিনি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মানুযায়ী যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকারী। (১) সেন রাজবংশ আসলে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণের এত মর্য্যাদা দিয়াছিলেন। সেনবংশীয় বাঙ্গলার আদি রাজা বিজয় সেন। তাঁহার দেওপাড়া লিপিতে (২) চন্দ্রবংশীয় বীরসেন এবং দাক্ষিণাত্যের

১। সম্বন্ধ নির্ণয়ে উদ্ধৃত, পৃঃ ৭৩৯—৭৪১

২। Ins. of Bengal, III. PP. 45—54.

সেন বংশের পূর্ব্বেকার সংবাদ আছে। এই প্রশস্তি বলিতেছে:—"এইবংশে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়দের শিরমালার ন্যায় (ব্রহ্মক্ষত্রিয়ানামজনিকুল শিরোদাম সামন্ত) সেন ছিলেন। (৫শ্লোঃ)। দশরথের পুত্রের বীরত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তাঁহার বীরগাথা সেতুবন্ধে গীত হইত (৬শ্লোঃ)। তিনি কর্ণাটক-লক্ষ্মীর লুণ্ঠনকারীদের বিষ্ণুর ন্যায় ধ্বংস করেন (৮ শ্লোক)। শেষ বয়সে তিনি গঙ্গাতীরস্থ তপোবনসমূহ পরিভ্রমণ করিতেন। এই তপোবনসমূহ যজ্ঞের ঘৃতের সুগন্ধে পরিপূর্ণ থাকিত। এইস্থলে, হরিণ-শিশুরা আশ্রমস্থ নারীদের স্তন্যদুগ্ধ পান করিত এবং তোতাপাখি-সমূহ বেদের সমস্ত অংশ জানিত (৯শ্লোঃ)। সামন্তসেনের পুত্র ছিল হেমন্ত সেন (১০শ্লোঃ)। শেষোক্তের পুত্র ছিল বিজয় সেন (১৪—১৫ শ্লোঃ)। তিনি গৌড়েন্দ্রকে দ্রুতগতিতে পলায়ন করিতে বাধ্য করেন, কামরূপের রাজাকে বিতাড়িত করেন ও কলিঙ্গের রাজাকে পরাজিত করেন (২০শ্লো)। তাঁহার দয়ায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এত ধনের অধিকারী হইয়াছেন যে, তাঁহাদের স্ত্রীদিগকে নাগরিকগণের রমণীদিগদ্বারা মুক্তা, মণি, রৌপ্যমুদ্রা, অলঙ্কার প্রভৃতির সহিত তুলাবিচি, শাকপত্র, দাড়িম্ব বিচির পার্থক্য বুঝান হইত। তিনি যজ্ঞ করিতে কখন শ্রান্ত হইতেন না (২৪শ্লোঃ)। ইহজগতের ইন্দ্র প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করেন" (২৬শ্লোঃ)।

এই প্রশস্তি উমাপতি ধরদ্বারা লিখিত হয়। মেরুতুঙ্গের "প্রবোধ চিন্তামণি" পুস্তকে তিনি লক্ষ্মণসেন দেবের একজন মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহা "বারেন্দ্রক শিল্পীগোষ্ঠীচূড়ামণি-রাণক শূলপাণি" দ্বারা খোদিত হয় (৩৬শ্লোঃ)।

এইলিপিটি সেনবংশের প্রথমলিপি। ইহাতে সেনবংশের উৎপত্তির এবং আদি জন্মস্থল বিবৃত আছে। কিন্তু বর্ণনা কিঞ্চিৎ পরস্পর-

বিরোধী বলিয়া মনে হয়। দক্ষিণাপথের রাজাদের ন্যায় বীর সেন চন্দ্রবংশীয়; কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহাকে "ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়" বলা হইয়াছে। তৎপর, সামন্তসেন কর্ণাট-লক্ষ্মীর শত্রুদের ধ্বংস করিয়াছেন; সেতুবন্ধে তাঁহার যশোগান গীত হইত। কিন্তু শেষবয়সে তিনি গঙ্গাতীরে তপোবন পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এতদ্বারা দৃষ্ট হয়, অকস্মাৎ তাঁহাকে গঙ্গাতীরে তপোবন দর্শন করিয়া জীবন কাটাইবার ব্যবস্থা হইল। তাহা হইলে, আমরা বুঝিব কি, তাঁহার রাজ্য গঙ্গাতীরেই ছিল?

গঙ্গাতীরে তপোবনসমূহের উল্লেখ দ্বারা আমরা এই উপলব্ধি করি, ব্রাহ্মণ ও তৎসঙ্গে আনুষঙ্গিক উচ্চজাতির লোকদের বসবাস গঙ্গাতীরেই ছিল। উত্তর-ভারতের আর্য্য-সভ্যতা নদীর তীর ধরিয়াই বিবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া আজকাল নিরূপিত হয়। ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, গঙ্গাতীরেই বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ্য আর্য্য-উপনিবেশ প্রথমে স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মণেরা এই জন্যই ত্রিবেণী-সঙ্গমে বৈদিক সরস্বতী নদীর পুনরাহ্বান করিয়াছিলেন। আর্য্য-সভ্যতা পূর্ব্বগামী হইলে সরস্বতী নদী বর্ত্তমান আফগানিস্থানের 'হারাওতী' (কান্দাহারের আরগানদাব) হইতে ক্রমাগত পূর্ব্বগামী হইয়া হুগলীর নিকট ত্রিবেণী-সঙ্গমে অধিষ্ঠিত হইলেন। পদ্মাকে গঙ্গা বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। এইজন্যই বোধ হয়, নবদ্বীপে সেন রাজাদের একটি 'জয় স্কন্ধাবার' ছিল।

বিজয় সেনের বারাকপুর প্রাপ্ত লিপি (৩) "ওঁ ওঁ নমঃ শিবায়" বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে কথিত হইয়াছে যে, চন্দ্রবংশে রাজপুত্রগণের জন্ম হয়। সেই বংশে সামন্তসেনের উদ্ভব হয়। ইনি ক্ষত্রিয়গণের শিরোভূষণ হন (৪ শ্লোক)। তাঁহার পৌত্র বিজয় সেন, শূরবংশীয় বিলাস দেবী তাঁহার রাণী হন (৬-৭ শ্লোক)। তাঁহাদের পুত্র বল্লাল

সেন-ক্ষত্রিয়গণের আত-পত্রস্বরূপ ছিলেন। মহাদেবী বিলাস দেবীর কণক তুলা-পুরুষ মহাদান ক্রিয়াতে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে বিজয় সেনদেব মধ্যদেশ বিনির্গত কান্তিজক্ষীয় রত্নকার দেবশর্ম্মণের প্রপৌত্র উদয়কর দেবশর্ম্মণকে ৪ পটক ভূমি—যাহার আয় (বাৎসরিক ?) ২০০ কপর্দ্দক-পুরাণ (৩২—৩৪ লাইন) দান করিতেছেন। রাজার শীল মোহরের প্রতীক ছিল—সদাশিব।

বিজয়সেন ও বল্লাল সেনেব লিপিতে বর্ম্মণ লিপির ন্যায় কর্ম্মচারীদের তালিকামধ্যে পুরোহিত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ শব্দ দুইটি পাওয়া যায়। "মহাগণস্থ" শব্দটি দৃষ্ট হয়। এতদ্বারা দৃষ্ট হয়, ব্রাহ্মণ্যবাদীয় রাষ্ট্র-পরিচালনাকার্য্যে ধর্ম্মাধ্যক্ষের নির্দ্দিষ্টস্থান আছে। আর "মহাগণস্থ" দ্বারা তখনও "গণ" অর্থাৎ সাধারণের সংঘ বাঙ্গলায় ছিল তাহা অনুমান করিতে পারি। এই শব্দ দ্বারা আজকাল The Head of a village or Town Corporation বলিয়া অনুমিত হয়। এই লিপির দূতক (মধ্যবর্ত্তী লোক) হইতেছেন শালাভড নাগ। পালযুগের আমলাতান্ত্রিক বাঁধা গৎ দ্বারা এই লিপি শেষ হয়, "পুরোহিত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ, মহাগণস্থ······ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণাম ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্থং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতিচ মতমস্তু ভবতাম।"

লক্ষ্মণ সেনের আমুলিয়া লিপিতে "ওঁ ওঁ নমো নারায়ণায়" বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে। (৪) এই লিপিতে বংশ পরিচয় আছে: "তেষোবিষ -অর-মুষোদ্বিষতাম ভুবন্ ভূমিভূর্জ স্ফূট মহৌষধিনাথবংশে (৩ শ্লোক)। এই আলঙ্কারিক ছন্দে চন্দ্রকে বুঝাইতেছে। কিন্তু এই অলঙ্কারের "মহৌষধি নাথবংশে" উক্ত হইয়াছে দেখিয়া সেনদের বাঙ্গলার বৈদ্য জাতীয় বলিয়া এখনও দাবী করা হয়। এই তাম্রশাসন দ্বারা মধুদেব

৩—৪। Insc. of Bengal, III. PP. 59; 87.

শর্ম্মণকে ব্যাঘ্রতটিতে একটী গ্রাম দান করা হইতেছে। সেন রাজাদের শৈবরূপেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু লক্ষ্মণ সেনকে এই লিপি. অনুসারে বৈষ্ণবরূপে দৃষ্ট হয়। তিনি নিজেকে "পরম বৈষ্ণব" বলিয়াছেন। ইহাতে লক্ষ্মণ সেনের সন্ধি-বিগ্রহিক (Minister of War and Peace) হইতেছেন নারায়ণ দত্ত।

লক্ষ্মণ সেনের মাধাই নগর লিপিতে (৫) অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আছে। ইহা তাঁহার রাজত্বের ২৫ সম্বৎসরের ভাদ্র মাসে প্রদত্ত হয়। ইহাতে বলা হইয়াছে, চন্দ্রের বংশে বীর সেন উদ্ভূত হন, তাঁহার বংশে কর্ণাট ক্ষত্রিয়দের কুল-শিরোদাম সামন্ত সেন জন্মগ্রহণ করেন (৪ শ্লোক)। বল্লাল সেনের রাণী "পুরমৌলিরত্ন চালুক্য ভূপাল কুন্দেন্দু লেখা" রামদেবী (৯ শ্লোক)। তাঁহাদের সন্তান লক্ষ্মণ সেন (১০ শ্লোক)। তাঁহার যৌবনের (যুবরাজাবস্থায়) কৌমার কেলী হইতেছে—গৌড়েশ্বরের লক্ষ্মী হঠাৎ কাড়িয়া লওয়া, কলিঙ্গ রমণীগণের সহিত কেলী করা, কাশীরাজকে যুদ্ধে জয় করা (১১ শ্লোক)। পুনঃ ইনি বলিতেছেন, ইনি গৌড়েশ্বর, সোমবংশ-প্রদীপ, পরম ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়, কলিঙ্গকে খর্ব্ব (বিকলী) করিয়াছেন, কামরূপ জয় করিয়াছেন (২৫—৩৩ পং)। ইনি ঐন্দ্রী মহাশান্তি উপলক্ষে যজ্ঞগৃহের রক্ষাকর্ত্তা গোবিন্দ দেবশর্ম্মণকে ভূম্রিচ্ছিদ্র ন্যায়ানুসারে ১০০ পুরান ও ৬৮ কপর্দ্দক বাৎসরিক আয়ের ভূমি দান করা হইতেছে (৩৯—৫১ পং)।

এই লিপির এক জায়গায় সেনবংশকে কর্ণাট ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। অন্য এক স্থলে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে; ইহা পরস্পর-বিরোধী। এতদ্বারা আসল তথ্যটি লুক্কায়িত রহিল। অতঃপর এই ঐতিহাসিক

৫। 'লক্ষ্মণ সেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন'—নলিনীকান্ত ভট্টশালী—মাসিক বসুমতী, ২য় খণ্ড, চৈত্র, ১৩৪৯; Insc of Bengal. III. P. 112.

তথ্য পাওয়া যায় যে, লক্ষ্মণসেন যুবরাজাবস্থায়ই অকস্মাৎ গৌড় আক্রমণ করিয়া পালদের গৌড়রাজ্যের শেষাংশও তাঁহাদের হস্তচ্যুত করেন এবং কলিঙ্গ ও কামরূপ জয় করেন। কাশীরাজ, অর্থাৎ কান্যকুব্জের গহড়ওয়াল রাজাকে পরাজিত করেন।

লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর লিপি (৬) বিক্রমপুর হইতে প্রদত্ত হয়। ইহাতে রাজকর্ম্মচারীদের তালিকায় পুরোহিতের পরিবর্ত্তে 'মহাপুরোহিত' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

পুনঃ লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি-লিপিতে ভূমির সীমানা নির্দ্দেশ কালে উক্ত হইয়াছে, "পূর্ব্বে বুদ্ধ বিহারের দেবতার অকরদ ভূমির অন্তভাগের পূর্ব্বসীমার প্রাচীর আছে" (বুদ্ধ বিহারী দেবতানি করদের স্নানভূম্যধাভাপপূর্ব্বালি)।

এই লিপিদ্বারা বরেন্দ্রীর ভেলহিস্তি গ্রামে ঈশ্বর দেবশর্ম্মণকে হেমাশ্বরথ মহাদান যজ্ঞে আচার্য্যের কার্য্য করায় দক্ষিণাস্বরূপ দান করা হয়। সেনবংশের লিপিসমূহ মধ্যে এই একটি মাত্র স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন উল্লেখ পাওয়া গেল। এতদ্বারা ইহা বেশ বুঝা যায় যে, খৃঃ দ্বাদশ-শতাব্দীতে উত্তর-বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্ব ছিল। পুনঃ, এই লিপিতে একটি বড় যজ্ঞের উল্লেখ আছে। এই যজ্ঞ মৎস্যপুরান ২৮১ অধ্যায়, ১১—১৬ শ্লোকে উল্লিখিত আছে। ইহা ষোড়শদানের অন্যতম। এতদ্বারা সাত কিংবা চারিটি সুবর্ণ অশ্ববাহিত একটি সুবর্ণ-রথ দান করা হইত।

এই সকল যজ্ঞের দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায় যে, সেনরাজ্যে পৌরাণিক যুগের নানাপ্রকার যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইত।

লক্ষ্মণসেনের ১২০৪ খৃঃ ভাওয়াল-লিপিতে(৭) উল্লিখিত আছে, তাঁহার

৬। Insc. of Bengal, III. P. 96

৭। নলিনী ভট্টশালী—ঐ, পৃঃ ৫৯৭

চারি রাণী ছিলেন, যথা: প্রিয়াদেবী, কল্যাণ দেবী, অহ্লনাদেবী ও ভাড়া দেবী। এই স্থলে একজন নূতন সন্ধি-বিগ্রহিকের নাম পাওয়া যায়—শঙ্কর ধর। ইহাতে "নিবন্ধন" (Registration) লেখকের নাম ছিল সাহস মল্ল। ইনি রাজার হইয়া সহি করিতেছেন। পুনঃ ১১৮৩ খৃঃ প্রদত্ত লক্ষ্মণ সেনের শক্তিপুর-লিপিতে দৃষ্ট হয় কুবের নামক এক ব্রাহ্মণকে তিনি এক গ্রাম দান করেন। এই ভূমির আয় ৫০০ (কপর্দ্দক পুরান ?)। কিন্তু এই গ্রাম পূর্ব্বে বল্লালসেন জনৈক গয়াপ ব্রাহ্মণকে দান করেন। ভ্রম ধরা পড়িলে রাজা কর্ত্তৃক তাহা বাজেয়াপ্ত করা হয় (কোষস্থিকৃত) এবং তৎপরিবর্ত্তে কুবেরকে ৮৯ দ্রোণ ভূমি দান করেন। এই স্থলে লক্ষণীয় যে, ভুল ধরা পড়িলে রাজা সেই ভূমি রাজকোষের অন্তর্গত করেন। ইহা দ্বারা ভূমির মালিকানা-স্বত্ব রাজারই ছিল বলিয়া দেখা যায়।

মাধাই নগর ও ভাওয়াল রাজবাড়ীতে প্রাপ্ত দুইখানি ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিষয়ে ৺ভট্টশালী বলিয়াছেন, ইহা তুর্কীদ্বারা "নোদিয়া" আক্রমণের পরে লক্ষ্মণসেন দ্বারা প্রদত্ত হয়। তিনি ঐন্দ্রী মহাশান্তি যজ্ঞ তাৎপর্য্যে বলিয়াছেন, "ঐন্দ্রী মহাশান্তির অনুষ্ঠান হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, অনতিপূর্ব্বে নিশ্চয়ই লক্ষ্মণসেনের রাজ্যভঙ্গ হইয়াছিল, শত্রুর আরও আক্রমণ তিনি আশঙ্কা করিতেছিলেন, এবং শত্রুবধ তাঁহার কার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাই যে ইক্তিয়ারুদ্দিন কর্ত্তৃক আক্রমণ এই বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতেছে না।...১২০২ খৃঃ কার্ত্তিক মাসেই ইক্তিয়ারুদ্দিনের আক্রমণ সংঘটিত হয়।...এই আক্রমণে লক্ষ্মণসেন পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ এবং উত্তরবঙ্গের পশ্চিমাংশ হারাইয়া পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং বিক্রমপুর হইতে ধার্য্যগ্রামে রাজধানী পরিবর্ত্তিত হইল। পরবর্ত্তী ২৭শে শ্রাবণ তারিখে, ১২০৩ সনে, রাজত্বের ২৫শ সম্বৎসরে দৈবশান্তির উদ্দেশ্যে ঐন্দ্রী-মহাশান্তি অনুষ্ঠিত হয়। তাম্রশাসনখানি

প্রদত্ত হয়। পুনঃ তিনি বলিতেছেন, "এই ঘটনার (ইক্তিয়ারুদ্দিনের আক্রমণ) পরেও তিনি যে অন্ততঃ আরও দুই বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন ভাওয়াল রাজবাড়ী শাসন তাহার অকাট্য প্রমাণ...লক্ষ্মণসেন আর কতদিন বাঁচিয়াছিলেন, বলিবার উপায় নাই।"

ভাওয়াল-শাসনে লক্ষ্মণসেনের পূর্ব্ব-কৃতিত্বের পুনরাবৃত্তি আছে। যথা: কলিঙ্গজয়, প্রাগজ্যোতিষরাজকে পরাজয়, কাশীরাজকে জয়, গৌড়বিজয়। লক্ষ্মণসেনের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া ভট্টশালী বলিয়াছেন: "মুসলমান শাসন যে ইক্তিয়ারুদ্দিন প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডে শতবর্ষকাল আবদ্ধ হইয়াছিল এবং ঐ সীমানা ছাড়াইয়া আর অগ্রসর হইতে পারে নাই, উহাও অকাট্য ঐতিহাসিক সত্য।...নদীয়া লুণ্ঠনের দশ মাস মাত্র পরে মাধাইনগর তাম্রশাসন দ্বারা মুসলমান রাজ্যের পূর্ব্ব-প্রান্তে চলনবিলের পরে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিতে দেখিয়া মনে হয়, সেনবংশীয় অচ্যুৎ সেন যেন নিমদীঘিতে সদন্তে নিবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া বাহ্বস্ফোট করিয়া মুসলমানগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছিলেন। ক্ষণবিজয়ী মুসলমান-বিজেতা ঐ সীমা পার হইতে পারে নাই।... লক্ষ্মণাবতীর ক্ষুদ্র মুসলমান রাজ্য, মুসলমান আক্রমণের আদিযুগের সিন্ধুরাজ্যের মতন, আর বাড়িবার সুযোগ পায় নাই। কাজেই লক্ষ্মণ সেনের ক্ষণিক পরাজয় সত্ত্বেও, নিরপেক্ষ বিচারক মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে—এই Non-martial race-পূর্ণ বাঙ্গালী রাজ্যে আসিয়াই সেই বন্যাকে প্রতিহত হইতে হইয়াছিল—যাহা উত্তর-ভারতের মহামহাবীরপূর্ণ রাজ্যসমূহকে গ্রাস করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইতে অল্পায়াসেই সমর্থ হইয়াছিল"।

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষযুগে ১১৯৬ খৃঃ দক্ষিণ-বাঙ্গলার বর্ত্তমানের সুন্দরবন অঞ্চলে পূর্ব্ব-খাদি নামক স্থানে ডোম্মনপাল নামক একজন

সামন্ত নিজেকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। পশ্চিমের সুন্দরবন অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি খোদিত-লিপি এই সংবাদ বহন করিতেছে।(৮) এই লিপি বলে, এই পালবংশ অযোধ্যা হইতে আগত এবং পূর্ব্ব-খটিকা সম্পত্তিরূপে পায়। ইঁহার উপাধি ছিল : পরম-মহেশ্বর, মহামাণ্ডলিক। হয়ত ইনি এইস্থানের একজন শাসনকর্ত্তা বা একজন সামন্ত ছিলেন। এই লিপিতে তাঁহার মহাসামন্তাধিপতি, মহারাজাধিরাজ উপাধি দৃষ্ট হয়। এতদ্বারা তিনি নিজেকে স্বাধীন নরপতি রূপে ঘোষণা করেন বলিয়া প্রতীত হয়। কেহ কেহ ইহা অনুমান করেন যে, এই কালের "দেববংশ" পূর্ব্বে মেঘনাঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। (৯)

এতদ্বারা অনুমিত হয়, লক্ষ্মণসেনের শেষকালে রাজ্য মধ্যে বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল; ভারতীয় চিরন্তন বিকেন্দ্রীকরণ গতি পুনঃ আবির্ভূত হইয়াছিল। এই গোলমালেই ১২০২ খৃঃ ইক্তিয়ারুদ্দিন বক্তিয়ার খিলিজির আক্রমণ হয়। লক্ষ্মণসেন হয়ত ১২০৬ খৃঃ মৃত হন; কারণ সামন্ত শ্রীধরদাসের সদুক্তি কর্ণামৃত নামক পুস্তকে উক্ত আছে, ১২০৫ খৃঃ তিনি শাসন করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্রেরা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গলায় রাজত্ব করিতেন।

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষকালে "নোদিয়া"তে অবস্থিতি কালে তুরস্ক মুসলমানদল বক্তিয়ার-পুত্র ইক্তিয়ারুদ্দিনের অধীনে অশ্ববিক্রেতার ছলে অকস্মাৎ রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করেন। পঞ্চাশ বৎসরের পরে মিনহাজ নামক কোন এক বিদেশীয় মুসলমানের লেখায় উক্ত আছে, লক্ষ্মণসেন পূর্ব্ববঙ্গে পলাইয়া যান। তথায় তাঁহার পুত্রেরা এখনও রাজত্ব করিতেছেন।

৮। I. H. Q. X. 321ff

৯। History of Bengal. vol II. P223.

এই বিষয়ে বহুদিন ধরিয়া বাঙ্গালী স্বদেশী ঐতিহাসিক এবং লেখকেরা নানাভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাহার পুনরুক্তি এই স্থলের আলোচ্য নয়।(১০) কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক দিক দিয়া এই বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। পুনরুজ্জীবিত স্বাধীন-ভারত রাষ্ট্রের ভবিষ্যত জন্য, মুষ্টিমেয় বৈদেশিক দ্বারা উত্তর-ভারত কেন এক ঝটিকাতে পড়িয়া গেল, তাহা সমাজতত্ত্বের অনুসন্ধানের বস্তু।

এই স্থলে বক্তব্য এই যে, লামা তারানাথ ও মিনহাজ বর্ণিত ঘটনাগুলি একত্রে পাঠ করিলে, মগধ ও গৌড়ের পতনের একটা ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইবে। ইক্তিয়ারুদ্দিন যে কৌশল মগধে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেই কৌশলে গৌড়ও গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিনহাজ স্বীয় স্বধর্ম্মীর বড়াইয়ের কথা বলিয়াছেন কিন্তু হয় সব সত্য তিনি জানিতেন না বা জানিয়াও গোপন করিয়াছেন। এই স্থানে, এইটুকু বক্তব্য, ঘোরীর আক্রমণ এবং উত্তর-ভারত বিজয় সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যাহা জানিতাম, তাহা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের দ্বারা অর্দ্ধ-সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। পাণিপথযুদ্ধের এক বৎসর পরে দিল্লী আক্রান্ত হয়। পৃথ্বিরাজের ভ্রাতা রনথম্বরে করদরাজা হন এবং তাঁহার একপুত্র "গোলা" ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া আজমীরে পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করেন। (১১) জয়চন্দ্রের পুত্র হরিষচন্দ্র স্বাধীনভাবে খণ্ডরাজ্যে রাজত্ব করেন। (১২) লক্ষ্মণসেনের বংশ পূর্ব্ব-বঙ্গ শাসন করেন। (১৩)

১০। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত History of Bengal, vol II, দ্রষ্টব্য।

১১। Ishwari Prasad—Medieval India.

১২। H. C, Ray—Dynastic History of India.

১৩।—Insc. of Bengal, III.

শেষোক্ত দুই বংশীয় রাজারা খণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও ব্রাহ্মণদের গ্রাম দান করিতেছেন বলিয়া তাম্র-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বাঙ্গলায় মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমে (১৪) প্রবাদ আছে যে, লক্ষ্মণ সেন পুত্র কেশব সেন এই সব স্থান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তুর্কীর বিপক্ষে যুদ্ধদান করিয়াছিলেন। হরিমিশ্রের (১৫) কারিকায় আছে: "বল্লাল তনয় রাজা লক্ষ্মণ মহাশয়, জন্ম গ্রহ ভয়ে ও দোষে তাঁহার কলঙ্ক ঘটিয়াছিল। তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রের নাম কেশব, তিনি যবনের ভয়ে গৌড়রাজ্য পরিত্যাগ করায়, পুনরায় (রাঢ়ীয়) ব্রাহ্মণগণের মর্য্যাদা স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। পুনঃ এড়ু মিশ্র লিখিয়াছেন (১৬): রাজা কেশব সেন সৈন্যগণ, পিতামহ প্রতিষ্ঠিত বিপ্রগণ ও অপরাপর স্বজনবর্গ সঙ্গে লইয়া সেই রাজার নিকট গমন করিলেন। সেই বিখ্যাত নরপতি মহা আদর পূর্ব্বক কেশবের সম্মাননা করিলেন এবং তাঁহার ও অনুচর পারিষদবর্গের জীবিকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।" কিন্তু এই রাজা কে তাহার কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু এক আড়ম্বর ভাষাপূর্ণ তাম্রলিপি এদিলপুরে পাওয়া গিয়াছে (১৭)। ইহাতে কেশব সেন তান্দ্রাদেবী (পাঠান্তরে তাড়াদেবী) গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। লিপিতে তাঁহার বীরত্বের কাহিনী বর্ণিত আছে; তিনি "গর্গযবনান্বয়-প্রলয়-কালরুদ্রোনৃপ" ছিলেন (২১ শ্লোক)। ইহার অর্থ তিনি ঘোরী মুসলমানদের হারাইয়াছিলেন, হয়ত কোন খণ্ডযুদ্ধে তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। ইনি ধান্যশস্যক্ষেত্রযুক্ত ও উচ্চ অট্টালিকাপূর্ণ গ্রামসমূহ ব্রাহ্মণদের দান করিয়াছিলেন

১৪। গৌরহরি মিত্র: বীরভূমের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৭।

১৫—১৬। নগেন্দ্রবাবু: "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫২-১৫৩।

১৭। Inse Bengal: III. P. 123.—124.

২৪ শ্লোঃ)। তাঁহার যজ্ঞাগ্নির ধূম চারিদিকে এমন বিকীর্ণ হইত, যেন সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া যাইত (১৯ শ্লোঃ)। ফল্গুগ্রাম হইতে তিনি শ্রুতি পাঠক ঈশ্বর দেবশর্ম্মণকে দান করিতেছেন। ইহাতে লক্ষ্মণ সেনের অপর একপুত্র বিশ্বরূপ সেনের নামোল্লেখ আছে (১০ শ্লোঃ)। এই লিপিতে লক্ষ্মণ সেন জয়স্তম্ভের সহিত পুরী, কাশী, ত্রিবেণী-সঙ্গমে (প্রয়াগ) যজ্ঞস্তম্ভ (যূপ) স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে (১৩ শ্লোঃ)। এই লিপিতেই বাঙলার রাজনীতিক বিপর্য্যয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কারণ 'ঘোরীপুত্রদের শত্রু' বলিয়া কেশবসেন নিজে স্পর্দ্ধা করিয়াছেন। কেশবসেন বিক্রমপুর হইতে অনুশাসন প্রদান করিতেছেন না, ইহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। কিন্তু তিনি পুরাতন আমলাতান্ত্রিক ঠাট ও উপাধিসমূহ সমানভাবেই বজায় রাখিয়াছেন।

এই লিপির সহিত এড়ু মিশ্রের উক্তির সামঞ্জস্য নাই বলিয়া মনে হয়। কেশব সেন যদি আর কোন রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি নিজেকে "গৌড়েশ্বর" বলিয়া ব্রাহ্মণকে গ্রাম দান করিবেন কি প্রকারে? অন্যদিকে, এই লিপি দ্বারা লক্ষ্মণ সেনের দিকবিজয় কাহিনীর দাবীর সমর্থন পাইলাম। তিনি পুরী হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। এতদ্বারা তিনি গৌড়চক্রের স্বাভাবিক সীমানা পুনঃ স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেনরাষ্ট্র স্বভাবতই পালরাষ্ট্রের গতির অনুসরণ করিতেছিল।

লক্ষ্মণ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্ব সেনের মদনপাড়া-লিপি (১৮) ফল্গু গ্রাম পরিসর সমাবাসিত শ্রীমজ্জায় স্কন্ধাবার হইতে পরম সৌর অরিরাজ গৌড়েশ্বর শ্রীমৎ বিশ্বরূপ সেন দেবপাদ বিজয়ী মহাপুরোহিত মহাধর্ম্মধ্যক্ষ

১৮। Insc. of Bengal III. 135

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোত্তর প্রভৃতিদের জানাইতেছেন যে, পৌণ্ডবর্দ্ধনভূক্তির অন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুর অঞ্চলে পিঞ্জোকাটি গ্রাম আয় সমেত বিশ্বরূপ দেবশর্ম্মণকে শিবপুরাণোক্ত ভূমিদানের ফল লাভের জন্য দান করিতেছেন। এই দান তাঁহার রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসরে প্রদত্ত হয়। মহাসন্ধি-বিগ্রহিক কপি-বিষ্ণু ইহার দূতক ছিলেন। পুনঃ এই লিপিতে বিশ্বরূপ সেন নিজেকে "গর্গযবনান্বয়-প্রলয়-কাল-রুদ্রোনৃপ" (১৭ শ্লোঃ) বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়াছেন।

এই লিপিও ফল্গু গ্রাম হইতে প্রদত্ত হইযাছে এবং ইহাতেও পুরাতন গৌড়ীয় আমলাতান্ত্রিক ঠাট বজায় আছে। ইনিও ঘোরীপুত্রদের দমনকারী বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করিয়াছেন। এই লিপির তারিখ দেখিয়া নির্দ্ধারিত হয়, তাঁহার রাজ্য অনাক্রান্ত হইয়াই চলিতেছিল ।

বিশ্বরূপ সেনের যে লিপিখানা কলিকাতা সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত আছে। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত লিপির ভাষা ও উপাধিসমূহ প্রদত্ত হইয়াছে। এই অনুশাসন দ্বারা অভল্লিক পণ্ডিত হলায়ুধ শর্ম্মণকে বাৎসরিক আয় ৫০০ পুরাণ (৫৯-৬৮ শ্লোঃ) সমেত ৩৩৬½ উন্মানভূমি দান করা হইতেছে। ইহা চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে রাজমাতা কর্তৃক দান করা হইয়াছিল। দেউল হস্তী গ্রামে ৯০ উদান, আর ২৫ পরিমিত ভূমি যাহা পূর্ব্বে হলায়ুধ দান করিয়াছিলেন এবং পরে কুমার সূর্য্য সেন তাঁহার জন্ম-তিথি উপলক্ষে এই ভূমি তাহাকে দান করেন। পুনঃ সেই গ্রামের ৭ উদান ভূমি, আয় ২৫, যাহা হলায়ুধ ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা পরে সন্ধি-বিগ্রহিক নাঁই সিংহ কর্ত্তৃক তাহাকে প্রদত্ত হয়। পুনঃ ঘাঘর-কাট্টি পাটকে ১২¾ উদান—আয় ৫০ ভূমি, রাজ-পণ্ডিত মহেশ্বরের নিকট হইতে হলায়ুধ ক্রয় করিয়াছিলেন এবং পাটিলাদি বিকাতে ২৪ উদান ও ৫০ আয়ের ভূমি কুমার পুরুষোত্তম সেন রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসরে

উত্থান দ্বাদশী দিবসে দান করিয়াছিলেন। এই সকল ভূমি রাজকীয় "সদাশিব" নামক শিলমোহরযুক্ত করিয়া অনুশাসন দ্বারা দান-গ্রহীতাকে প্রদত্ত হয়। বোধ হয় পূর্ব্বেকার দানগুলি একটী কবালা (বিক্রয়ের দলিল) দ্বারা গ্রাহ্য করা হয়।

এই লিপি হইতে কতকগুলি বিশেষ সংবাদ সংগৃহীত হয়। ইহাতে রাজমাতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্বারা তাবাকাতি নাসিরিতে উল্লিখিত তুরস্কের হস্তে লক্ষ্মণ সেনের রাণীদের পতিত হওয়ার গল্প খণ্ডিত হয়। লক্ষ্মণ সেনের পুত্রগণের নাম ব্যতীত কুমার সূর্য্য সেন ও পুরুষোত্তম সেনের নামোল্লেখ দেখা যায়। আর দেখা যায়, যাগ-যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণদের দান প্রভৃতি অনুষ্ঠান যেন পূর্ব্বের স্থায়ই চলিয়াছে, যেন রাষ্ট্রে কোন বিপর্য্যয়ই উপস্থিত হয় নাই। এই লিপিতে পুরী, কাশী এবং প্রয়াগ (ত্রিবেণী) প্রভৃতি জায়গায় লক্ষ্মণ সেনের "সমর জয়স্তম্ভ মালা"র সহিত যজ্ঞযুপ স্থাপন করার কথার উল্লেখ আছে (১৪ শ্লোঃ)। এইস্থলে দ্রষ্টব্য যে, কেশব সেনের লিপিতে বিক্রমপুর 'বঙ্গে' অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে (৪৬-৫০ পং) এবং বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য পরিষদ লিপিতে "দক্ষিণে বঙ্গালবড়াভুঃ" উল্লেখ আছে।

লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর ১২৪৩ খৃঃ প্রদত্ত একটি লিপি চট্টগ্রাম হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা তথাকার রাজা দামোদর প্রদত্ত। (১৯) এই রাজবংশ চন্দ্রবংশীয় বলিয়া দাবী করেন (২ শ্লোঃ)। দামোদর "সকল ভূপতি চক্রবর্ত্তী" বলিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই বংশ বর্ম্মণ ও সেন বংশের স্থায় বৈষ্ণব ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

সেন পর যুগ

যখন খিলিজি তুরস্ক দল উত্তর-বাঙ্গলার কিয়দংশ এবং পশ্চিম-বাঙ্গলা ক্রমে ক্রমে আয়ত্তাধীন করিতেছিল, তখন পূর্ব্ববঙ্গে ইতিহাসের আর

এক অঙ্ক রচিত হইতেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষকালের পর সেন বংশের আর কোন সংবাদ আজ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। সেন বংশের পরিবর্ত্তে "দেব বংশ" তথায় উত্থান হয়। দশরথ দেবের একটি লিপিতে (২০) এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ রাজনৈতিক ও সামাজিক সংবাদ পাওয়া যায়। ইনি "মহারাজাধিরাজ অরিরাজ দনুজমাধব শ্রীদশরথ দেব" বলিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছেন। পুনঃ তিনি নিজেকে "সোমবংশ প্রদীপ, দেবান্বয় কমল বিকাশ ভাস্কর" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন (১-৫ শ্লোঃ)। এই লিপিটি বিক্রমপুর হইতে প্রদত্ত হয় (১-৩)। ইনি বলিতেছেন, ইনি নারায়ণের দয়ায় গৌড়রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন (১-৪)। এই লিপিতে যেসব ব্রাহ্মণকে ভূমি প্রদান করা হইয়াছে, তাহাদের নাম ও গাঁই উল্লিখিত আছে। এই শাসন দশরথ দেবের রাজ্যের তৃতীয় বৎসরে প্রদত্ত হয়।

এই লিপিদ্বারা মুসলমান ঐতিহাসিকদের দনৌজা বা নৌজা রায়ের এবং বাঙ্গলা কুলজীগ্রন্থের রাজা দনুজমাধব দেবের (২১) সন্ধান পাওয়া যায়।

মুসলমান ঐতিহাসিকেরা বলেন, ১২৮৩ খৃঃ যখন দিল্লীর সম্রাট বলবন গৌড়ের বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা তোগ্রলকে পরাজিত করিতে আসেন, সেই সময়ে স্থানীয় রায় তোগ্রলকে ধরাইয়া দিবে বলিয়া সম্রাটের সহিত এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। তারিখ-ই-মোবারকসাহী (২২) এই চুক্তির জন্য উভয়ের সাক্ষাৎকারের বর্ণনা প্রদান করিয়াছে।

১৯-২০। Insc. of Bengal, III. PP. 158-159; 181-182.

২১। Ellot; History of India. vol III. P. 116.

২২। Tarikhu Mubrakvtati transbled by Bosu.

রায় বলিয়া পাঠান যে, তিনি তোগ্রলকে ধরিয়া দিবেন, কিন্তু সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎকালে তিনি যেন তাঁহাকে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করেন। ওমরাহদের পরামর্শানুযায়ী সম্রাট একটি বাজপক্ষী হস্তে করিয়া বসিয়া থাকেন এবং রায় আসিলে সেই বাজপক্ষী ছাড়িয়া দিয়া ঊর্দ্ধ দিকে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। এতদ্বারা উঠিয়া দাঁড়ান এবং ভাল করিয়া পক্ষীর প্রতি নজর রাখা উভয় কাজটিই সম্পাদিত হয়।

এই সংবাদ হইতে এই তথ্য পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হয় যে, তিনি একজন স্বাধীন নরপতি ছিলেন। বাঙ্গলা পুঁথিসমূহে তাঁহাকে অত্যন্ত বড় করিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে। হরি মিশ্রের কারিকায় উক্ত হইয়াছে, তিনি সেনবংশের পর আবির্ভূত হন:

'প্রাদুরভবৎ ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরম্।
দনৌজা মাধবঃ সর্ব্বভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ ॥৪॥
("সম্বন্ধনির্ণয়ে" উদ্ধৃত, পৃঃ ৭১১)।

তিনি সেনবংশীয় ছিলেন না, ইহা তাম্রলিপির সংবাদের সহিত মিলে। আবার, এড়ু মিশ্রের কারিকায় উল্লিখিত আছে;

"...দনুজ মাধু যদা রাজা।
কামরূপ আদি কাশী পর্য্যন্ত যে প্রজা" ॥
("সম্বন্ধ নির্ণয়ে" উদ্ধৃত, পৃঃ ৭১৩)

পুনঃ কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণে নিজবংশ পরিচয়ে উল্লেখ দেখা যায়।

"পূর্ব্বেতে আছিল শ্রীদনুজ (বেদানুজ) মহারাজা।
তার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা ॥
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভোগে ভুঞ্জে তেহঁ সুখের সংসার" ॥ পৃঃ ৫৪

ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, এই স্থলে দনুজমাধবকে 'বেদানুজ' বলিয়া ভুল করা হইয়াছে। এই স্থলে বক্তব্য: ভবদেব ভট্ট-প্রশস্তি এবং দামোদরের লিপিতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের গাঁই-প্রথা বহু পূর্ব্বেই সংগঠিত হইয়াছিল। এতৎভিন্ন আমরা হরি মিশ্রে আরও সংবাদ পাই যে, পশ্চিমবঙ্গে তুর্কীশাসন প্রবর্ত্তিত হইলে অনেক ব্রাহ্মণ দামোদরের সভাতে গিয়া হাজির হন:

এতৎসভায়াং বহব আগতা ব্রাহ্মণা নরাঃ।
নানাগুণ-সমাযুক্তা দ্বাবিংশতি-কুলোদ্ভবাঃ ॥৫॥
("সম্বন্ধ নির্ণয়ে" উদ্ধৃত, পৃঃ ৭১১)।

এই লিপির পরে, দনুজমর্দ্দনদেব এবং মহেন্দ্র নামক দুইজন স্বাধীন রাজার টাকা বাঙ্গলার সর্ব্বত্র আবিষ্কৃত হইতেছে। কেহ দনুজমর্দ্দনদেবকে রাজা গণেশের সহিত সনাক্ত করিতে চান; কেহ পৃথক ব্যক্তি বলেন। ৺প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্র বসু মহাশয় এই দনুজমর্দ্দনদেবকে চন্দ্রদ্বীপের (বাখরগঞ্জ জেলা) কায়স্থরাজা দনুজমর্দ্দন দেবের সহিত একই ব্যক্তি বলেন (২৩)। অন্যপক্ষে, স্বাধীন রাজা গণেশের নামাঙ্কিত কোন মুদ্রা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। আবার তাহার জাতি লইয়াও বিতণ্ডা আছে। ইঁহাদের মধ্যে কে তীব্বতীয় পুস্তকানুযায়ী "জঙ্গল রাজা" ও "সগল রাজা" তাহাও নির্দ্ধারিত করিবার উপায় নাই। তবে, তীব্বতীয় ও বাঙ্গালার ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব-প্রভৃতির তুলনামূলক পাঠে এই সত্য নির্দ্ধারিত হয় যে, তুর্কী আধিপত্য যুগের মধ্যকালে, ভীরুতা অপবাদগ্রস্ত বাঙ্গলার হিন্দুরা নিজেদের স্বাধীনতার বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন, যাহা আর্য্যাবর্ত্তের সামরিক হিন্দুজাতিরা করিতে

২৩। নগেন্দ্র বসু: "রাজন্য কাণ্ড"

অক্ষম ছিল। নিখিল ভারতীয় ইতিহাসের পটভূমিকাতে ইহা এক বড় ঘটনা (২৪)।

সেনযুগের কৃষ্টি

শূর এবং বর্ম্মণ বংশের শাসন সময়ে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম যে -নূতনভাবে পুনঃ-স্থাপিত হয় তাহা আমরা পূর্ব্বোক্ত লিপিসমূহ পাঠে উপলব্ধি করিয়াছি। সেনযুগে তাহার পূর্ণতা লাভ করে। এই যুগে বহিরাগত ব্রাহ্মণদের বংশধরেরা বাঙ্গলায় নূতনভাবে ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হন। ভবদেবভট্ট ব্যতীত লক্ষ্মণসেন তাঁহার ধর্ম্মাধ্যক্ষ পণ্ডিত হলায়ুধ দ্বারা ব্রাহ্মণদের মধ্যে বৈদিক ধর্ম্ম ও সদাচার পুনঃস্থাপিত করিবার জন্য "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব", "পণ্ডিত সর্ব্বস্ব" প্রভৃতি লেখান। তিনি এই প্রকারে একশত "সর্ব্বস্ব" গ্রন্থ রচনা করেন (২৫)। তাঁহার ভ্রাতা পশুপতি বৌদ্ধ-তান্ত্রিক কদাচার হইতে লোকদের নিবৃত্তি করিবার জন্য "মৎস-সূক্ত" রচনা করেন। এতৎব্যতীত "শ্রাদ্ধাদিকৃত পদ্ধতি" এবং "পাকযজ্ঞ পদ্ধতি" রচনা করেন। আর এক ভ্রাতা ঈশান এতদুদ্দেশ্যে "দ্বিজাহ্নিক-পদ্ধতি" নামক পুস্তক লিখেন (২৬)। লক্ষ্মণসেনের সামন্ত শ্রীধরদাস "সদুক্তিকর্ণামৃত" পুস্তক লিখেন।

অন্যদিকে কবি জয়দেব "শ্রীগীত-গোবিন্দম্" লিখেন, ধোয়ী "পবনদূত" লিখেন। এই সব কবিতার পুস্তকদ্বারা প্রতীত হয়, নাগরিকেরা ভোগবিলাসে মগ্ন ছিল। মোগলযুগের প্রাপ্ত "সেখ-শুভোদয়া" পুস্তক যাহা হলায়ুধ দ্বারা লিখিত বলিয়া উক্ত আছে (সমালোচকেরা ইহা মিথ্যা বলেন) তাহা সত্য না হইলেও কিংবদন্তীর

২৪। জয়চন্দ্র নারং "ইতিহাস প্রবেশ" (হিন্দি) দ্রষ্টব্য।

২৫। প্রথমোক্ত ব্যতীত বাকিগুলি এখন পাওয়া যায় না। Kane: History of Dharmasastras. vol. I. দ্রষ্টব্য।

২৬। Kane. vol. 1.

উপর ভিত্তি স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর, তাহাতে রাজসভা ও সমাজের যে বর্ণনা আছে তাহা ধোয়ীর তথ্যেরই প্রতিধ্বনি করে। এই সব পুস্তক ব্যতীত মাঘের "শিশুপালবধম্" এবং শ্রীহর্ষের "নৈষধ চরিতম্" হিন্দুর পতন যুগের চিত্র প্রদান করে। ইহাতে ভোগবিলাস এবং আদিরসের চর্চ্চার কথাই আছে। মাঘবর্ণিত যাদব বীরেরা এবং বাঙ্গলার হৃতসর্ব্বস্ব রাজা কেশব সেনের বর্ণনাই তাহার সাক্ষ্য-প্রদান করে।

একদিকে ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামীর চূড়ান্ত হইতেছে, অন্য দিকে কামকলার চর্চ্চার উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। কেশবসেন "দুর্ব্বাতৃণজলসিক্ত করিয়া ধর্ম্মাত্মাদের সমাজে দান করিতে যেমন পটু ছিলেন" তেমন "মৃগনয়না রমণীগণের নীবিবন্ধ খুলিতেও মজবুত ছিলেন" (এদিলপুরলিপি. ১ম শ্লোঃ)। পুনঃ তাঁহার যজ্ঞের অগ্নি ক্রমাগত জগতে পরিব্যাপ্ত হইত, আকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইত (১৯ শ্লোঃ)।

পাললিপিসমূহে আমরা ব্রাহ্মণদের গ্রামদান করিতে পাঠ করি; কিন্তু সেনলিপিসমূহে কোন অব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মীয়কে দান দৃষ্ট হয় না। রাজা, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ লইয়াই রাষ্ট্র। পতিতেরা একবারে ধর্তব্যের মধ্যে নয়, কেবল ব্যবসায়ীদের প্রতিভূ "মহাগণস্থ" রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে স্থান পাইয়াছেন। পালদের মন্ত্রী হইতেন ব্রাহ্মণেরা; কিন্তু সেনদের লিপিতে মন্ত্রীর নাম পাই: নাগ, ঘোষ, দত্ত, ধর, বিষ্ণু, সিংহ। এই নামগুলি বর্ত্তমানের কায়স্থ ও নবশায়কজাতিদের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু সপ্তম শতাব্দী হইতে ভারতের সর্ব্ব খোদিত-লিপিতে রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে 'কায়স্থ' নামোল্লেখ হইতে দেখি। কুলুজীগ্রন্থসমূহে আরও নাম আছে, সেইগুলি কায়স্থ-বংশীয়। এইজন্যই এই নামগুলি কায়স্থজাতীয় হওয়া সম্ভব।

সেনদের লিপি পাঠে দৃষ্ট হয় যেন তাঁহারা বাঙ্গলার অতীত কৃষ্টি এবং সামাজিক পৈত্রিক স্বত্ব (Social heritage)অস্বীকার করিয়াই বাঙ্গলার

রাষ্ট্রে "বৈদিক যুগ" প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এতদ্বারা মনে হয়, গুপ্তযুগে এবং পরে, নব-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম যখন মস্তকোত্তোলন করে, সেই সময়ে কালিদাস ও ভবভূতি যে 'তপোবন' ও'বর্ণাশ্রম' আদর্শের প্রচার করিয়াছিলেন, সেন রাজারা বাঙ্গলায় তাহা সমূর্ত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিত। এইজন্য বাঙ্গলায় আজ পর্য্যন্ত আপামর ব্রাহ্মণ্য আদর্শে প্রভাবান্বিত। রাজাদের দাক্ষিণাত্যের উৎপত্তি এই গোড়ামীর সহায়ক হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র (২৭) বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছেন, বাঙ্গলায় দক্ষিণের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ এবং ব্রাহ্মণদের থর-কামানমস্তকে খোঁপার ন্যায় চুল রাখা প্রভৃতি দক্ষিণের আচার সেনদের দ্বারা বাঙ্গলায় প্রচলিত করা হয়।

সেন রাজারা চারিদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ব্রাহ্মণদের পোষণের জন্য গ্রাম দান করিয়াছেন। আর একটি ব্যবস্থা তাঁহারা স্থাপনা করিয়াছেন—কৌলিন্য প্রথা। চরিত্রগত উচ্চগুণ বংশগত করিবার জন্য বল্লালসেন "কৌলিন্য প্রথা" স্থাপন করেন বলিয়া কুলজীগ্রন্থসমূহ উল্লেখ করে। কুলজীগ্রন্থসমূহ মধ্যে উল্লেখ আছে শূর বংশের রাজত্বকালেই "গাঁই" ও "কুলবিধি" প্রবর্ত্তিত হয়, বল্লাল "অনাচার" নিবারণের জন্য নূতনভাবে কুলবিধি স্থাপন করেন। (২৮) কিন্তু খোদিত-লিপিতে এই বিষয়ে কোন সংবাদ নাই, যদিচ গাঁই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

কৌলিন্য-প্রথা পশ্চিমের হিন্দীভাষীদের মধ্যে এবং মিথিলার ব্রাহ্মণদের মধ্যে আছে এবং অত্যন্ত বাধাবাধি নিয়মও আছে। তজ্জন্য ইহা জাতির ক্ষতিই হয়, কোন উপকার হয় না। চরিত্রের উচ্চগুণ

২৭। R. L. Mitra. "The Indo- Aryans"

২৮। নগেন্দ্র বসু, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ; পৃঃ ১৩১-১৩৩।

বংশপরম্পরা করার চেষ্টা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। ইহা অস্বাভাবিক; Eugenics—বিজ্ঞানসম্মত নয়। বাঙ্গলায় ইহার ফলও বিষময় হইয়াছিল (ঈশ্বরচন্দ্র-বিদ্যাসাগর, "বহু বিবাহ" দ্রষ্টব্য)।

সেনযুগের শাসনসমূহ এবং কুলুজীগ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, এইযুগে বাঙ্গলার সামাজিক চক্র ঘুরিয়া গিয়াছে। লিয়ন ট্রটস্কী রুষ বিপ্লব বর্ণনাকালে বলিয়াছেন যে, বোলচেভিক বিপ্লব দ্বারা কেবল রঙ্গমঞ্চের চাকা ঘুরাইয়া দেওয়া হয়; পূর্ব্বদলের পরিবর্ত্তে কেবল একটি নূতন দল অভিনয় করিতে লাগিল। বাঙ্গলায়ও এই সময়ে তদ্রূপই হইতে দেখা যায়। সেনদের সময়েও সেই বাঙ্গলা, সেই জনসাধারণ, কিন্তু শাসকশ্রেণী নূতন দল দ্বারা সংগঠিত হয়। আজ যে পালযুগের সমস্ত স্মৃতি বিস্মৃত বা অজ্ঞাত, পালযুগের বাঙ্গলার কোন চিহ্ন সেনযুগ ও তৎপর যুগে ছিল না, তাহার এই কারণ অনুমান করা যাইতে পারে যে, শাসকশ্রেণীর মধ্যে একটা যেন মূল জাতিগত পরিবর্ত্তন (Racial change) ঘটিয়াছিল। এই প্রতিক্রিয়াশীল-বিপ্লব দ্বারা রাষ্ট্রে নূতনাদর্শ এবং সমাজে নূতন ব্যবস্থা প্রদান করা হয়।

কান্যকুব্জের কিংবদন্তী

খোদিত-লিপিসমূহ এবং কুলুজীগ্রন্থ সকল উপরোক্ত মন্তব্য সমর্থন করে। বাহির হইতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির লোকেরা আসিয়া বাঙ্গলায় বসবাস করিতে থাকে। শূরেরা দরদিস্তান হইতে, বর্ম্মণেরা পঞ্জাব বা কলিঙ্গ হইতে, সেনরা কর্ণাটক হইতে আসেন। অবশ্য তাঁহাদের সঙ্গে একটা কুল (clan) এবং সাঙ্গপাঙ্গ ছিল, যাহারা তাঁহাদের শাসন কায়েম রাখিতে সাহায্য করিত। তৎপর, কান্তকুব্জ হইতে কতিপয় কায়স্থ জাতীয় লোক আসিবার কথা কুলুজীগ্রন্থে বলে (এই জনশ্রুতি কান্তকুব্জ ও পশ্চিমেও আছে যে, তথা হইতে ব্রাহ্মণও

কায়স্থ বাঙ্গলায় যায়)। এইসব বহিরাগত লোকেরাই শাসকশ্রেণী সংগঠন করিয়াছিল।

প্রাচ্যবিদ্যার্ণব বসু বলেন, ১১শ শতকের ভবদেব-প্রশস্তি এবং উক্ত শতাব্দীতে নারায়ণ দ্বারা রচিত "ছন্দোগ-পরিশিষ্ট-প্রকাশ" আলোচনা করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যেমন বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ কনৌজ হইতে এদেশে আগমন করেন তাঁহাদের সুখে বসবাসের জন্য গৌড়পতি তেমন বহুসংখ্যক শাসন-গ্রাম দান করিয়াছিলেন (২৮ক)।" তাঁহার মতে ব্রাহ্মণদের "গাঁই" এই প্রকারে উদ্ভূত হয়, ইহার অর্থ গ্রামপতি (২৯)। তাঁহার মতে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন জন্য এই ব্যবস্থা হইয়াছিল (৩০)।

কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন ভারতের অন্ততঃ পাঁচ প্রদেশে প্রচলিত আছে। বাঙ্গলায় এই কিংবদন্তী হালের নয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মৈথিল পণ্ডিত দ্বিজবাচস্পতি যখন চন্দ্রদ্বীপরাজ দনুজমর্দ্দন দেবের বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের সমীকরণকল্পে সাহায্য করেন তখন তাঁহার "কুলরাম" পুস্তকে রাজা যোদ্ধবেশী কনৌজীয়া পঞ্চ ব্রাহ্মণদের স্বাগত করেন নাই বলিয়া তাঁহারা একটি শুষ্ক গজারী গাছ (মল্লকাষ্ঠ) পুনর্জীবিত করেন, ইহা লিখিত আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমাপ্ত "বল্লাল চরিত" গ্রন্থেও পঞ্চ-ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ-কায়স্থের কনৌজ হইতে আগমনের কথা আছে। শ্যামল বর্ম্মণের শকুন সত্রযজ্ঞে কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণের আগমনের কথা লিখিত পুঁথি এবং খোদিত-লিপিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কিংবদন্তী পুরাতন, ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৮ক। ঐ, পৃঃ ১৬।

২৯। ঐ ঐ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫-৬।

৩০। মুসলমান যুগেও বিজেতারা এই নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। খানকতক হিন্দু গ্রামের মধ্যে একটা "পাঠানপাড়া" স্থাপিত হয়।

ইহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। হয়ত ইহাই সত্য যে যশোবর্দ্ধণ কন্তী (৩১) বৌদ্ধদের হস্ত হইতে কান্যকুব্জ জয় করিয়া বৈদিক-ধর্ম্ম পুনঃ স্থাপন জন্য সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম প্রচারক প্রেরণ করেন, তাহাই বিভিন্ন প্রদেশে এই কিংবদন্তীর সৃষ্টি করিয়াছে।

সেনযুগের একটি জাজ্জ্বল্যমান কীর্ত্তি হইতেছে পরিভদ্রকুলের মহামহোপাধ্যায় জীমূতবাহনদ্বারা "দায়ভাগ" নামক আইন পুস্তক প্রণয়ন করা। এতদিন Inferiority complex দ্বারা অভিভূত হইয়া ইংরেজের পদানুসরণ করিয়া আমাদের আইনজ্ঞরা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, জীমূতবাহন মুসলমান আইনদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এই পুস্তক রচনা করেন। কিন্তু বর্ত্তমানের অনুসন্ধান সেই ভ্রান্তির নিরসন করিতেছে। ইহা বৈদিক প্রথা, কৌটিল্য, মনু, নারদ প্রভৃতির ধারা বহন করিতেছে। একাদশ শতাব্দীতে লিখিত বিজ্ঞানেশ্বরের "মীতাক্ষরা" আইন বাঙ্গলায় প্রচলিত হয় নাই। ইহারও কোন প্রমাণ নাই যে উত্তর-ভারতে বা সমগ্র ভারতে মধ্যযুগীয় যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা প্রসূত ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। মনুই বলবৎ ছিল।

মধ্যযুগের শেষের দিকে মৈথিল পণ্ডিত শ্রীকর যখন আইনের নূতন ব্যাখ্যা দিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের "পিতামহের ভূমি, উপাস্ত (corody) এবং দ্রব্য পিতাপুত্রের সমসাম্য" (২।১২২) মতের সমর্থন করেন তখন তাহা বাঙ্গলায় গৃহীত হয় নাই। বরং স্মৃতিকার উদ্দোত উক্ত শ্লোকের অন্য ব্যাখ্যা দিয়া "পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের পূর্ণ অধিকার" এই অভিমত প্রকাশ করেন। তৎপর জীতেন্দ্রিয় নামক একজন বাঙ্গালী লেখক "অপুত্রক ব্যক্তির সম্পত্তিতে তাহার বিধবা স্ত্রীর জীবনস্বত্ব" এই অভিমত প্রকাশ করেন। পুনঃ হলায়ুধ নামক এক পণ্ডিত (ইনি "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" রচয়িতা নন)

৩১। K. P. Jayaswal: Hindu polity দ্রষ্টব্য।

যিনি বাঙ্গালীও হইতে পারেন বা মৈথিলীও হইতে পারেন (৩২) তিনিও জীমূতবাহনের মতের পরিপোষক। ইঁহারা সকলেই জীমূতবাহনের অগ্রবর্ত্তী লোক। এতদ্বারা আজকাল প্রতীত হইতেছে জীমূতবাহন প্রচলিত বাঙ্গালী আইন-প্রথা লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মত হইতেছে, পুত্রাভাবে ভাগিনেয় বা দৌহিত্রকে বিষয়াধিকারী সাব্যস্ত করা। সমালোচকেরা বলেন, "যে পিণ্ড দেবে, সেই বিষয় পাবে" এই অভিমত তিনি সৃজন করিয়া মেয়ের দিকের আত্মীয়দের (cognates) বিষয়াধিকার দিয়াছেন। কিন্তু ৮-৯ শতাব্দীতে শ্রীকর এবং মেধাতিথিও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বিভিন্নদেশের তুলনামূলক আইনেব অভিব্যক্তি পাঠ করিলে ইহা প্রতীত হইবে,, যখন একটি মানবসমাজ তাহাব কৌমাবস্থায় (Tribal-stage) থাকে, তখন সম্পত্তি সগোত্রীয়দের (Agnates) মধ্যে অর্শায় কিন্তু যখন সেই সমাজ কৌমাবস্থা ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন কৌম মিশিয়া একটি "নেশন" হয়, তখন তাহা Agnates এবং cognatesদের বিষয়াধিকার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করে। রোমের Justinian code হইতে বর্ত্তমানের আমেরিকার আইন পর্য্যন্ত এই সাক্ষ্য প্রদান করে।

মীতাক্ষরা সগোত্রমধ্যে বিষয় আবদ্ধ রাখে, চৌদ্দপুরুষের মধ্যে কোন ওয়ারিশান না থাকিলে ভিন্ন গোত্রে তাহা অর্শায়। এইজন্য মীতাক্ষরা আইন কেবল agnatic ব্যবস্থা প্রদান করে। আইনের দিক দিয়া ইহা এখনও কৌমাবস্থায় আছে। দ্বিতীয়তঃ, যাজ্ঞবল্ক্যের উপর মীতাক্ষরা স্থাপিত; তাহার উপরোক্ত শ্লোকের উপর ভিত্তি করিয়া মীতাক্ষরা "বংশগত সম্পত্তিতে যৌথ অধিকার (Joint-ownership) ব্যবস্থা প্রবর্ত্ত

৩২। Kane : History of Dharmasastras, vol, I and III দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে। কিন্তু ইহা বেদ, মনু, বৌধায়ন, নারদ প্রভৃতির বিরুদ্ধ। ইহা আর্য্য আইন অনুযায়ী নয়। লেখকের মতে ইহা সম্ভবত বিদেশীয় জাতিদের কাছ হইতে গ্রহণ করা হয়। যেসব বিদেশীয়েরা ভারত মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং সম্পূর্ণভাবে বর্ণাশ্রমী "হিন্দু" হয়, তাহাদের কৌমগত প্রথা অর্থাৎ জন্মগত অধিকার (Right by birth) পদ্ধতিই যাজ্ঞবল্ক্য এবং বিষ্ণু মধ্যযুগে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়। বিদেশীয় রীতি যে হিন্দু আইনে ঢুকিয়াছে ইহা আজকাল কেহ কেহ বলিতেছেন (৩৩)।

দায়ভাগ আর্য্য প্রথার বাহক। ইহা আজকাল স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা মনু ও নারদের ধারা বহন করিতেছে (৩৪)। ইহাতে মুসলমান প্রভাব নাই কিন্তু বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, ভারতের মধ্যে একমাত্র জীমূতবাহন কেন agnates এবং cognates মিলাইয়া দায়াধিকার স্থির করিলেন? তুলনামূলক পাঠের ফল আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভারতের মধ্যে বাঙ্গলাই প্রথম নেশন রূপে বিবর্ত্তিত হয়। বাঙ্গলায় কৌমাবস্থার কোন নিদর্শন আমরা মৌর্য্যযুগের পর পাই না। বাঙ্গলায় বর্ণভেদ আছে, বিবাহকালে জনপদ-গত ভেদ আছে। কিন্তু Tribal বা clan-প্রথা বহুদিন অন্তর্হিত হইয়াছে। বাঙ্গালীরা একটি নেশন, কাজেই এক আইন সকলকার, পিতৃ গোত্র এবং কন্যাগোত্র এক দায়াধিকারের অধীন।

ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দীতে বুর্জোয়া-ডেমোক্র্যাটিক বিবর্ত্তন সম্মত পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের যে অধিকার অভিব্যক্ত করিয়াছে, একাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলা তাহা বিবর্ত্তিত করে। এইজন্য দায়ভাগের দায়াধিকার

৩৩। Naresh Sengupta : Sources of Law and Society in ancient India" 1913,

৩৪। Mayne and Iyengar : Hindu Law দ্রষ্টব্য।

দখে বর্ত্তমান ইউরোপের সাদৃশ্য লক্ষিত হয় (৩৫)। অন্য দিকে, মীতাক্ষরা আইন জার্ম্মাণীর মধ্যযুগীয় আইন, যাহা right by birth গ্রাহ্য করিত তাহার সহিত মিল আছে।

বাঙ্গলার "দায়ভাগ" প্রদত্ত দায়াধিকার বুর্জ্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক আইন। এতদ্বারা অনুমিত হয় বাঙ্গলায় সামন্ততন্ত্র তখন ধ্বংস হইয়াছিল। জীমূত-বাহনের "দায়রত্ন" (দায়ভাগ ইহার একটি অংশ) বিশেষভাবে উদ্ঘাটিত হইলে এবং ইহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিলে বাঙ্গলার অতীত ইতিহাসের একটি অধ্যায় আবিষ্কৃত হইবে। বর্ত্তমান কানে মহোদয় জীমূতবাহনের তারিখ একাদশ শতাব্দী বলেন। শ্রীপঞ্চানন ঘোষ মহোদয় বলেন ১০১৪ শক অর্থাৎ ১০৯২ খৃঃ জীমূতবাহন জীবিত ছিলেন (জীমূতের "কালবিবেক" দ্রষ্টব্য (৩৬)। এড্‌মিশ্রের কারিকায় জীমূতবাহনকে রাজা বিষক্সেনের আইনমন্ত্রী বলা হইয়াছে। ইহা বিজয়সেনের অন্য নাম বলা হয়। জীমূতবাহনের সঠিক তারিখ যাহাই হউক না কেন, ইহা নব-ব্রাহ্মণ্যবাদের স্থাপনা এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীয় রাষ্ট্রগঠনের যুগে লিখিত হইয়াছিল। ভারতের কৃষ্টির মধ্যে ইহা বাঙ্গলার একটি অপূর্ব্ব দান। জীমূতবাহন, কাশীর আইনপুস্তক মিত্রমিশ্রের "বীর-মিত্রোদয়" (ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত) এবং বঙ্গের "ব্যবহার ময়ূখ" নামক আইন পুস্তককে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। উপস্থিত জীমূতবাহনের দায়াধিকার ব্যবস্থা (Hindu code Bill) দ্বারা সর্ব্ব-ভারতীয় করার প্রচেষ্টা হইতেছে।

৩৫। P. N Sen : Tagore Law Lecture দ্রষ্টব্য।

৩৬। Panchanan Ghose : "Jimutavahana" in Calcutta Law Journal. vol 26. Dec 16. 1917.

তুরস্ক আক্রমণ

অকস্মাৎ নোদিয়ায় একটা বৈদেশিক অভিযান হইল এবং দিক-বিজয়ী রাজা লক্ষ্মণ সেন তথা হইতে পলায়ন করিলেন এই কথা হরি মিশ্রের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত আলোচিত হইতেছে। কিন্তু আসল তথ্য আজ পর্য্যন্ত উদ্‌ঘাটিত হইল না। এই বাদানুবাদ বিষয়েও শ্রেণী-স্বার্থ দৃষ্ট হয়। মিনহাজ লিখিয়াছেন, দৈবজ্ঞ বা গণক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আসিয়া রাজাকে ভয় দেখায় যে, শাস্ত্রে লিখিত আছে এক অজানুলম্বিত-বাহু শ্বেতবর্ণের তুরস্ক আসিয়া বঙ্গ জয় করিবে। (এই প্রকারের কথা আরব দ্বারা সিন্ধু আক্রমণের সময়ে একদল ব্রাহ্মণ প্রচার করিতেন—"চাচনামা" দ্রষ্টব্য)। রাজা মগধে লোক পাঠাইলেন, অনুসন্ধান করিতে; তাহারা আসিয়া বলিল, ইহা সত্য কথা. এই তুরস্কটি ঐপ্রকার আকৃতির লোক। সাহু এবং ধনীরা পূর্ব্ববঙ্গ ও কলিঙ্গে পালাইতে লাগিল।

কাশ্মীর হইতে ভিক্ষু শাক্যশ্রীভদ্র মগধে আসিয়া ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা বিনষ্ট এবং তুরস্কের ধ্বংসলীলা দেখিয়া ভয়ে বাঙ্গলার জগদ্দল বিহারে পলাইলেন। (৩৭)বক্তিয়ার-পুত্রের মগধ লুণ্ঠন রাজসভায় অজ্ঞাত ছিল না। রাজা বৃদ্ধ হইলেও আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য রাষ্ট্রের অন্যান্য অধিনায়কেরা কেন কোন প্রচেষ্টা করেন নাই এই স্থলে ইহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য।

পূর্ব্বে, মুসলমান ঐতিহাসিকদের স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের পূর্ব্বের স্বদেশপ্রেমিক হিন্দু লেখকেরা, একদল ব্রাহ্মণ ও দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল তাহা ছন্দে বন্দে স্বীকার করিতেন ("বঙ্গাধীপ পরাজয়" "মৃণালিনী", দ্রষ্টব্য)। রাজসভার একদল

৩৭। S. C. Das.—Antiquity of Chittagong in I. A. S. B. 1898. P. 205; Taranatha, Geschichte, P P 254-255.

লোক যে রাজাকে শাস্ত্রের নামে (সংস্কৃত ভাষার কোন পুস্তক লিখিত হইলেই বিশ্বাসী হিন্দুর কাছে তাহা শাস্ত্র হয়) তুরস্ক দ্বারা বঙ্গ বিজয় অবশ্যম্ভাবী তাহা অতিবৃদ্ধ রাজাকে বুঝাইতেছিলেন। ধনীরা পলাইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ রাজা সাহস দেখাইয়া নোদিয়াতে রহিলেন; কিন্তু তত্রাচ আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই কেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত "বাঙ্গলার ইতিহাস" গ্রন্থে মুসলমানদের প্রণীত বিভিন্ন পুস্তকের বিবৃতি তুলনামূলকভাবে আলোচিত হইয়াছে। বৃদ্ধ রাজাকে সওদাগরী দ্রব্যসমূহ দেখাইবার ছলে বাহিরে আমন্ত্রণ করিয়া বক্তিয়ার-পুত্রের ইঙ্গিতে তুরস্করা তাঁহার উপর আক্রমণ চালায়; কিন্তু বাজরক্ষীরা তাহা প্রতিহত করে এবং কয়েকজন তুরস্ককেও নিহত করে। শেষে রক্ষীরা রাজাকে অকুস্থল হইতে সরাইয়া লইয়া যায়। তিনি পূর্ববঙ্গে পলাইয়া গিয়া আরও কতিপয় বৎসর জীবিত ছিলেন এবং যাগ-যজ্ঞ করিয়া গ্রহশান্তি করিতেছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের গ্রাম দান করিতেছিলেন। ইহাই নানা বিতর্কের শেষ সিদ্ধান্ত। তত্রাচ আমাদের প্রশ্নের উত্তর ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বীর শরীর-রক্ষীরা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া রাজাকে বাঁচাইয়াছিল। এই তথ্য এতদিন পরে উদ্‌ঘাটিত হইল আর এই আক্রমণ সত্ত্বেও রাজা পলাইতে সক্ষম হইলেন। ফরাসী বিপ্লবের প্রাকালে রাজার সুইস্ গার্ডদল উন্মত্ত নাগরিকদের দ্বারা নৃশংসভাবে নিহত হইলে ফরাসী ইতিহাস তাহা জাজ্বল্যভাবে স্বীকার করিয়াছে, এবং নিহতদের দেশে (জুরিখনগর) তাহাদের স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপিত করা হইয়াছে। কিন্তু এই অজ্ঞাত বাঙ্গালী গার্ডদের কোন উল্লেখ এতদিন কোন বাঙ্গালী ইতিহাস করে নাই।

কিন্তু আমাদের এই নূতন উদঘাটিত সংবাদ বিষয়ে একটু খট্‌কা

থাকিয়া যাইতেছে। পূর্ব্ব-ভারতের অধীশ্বর কেন তুরুক অশ্বারোহীদের সওয়ার দ্রব্য দেখিতে এবং মান্যসূচক খেলোয়াৎ গ্রহণ করিতে অসময়ে (বৈকালে) প্রাসাদের বাহিরে যাইবেন? বিশেষতঃ যখন রাজা জানিতেন মগধে তাঁহারই রাজ্য মধ্যে তুরুকেরা লুটতরাজ করিতেছে, হত্যা ও ধ্বংসের লীলা চালাইতেছে। প্রকাশ্য রাজসভাই এইসব বিষয়ের উপযুক্ত স্থান। এই সব কারণ বশতঃ আমাদের সন্দেহ হয় রাজসভাতে "প্রাসাদ বিপ্লব" (Palace Revolution) করিয়া বৃদ্ধ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার একটি ঘোর ষড়যন্ত্র ছিল। তাহাতে তুরুকের সহিত বৌদ্ধ ভিক্ষু, দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্যেরাও বিজড়িত ছিল বলিয়া আমাদের ধারণা। ইহারাই "পঞ্চম বাহিনী" গঠন করিয়াছিল। তারানাথ ও মিনহাজের পুস্তকসমূহ একত্র করিয়া পাঠ করিলেই এই ধারণার উদ্ভব হয়। কিন্তু বর্ত্তমান ঐতিহাসিকেরা শ্রেণী-জ্ঞান এবং সাম্প্রদায়িক-জ্ঞান (যাহা শ্রেণী-জ্ঞানের রূপান্তর) প্রণোদিত হইয়া স্বদেশের প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা চাপিয়া যাইতেছেন। পূর্ণ সত্য তথ্য মিনহাজ হয় জানিতেন না, বা জানিলেও জানান নাই। তিনি কেবল স্বধর্ম্মীয়দের বীরত্বের বড়াইয়ের বর্ণনাই করিয়াছেন। আমরা কিন্তু তুরুকের বীরত্বের কোন প্রমাণ ইহাতে দেখি না। ভারতের ইতিহাসে ষড়যন্ত্র দ্বারা প্রাসাদ-বিপ্লব অথবা coup d'etat দ্বারা বড় বড় রাজ্য (রাজ-তরঙ্গিনী দ্রষ্টব্য) ও সাম্রাজ্যের (নন্দ সাম্রাজ্য ও মৌর্য্য-সাম্রাজ্য) বিপর্য্যয়ের সংবাদ পাওয়া যায়।

মগধ ও নোদিয়ার এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া ইংরেজ ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ যথার্থ কথাই বলিয়াছেন, এই দুই দেশের গভর্ণমেণ্ট এত অক্ষম ছিল যে এক স্রোতে তাহা ভাসিয়া যায়। তাহারা ধ্বংস হইবারই উপযুক্ত।

আমাদের ভারতীয় ইতিহাস পাঠে এই জ্ঞান হয় যে, কেন্দ্রের শাসন শক্তিশালী না থাকিলে ভারতীয় ইতিহাসের চিরন্তন মাৎস্য-ন্যায় গতি অনুযায়ী সীমানা বিদ্রোহ করে। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষকালে তাহা সমুপস্থিত হইয়াছিল। তৎপর বৃদ্ধ রাজা বৈষ্ণবপদাবলীর রসে নিমগ্ন, হয়ত অন্য লোক সিংহাসনের উপর লোলুপ দৃষ্টিতে ছিল। ইহারাই ষড়যন্ত্র করিয়া রাজ্যকে বিকল করিয়া দিয়া বিদেশী তুরস্কের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল। তৎপর, অসন্তুষ্ট অন্য ধর্ম্মীয় লোকেরাও যে ইহার মধ্যে লিপ্ত ছিল না কে বলিল? মগধের একদল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বক্তিয়ারপুত্রের সহিত মিলিয়া মগধ, বাঙ্গলার একদল লোকদের সহিত তাহার যোগ স্থাপন করার অর্থই এই।

কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, পাঞ্জাব হইতে পশ্চিম-বাঙ্গলা পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তের বিশাল ভূমি তুরস্ক আক্রমণের এক ঝটিকাতেই পড়িয়া গিয়াছিল কেন? জনসাধারণ বিধর্ম্মী এবং বিদেশী শাসন কেন প্রতিরোধ করে নাই। আমরা বলিব, বহু কালের যথেচ্ছাচারী শাসন, লোকের মধ্যে স্বায়ত্ত-শাসনের অভাব, শ্রেণীগত রাষ্ট্রে গণ-সমূহের সহিত শাসকশ্রেণীয় অভিজাতদের সংযোগের অভাব এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মক্ষেত্রে গুরু ও অলৌকিকত্বে বিশ্বাস—এই সমস্তের সমবায়ে জনসাধারণকে নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বীর্য্য করিয়াছিল। জাতীয় স্পর্দ্ধার উদয় হওয়া অসম্ভব ছিল।

মগধ ও বাঙ্গলায় যাহা ঘটিয়াছিল, এই প্রকারের ঐতিহাসিক প্রহসন ইউরোপে অজ্ঞাত নাই। মধ্যযুগে সুইডেন হইতে ভারাঙ্গীয়েরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে রুষদেশে গিয়া অস্ত্র সাহায্যে অধিকার স্থাপন করিয়াছিল। মগধ ও বাঙ্গলার ঘটনার সহিত ফ্রান্সের নর্ম্মান আক্রমণের সৌসাদৃশ্য আছে। জার্ম্মান জাতীয় ফ্রাঙ্কদের দ্বারা

প্রতিষ্ঠিত বিরাট সাম্রাজ্য নবম শতাব্দীতে এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল যে, মুষ্টিমেয় নর্ম্মানরা ক্রমাগত ফ্রান্সের উত্তরভাগ লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত, কেহ তাহাদের প্রতিরোধ করিতে পারিতনা। ৮৬৫ খৃঃ মাত্র ২০০শত নর্ম্মান আসিয়া প্যারিস নগরের মন্ত-ভাণ্ডার দিনমানে লুটিয়া লইয়া যায়, অথচ নাগরিকেরা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া থাকে। অবশেষে, উত্তর-ফ্রান্সের একাংশ অধিকার করিয়া তাহারা বসবাস করে। ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহা লইয়া আধুনিক ঐতিহাসিকেরা খুব মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ইংরেজ ঐতিহাসিক হালাম বলিতেছেন,—(৩৮)

"The cowardice of the French during the Norman incursions of the ninth century, has struck both ancient and modern writers, considering that the invaders were by no means numerous, and not better armed than the inhabitants··· No-one, says Paschasins Rodbert, could have anticipated that a kingdom so powerful, extensive and populous, would have been ravaged by a handful of barbarians. Never was France in so deplorable a condition as under Charles the Bald. Almost all his capitularies are ecclessiastical. The clergy were now at their zenith.···the church took the ascendent in the national councils.* And this contributed to render the nation less warlike, by depriving it of its natural leaders. It might be added, according to Sismondi, very probable suggestion that the faith in relics, encouraged by the church, lowered the spirit."

৩৮। H. Hallam—"View of the state of Europe during the Middle Ages," vol 1. pp. 134-135.

মগধ ও গৌড়ের অবস্থার সহিত এই বর্ণনার কি সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে! একেইত শুভ ফল প্রাপ্তির জন্য ভিক্ষুদের অস্থিপূজা, মহাযানী ও তীর্থিক তান্ত্রিক, বৌদ্ধ সিদ্ধদের ও তাহাদের ডাকিনীদের অলৌকিক ক্রিয়া, ভুতুড়ে গল্প, আলকেমির তুকতাক দ্বারা মনকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার উপর আবার সেন রাজসভায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের স্থান হইল। সেনযুগে ব্রাহ্মণপুরোহিততন্ত্রের একাধিপত্য ছিল। সেনরাষ্ট্র আজকাল-কার ভাষায় ব্রাহ্মণ্যবাদীয় Totalitarian State ছিল। এই ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল বর্ণাশ্রম ও উহার আনুষঙ্গিক পুরোহিত-তন্ত্রকে পোষণ করা আর রাজার কর্ত্তব্য ছিল, "সর্ব্ব বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাপন প্রবৃত্ত" (হর্ষবর্দ্ধনের সোনপাত লিপি দ্রষ্টব্য) (৩৯) হওয়া। উপরোক্ত সকল অনুষ্ঠান দ্বারা একেইতো অজ্ঞতাজনিত পঙ্গু মন সৃষ্ট হইয়া মস্তিষ্ক বিকল হইয়াছিল। তৎপর ব্রাহ্মণ্য শাসন ও শোষণ দ্বারা সমাজদেহও পক্ষপাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল; কাজেই বিদেশীকে রুখিবে কে? হিন্দুর পরাজয়ের কারণ এক কথায় বলা যায়—মানসিক অজ্ঞতা। এই যুগের অবস্থার বিষয় উর্দ্দু কবি হালি যথার্থই বলিয়াছেন: "ইধর হিন্দমে থা হর তরফ অন্ধেরা, গিয়ানীকা গুন থা লড্ডামে ডেবা '(মুসদ্দস)। রাগ করিলে চলিবে কেন? ইহাই সত্য ঘটনা।

সেন যুগের অর্থনীতি

পালযুগের ন্যায় সেনযুগের লিপিতে সামন্ততান্ত্রিক পর্য্যায়ের বহর দেখা যায় না। যদিচ, বর্ম্মণ-লিপিতে 'ভৌগিক,' সেন লিপিতে 'মহাভোগিক', 'মাণ্ডলিক', 'মহামাণ্ডলিক', 'বিষয়পতির' উল্লেখ দেখা যায়, তত্রাচ এই সব পদের বাহুল্যাভাব। বোধ হয়, সন্ধ্যাকর নন্দী বর্ণিত পুরাতন

৩৯। C. I. I. vol III. no 52, p 232.

সামন্তশ্রেণীর কাঠাম রাষ্ট্রের ভাগ্যবিপর্য্যয় দ্বারা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অথবা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্যদিকে কর্ম্মচারীদের তালিকার সংখ্যাও কম। পালযুগের ক্ষুদ্র মাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষের লিপিতে ৩৪—৩৬ পদাভিষিক্ত লোকের নাম আছে; অন্য পক্ষে বিজয়সেনের বারাকপুর-লিপিতে ২৯টি নাম এবং লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া-লিপিতে ২৮টি নামের উল্লেখ আছে। বোধহয় ঘোরতর রাষ্ট্র আবর্ত্তনদ্বারা অর্থনীতিক্ষেত্রে একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। নূতন শাসকশ্রেণী পুরাতনকে নিশ্চয়ই ধ্বংস করিয়াছিল; কারণ সন্ধ্যাকর নন্দী উক্ত সামন্তরাজ্যের নাম যথা: অটবী, অপার মান্দার, তৈলকুপী প্রভৃতি নাম আর কোথাও উল্লিখিত হয় নাই।

ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাঙ্গলা বরাবর কৃষি-প্রধান। এইজন্য কৃষি অর্থনীতিই প্রাধান্য লাভ করে। রাজগণকে কর্ষণোপযোগী ভূমিই ক্রমাগত দান করিতে দেখা যায়। এই দান বিভিন্ন পরিমাপক নলের দ্বারা মাপ করা হইত। দানকালে কর্ষণোপযোগী ভূমি, তৃণ. পুতিতৃণ আম্র, পনস, গুবাক, নারিকেল, লবণ প্রভৃতি আয়ের দ্রব্য বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, চাষের ভূমি ব্যতীত ফল ও সুপারী, নারিকেল প্রভৃতি ব্যবসায়ের সামগ্রী ছিল। অন্যপক্ষে গুপ্তযুগের ন্যায় শ্রেষ্ঠীদের নাম খোদিত-লিপিসমূহে উল্লিখিত হইতে দেখা যায় না। কিন্তু 'মহাগণস্থ' ও বরেন্দ্রের 'শিল্পিগোষ্ঠীর' সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমোক্ত শব্দে গ্রাম অথবা নগর-সভার প্রধান ব্যক্তি বলিয়াই অনুমিত হয় (৪০)। পাণিনি 'গণ' ও 'সংঘ' শব্দে 'সমূহ' (collection) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন (৩।৩, ৮৬)।

এতদ্বারা গ্রামে বা নগরের কোন প্রকারের সংঘবদ্ধ সভা বা সমিতি ছিল

৪০। Ins. of Bengal III. Appendix

বলিয়া অনুমিত হইতে পারে, 'মহাগণস্থ' হইতেছেন তাহার প্রতিনিধি। অন্যান্য প্রদেশের খোদিতলিপিসমূহের সহিত বাঙ্গলার পাল ও সেনযুগের লিপির তুলনামূলক পাঠ করিলে এই তথ্য চোখে পড়িবে যে, আমলা-তান্ত্রিক তালিকা বাঙ্গলায় অতি বড়। ইহাতে অনুমিত হয়, রাজ-পাদোপজীবীর দল, অর্থাৎ সরকারী চাকুরিয়ার দল বাঙ্গলায় খুব বেশী ছিল। আর ইহারা যে নগদ মাহিনাপ্রাপ্ত একটা "সিভিল সার্ভিস" গঠন করিয়াছিল তাহারও কোন প্রমাণ নাই। মৌর্য্য যুগের পর, মনু মাহিয়ানাস্বরূপ গ্রাম দানের কথা বলিয়াছেন। এইজন্য অনুমান করিতে হয়, এই বিরাট আমলাতন্ত্র রাজসরকারে চাকুরীর পারিশ্রমিকের স্বরূপে ভূমি ভোগ করিয়া জমির ভোগাধিকার,ধাপেধাপে নাবিয়া যাওয়ার (sub-feudation) গতিবৃদ্ধি করিয়াছিল। বর্ত্তমান বাঙ্গলার ভূমি ধাপে ধাপে নামিয়া যাওয়ার স্তর পশ্চিমে অন্ততঃ বারটি. পূর্ব্বে অন্ততঃ উনিশটি। ভূমির এই প্রকারের ভোগাধিকার একদিনে গঠিত হয় নাই; অতীতে নিশ্চিত ইহার মূল নিহিত আছে। এই অর্থ-নীতি ব্যবস্থাই বাঙ্গলার মধ্যবিত্তশ্রেণী ও ভূমিতে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীসমূহের উদ্ভবের জন্য দায়ী। পুনঃ, পালযুগের ন্যায় ভূমিতে রাজার মালিকানা স্বত্ব দৃষ্ট হয়।

লিপিসমূহ পাঠ দ্বারা নির্দ্ধারণ করা যায়, রাজবংশ. রাজন্য, রাণক ও ঠক্কুর (৪১) উপাধিধারী (বিশ্বরূপের সাহিত্যপরিষদলিপি) উচ্চকর্ম্মচারী, বড় ভূস্বামী লইয়া অভিজাত অথবা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী। তৎপর, মাঝারি রকমের ভূস্বামীব্য বসায়ী-সংঘের (গণ-সমূহ) মহাগণস্থ এবং শিল্প-সংঘের নেতাদের লইয়া (রাণকচুড়ামণি) উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী; ইহার নিম্নে আম্র, শংখ, নারিকেল, লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী

৪১। বল্লালচরিতে লিখিত আছে, বল্লাল সেন তাঁহার নাপিতকে "ঠক্কুর" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন ইহাতে সভাসদেরা চটিয়াছিলেন।

ও ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী (রাজপাদোপজীবী ও রাজসেবক) এবং ক্ষেত্রকরদের লইয়া নিম্ন-মধ্যবিত্তশ্রেণী গঠিত হইয়াছিল। সর্ব্বনিম্নে কর্ষক (পালবংশের কমৌলি-লিপি), ও কায়িক শ্রমজীবী শ্রেণী গঠিত হয়। ভবদেব ভট্টের পুষ্করিণী খনন কার্য্যে ও সকল লিপিতে রাজা দ্বারা দানকালে গ্রামকে বেগার খাটা হইতে রেহাই দেওয়ার সর্ত্তের সংবাদে, কায়িক শ্রমিক শ্রেণীর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

এই সকল শ্রেণীর মধ্যে আরও কয়েকপ্রকার সামাজিক জীবের সন্ধান পাওয়া যায়। ভবদেবভট্ট তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে দেবদাসী নর্ত্তকী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তৎপর ব্রাহ্মণ পুরোহিত, বৌদ্ধ বিহারের উল্লেখে ভিক্ষু প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু ইহারা অর্থনৈতিক শ্রেণী সংঘটিত করে নাই।

একাদশ অধ্যায়

প্রাক্-মোগল যুগ

তুরস্কের দ্বারা উত্তর-ভারত জয় ভারতের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ঘটনা। ইহা পূর্ব্বেকার যবন, শক, হূণ প্রভৃতির আক্রমণের ন্যায় নয়। তাহারা ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতীয় কৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছিল এবং ভারতীয় জাতিদের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই বারের বৈদেশিকদের অভিযান অন্য প্রকারের। ইহারা ব্যক্তিগত বা জাতিগতভাবে যতই বর্ব্বর হউক না কেন, ইহাদের পশ্চাতে ছিল

আরব খেলাফতের কৃষ্টির দান। এইজন্য, এই নব-বিজেতারা সর্ব্ব-বিষয়ে ভারতীয়-কৃষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বী একটা সংস্কৃতি আনয়ন করিয়াছিল। তৎপর তুরস্ক-মুসলমানেরা এই দেশের সর্ব্বত্রই সহানুভূতিশীল লোক পাইয়াছিল, যাহারা ব্রাহ্মণ্যবাদীয় শাসন পর্য্যুদস্ত হইতে দেখিতে চাহিত। আমরা তাহাদের আজ "দেশদ্রোহী" বা "বিভীষণের দল" বলিতে পারি কিন্তু কেন এই অনুষ্ঠান সংঘটিত হইল তাহার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বিন কাসেমের কাছে জাঠ ও মেডেরা যে মনোবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছিল (১) তাহার বহু শতাব্দী পরে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক বাঙ্গলা কবিতাতে আমরা তাহারই প্রতিধ্বনি পাই। দেশের একদল লোক শাসকশ্রেণীর দ্বারা প্রপীড়িত হইতেছিল—ইহাই ছিল মূলকথা। বর্ণাশ্রম সমাজ-পদ্ধতি তাহাদের নিপীড়ন করিতেছিল; কাজেই এই যন্ত্রকে যাহারা পর্য্যুদস্ত করিতে পারে তাহাদের কাছেই পতিত ও নির্য্যাতিতেরা দৌড়িয়াছিল! (২) তাহারা বর্ণাশ্রম পদ্ধতিকে নিজেদের অনুকূল বা নিজেদের জিনিষ মনে করে নাই; কাজেই তাহার জন্য প্রাণত্যাগ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এইজন্যই এই বৈদেশিকদের দ্বারা উত্তর-ভারত বিজয় অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছিল। লেন-পুল বলিয়াছেন, ইহা দুইটা বিভিন্ন পদ্ধতির দ্বন্দ্ব ছিল। তাহা ঠিক বটে, রণক্ষেত্রে তাহার পরীক্ষা হইয়াছিল। ভারতীয়দের গ্রাম্য-চাষীর দল, যাহারা প্রয়োজনকালে সামন্তদের সিপাহী হইত এবং যাযাবর জাতীয় সুদক্ষ এবং সংঘবদ্ধ তুরক অশ্বারোহীর দলের রণক্ষেত্রে সংঘর্ষ

১। Lane Poole: History of Maedieval India; Kanungo: History of the Jats দ্রষ্টব্য।

২। এই মনস্তত্ত্বানুসারে বর্ত্তমানের ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা ইংরেজ-শাসনের বিপক্ষে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

হইয়াছিল। বর্ণাশ্রমের সহিত সাম্যবাদের পরীক্ষা হইয়াছিল। ইতিহাসের তথ্যের সম্মান জন্য এই সত্য স্বীকার করিতে হইবে যে, রণ-সম্ভার ও রণ-নীতি বিষয়ে ভারতীয়েরা বৈদেশিক বিন কাসেমের সময় হইতে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ পর্য্যন্ত হীন ছিল (৩)। কৌটিল্যের যুগ বিস্মৃতির অতলতলে চলিয়া গিয়াছে, বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের রণনীতি ও অর্থনীতির পুস্তকগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে। এই প্রকারেই কাত্যায়নস্মৃতি ও নারদস্মৃতি অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। এই উভয় স্মৃতি পুরোহিত-তন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত চরমপন্থীয়। ইহাতে বিধবা-বিবাহ, তালাক ও পুনর্বিবাহ, বিবাহার্থী যুবকের (নারদে) লিঙ্গ পরীক্ষা করিবার কথা আছে। আর্য্য-কৃষ্টির উৎকৃষ্ট বিষয়গুলি কালের বশে বা পুরোহিততন্ত্রের কৌশলে লোকচক্ষুর অন্তরাল হইয়াছে। পুরোহিত-তন্ত্র ভারতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত লামা তারানাথের পুস্তকোক্ত গুরুবাদ, হাড়্‌পূজা, ম্যাজিক ও অলৌকিক গল্প, ব্রাহ্মণ্য পুরোহিত-তন্ত্রের শোষণোপযোগী ব্যবস্থা এবং বিদেশের ঘটনা বিষয়ে লোকদের অচৈতন্য করিয়া রাখা আর রামায়ণ, মহাভারতের বীরদের ম্যাজিক কার্য্যই যুদ্ধ-বিদ্যার পরাকাষ্ঠা বলিয়া বর্ণনা প্রভৃতি দ্বারা ভারতীয় মনকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল। স্বয়ং কাশীরাজ জয়চন্দ্র এবং তাঁহার দুই রাণী বৌদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। (৪) ভিক্ষু শ্রীমিত্র তাহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। তিনি 'একজটা', 'উগ্রতারা' ও 'দত্তারা' প্রভৃতির পূজায় মত্ত ছিলেন। এই বিদেশীয় অভিযানের ফল কি হইবে সেই বিষয়ে কেহই সচেতন ছিলেন না।

৩। এই বিষয়েও J. N. Sarkar, "History of the Moghuls." vol. III. দ্রষ্টব্য।

৪। EP. Ind. vol. v. Appendix P, 26, No, 177; I. H. Q. March 1929.

এই প্রকারে ভারতীয় মনের ক্ষেত্রকে যখন শ্মশানে পরিণত করিয়া নানাভাবের শোষণের বস্তু করিয়া "অন্ধকার যুগ" আনয়ন করা হইয়াছিল, তখনই বিদেশীয় মুসলমান অভিযান হইয়াছিল। তাহাদের দলে যে হিন্দু-পাণ্ডার বুজরুগীর-অতীত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ছিল তাহা মামুদ গজনবীর সোমনাথের মূর্ত্তি ভাঙ্গা ব্যাপারে লক্ষ্য হয়। (৫) ওটবীর মতন ঐতিহাসিক, আলবেরুণীর মতন দার্শনিক ছিল তুরস্কের দলে; আর আর্য্যকৃষ্টির উৎকর্ষতার পতাকাধারী ছিল ঘোর অজ্ঞ ও শোষক পাণ্ডারদল এবং আলকেমিষ্ট তান্ত্রিক ভিক্ষুর দল! এই সংঘর্ষের প্রতিক্ষেপে আর্য্য-ভারতীয়ের বংশধরেরা, যাহাদের পরে এই বিজাতীয় বিজেতারা "হিন্দু" নামকরণ করেন তাহারা পশ্চাৎ অপসারণ করেন এবং তৎকালীয় বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন মুসলমান নেতারা ও সাম্যাদর্শে অনুপ্রাণিত সংঘবদ্ধ তুরস্ক মুসলমানদল জয়যুক্ত হন।

আজকাল, একদল শিক্ষিত লোক বলিতেছেন যে, বর্ণাশ্রম সমাজ-পদ্ধতি শ্রেণী-বৈষম্য ও বর্ণ-বৈষম্য প্রভৃতির সমাধান করিয়া দেয়; এইজন্যই ভারতে কখন শ্রেণী-সংঘর্ষ হয় নাই। এই হেতু দেখাইয়া তাঁহারা অন্য সমাজ-পদ্ধতি অপেক্ষা বর্ণাশ্রম পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করিয়া বেড়ান। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতীয় সমাজে শ্রেণী-সংঘর্ষ নানাকারণে এবং নানাপ্রকারে চলিতেছে। এই সংঘর্ষের জেরস্বরূপ ভারতীয় শোষিত ও পতিতেরা বিদেশীয় ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহারই ফলে মামুদ গজনবীর সময় হইতে ভারতের প্রদেশের পর প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হইয়া বিদেশরূপে পরিণত হইতেছে।

৫। Elliot; "History of India, told by her own Historians" দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গলার অবস্থা

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষকালে কৌশলে এবং একদল পঞ্চমবাহিনীর সাহায্যে তুরস্ক-মুসলমানেরা 'নোদিয়া' দখল করে এবং ক্রমশঃ পশ্চিম-বঙ্গে শাসন প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু বর্ত্তমানকালের অনুসন্ধানের ফলে আমরা এই তথ্য পাই যে, সমগ্র বাঙ্গলায় আধিপত্য বিস্তার করিতে তাহাদের তিন শতাব্দী লাগে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে সম্রাট হুসেনশাহ বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা উত্তরবঙ্গের কামাটপুর রাজ্য জয় করেন। ইতিপূর্ব্বে রাজা গণেশ স্বাধীন নরপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পুনরায় স্বাধীন রাজা দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রের মুদ্রা বাঙ্গলার সর্ব্বত্র আবিষ্কৃত হইতেছে। পুনঃ, উড়িষ্যার এক রাজা একবার গৌড়ের সুলতানকে পরাজিত করিয়া গৌড় পর্য্যন্ত অবরোধ করিয়াছিল। (৬) হুসেন শাহের সময়ে পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জয়ানন্দের 'চৈতন্ত-মঙ্গল' পুস্তকে লিখিত আছে, উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রদেব হুসেন শাহের বিপক্ষে অভিযান করিয়া বঙ্গ-বিজয়ের সঙ্কল্প করেন; কিন্তু চৈতন্তদেবের মন্ত্রণায় সেই অভিলাষ তিনি ত্যাগ করেন। অবশেষে লক্ষ্মণ সেনের সভায় যে ষড়যন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল, প্রতাপ রুদ্রের সভাতেও সেই প্রকারের ষড়যন্ত্রের উদ্ভব হয়। পাত্র হরিচন্দন, হুসেন সাহের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া প্রতাপরুদ্রকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করে। ইহার ফলে, উড়িষ্যা রাজ্যের পশ্চিমবঙ্গের অংশ হুসেনশাহ গ্রহণ করে আর প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পর হরিচন্দন তাঁহার দুই পুত্রকে হত্যা করিয়া "মুকুন্দদেব" নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করে। কিন্তু পরের গৌড়ের সম্রাট

৬। Stewart, 'History of Bengal' দ্রষ্টব্য।

সোলেমান কররাণীর রাজ্যকালে সেনাপতি কালাপাহাড় উড়িষ্যা বিজয় করে এবং মুকুন্দদেবও যুদ্ধে নিহত হয়। উড়িষ্যা পুনরায় গৌড় চক্রের অন্তর্গত হয়। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক হিন্দুদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য: "সাতশত বৎসরে হিন্দুরা কিছুই শিক্ষা লাভ করে নাই, কিছু শিখেও নাই।"

ইহা হইল রাজনীতিক সংবাদ। এক্ষণে জনগণের সংবাদ অনুসন্ধান করা যাউক। গৌড়ের সুলতানদের সময়ে হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতেরা সম স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া কর্ম্ম করিতেন। বক্তিয়ারের সঙ্গেই অনেক "কালোমুখো রাজা" উপাধিধারী লোক জুটিয়াছিল, ইহা মুসলমান ঐতিহাসিকেরা বলিয়া গিয়াছেন। ইহারা বক্তিয়ারের সঙ্গে কামরূপ অভিযানে সঙ্গী হইয়াছিল (এই সব জন্যই পদ্ম-পুরাণে আক্ষেপোক্তি আছে!) সুলতান ইলিয়াস সাহের জন্য হিন্দু ও মুসলমান সমানভাবে রণক্ষেত্রে প্রাণদান করিয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দু জমিদারেরা তাঁহার পক্ষে ছিল। একডালাব যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন সহদেব। তিনি রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। রাজা গণেশ হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের প্রিয়পাত্র ছিলেন। পরে তাঁহার পুত্র যদু (৭) যখন তাঁহার সভাসদগণকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন এবং সর্দ্দারদের এতৎরূপে তাঁহার সিংহাসন আরোহণ করিতে আপত্তি থাকিলে তিনি সিংহাসন তাঁহার ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দিতে রাজী আছেন, তখন হিন্দু ও মুসলমান সভাসদেরা এক বাক্যে বলে যে, তিনি যে ধর্ম্মেই বিশ্বাসবান হউন তাঁহারা তাঁহাকে রাজা বলিয়া মানিবে ("ফেরিস্তা" দ্রষ্টব্য)। বাদশাহ হুসেন সাহ সুবুদ্ধি খাঁ নামক

৭। T. W. Arnold: "Preaching of Islam"—Spread of Islam in Bengal. P. 228.

একজন হিন্দু জমিদারের বাড়ীতে মানুষ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীরা হিন্দু ছিলেন। পরবর্ত্তী বাদসাহ, বীরভদ্র গোস্বামীকে 'তুমি বড় ফকীর' বলিয়া সম্মান করেন ("প্রেম-বিলাস")। মুসলমান অভিজাতদের প্রচেষ্টায় রামায়ণ প্রভৃতি বাঙ্গলায় ভাষান্তরিত হয় এবং বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন হয়। হিন্দু ও মুসলমানের ভাবের আদান-প্রদানের সম্পূর্ণ সংবাদ এখনও সংগৃহীত হয় নাই। এক শতাধিক মুসলমান-বৈষ্ণব কবির কবিতা মুন্সী আবদুল করিম সংগ্রহ করিয়াছেন। অন্যপক্ষে, গণসাধারণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ্যবাদীয় লোক ও মুসলমানগণ একত্রিত হইয়া গণসমূহের নিপীড়ন ও শোষণ করিতেছে। ৺নগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন—"এই সময়ের রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদের কুলগ্রন্থ পাঠ করিলে মনে হইবে যে, তৎকালে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও মুসলমান রাজপুরুষ-গণের প্রচেষ্টায় রাঢ় ও বারেন্দ্রভূমি হইতে বৌদ্ধশ্রমণেরা সম্যক বিতাড়িত বা উৎসাদিত হইয়াছিলেন।" (৮)

এই সময়ের একজন পর্টুগিস পরিব্রাজক বার্ব্বোসার প্রত্যক্ষ-দর্শিতার ফল পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এই যুগে জলস্রোতের ন্যায়, হিন্দু মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। সামাজিক ইতিহাসের বিশিষ্ট ঘটনা এই যে, মুসলমান শাসনের কাল হইতেই আমরা বৌদ্ধদের আর কোন সংবাদ পাই না। তাঁহারা এখন গেলেন কোথায়? ইউরোপীয় ভাষায় একটা কথা আছে—Religion follows the flag (ধর্ম্ম রাজ-শক্তির অনুগমন করে)। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, গৌড় ও মগধে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থান হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মীয় রাজাদের সময়ে অব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মসমূহ পদদলিত বা সংখ্যাহীন হইতেছিল। তৎপর মুসলমান

৮। নগেন্দ্রনাথ বসু: 'রাজন্য কাণ্ড', ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬০।

শাসনকালে গণসমূহ নানা কারণবশতঃ দলে দলে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে থাকে? (৯) ইসলামীয়-নীতি অনুসারে আইন ও অন্যান্য উপায়ে মুসলমানকরণ চলিতে থাকে। বলিষ্ঠ হিন্দুর ছেলেকে ক্রয় করিয়া পাঠান-গোষ্ঠীতে পালন করিয়া বঙ্গে এবং সর্ব্বত্র পাঠান-গোষ্ঠী বৃদ্ধি করা হয় (৯ক)। কৃষকেরা খাজনার দায় হইতে রেহাই পাইবে বলিয়া নিজেকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে থাকে। মুসলমান ব্যবসায়ী হিন্দু ব্যবসায়ী অপেক্ষা কম হারে সওদার উপর মাসুল দিত। (১০) উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কাল পর্য্যন্ত এই প্রভাব বিদ্যমান থাকে।

ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলির বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হয়, নাথ-ধর্ম্মী ও বৌদ্ধদের একদল যেমন ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল, অপর একদল তেমন ব্রাহ্মণ্য সমাজের দিকে ঝুঁকিতে লাগিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, লামা তারানাথের ইতিহাসেই তাহার ইঙ্গিত আছে। তাঁহার দ্বারা উক্ত, বুদ্ধে অনুরক্ত "ক্ষুদ্র নটেশ্বরেব দল" আর বাঙ্গলায় নাই। আসল কথা এই যে, রাজশক্তির আশ্রয়ের অভাবে অব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলি সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিদেশী মুসলমানদের সাহায্য করার অপরাধ যেমন বৌদ্ধদের হয়, তদ্রূপ বেশী ক্ষতিগ্রস্ত তাহারাই কিন্তু হয়। প্রাচীনকালের 'ব্রাত্য' প্রধান স্থানগুলি পরে বৌদ্ধ প্রধান হয় এবং এই প্রদেশগুলিই পরে মুসলমান-প্রধান হয়। এই বিষয়ে ডাঃ সহীদুল্লাহ বলিতেছেন: "যে দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের এত নিবিড় প্রভাব ছিল, সে দেশ

৯। T. W. Arnold: "Preaching of Islam", পৃঃ ২২৯।

৯ক। Arnold; Ameer Ali: "Mussalmans of India." দ্রষ্টব্য

১০। Price, "Report on the Settlement of Midnapur" দ্রষ্টব্য।

হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম লুপ্ত হইল কেমন করিয়া—এই প্রশ্ন অনেকেরই মনে উঠিতে পারে।...মোটের উপর বাঙ্গলার বিশাল হিন্দু ও মুসলমান মণ্ডলী এই বৌদ্ধগণকে গ্রাস করিয়া লইয়াছে।...মুসলমানগণের মধ্যে যাহাদিগকে বেদাতী ফকীর (আরবী বিদ-আৎ-নূতনত্ব, নবসৃষ্টি) বা নেড়ার ফকীর বলা হয়, তাহাদের মধ্যে অনেকটা সহজসিদ্ধির ভাব দেখা যায়। আমার মনে হয়, সত্যপীর নিরঞ্জনের এবং মাণিক পীর গোরক্ষনাথেরই প্রকারভেদ"। (১১)

অন্যদিকে, "ভিক্ষু শূন্য বৌদ্ধ-সমাজ একরকম বে-ওয়ারিশ মাল। যে যাহাকে পারে, আপনদলভুক্ত করিতে লাগিল।" ৺শাস্ত্রী বলিতেছেন, "এই সকল ঘটনা বোধ হয় ১২০০ হইতে ১৪০০ সাল, এই দুই (১২) শত বৎসরের মধ্যে হইয়াছিল।" এই যুগেই, বৌদ্ধতন্ত্রগুলি ব্রাহ্মণ আগমবাগীশেরদল আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। "এইরূপ আস্তে আস্তে বৌদ্ধতন্ত্র লোপ পাইল, আর তাহাদের মধ্যে যাহা লইবার ছিল, ব্রাহ্মণেরা সেগুলি আপন তন্ত্রভুক্ত করিয়া লইলেন। কোন কোন বিষয় আপনাদের স্মৃতিতেও উঠাইলেন।" (১৩)

হিন্দু-বাঙ্গলার পুনর্জাগরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রী বলেন, "গণেশবংশীয় রাজাদের সময়েই বাঙ্গলার হিন্দু-সমাজের জাগরণ হয়।" এই বংশের যদু মুসলমান হইয়াও বৃহস্পতি নামক পণ্ডিতকে বড় সম্মান করেন এবং তাঁহাকে "রায় মুকুট" উপাধি প্রদান করেন। ইনি "স্মৃতি কণ্ঠহার" নামক একখানি স্মৃতি বই লিখিয়া হিন্দুর সমাজ বাঁধিবার চেষ্টা করেন। এই

১১। "শূণ্য পুরাণ": ৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ডাঃ সহীদুল্লাহ লিখিত ভূমিকা: পৃঃ ১৩।

১২।১৩। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: "সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা," ষট্‌ত্রিংশ ভাগ, বঙ্গাব্দ ১৩৩৬, ইংরাজী ১৯১২।

পুস্তকে দৃষ্ট হয় বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ সমাজে তখন চতুবর্ণে বিবাহ প্রথা ছিল ; কারণ ইহাতে একজন ব্রাহ্মণের চারিবর্ণের স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের বর্ণানুযায়ী পৃথক অশৌচ ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। শাস্ত্রী বলেন, "এ সময়েও বৌদ্ধরা বেশ প্রবল ছিলেন। ১৪২৬, ১৪৩৬ ও ১৪৪৪ সালেও বাঙ্গলায় ভাল ভাল বৌদ্ধ গ্রন্থ কপি করা হইত। বেণু গ্রামের মিত্রেরা 'বোধিচর্য্যাবতার' কপি করাইয়াছিলেন...মিত্র মহাশয় নিজে ও তাঁহার পুত্র দুইজনেই 'বোধিচর্য্যাবতার' পড়িয়াছিলেন" (১৪)।

এইযুগে দুইখানি পুরাণ লিখিত হইয়াছে : "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ" এবং "বৃহৎধর্ম্ম পুরাণ"। পুস্তক দুইখানি বাঙ্গলাদেশেই লিখিত হইয়াছে এবং বাংলার জাতিসমূহের তালিকা আছে। এই দুই পুরাণ চিরন্তন পুরোহিত-তন্ত্রীয় রীতি অনুযায়ী লেখা, ব্রাহ্মণ ব্যতীত সর্ব্বজাতি শূদ্র এবং মিশ্রিত বর্ণের উৎপত্তি। ইহাতে ৩৬ জাতির উল্লেখ আছে। শূদ্রেরা পুনঃ উত্তম, মধ্যম এবং অধম বলিয়া বিভিন্নীকৃত হইয়াছে। ইহাতে "কায়স্থ" ও "বৈদ্য" জাতির উল্লেখ নাই, তৎপরিবর্ত্তে "করণ" এবং "অম্বষ্ঠ" নামোল্লেখ আছে। আশ্চর্য্যের কথা এই "রাজপুত্র" (রাজপুত ?) জাতিকে শূদ্র বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে তাহাদের প্রতিলোম" জাত শূদ্র বলা হইয়াছে। পুনঃ বৃহস্পতির বঙ্গজকায়স্থ-কারিকায় 'রাজ-পুত্রের' সহিত বিবাহ দান নিষিদ্ধ হইয়াছে (১৫)। এইসব প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতীত হয়, তুরস্ক শাসন কালে বাঙ্গলার সমাজ একটা দ্রবমান কটাহ মধ্যে ছিল ; শ্রেণী-স্বার্থ ও শ্রেণী-সংঘর্ষ ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক বস্তুতন্ত্রপ্রসূত দ্বন্দ্বনীতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সমাজকে নূতনভাবে গঠিত করিতেছিল। শ্রেণী-সংঘর্ষের ফলে সমাজে নিজ শক্তি অনুযায়ী স্বীয় জাতির মর্য্যাদা লোকে আদায় করিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান

১৪। শাস্ত্রী, ঐ পৃ ১৬

১৫। নগেন্দ্রনাথ বসু, "দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড" (১ম খণ্ড) পৃঃ ৯৮।

বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের কাঠামো পরিদৃশ্যমান হয়। এই সময়ে নবদ্বীপের "রাজা" বুদ্ধিমন্ত খাঁনের সভাতে আনন্দভট্ট দ্বারা "বল্লাল চরিত" লেখা সমাপ্ত হয়। তাহাতে বাঙ্গলার জাতিগুলির যে পর্য্যায় প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে আজকালকার সহিত সাদৃশ্য আছে।

বল্লালচরিতে একটি সামাজিক সংবাদ বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। আনন্দভট্ট বলিতেছেন, বল্লাল, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের ব্যাকুল দেখিয়া বীজ-মাহাত্ম্য বিবেচনা করিয়া (original stock) সংস্কার করিয়া ব্রাহ্মণত্ব এবং ক্ষত্রিয়ত্ব কল্পনা করিলেন অর্থাৎ নূতন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় তৈয়ার করিলেন। (অধ্যায় ২৩।২১-২৩)। "শেখশুভোদয়া' গ্রন্থে "রাজপুত্র" জাতির উল্লেখ আছে এবং লক্ষ্মণসেন বলিতেছেন, এই জাতীয় লোকের সহিত তাঁহার স্বজাতীয়ত্ব আছে (১৩০ পৃঃ)। পুনঃ বল্লালচরিতে বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ানীর গর্ভে ক্ষেত্রী বা রাজপুত্র (রাজপুত) জন্ম লাভ করে ("ক্ষত্রায়াং ব্রাহ্মচ্ছেত্রী রাজপুত্রো উচ্যতে")। ইহার পূর্ব্বে, জীমূতবাহন চতুবর্ণের লোকদের দায়াধিকার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। অথচ জীমুত-বাহনের এবং এই সব গ্রন্থকারের পরবর্ত্তীকালের লোক রঘুনন্দন বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণ বলিয়া তাঁহার শুদ্ধিতত্বে ব্যবস্থা দিলেন। তিনি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বর্ণগত বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেন নাই এবং অস্তিত্বও স্বীকার করেন নাই (শুদ্ধিতত্ব ৭১—৭২)। অন্যদিকে উড়িষ্যা, বিজয় নগর, উত্তর-পশ্চিম, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে ক্ষত্রিয় জাতীয় রাজারা রাজত্ব করিতেছেন এবং ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীকারী জাতিসকল উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বর্ত্তমান ছিলেন এবং এখনও আছেন। রঘুনন্দনের পরেও "প্রেমবিলাস" গ্রন্থে বলিতেছে "ব্রহ্মক্ষত্রি. বৈশ্য. শূদ্র বসে পদ্মাবতী তীরে"।

পুরোহিত-তন্ত্রের শ্রেণী-স্বার্থদুষ্ট এবং কল্পিত জাতিতত্ব আমাদের

বাস্তব প্রতিষ্ঠান জানিতে সাহায্য প্রদান করে না। কিন্তু আমরা দেখি বল্লালসেন হইতে রঘুনন্দন পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে শ্রেণী-সংঘর্ষের ফলে এবং বিধর্মীয় শাসনের চাপে যে সমাজ-বিন্যাসে বিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহারই আভাষ আমরা বল্লাল-চরিত গ্রন্থে পাই এবং আজও তাহা কম বেশী সত্য।

বাঙ্গলায় মুসলমান শাসনকালের সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠান হইতেছে—চৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুত্থান। মুসলমান বিজয়ের পর চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে উভয় ধর্ম্মের ভাবের সম্মিলনে নব-বৈষ্ণবধর্ম্মের ও সংস্কারক সম্প্রদায়গুলির ('সন্ত'—আন্দোলনসমূহ) উত্থান হয়। বাঙ্গলায় সেই তরঙ্গের প্রতিধ্বনি আসিয়া গৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মরূপে বিস্তৃতি লাভ করে। এই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হিন্দু মুসলমানকে এক প্রেম-ধর্ম্মে একত্রিত করা ("ব্রাহ্মণে যবনে মিশি করিতেছে কোলাকুলি, পরতেকে চাহ একবার"—দীন কৃষ্ণদাস)। পুনঃ এই ধর্ম্মে বর্ণ বিভেদ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করে ("জাতির বিচার নেই বৈষ্ণব বর্ণনে"—দেবকীনন্দন, বৈষ্ণব বন্দনা)। বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রথম যুগে মুসলমান ভক্তদের গ্রহণ করা হয়, এবং তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতীয় লোক ঝড়ু ঠাকুর সকলের সম্মান পান (১৬)।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের ফলে বাঙ্গলার ধর্ম্মক্ষেত্রে এক বিপুল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। আজকাল বাঙ্গলায় দুইটি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়: হিন্দু এবং মুসলমান। যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অব্রাহ্মণ্য দল পূর্ব্বে ছিল তাহারা নব-বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারের ফলে বৈষ্ণব মতের হিন্দু সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করে। সহজযানী নেড়াচার্য্যের নেড়া নেড়ীর দল, গোরক্ষনাথের

১৬। বৈষ্ণব আখড়ায় আজও মুসলমান ভেক লইলে স্থান পান।

নাথ-ধর্ম্মীয় দল প্রভৃতি আজ বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। লেখক অন্যত্র মধ্যযুগীয় সমাজতত্ত্বের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন (১৭)।

কিন্তু হিন্দু সমাজের নূতন পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করিলে দৃষ্ট হয়, ইহা পুনরায় দুইভাগে বিভক্ত হয়ঃ বেশীর ভাগ অভিজাতগণ পুরাতন তান্ত্রিক ধর্ম্ম আঁকড়াইয়া রহিলেন। বহুপূর্ব্বেই হলাযুধ "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেনঃ "রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণ তান্ত্রিক; পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্যগণ মধ্যে বেদের আলোচনা আছে" (১৮)। এই রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণ আজও বেশীরভাগ তান্ত্রিক। ৺শাস্ত্রী অনুমান করিয়াছেন, কায়স্থগণ রাজকর্ম্মচারী ছিল এবং পূর্ব্বীয় রাজধর্ম্ম মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্ত ছিল। ইঁহারা আজও বেশীর ভাগ তান্ত্রিক বা শাক্ত; বৈদ্যরাও তদ্রূপ। অন্যপক্ষে, অধিকাংশ অন্য জাতীয় লোকেরা গৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। অবশ্য ইহাও কথিত হয়, অতি নিম্নশ্রেণীয় বাগদি জাতি আজও শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী; অন্যপক্ষে, সমাজের বাহিরে স্থিত বাউরী জাতি ধর্ম্মঠাকুরের পূজারক্ত। বর্ত্তমানে তথাকথিত অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য জাতিদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার চলিতেছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের দ্বার তাহাদের জন্যে উন্মুক্ত রহিয়াছে। এই প্রকারে ধর্ম্মের আবরণে শ্রেণী-সংগ্রাম চলিয়াছিল। ভারতের সর্ব্বত্রই নব-বৈষ্ণব প্রভৃতি সংস্কারকামী ধর্ম্ম গণ-আন্দোলন ছিল। এই সামাজিক পরিবর্ত্তনের ফলে, বাঙ্গলার বেশীরভাগ লোক অথবা বর্ত্তমানের রাজনীতিক পরিস্থিতির ভাষায় বেশীর ভাগ বাঙ্গলার আজ মুসলমান, তার পরেই স্থান হইতেছে গৌড়ীয়

১৭। লেখকের "বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজ-তত্ত্ব" দ্রষ্টব্য।

১৮। শেষোক্ত দুই জাতির ব্রাহ্মণদের বিষয় বিতর্ক উঠিয়াছে। ইঁহারা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কি বাহিরের লোক।

বৈষ্ণবের। অনুসন্ধান করিয়া তুলনামূলকভাবে দেখিলে ইহা প্রতীত হইবে যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম সর্ব্ব-বিষয়ে ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। ব্যবহারিক দুঃখ দূর করিবার জন্য অর্থাৎ সামাজিক যে সুবিধার জন্য লোক মুসলমান হইতে চায়, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সেই সকল সুবিধাই ইহার ভক্তকে প্রদান করে। বৈষ্ণবধর্ম্ম হিন্দুসমাজে এক বিরাট বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিল। ইহা একটা গণ-আন্দোলন ছিল এবং গণ-সমূহের মধ্যে ইহা আজও কার্য্যকরী হইতেছে। যখন বাঙ্গলার সমাজ এই প্রকারে রূপান্তরিত হইতেছে, তখন বনিয়াদি স্বার্থকে (Vested Interests) বাঁচাইবার জন্য যে সব ধর্ম্মকর্ম্ম বা অনুষ্ঠান-সমূহ সংঘটিত হইল তন্মধ্যে কুল্লুক ভট্ট ও রঘুনন্দনের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মনুসংহিতার টীকা করিবার সময় কুল্লুক 'অনার্য্য' শব্দের অর্থ করিলেন 'শূদ্র' (১৯)। ইহার উপর সুর চড়াইয়া রঘুনন্দন বলিলেন, বাঙ্গলায় কেবল দুই বর্ণ আছে: ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। এই উক্তি দ্বারা এক কথায় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর বাহিরের সমুদায় লোককে ইঁহারা "শূদ্র" বলিয়া অভিশপ্ত করিলেন। ইহার অর্থ—ব্রাহ্মণই একমাত্র আর্য্য, অর্থাৎ বৈদিক সভ্যতার অধিকারী; আর ঐ জাতির বাহিরের সকলেই "অনার্য্য ও শূদ্র" অর্থাৎ তাহারা বৈদিক-সভ্যতার অধিকার ও সুবিধা ভোগের বাহিরে (২০)। এতদ্বারা ইঁহারা ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত মনুকেও হার মানাইলেন। পুনঃ, গৌড়ের মুসলমান শাসনের যুগে ব্রাহ্মণদের মধ্যে জাতি মারামারি অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যায়। মুসলমানের খানা শুঁকিলে বা তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিলে জাতি যাইত (নগেন্দ্র বসুর "ব্রাহ্মণ কাণ্ড" দ্রষ্টব্য)।

১৯। বঙ্গবাসী সংস্করণ কুল্লুকভট্টের সটীক 'মনুসংহিতা', ১০ম অধ্যায়, ৬৭, ৭৩ শ্লোক।

২০। কুল্লুকের "আর্য্য" শব্দ কেহ যেন নাৎসী জার্মাণ অর্থে বুঝিবেন না। তিনি যাস্ক, বৌধায়ন প্রভৃতির অর্থে ইহা বুঝিবেন।

ভারতের অন্য প্রদেশে এইরূপ ভয়াবহ শুচিবায়ু আবির্ভূত হয় নাই। ইহার কারণ কি? ইহা কি কেবল ব্রাহ্মণ্যবাদাভিমানী ও শুচিবায়ু-রোগগ্রস্ত মনের বিকার মাত্র, অথবা পরাজিত ও ভীত হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষণ প্রচেষ্টা মাত্র। ভারতের অন্যত্র কুত্রাপি জাত মারামারির নজির নাই। এই অনুষ্ঠানের কোন অর্থনৈতিক কারণ নিশ্চয়ই লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকায়িত আছে। লেখককে নবদ্বীপের বৈষ্ণবধর্ম্মীয় প্রাচীন ধর্ম্মগুরু ৺হরিদাস গোস্বামী মহোদয় বলিয়াছিলেন যে, এই যুগে অনেক ব্রাহ্মণ মুসলমান রাজাদের নিকট অর্থ পাইয়া লোকের জাতি মারিয়া বেড়াইত। ইহারই ফলে এই যুগে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণদের মধ্যে এত জাত-মারামারির প্রাদুর্ভাব হয়। (২১) লেখক ইহাও শুনিয়াছেন যে, গৌড়ের সুলতানেরা অনেক ব্রাহ্মণকে "লাখেরাজ" বা "ব্রহ্মোত্তর" জমি দান করিয়াছেন। পরে, মোগলযুগে অনেক ব্রাহ্মণ "জাতিমাশ" জমি পাইয়াছেন। তাহার নজিরস্বরূপ পাট্টা বাহির হইতেছে। ব্রাহ্মণদের এই প্রকারের অপচেষ্টা ইংরেজ আমলের প্রথম যুগেও চলিয়াছিল। বাঙ্গলার দেওয়ানী হস্তে পাইয়া ইংরেজ "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি" যখন রাজত্ব চালাইবার জন্য একটা 'অনুসন্ধান কমিটি' স্থাপন করিয়া আভ্যন্তরীণ সংবাদ সংগ্রহ করিল তখন সেই "Select committee" তাহার Report-এ এই কথা বলে। "গ্রামে গ্রামে মৌলুবী ও ব্রাহ্মণ আছে যাহারা জজীয়তী করে, কিন্তু তাহাদের Licence নাই। এইসব ব্রাহ্মণ যাহার উপর বিরক্ত (piqued) হয় তাহার জাতি মারিয়া দেয়। জাতি মারিলে, কেবল রাজাই তাহাকে জাতিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে

২১। ৺গোস্বামী মহাশয় লেখককে জানান যে, এই বিষয়ে এক সময় 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি কাগজে তিনি লিখিয়াছেন। অন্যলোকেও লেখককে অবগত করিয়াছেন যে, এই বিষয়ের প্রমাণ আছে।

সক্ষম; কিন্তু মুসলমান রাজারা এই বিষয়ে ঔদাসীন, কারণ তাহারা হিন্দুদের নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়া মনে করিত। অবশেষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হুকুম দিলেন, বিনা কারণে যেন কোন লোকের জাতিমারা না হয়।" (২২) এই রিপোর্টের অর্থ, মুসলমানযুগে হিন্দুর দায়াধিকার ও সিভিল আইন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দ্বারা সম্পাদিত হইত। ফৌজদারী মকদ্দমা কাজীর দ্বারা বিচার করা হইত। ব্রাহ্মণ জজ পণ্ডিতেরা এই সুবিধা পাইয়া যাহাকে তাহাকে জাতিচ্যুত করিবার ফতোয়া দিত। এই কুপ্রথা ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট বন্ধ করিয়া দেয়। এই প্রকারেই হিন্দু সমাজ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সমাজ বিপর্য্যস্ত হয়। প্রত্যেক ব্রাহ্মণবংশে নানা "দোষ" স্পর্শে (দেবীবরের "মেল বন্ধন" দ্রষ্টব্য)। স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহের অসুবিধা হয়। ব্রাহ্মণেরাই হিন্দু সমাজের পরিচালক, তাহাদের ধ্বংস করিলেই বিজিত লোকেরা বশীভূত হইবে, এই কারণেই বরাবর বিজাতীয় বিজেতারা ব্রাহ্মণদের ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছে। আলেকজান্দার, শক রাজারা (জয়সওয়াল দ্রষ্টব্য), বিনকাসেম প্রভৃতি সকলেই এই নীতি গ্রহণ করিয়াছে। বাঙ্গালায় দৃষ্ট হয়, বিজেতারা ব্রাহ্মণ সমাজ মধ্যেই নিজেদের কার্য্যের সুবিধা করিয়া দিবার "বিভীষণ" পায়। ইহার ফলে, বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ সমাজ বিপর্য্যস্ত হয়। অবশেষে দেবীবর ঘটক ১৪৮০ খৃঃ মেল বন্ধন প্রবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজে বিবাহের সুবিধা করিয়া দেন। এই অনুষ্ঠান চৈতন্য দেবের জন্মের পাঁচবৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হয়। উত্তর-ভারতে প্রবাদ আছে, ব্রাহ্মণ মুসলমান হইলে "সৈয়দ" হয়, রাজপুত "পাঠান" হয়,

---

২২। Report of Select Committee, Talboys Wheeler-এর History of India পুস্তকে উদ্ধৃত।

শূদ্রেরা 'সেখ' হয়। বাঙ্গলায় কথিত হয়, ব্রাহ্মণ "ঠাকুর সাহেব" হয়, কায়স্থ "খাঁ সাহেব" হয়, অন্যান্য জাতিরা "সেখ" হয় (ইহা একজন মুসলমান লেখককে জানান)। পূর্ব্ববঙ্গে এমন মুসলমান বংশীয় লোক আছেন যাঁহারা নিজেদের "ঠাকুর" বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন (ইহাও একজন নামজাদা মুসলমান বলিয়াছেন। তাঁহার মাতাকে গ্রামের মুসলমানেরা "ঠাকুর-ঝি" বলিয়া সম্বোধন করিত)। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রেণী চৈতন্য পরিলক্ষিত হয়। লোকে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিলে তাহার সামাজিক মর্য্যাদার পরিবর্ত্তন হয় না। রোমানরা খৃষ্টান এবং ইরানীরা মুসলমান হইলেও এই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল। হিন্দু অনাচরণীয় যুগী, জোলা হইয়া জাতির মর্য্যাদার উন্নতি করিতে পারে নাই। অস্পৃশ্য হিন্দু মুসলমান অস্পৃশ্য হইয়া আছে।

স্বীয় স্বার্থের জন্য একদল ব্রাহ্মণের এই অপচেষ্টা বিষয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। মহম্মদ-বিন কাসেম হইতে বক্তিয়ার খিলজির আক্রমণ পর্য্যন্ত একদল ব্রাহ্মণ বিজেতৃবর্গের সহিত মিলিয়াছিল। মোগল যুগেও একদল ব্রাহ্মণ মোগল আক্রমণকারীদের সহিত মিলিত হয় এবং স্বাধীনতা প্রয়াসী হিন্দু সামন্ত রাজাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল।

এই যুগের একটী বিশিষ্ট অপচেষ্টা হইতেছে রঘুনন্দন দ্বারা বেদের শ্লোক জাল করিয়া "সতীদাহ" ব্যবস্থা প্রদান করা (অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব, শুদ্ধিতত্ত্ব অধ্যায়)।

এই প্রকার অপচেষ্টা কেন সংঘটিত হইল, ইহাই প্রশ্ন। মহামহোপাধ্যায় কানে বলেন, একজন ইংরেজ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, হিন্দু ধর্ম্মের পীঠস্থল কাশী অঞ্চলে বাঙ্গলা অপেক্ষা কম "সতীদাহ" হইয়াছে। ইহার কারণ কানে প্রদর্শন করেন, কাশীর আইনপুস্তক মিত্রমিশ্রের

"বীরোমিত্রোদয়" বিধবাদের স্বামীর ধনে অধিকারী করে নাই।(২৩) অন্যপক্ষে আমরা দেখি বাঙ্গলায় পুরাতন কাল হইতেই জীতেন্দ্রিয়, পরে জীমূতবাহন অপুত্রক বিধবাকে তাহার স্বামীর ধনে "জীবনস্বত্ব" (Life interest) প্রদান করিয়াছেন। ইহা বনিয়াদী স্বার্থের ক্ষতিকারক। এইজন্যই কি ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যার দ্বারা পরিচালিত হইয়া বেদের শ্লোকের এই জাল হইয়া 'সতীদাহ' ব্যবস্থা প্রদত্ত হয় ?

আশ্চর্য্যের কথা এই, রঘুনন্দন তাঁহার পুস্তকে জীমূতবাহনের আইন সমর্থন করেন। অন্য পক্ষে, তাহার পরে মিত্রমিশ্র তাঁহার আইনপুস্তক প্রণয়নকালে জীমূতবাহনের সমালোচনা করেন এবং রঘুনন্দনকেও উদ্ধৃত করেন। কিন্তু তিনি এই জাল ব্যাপার বিষয়ে নীরব। সেই প্রকারে নীলকণ্ঠও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁহার আইন পুস্তক 'ব্যবহার-ময়ূখ' প্রণয়নকালে রঘুনন্দনের এই মিথ্যা রচনা বিষয়ে নীরব। পুনঃ ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গলায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার জীমূতবাহনের আইন পুস্তকের টীকা প্রণয়নকালে গৌতমের এক শ্লোক যাহা বিজ্ঞানেশ্বর স্বীয় মত সমর্থনের জন্য উদ্ধৃত করেন তাহা "অমূল" মিথ্যা বলিয়া ধরাইয়া দেন। কিন্তু তিনিও এই বিষয়ে নীরব। এতদ্বারা আমরা এই নীরবতাকে ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্রের শ্রেণীলক্ষণপ্রসূত বলিব ? অথবা বেদাধ্যয়ন বিষয়ে অজ্ঞতাপ্রসূত সমালোচনার ভয় বলিব ? তখন ভারতে নিশ্চয়ই অনেক বেদাধ্যায়ী পণ্ডিত ছিলেন, যাঁহারা রঘুনন্দনের এই ভুল ধরাইয়া দিতে পারিতেন। এই বিষয়ে আমরা বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ্য শ্রেণী-চেতনাই ("ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণাগতিঃ") পরিলক্ষিত করি। অবশেষে, উনবিংশ শতাব্দীতে মানবতারূপ ভাবদ্বারা প্রণোদিত হইয়া একদল ব্রাহ্মণ কলিকাতায়

২৩। Kane, "History of Dharmasastras," Vol II, pt II.

একটি সমিতি করিয়া প্রদর্শন করান যে, এই শ্লোক ভুল এবং তাঁহারা চিতার সতী হইতে উদ্যত নারীকে শাস্ত্রীয় বচনসমূহ দ্বারা নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেন। শেষে রামমোহন রায়ের আন্দোলনে ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ইহা বে-আইনী বলিয়া বন্ধ করেন।

সংরক্ষণকারীদল বলেন, রঘুনন্দন বাঙ্গলার হিন্দুকে বাঁচাইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার সমাজতত্ত্বের অনুসন্ধান করিলে ইহার বিপরীতই প্রতীত হইবে। রঘুনন্দন কর্ত্তৃক বনিয়াদী স্বার্থের জনকতকের সুবিধা হয়ত হইয়াছে, কিন্তু হিন্দু সাধারণের বেশীরভাগ অংশ অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-বীরভদ্র গোস্বামীদের দ্বারাই উপকৃত হইয়াছে।

উত্তর-ভারতের অবস্থা

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উত্তর-ভারত তুরস্ক মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়। তাহারা মুসলমান ধর্ম্মীয় শাসন প্রবর্ত্তিত করে, নিজেরা অভিজাত শ্রেণীতে সংস্থাপিত হয়। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারিগণ বলেন, এই বিদেশী আক্রমণকারীদের দ্বারা প্রচলিত অর্থনীতিক সম্বন্ধ কোন প্রকারে বিশৃঙ্খলা প্রাপ্ত হয় নাই, কেবল একটী সুবিধাভোগকারী শ্রেণীর স্থলে আর একটা শ্রেণী স্থাপিত হয়। যদিচ নূতন শাসকশ্রেণীর সভ্যদের অনেকে বিজিত হিন্দুদের জায়গীর (fiefs) এবং বৌদ্ধ সংঘারামসমূহের দেবত্তভূমি বাজেয়াপ্ত করিয়া নেয়, তত্রাচ ভূমির কৃষকদের অবস্থা পূর্ব্বের মতনই ছিল। এই উপলক্ষে আমরা একটি ঘটনা স্মরণ করাইতে চাই : যখন জাঠেরা ও মেদেরা বিন কাশেমের কাছে নালিশ করিল, পূর্ব্বেকার ব্রাহ্মণ রাজা যখন তাহাদের অস্পৃশ্য

করিয়া রাখিয়াছিল এবং লাল কাপড় পরিয়া সহরের বাহিরে বাস করিবার হুকুম দিয়াছিল, তখন কাসেম মৃত রাজা দাহিরের ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর কাছ হইতে ইহার সত্যতা জানিয়া লইয়া বলিলেন, "তোমাদের পূর্ব্বেকার মতনই থাকিতে হইবে (২৪)।"

এই প্রকারের রাজনীতিক পন্থা লইয়া নূতন বিজেতৃবর্গ শাসন করিতে লাগিলেন। এইজন্য একজন অনুসন্ধানকারী বলিতেছেন: মুসলমান শাসন সময়ে আমরা ভারতীয় ইতিহাসের একটি নূতন অধ্যায়ে প্রবেশ করিতেছি না, কেবল ভারতীয় ইতিহাসের চিরন্তন ক্রমবিকাশের গতি যাহা আজও সমাপ্ত হয় নাই, তাহারই একটা ধাপে (stage) প্রবেশ করি (২৫)।

এতদ্বারা দৃষ্ট হয়, শাসক ও প্রজাদের বংশ-পরম্পরায় যে সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে তাহাই মুসলমান যুগে অটুট রহিল। কৃষিজীবী প্রজাকে তাহার ভূমির উৎপাদিত দ্রব্যের একাংশ রাজাকে দিতে হইত, ইহার পরিবর্ত্তনে রাজা রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিত। কিন্তু হিন্দুযুগের নীবারের ⅙ অংশের পরিবর্ত্তে আলাউদ্দিন খিলিজি ½ অংশ ভাগ ধার্য্য করে (২৬); পুনঃ গোচারণভূমির উপর একটি ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হয় (২৭)। এতদ্বারা দৃষ্ট হয় যে, এই শাসনকালে গোচারণভূমি গভর্ণমেণ্টের হয়। পুনঃ ঐতিহাসিক বারনি বলিতেছেন, "মহম্মদ টোগলক অনেক অত্যাচারপূর্ণ "আবওয়াব" (cesses) সৃষ্টি করেন এবং জমির কর-সমূহ এত বৃদ্ধি করেন যে, রায়তদের পিঠ ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহারা

২৪। "চাচনামা"; কানুনগো, History of the Jats দ্রষ্টব্য।

২৫। Kunwar M. Ashraf: Life and Conditions of the People of Hindusthan" (1000—1550 A. D), mainly based on Islamic sources), p. 106

ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়।(২৮) ইহা দোআবা অঞ্চলে সংঘটিত হয়। অবশ্য "সুলতান কৃষিকর্ম্ম পুনঃ স্থাপিত করিবার জন্ম চেষ্টা করেন, এবং কূপ সকল খনন করান, কিন্তু লোকে কিছু করিতে সক্ষম হয় নাই।" (২৯)

অনুবাদক এলিয়ট এই স্থলে বলিতেছেন, ভারতীয় মুসলমান ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম স্থান যেখানে "আবওয়াব" শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তৎপর ঐতিহাসিক আফিফ বলিতেছেন: সুলতান ফিরোজ টোগলক পয়গম্বরের আইন তাহার কর্ম্মের আদর্শ করেন। এইজন্ম এই আইনের ব্যতিক্রম যাহা হইত তাহা তিনি নিষেধ করিতেন। গভর্ণমেণ্টের ন্যায্য আদায়ের উপর লওয়া হইত না...এমন আইন করা হইল যদ্বারা রাইয়ত ধনী হইতে লাগিল (৩০)।

ফিরোজাবাদের একটী মসজিদের প্রাচীরে সুলতান ফিরোজের কর্ম্মের তালিকা খোদিত-লিপিতে পাওয়া যায়। ইহাতে দৃষ্ট হয়, তিনি কর্ম্মচারীদের বে-আইনী অর্থ লওয়া বন্ধ করেন এবং গোচারণ-ভূমিকে পুনঃ মুক্ত করেন। ফিরোজ নিজে বলিতেছেন, কৃষকদের কাছ থেকে তাঁহার আদায় অত্যন্ত কম করেন।(৩১) এই স্থলে দ্রষ্টব্য এই, ফিরোজ তাঁহার "ফুতুহাতে" (বিজয়) ২৩ রকমের আবওয়াব উল্লেখ করিয়াছেন। এই বে-আইমী আদায়,তখন এত বাড়িয়াছিল।

সম্রাট বাবরের রোজ-নামচা পাঠে দৃষ্ট হয়, মোগল-যুগের পূর্ব্বে প্রাচীন প্রথামত কৃষিকর্ম্ম চলিতেছিল। এইস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, তোগলক

২৮-২৯। Elliot : Vol III—Barni's "Tarikh—i—Firuz-shahi. pp, 182—250 , Afif, p. 290.

৩০। Elliot : Vol III. ঐ, Tarikh-i-Firuzshahi.

৩১। Ferishta, translated by Briggs, Vol I. p. 462.

যুগে মরোক্কোর পরিব্রাজক ইব্‌ন বতুতা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কামরূপে (কামরু) জল তুলিবার যন্ত্র (water wheel) ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছিলেন (৩২)। বাবর পঞ্জাবে পারসিক চক্র (Persian wheels) দ্বারা জল তুলিতে দেখিয়াছেন বলেন। কিন্তু আমরা ঋকবেদেই উক্তস্থলে "ঘটিচক্র" ব্যবহার করিবার উল্লেখ দেখি (১০।৯৩।১৩)।

উপরোক্ত সংবাদসমূহ দ্বারা আমরা বোধগম্য করি যে, মোগল-পূর্ব্ব মুসলমান শাসনকালে সামাজিক অর্থনীতিকাবস্থা পুরাতন হিন্দু-যুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ছাঁচের ছিল এবং তাহারই জের চলিতেছিল। বিজিত দেশসমূহকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য সৈন্য দিয়া দখল রাখার প্রচেষ্টাকে "শাসন" বলা হইত; জায়গীরদাররাই বড়বড় রাজকর্ম্মের পরিচালক ছিল। এই জায়গীরদারদের দেশের সর্ব্বত্র বিস্তারিত করিয়া রাখা হইত বলিয়া মুসলমান ঐতিহাসিকরা বলেন (৩৩): "এই অভিজাতেরা বিধর্ম্মীদের ষড়যন্ত্র দমন করিতে এবং নিজেদের অধীনস্থ দেশ নিরাপদ রাখিবার বিষয়ে কোন আলস্য প্রকাশ করিত না। এইজন্য রাজ্যের নিরাপত্তা বিষয়ে সুলতানদের (ফিরোজ তুগলক, ১৩৫১—১৩৮৮ খৃঃ) কোন ভাবনা ছিল না।" আমরা বহলুল লোদী (১৪৫১—১৩৮৯খৃঃ) বিষয়ে শুনি, তিনি বলিতেন: "যে আফগান 'রো' (Roh উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পার্ব্বত্য অঞ্চল) হইতে হিন্দদেশে আসে, তাহাকে আমার কাছে লইয়া আইস। আমি তাহার উপযুক্ততার বেশী জায়গীর প্রদান করিব,...তাহারা প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক মাস, প্রত্যেক বৎসরে আসিতে লাগিল এবং সন্তুষ্ট হৃদয়ে জায়গীর পাইতে লাগিল" (৩৪)। পুনঃ

৩২। H. A. R. Gibb "Selection's from tbe Travels of Ibn Batuta," p. 270—271,

৩৩। "Tarikh-i-Mubarak-Shahi" in Elliot; lV. p 13.

৩৪। "Tarikh-i-Shershahi" in Elliot. IV. pp 307—308

সেকেন্দর লোদীর সময়, (১৪৮৯—১৫১৭ খৃঃ) আমরা সংবাদ পাই, দেশের অর্দ্ধেক ভূমি ফারমুলি কৌমকে প্রদান করা হয়। অন্যান্য আফগান কৌমদের বাকী অর্দ্ধেক দেওয়া হয় (৩৫)। আবার, ইহাও দৃষ্ট হয় যে, সুর বংশীয় সুলতান আদালি পূর্ব্ব-প্রদত্ত জায়গীরগুলা ফিরাইয়া লইয়া অন্য লোকদের প্রদান করে। এই বিজেতৃবর্গ উত্তর-ভারত দখল করিয়া রাখে এবং জায়গীরদারদের দ্বারা দেশ শাসন করে। তুগলকের রাজত্ব কালেই এই শাসন-প্রথা বিশেষ-ভাবে প্রকাশ পায়। এই বিষয়ে একজন ঐতিহাসিক বলিতেছেন: "সাম্রাজ্য সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিল এবং সুলতান এই পদ্ধতির শীর্ষদেশে ছিল।"(৩৬)

ইসলামীয় সমাজ সাম্যবাদীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক ভাব ইসলামীয় সমাজের মর্ম্মস্থল মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করিয়াছিল যে, বলবন এবং তাহার উত্তরাধিকারীদের সময়ে, "একজনের নিম্নশ্রেণীতে জন্ম হইলেই তাহার সরকারী চাকরী প্রাপ্তির অন্তরায় হইত। অভিজাতেরা এবং রাজকর্ম্মচারীরা রাজসরকারে চাকরির জন্য উচ্চ শ্রেণীতে জন্ম প্রাপ্ত লোক ব্যতীত অনুরোধ করিতে সাহস করিত না।"(৩৭) ঐতিহাসিক বারনি বলিতেছেন, "বলবন নিম্নশ্রেণীতে জন্ম বা নিম্নশ্রেণীয় পেশার লোকদের সহিত বাক্যালাপ করিতেন না এবং বন্ধু বা বেগানা লোকদের সহিত মেশামেশি করিতেন না।" (৩৮)

৩৫। "Wakiat-i-Mushtaki," Elliot. IV. 547.

৩৬। Ishwari Prasad. "A History of the Quraunah Turks in India". p.259.

৩৭। Ibid. "History of Mediaeval India, p. 191.

৩৮। Barny in Elliot, III. p 118.

বহলুল লোদীর খুল্লতাত পুত্র এই অপমান সহ্য করিতে পারেন নাই যে, একজন সেকরার মেয়ের পুত্র সম্রাটের মুকুট ধারণ করিবে! (৩৯)

এক্ষণে সামাজিক অবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধান করা যাউক। অনুসন্ধানকারী বলিতেছেন (৪০), এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান কৃষ্টিগত কোন সংঘর্ষ ছিল না; বরং দুইদলের কৃষ্টির শক্তিসমূহ পরস্পরের সহিত মিলিত হইতেছিল, তাহাদের পার্থক্য উঠিয়া যাইতেছিল। এই যুগেই কবীর, নানক, নাথদের দ্বারা সন্ত আন্দোলনসমূহ সৃষ্ট হইয়া হিন্দু ও মুসলমানের পার্থক্য অন্তর্হিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এই সময়ের সুলতানের এবং হিন্দু রাজারা ভোগে থাকিতেন এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন (৪১)।

পুনঃ এই অনুসন্ধানকারী বলিতেছেন: "এই সময়ে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের সহিত হিন্দু সাধারণের পার্থক্য করা কতকটা মুস্কিল ছিল। বেশীর ভাগ ইহারা হিন্দু থেকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। এতদ্বারা তাহাদের সামাজিক অবস্থার কোন বস্তুতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, হয়ত কোন কোন স্থানে উন্নতিলাভ করিয়াছে। মুসলমান হইয়া সাধারণ মুসলমান তাহার পুরাতন বাতাবরণ অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকাবস্থা পরিবর্ত্তন করে নাই। ইহার ফলে ভারতীয় ইসলাম হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ লক্ষণ গ্রহণ করিতে লাগিল। মুসলমানদের সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীরা পরস্পর পৃথকভাবে থাকিবার জন্য একই নগরের বিভিন্নাংশে বাস করিতে লাগিল। অন্যদিকে, বিজাতীয় শাসকদের এবং সুবিধাভোগকারী শ্রেণীদের সম্মান প্রদর্শন করা হইত, তজ্জন্য বিদেশীয় এবং অ-ভারতীয় বংশোৎপত্তিই সামাজিক মর্য্যাদার শ্রেষ্ঠ দাবী রূপে গণ্য হইত। এইজন্য

৩৯। Ishwari Prasad, Mediaeval History of India.

৪০-৪১। M. Ashraf: op, cit P 131. এই বিষয়ে Cambridgre, "History of India." Vol. III. P.364. দ্রষ্টব্য।

লোকে যতদূরসম্ভব বিজাতীয় বংশোৎপত্তি নিজেদের জন্ত আবিষ্কার করিত" (৪২)।

এই বিষয়ে ঐতিহাসিক হাণ্টার বলিতেছেন, (৪৩) "ভারতের হাওয়াতেই জাতিভেদ আছে। ইহা মুসলমানদেরও সংক্রামিত করে এবং আমরা দেখি তাহাদের ক্রমাভিব্যক্তি হিন্দু বৈশিষ্ট্যানুযায়ী চলিতেছে। উভয় সম্প্রদায়ের উচ্চ সামাজিক পদ নির্ভর করে বিদেশীর উৎপত্তির উপর, উভয়েতেই উচ্চপদের চাবিকাটি হইতেছে "পশ্চিম"। শ্রমশিল্পজীবী মুসলমান শ্রেণীরা হিন্দুদের ন্যায় দস্তুরমত জাতিতে বিভক্ত, তাহাদের সমিতি (জাতি পঞ্চায়েৎ) আছে, তাহার কর্মচারীসমূহ আছে যাহারা জাতির নিয়ম পালন রক্ষা হইতেছে কিনা তাহার পর্য্যবেক্ষণ করে। অন্যথা হইলে 'একঘরে' (Boycott) করিবে।" গেট (৪৪) নামক আর একজন অনুসন্ধানকারীও এই প্রকারের সংবাদ দেন। কলু মুসলমান হইয়া "থালু" হইয়াছে, জুগী "জোলাহা" হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের হিন্দু আমলের জাতি-পঞ্চায়েৎ এখনও অটুট আছে।

পুনশ্চঃ, অনুসন্ধান দ্বারা অনুমিত হয়, হিন্দু অভিজাতশ্রেণীর বিলুপ্তির জন্য পৃষ্ঠপোষকত্বের অভাবে বিভিন্ন হিন্দু শিল্পী সম্প্রদায়গুলি মুসলমান হইয়াছে।

এই সময়ে কৃষকদের এবং উচ্চশ্রেণীর জীবনযাপনের মান সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। ধনীদের মধ্যে বহু ধন সঞ্চিত হইয়াছিল। একজন মুসলমান ঐতিহাসিক বলিতেছেন, মিঞা মহম্মদ কালাপাহাড় নামে

৪২। ঐ

৪৩। "Imperial Gazetteer", Vol II. P. 329.

৪৪। Gait, in Encyclo paedia of Religion & Ethics.

একজন আফগান আভিজাত্যীয় ব্যক্তি ৩০০ মণ সোনা সংরক্ষিত করিয়াছিল (৪৫)।

এই সময়ে "পর্দা"-প্রথা বিশেষভাবে পরিবর্দ্ধিত হয়। ডাঃ আসরাফ বলেন, বিদেশীয়, বিশেষতঃ মঙ্গোলদের আক্রমণ জন্য ইহা সংঘটিত হয়। পুনঃ, হিন্দু প্রথার ন্যায় অনুলোম বিবাহ চলিত, কিন্তু প্রতিলোম চলিত না। সৈয়দ সেখের কন্যা লইত কিন্তু দিত না। পূর্ব্বাগত বৈদেশিক মুসলমান ও দেশজ মুসলমানের মধ্যে বিবাহ ঘৃণ্য ছিল।

আকবরের পূর্ব্বের উত্তর-ভারতে শাসকেরা এবং উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সেই যুগীয় কৃষ্টি অনুযায়ী বিশেষ আরাম ও বিলাস মধ্যে বাস করিত। অন্যদিকে বেশীর ভাগ সাধারণ লোক প্রাচীনপন্থীয় চিরন্তন অবস্থায় নিমজ্জমান ছিল। তাহাদের কৃষ্টি অতি নিম্নাবস্থার ছিল, তাহাদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি প্রাচীন কুসংস্কার, তুকতাক ও ম্যাজিক মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তাহাদের মানসিক কৃষ্টি পরম্পরাগত উপাখ্যান, জনগত গান ও ভূতের গল্পে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। (৪৬)

পোষাক বিষয়ে দৃষ্ট হয়, উচ্চস্তরের মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু ফ্যাসানের পাগড়ী পরার রাওয়াজ চলিতে থাকে। অন্যদিকে হিন্দু অভিজাতেরা মুসলমান অভিজাতদের নকল করিত। সাধারণ হিন্দুরা খালিমাথা ও খালিপায়ে চলিত, একটা ধুতিই যথেষ্ট ভদ্রয়ানা পরিচ্ছদ ছিল। (৪৭)

এই যুগে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই: সমাজে কেবল উচ্চ স্তর এবং নিম্ন স্তর ছিল। অভিজাতেরা বিলাসিতায় নিমগ্ন ছিল। আর নিম্নশ্রেণীয়েরা

৪৫। "Tarikh-i-Shershahi of Abbaskhan" Serwani. B. M. Add. 2409. আসরাফ দ্বারা উদ্ধৃত, পৃঃ ২৩০।

৪৬-৪৭। আসরাফ ঐ, পৃঃ ৩২৮-৩২৯।

নিষ্পেষিত ও শোষিত হইত। বারনি বলিয়াছেন, আলাউদ্দিন খিলিজি হিন্দুদের কি প্রকারে শাসন করিতে হইবে তাহা মৌলবীদের জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা আবু হানিফার ব্যবস্থার কথা বলেন। ইহা সুলতানের মনঃপুত হয় নাই। তিনি বলিলেন, আমি হিন্দুদের যে অবস্থায় রাখিয়াছি তাহাতে তাহারা কেবল একটি লাঙ্গোটি পরিধান করিয়া জীবনধারণ করে। পুনঃ এই সময় ইজিপ্ত হইতে একজন মৌলবী ভারতে আসেন এবং তিনি সুলতানের কর্ম্মের অনুমোদন করিয়া বলেন, আমি শুনিয়া সুখী হইলাম যে, আপনি হিন্দুদের প্রতি যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তদ্বারা হিন্দু স্ত্রীলোকেরা ও তাহাদের পুত্রেরা মুসলমানের বাড়ী ভিক্ষা করিয়া খাইতেছে। তুমি পুণ্য অর্জ্জন করিতেছ (৪৮)। পুনঃ ফিরোজ টোগলকের সময়ে অসম্ভবভাবে দাসপ্রথা বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইয়াছিল। এই প্রকার (৪৯) অবস্থায় ইহা আশ্চর্য্যের কথা নয়।

আবার ইহাও দৃষ্ট হয়, যে স্থলে সমস্বার্থ হইয়াছে তৎস্থলে হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতেরা একীভূত হইয়া কার্য্য করিয়াছে। ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দু অভিজাতেরা দিল্লী হইতে বাঙ্গলা পর্য্যন্ত একীভূত হইয়া মোগলের বিপক্ষে লড়িয়াছে। একজন পাঠান অভিজাতকে মোগলরাষ্ট্র পরিচালক বৈরাম খাঁ পেনসন দিতে চাহিলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। হিন্দু সেনাপতি হেমুর স্ত্রীকে আকবর পেনসন দিতে চাহিলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। (৫০)

দাক্ষিণাত্যে ও বাহমণি রাষ্ট্র এবং পরের মুসলমান রাষ্ট্রসমূহে হিন্দু

৪৮। Ishwari Prasad "A History of Mediaeval India P. 312.

৪৯। Ishwari Prasad, A History of Mediaeval India.

৫০। আসরাফের পুস্তক ও "আকবর নামা" দ্রষ্টব্য।

অভিজাতেরা সুলতানদের স্বার্থের সহিত জড়িত হইয়াছিল। বিজাপুর প্রভৃতি রাষ্ট্রে চাকরী করিয়া নূতন মহারাষ্ট্র অভিজাতশ্রেণী উদ্ভূত হয়। শিবাজীর পিতা এমন একজন অভিজাত, ঘোড়পড়ে গোষ্টি এমন একটি বংশ। (৫১) ভবিষ্যতের মহারাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থান এতদ্বারা সম্ভব হয়।

এইসব দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা দেখি যে, মোগল-পূর্ব্ব যুগে, মুসলমান শাসিত ভারতে মুসলমান ও হিন্দু অভিজাতেরা এক স্বার্থের বিনিময়ে একীভূত হইয়াছিল। ইহারা সমবেতভাবে গণসমূহকে শোষণ করিত। মোগল বিজয়ে সেই সমস্বার্থে আঘাত পড়িয়াছিল, তজ্জন্যই সর্ব্বত্র উত্তর-ভারতে ও বাঙ্গলায় ইহারা মোগলের বিপক্ষে সমবেতভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল। অন্যপক্ষে এই সময়ে হিন্দু বনিয়াদি স্বার্থ, হিন্দু গোঁড়ামী— "হিন্দু জাতীয়তা" রূপ ধারণ করিয়াছিল। উভয় ধর্ম্মের গোঁড়ারা শ্রেণী-স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া সংস্কারান্দোলনের বিপক্ষে ছিল। খিলিজি ও টোগলক যুগে মুসলমান সাম্রাজ্যবাদ ইসলামের নামে ধর্ম্মান্ধতা প্রদর্শন করে ও হিন্দু সাধারণকে কঠোরভাবে পীড়ন করে। এই সময়ে মুসলমানকরণ সতেজে চলে।

এই যুগেই বাঙ্গলায় রঘুনন্দন, কাশী হইতে কমলাকরভট্ট, নীলকণ্ঠ, দক্ষিণ হইতে হেমাদ্রি নিবন্ধ লিখিয়া হিন্দু সমাজ সংরক্ষণের নূতন ব্যবস্থা প্রদান করেন। এতদ্বারা ইঁহারা বেদ, স্মৃতি ও তন্ত্রকে প্রাচীন ব্যবস্থা বলিয়া চাপা দিয়া নূতন ব্যবস্থা দ্বারা ঘোর অনুদারতা এবং স্বীয় শ্রেণী-স্বার্থের প্রাধান্যের কথা লিপিবদ্ধ করেন। ইহার ফলে হিন্দু সমাজের যুগধর্ম্মানুযায়ী পরিবর্ত্তনশীলতা ও অগ্রগতি শক্তি (Dynamism) ব্যাহত হইয়া হিন্দু সমাজকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কিন্তু সমাজশরীর মধ্যস্থিত দ্বন্দ্বনীতির ফলে সংস্কারকেরা স্বীয়

৫১। Ranade: "Rise of the Mahrattas."

সম্প্রদায় জন্য অন্ত ব্যবস্থা করেন (৫২)। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে চৈতন্য-দেবের স্বদেশে, তাঁহার শিষ্যদ্বয় গোপালভট্ট ও সনাতন গোস্বামী "হরিভক্তি বিলাস" নামক বৈষ্ণব স্মৃতি রচনা করেন। বাঙ্গলার বৈষ্ণবেরা তদ্দারাই পরিচালিত হন। রঘুনন্দনের মতানুযায়ী আচার পশ্চিমবঙ্গের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য শাক্তদের মধ্যেই গৃহীত হয়।

এই গোঁড়ামীর মধ্যেও আমরা শ্রেণী-স্বার্থ দেখি এবং নিবন্ধগুলিও শ্রেণী স্বার্থের পরিচায়ক।

দক্ষিণ ভারত

দক্ষিণ ভারতের কথা কহিতে গেলেই রামায়ণের গল্প হিন্দুর মনে উদয় হয়। এতদ্বারা হিন্দুর বদ্ধমূল ধারণা হইয়াছে যে, দক্ষিণাপথ জঙ্গলাকীর্ণ স্থান ছিল এবং তন্মধ্যে নর-খাদক অ-মানুষ জীব সকল বাস করিত। বাল্মীকি রামায়ণ সেই ধারণা প্রদান করে। এই মহাকাব্য মতে চিত্রকূট পর্ব্বত হইতে দক্ষিণের সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ঘন-বনানী সমাকীর্ণ স্থান, তন্মধ্যে স্থানে স্থানে উত্তরেব ঋষিবা গিয়া আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এই আশ্রমকে উপরোক্ত নরখাদকেরা উত্যক্ত করিত, সেইজন্য তাহারা ভগবানের কাছে ত্রাণকর্ত্তার আগমনের জন্য প্রার্থনা করিত। অবশেষে বিষ্ণু (উপনিষদের পরব্রহ্ম, বৈষ্ণবদের কাছে বিষ্ণু" হইয়াছে) রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া এই নরখাদকদের বিনাশ করিয়া ঋষিদের আবাস-স্থল নিরাপদ করে। এই নরখাদকদের রামায়ণে "রাক্ষস" বলা হইয়াছে। কিন্তু এই রাক্ষসেরা মহাভারতোক্ত রাক্ষস জাতি

৫২। এই সংস্কারকদের বিষয় ৺অক্ষয় কুমার দত্তের "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" দ্রষ্টব্য।

হইতে পৃথক। রামায়ণের রাক্ষসেরা উত্তরের লোকের ন্যায় সমান অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করে। তাহারা মানবের সঙ্গে বিবাহ করে। তাহাদের রাজার রাজধানী লঙ্কা, রামায়ণোক্ত সর্ব্ব নগর অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী এবং স্থপতিকার্য্যের পরাকাষ্ঠার নিদর্শন। পুনঃ ইহাদের নেতারা গোঁড়া বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে অনুরক্ত। দশমুণ্ড রাবণ পুরাণের পুলস্ত্য ঋষির পৌত্র এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৈদিক আচার পালন করিত। মায়াবী মারিচও তদ্রূপ।

ইহা হইল কাব্যের কবির বর্ণনা। রামায়ণ, মহাভারতের পর রচিত, এবং উভয়ই বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রচার জন্য লিখিত বলিয়া মনে হয়। ইহার শেষ কাণ্ডে গুপ্ত-সম্রাটদের রাজনীতির ছাপ প্রকাশ পায়। এই সব কবি কল্পনা দ্বারা আমরা ইতিহাসের কোন সন্ধান পাই না। এইজন্যই আমাদের বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের ফলকে আশ্রয় করিতে হয়।

ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, দক্ষিণ (ডেক্কান) ভারতের সর্ব্ব পুরাতন অংশ। তাঁহারা ভারতের উপদ্বীপ অংশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি আণ্টার্টিক মহাসমুদ্রের চারিধারকে "গণ্ডোয়ানা অঞ্চল" বলিয়া নামকরণ করিয়াছেন। এই সব অঞ্চল এক সময়ে একীভূত হইয়াছিল, তাহা ঘন হিমানী বেষ্টিত ছিল। দক্ষিণ পোল হইতে বিনির্গত তুষার রাশী পৃথিবীর এই অংশ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তখন ইহা "তুষার যুগের" অন্তর্গত ছিল। জীবন্ত প্রাণী তখন এইস্থলে ছিল না। এই সময়ে উত্তর ইউরোপ বরং গরম ছিল।

পরে, তিনটি মহাদেশ পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইলে প্লাইয়স্টিন (Pleistocene) বা কোয়ার্টারনারী (quarternery) বা তুষার যুগে (Ice age) এর কোন সময়ে বরফ পরিষ্কার হইলে মানব সেইস্থলে আবির্ভূত হয়। দক্ষিণ-ভারতে কোন্ সময়ে মানব আসিয়াছে তাহা

নিরূপণ করা দুরূহ। তবে এইটুকু অনুমান হয়, তুষার যুগের শেষের দিকে ভারতে মানবের আবির্ভাব হইয়াছে। নর্ম্মদা, গোদাবরী, সোয়ান (Soan) নদীসমূহের পাথর কুচির মধ্যে অথবা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মাটির উপরের স্তরে চেলিয়ান শ্রমশিল্প (Chellean industry) জনিত চকমকি নির্ম্মিত হস্তকর্ম্মের জন্য যন্ত্রপাতির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। উত্তরের উপর শিবালিক স্তরে এবং সোয়ান-নদীর পুরাতন মাটির স্তর মধ্যে পাথরের এই যন্ত্রসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্তরকে নিম্ন-তুষার-যুগের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। এইজন্য বলা হয়, শিবালিক পর্ব্বতমালাস্থিত স্তন্যপায়ী জন্তুর সমযুগীয় লোক হইতেছে ভারতীয় মানব। পুনঃ এই প্রাচীন মানবের নিদর্শনসমূহকে পুরাতন প্রস্তর যুগ ও নূতন প্রস্তর যুগ বলিয়া বিভাগ করা হয়। এই প্রস্তরযুগ অতিক্রম করিয়া ভারত "ব্রোঞ্জ-যুগ" বিবর্ত্তিত করে। ব্রোঞ্জের (কাংস) দ্রব্যসমূহ ব্যতীত, তাঁবার দ্রব্যসমূহ দক্ষিণ-ভারতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কিন্তু নর্ম্মদা ও গোদাবরী নদীসমূহের পুরাতন স্তরের পূর্ব্ব যুগে মানবের অস্তিত্ব স্বীকার করা একটা অনুমান মাত্র। শিবালিকের উচ্চ স্তরে মানবের অস্তিত্বের চিহ্ন নাই, হয়ত সর্ব্ব উচ্চ স্তরে তাহা ছিল (৫৩)।

এক্ষণে পুরাতত্ত্বের কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করা যাউক। এই বিষয়ে পূর্ব্বে সোয়ান-নদীর-স্তরে প্রাপ্ত প্রস্তর যন্ত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। হিমালয়ের তুষার-মধ্যযুগের স্তরের ভারতীয় নিদর্শনসমূহকে "মাদ্রাজ শ্রমশিল্প" (Madras Acheul) বলা হয়। এই শিল্পের যন্ত্র নির্ম্মাণ-

৫৩। D. N. Wadia : "Geology of India" (1944, Geological Survey of India. vols. IV and VI ; W. T. Blanford : "Geology of India" Pal. Indica I911-32 দ্রষ্টব্য।

কৌশল এবং তাহার অভিব্যক্তি দক্ষিণ-অফ্রিকার নিম্নপ্রস্তর যুগের শ্রম-শিল্পের অনুরূপ। কিন্তু ভারতে প্রস্তর যুগের নিদর্শন দ্বারা তাহার ব্যবহারকারী মানবের জীবনের কোন লক্ষণ বোধগম্য হয় না। হয়ত তাহারা যাযাবর ছিল (৫৪)। এইস্থলে ইহাও উল্লেখ্য যে, মধ্য-ভারতের গুহামধ্যে (সিঙ্গানপুর) যে সব চিত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা যে অগ্রে পুরাতন প্রস্তরযুগের মানবের অস্তিত্বের প্রমাণ প্রদান করে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল এবং তাহা দক্ষিণ-আফ্রিকা, স্পেনের জিব্রালটারের এবম্প্রকারের চিত্রের সহিত সাদৃশ্য প্রদান করে আর ইহার উপর ভিত্তি করিয়া কেহ কেহ একটা Brown Race যাহা দক্ষিণ-ভারত হইতে স্পেন পর্য্যন্ত অতি প্রাচীনকালে বিস্তৃত ছিল, তাহা কর্ণেল গর্ডন অনুসন্ধান দ্বারা খণ্ডন করেন। ইনি বলেন, ইহা যে পুরাতন-প্রস্তরযুগের শিল্পকলার নিদর্শন তাহার কোন প্রমাণ নাই। ইহার তারিখকে খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চ শতকের পূর্ব্বে লওয়া যায় না (৫৫)।

এক্ষণে নরতাত্ত্বিক কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করা যাউক। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা "দ্রাবিড় মূলজাতি", "আর্য্য-মূলজাতি", "ভারতের আদিম মানব" হইতেছে "নিগ্রোবটু" ইত্যাদি অনেক কল্পিত মূলজাতির সৃষ্টি করিয়া ভারতের ইতিহাসে বিভীষিকা উৎপাদন করিয়াছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ জার্ম্মাণ নরতত্ত্ববিদেরা যাঁহারা ভারতে আসিয়া অনুসন্ধান করিয়া স্বীয়মত লিপিবদ্ধ করেন তাঁহারা দক্ষিণের আদিবাসীদের সিংহলীয় "ভেদ্দা-স্থায়" (veddaid) জাতি বলেন। এই জাতি মূলতঃ ককেশীয় মূলজাতির সহিত সম্বন্ধ রাখে; কারণ তাহাদের মাথার চুলের মূল

৫৪। Stuart Piggot: "Pre-Historic India" দ্রষ্টব্য।

৫৫। Col. D. H. Gordon: Paper on "Mahadeo Hills" in Indian Art and Letters, X. 135-41.

ইণ্ডো-ইউরোপীয়দের ন্যায়। পুনঃ তাঁহারা দ্রাবিড় মূলজাতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, উত্তরের লোকদের সহিত দক্ষিণের আদিবাসীদের সংমিশ্রণে যে সব লোকের জন্ম হইয়াছে তাহারাই "দ্রাবিড়" বলিয়া কথিত হয় (৫৬)। শেষে আইকষ্টেড্ট দুইবার ভারতে আসিয়া এইমত ব্যক্ত করিয়াছেন: "দ্রাবিড় জাতি" এই নামটা ভ্রম উৎপাদক। ইহারা ভূমধ্যসাগরীয় জাতির অন্তর্গত। এই নামটি উঠাইয়া দেওয়া হউক (৫৭)। তিনি অবশ্য সমগ্র ভারতবাসীদের ভূমধ্যসাগরীয় জাতির একটি শাখা বলেন। ইনি তাহাদের নামকরণ করিয়াছেন Indiden (ভারতবাসী সকল)।

অবশ্য এই স্থলে উল্লেখ্য যে, বহুপূর্ব্বে ফ্লাওয়ার, হাক্সলী প্রভৃতি ইংরেজ মনীষীরা তথাকথিত দ্রাবিড় জাতিকে ভূমধ্যসাগরীয় জাতির অন্তর্গত বলিয়াছেন। শেষে আসেন, ভারতীয় সরকারী নরতত্ত্ববিদ গুহ। ইনি তেলেগুদের বা অন্ধ্রদের বিষয়ে বলিয়াছেন, ভারতের মধ্যে ইহারা খাঁটি ভূমধ্যসাগরীয় জাতীয় লক্ষণ বিশিষ্ট।

নিরপেক্ষ জার্ম্মাণদের অনুসন্ধানানুসারে দক্ষিণে আদিমবাসী এবং মিশ্রিত লোকসমূহ আছে। ইত্যবসরে একটি অতি প্রাচীন নর-করোটি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে আদি চানেল্লুর নামকস্থানে। এইবিষয় Zuckerman বলিতেছেন: "Craniological evidence derived from the present populations of the Dekkan does not support the hypothesis of a Pre-Dravidian racial stock whose representatives are, amongst others, the Australians, the jungle

৫৬। Emil Schmidt; von Luschan দ্রষ্টব্য।

৫৭। E. von Eickstedt: Rassenkunde und Rassengeschichte দ্রষ্টব্য।

tribes of southen India and the Veddahs of Ceylon. It is difficult however to decide whether craniological evidence is a fundamental criterion of race, if it were, the hypothesis of a common stock for the Jungle people of the Dekkan and the aborigines of Australia would be untrue." (৫৮) ইহার অর্থ: ডেকানের বর্ত্তমানের লোকদের করোটির পরীক্ষার ফলদ্বারা তাহাদের "দ্রাবিড়-পূর্ব্ব" (pre-Dravidian) মূলজাতি যাহার প্রতিনিধি হইতেছে অষ্ট্রেলীয়, দক্ষিণ-ভারতের জঙ্গল জাতিসমূহ এবং সিংহলের ভেদ্দাজাতিসমূহ তাহা হইতে উৎপন্ন এইমত সমর্থিত হয় না। করোটীর সাক্ষ্য দ্বারা একটা মূলজাতি নির্দ্ধারণ করা বড় শক্ত কথা। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ডেকানের জঙ্গলজাতিসমূহের সহিত অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের এক উৎপত্তিরূপ মত অস্বীকৃত হইবে।

তৎপর, দ্রাবিড়-ভাষী লোকেরা যাহাদের পূর্ব্বে Dravidian proper বলা হইত (হাডন দ্রষ্টব্য) তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে বিভিন্নতা দৃষ্ট হইবে। থারসটনের পরীক্ষার দ্বারা দুইটি মূলজাতীয় লক্ষণ পাওয়া গিয়াছে: একটি লম্বা মাথাবিশিষ্ট, আর একটি গোল মাথা-বিশিষ্ট; ডাঃ গুহও এই কথা বলিয়াছেন। এই গোলমাথার লোকদের শরীরের লক্ষণ পূর্ব্ব এবং পশ্চিম ভারতের আর্য্যভাষী গোলমাথাবিশিষ্ট লোকদের সহিত সাদৃশ্য আছে। পুনঃ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এলিয়ট স্মিথ আদি-চানেল্লুরে প্রাপ্ত একটি করোটি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, "ইহা ভূমধ্যসাগরীয় জাতি যাহা বর্ত্তমান ভারতীয়দের মধ্যে বিশিষ্টভাবে আছে, তাহার সহিত মিল হয়" (৫৯)। কিন্তু তিনি সুকারমানের উপরোক্ত

৫৮। "Bulletin on the Adichanellur skulls p. 19.

৫৯। "Essays on the Evolution of Man. p. 130. 1927.

অভিমতের উপরে এই টিপ্পনী করিয়াছেন যে, এই করোটি খাঁটি ভূমধ্য-সাগরীয় নয়; বরং ইহা যাহা তিনি Maritime Armenoid (সামুদ্রিক আরমনীয় ন্যায়) যাহা আলপাইন মূলজাতির একটা শাখা এবং যাহা "দ্রাবিড়" নামে খ্যাত মিশ্রিত লোকদের একটি উপাদানরূপে আছে, তাহারই এক নিদর্শন। বর্ত্তমান ইংরেজ বৈজ্ঞানিকদের মতের সহিত জার্ম্মাণ নরতত্ত্ববিদের মতের ঐক্য দৃষ্ট হয় যে, "দ্রাবিড়" বলিয়া একটা মূলজাতি নাই, আছে মিশ্রিত লোকসমূহ। পুনঃ এই মিশ্রিত লোকদের মধ্যে ভূমধ্যসাগরীয় এবং আরমেনীয়-ন্যায় মূলজাতীয় লক্ষণের লোকও আছে। এই প্রকারে সাম্রাজ্যবাদীদের সৃষ্ট "দ্রাবিড় জাতি" অন্তর্ধান করে। আর যেসব উপাদানে দক্ষিণের লোকসমূহ বিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা উত্তরেও আছে।

এইস্থলে ভাষার কথা উঠে। আমরা দেখিলাম, দ্রাবিড় জাতি নাই, আছে কিন্তু "দ্রাবিড় ভাষা।" এই ভাষার সহিত বর্ত্তমান জগতের কোন মূলভাষার মিল নাই। ষ্টেন কনো (৬০) এইজন্যই ইহাকে একটি স্বতন্ত্র বিবর্ত্তিত ভাষা বলিয়াছেন। অবশ্য দ্রাবিড় ভাষাসমূহে সংস্কৃত শব্দসমূহ নানাসংখ্যায় বিরাজ করিতেছে। ইহা কৃষ্টির ফল; উত্তর এবং দক্ষিণ ভারত একই ভারতীয় এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীয় কৃষ্টির অন্তর্গত।

দক্ষিণ-ভারতের এই প্রাগৈতিহাসিক তত্ত্ব বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল, যেহেতু বিদেশীয় সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে নানাভাবে বিচ্ছিন্ন ও বিখণ্ডিত করিয়া লোকগোচর করিয়াছে, এবং তাহার জেরস্বরূপ ভারতীয়দের মনকে পরস্পরের প্রতি বিষাক্ত করিয়াছে।

এক্ষণে ইতিহাসে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,

---

৬০। Sten Konow "On Dravidian Language" in Linguistic Survey of India by Grierson.

বৈদিক যুগে বেত্তলিয়া লোকেরা দক্ষিণে পলাইয়া যাইত। দক্ষিণ, বেদের লোকদের অজানিত স্থান ছিল না; কারণ, "কাবায় বস্ত্রপরিহিত মুনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে পরিভ্রমণ করিত" (১০-১৩৬)। পুনঃ ঋকবেদে "চতুরাঃ সমুদ্রান্" (৯।৩৩,৬) উল্লেখ আছে। এতদ্বারা অনুমিত হয় তৎকালের লোকেরা জানিত যে ভারতবর্ষ সমুদ্রবেষ্টিত। পুনঃ ইহাও কোন কোন মনীষী দ্বারা কথিত হয় যে, বৈদিক পর যুগের সূত্রকারেরা যথা. আপস্তম্ভ, বৌধায়ন দক্ষিণাপথবাসী ছিলেন।

ইহার পর আমরা মৌর্য্য-পর যুগের খারবেলের হস্তিগুম্ফায় খোদিতলিপিতে (খৃঃ ২০০) এই সংবাদ পাই যে, রাজা নন্দ গোদাবরী তীরের জিনমূর্ত্তি পাটলীপুত্রে লইয়া যান (৬১)। এতদ্বারা আমরা এই তথ্য অনুমান করি যে, অতি প্রাচীন কালেই জৈনধর্ম্ম সুদূর দক্ষিণে প্রচারিত হইয়াছিল। পুনঃ আমরা শুনি ভারতের প্রথম সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য শেষকালে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া তাঁহার জৈনগুরু পৌণ্ড্র নগরের ভদ্রবাহুর সহিত দক্ষিণের মহীশূরের অন্তর্গত, শ্রাবণ বেলগোলা নামক স্থানে অবস্থান করেন (৬২) এবং তথায় দেহত্যাগ করেন। দক্ষিণ নিশ্চয়ই তখন চন্দ্রগুপ্তের অধীন ছিল বা প্রভাবাধীন ছিল।

ইহার পর আমরা চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকের লিপি হইতে শুনি

৬১। EP. Ind. Vol. XX. No, 7. The Hasthigumpha Inscription of Kharvela.

৬২। এই তথ্য বিষয়ে সন্দেহ আছে। ৺পুরান নাহার বলিয়াছেন, ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। তাঁহার "শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের প্রাচীনতা" পৃষ্ঠা ৮৯—৯৭ উনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, ১৩৩৬ সাল, দ্রষ্টব্য।

যে, তিনি কলিঙ্গদেশ জয় করিয়া অনেক নরহত্যা করেন, তজ্জন্ত তিনি মানসিক পীড়া বোধ করিয়া বৌদ্ধ অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত হন (Rock Edict XIII)।

মৌর্য্যযুগের অবসানের পর, কলিঙ্গের পুনরুত্থান হয়। তথাকার রাজা খারবেল বলিতেছেন যে, তিনি নিজেকে ঐর (ঐল) বংশোদ্ভব চেট (চেদি) বংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। তিনি অসংখ্য নগর-সভা (city-corporation) ও রাষ্ট্রীয় সভা (Realm corporation) গুলিকে সুবিধা (privilege) প্রদান করিয়াছেন, রাজগহ (রাজগৃহ) উপর চাপ দেন, তাহার বীরত্বের কথা শুনিয়া যবনরাজ ডিমিত (Demetrius) মথুরাতে পালাইয়া যায়, ব্রাহ্মণদের অনেক বিষয়ে "মাপ" (Exemption) প্রদান করেন, ভারতবর্ষ জয় করেন।

তিনি একশত তের বৎসরের 'ত্রমিড়' (দ্রমিড়) দেশসমূহের সংঘ, (confederacy) যাহা তাহার দেশের পক্ষে বিপদজনক ছিল, তাহা বিধ্বংস করেন; বার বৎসর রাজত্বকালে উত্তরাপথের রাজাদের ভয় প্রদর্শন করেন; মগধের লোকদের ভয় উৎপাদন করিয়া 'সুগঙ্গীয়' প্রাসাদ (চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ) মধ্যে হস্তি চালাইয়া দেন; মগধরাজ বহসতমিত্তকে তাহার পদানত করিয়া কলিঙ্গ-জীনের মূর্ত্তি, যাহা রাজা নন্দ লইয়া গিয়াছিল, তাহা পুনস্থাপিত করেন, তিনি "অঙ্গ"সমূহ পুনঃ সঙ্কলন (উপাদয়ন্তি) করান; ভারতের সর্ব্বত্র হইতে জৈন পণ্ডিতেরা আসিয়া পুস্তকসমূহ পুনঃ লেখেন। জৈন ধর্ম্মপুস্তকসমূহ হয় বিক্ষিপ্ত-ভাবে ছিল বা বিনষ্ট হইয়াছিল। তজ্জন্য এই জৈন রাজা ভুবনেশ্বরের নিকটে হস্তিগুম্ফাতে একটি জৈন-সাধুদের সম্মেলন (সংঘযানো) আহ্বান করিয়া পুস্তকগুলি পুনরুদ্ধার করেন। এই লিপিতে শেষে খারবেল বলিতেছেন, তিনি সর্ব্ব সম্প্রদায়কে সম্মান করেন, সমস্ত মন্দির

পুনর্নির্মাণ করিয়াছেন। তিনি রাজর্ষি বসুর বংশধর মহান বিজয়ী রাজা খারবেল।

এই লিপিদ্বারা আমরা এই সংবাদ পাই, কলিঙ্গরাজ খারবেল, অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং সমগ্র ভারতে দিক্‌বিজয়ের পরিক্রমা করিয়া, অশোকের অনুকরণে জৈন সঙ্গীতি আবাহন করিয়া ধর্ম্মপুস্তকসমূহের পুনরুদ্ধার করেন। খারবেলকে জৈনধর্ম্মের "মহান কন্সটানটাইন" বলা যাইতে পারে

দ্বিতীয় সংবাদ এই, ইহাতে উত্তর-ভারতকে অর্থাৎ উত্তরাপথকে ভারতবর্ষ বলা হইয়াছে। কিন্তু বহু পরের যুগে, বিষ্ণুপুরাণ হিমালয় হইতে দক্ষিণের তাম্রপর্ণী নদী যাহা ভারতের সর্ব্ব দক্ষিণ এবং শেষ নদী তৎপর্য্যন্ত সমুদায় স্থানকে "ভারতবর্ষ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। এতদ্বারা নির্দ্ধারিত হয় এই নামটি কৃষ্টিবাচক। ঋকবেদের ভরতকুল এবং তাহাদের সাঙ্গপাঙ্গের দলের কৃষ্টি যতদূর স্থাপিত হইয়াছে ততদূর ব্রাহ্মণ্য পৌরহিত্যতন্ত্র ভারতবর্ষ বলিয়া আদৃত করিয়াছে। পুনঃ স্মৃতিসমূহ পাঠে দৃষ্ট হয়, এই ভারতবর্ষ ও উত্তরের আর্য্যাবর্ত্তের সীমানা বহুবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিভিন্ন বৈদেশিক আধিপত্য দ্বারাই এই সীমানার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ শব্দটি বৈদিক যুগের পরে সৃষ্ট। ঋকবেদে কেবল বিভিন্ন কৌমের মধ্যে "ভরতম্ জনম" নামোল্লেখ আছে। বৈদিক ঋষিদের মধ্যে অনেকেই ভরত কুলোদ্ভব। এক ভরতরাজবংশেই পাঁচজন ঋষির উদয় হয় (৬৩)। এই জন্যই পরের যুগের অগ্নিপুরাণ বলিয়াছে, ভারত রাজবংশে অনেক মহর্ষি ও রাজর্ষি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এতদ্বারা

৬৩। Dialctics of Hindu Ritualism, vol. 1, P. 107.

অনুমিত হয়, যে সব ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং ক্রিয়াকাণ্ড এই শাসকশ্রেণী সমুদ্ভূত করিয়াছে, তাহা যতদূর প্রসারিত হইয়াছে ততদূরই 'ভারতবর্ষ'। এই সূত্র ধরিয়া আমরা যাস্কের কথার অর্থ ধরিতে পারি, যখন তিনি কীকট দেশকে "অনার্য্য জনপদ" বলেন।

পুনঃ বৈয়াকরণিক পাণিনির সূত্র 'ভরত' একটি প্রাচ্য (২।৪,৬৬) জনপদ। এই জনপদের লোক ভারত। হয়তঃ পঞ্জাবের পূর্ব্বে (পাণিনি পাঞ্জাবের লোক ছিলেন) ভরত নামে কোন জনপদ ছিল। তাহারই কল্পিত নেতা (Hero-epomym) ছিল ভারত। "ইক্ষাকু" শব্দেরও উৎপত্তি তদ্রূপ। এইসব স্থলে দেশ হইতে দেশনেতার নাম সৃষ্ট হইতেছে।

এই লিপির তৃতীয় সংবাদ এই, খারবেল পাটলীপুত্র হইতে "কলিঙ্গ-জিন" মূর্ত্তি উদ্ধার করেন। জয়শোয়াল এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁহারা এই লিপির অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারা অনুমান করেন, ইহা সলিল-জিনের মূর্ত্তি। ইনি মাদ্রাজ বিভাগেব গোদাবরী জেলার ভাদলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্বারা আমরা নির্দ্ধারণ করি, বুদ্ধ ও তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্দ্ধমানের পর ও নন্দরাজবংশের অগ্রে দক্ষিণে জৈন-ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, কারণ মৌর্য্যযুগের অগ্রেই কতিপয় প্রাচীন স্মৃতিকার দক্ষিণে উদয় হইয়াছিলেন, এবং বেদের যুগের সাধুরা তথায় যাতায়াত করিতেন ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

চতুর্থ সংবাদ এই, এই লিপি দ্বারা আমরা সংবাদ পাই জৈন সম্প্রদায় তখন মূর্ত্তিপূজায় অনুরক্ত হইয়াছে। ইতিহাস পাঠে এই তথ্যই সংগৃহীত হয় যে, জৈনরাই সর্ব্বপ্রথম মূর্ত্তিপূজার উদ্ভাবন করেন। স্বামী দয়ানন্দও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন।

পঞ্চম সংবাদ এই, এই লিপিতে আমরা দ্রাবিড়-ভাষীদের রাজনীতিক সংঘের অস্তিত্বের উল্লেখ পাই। খারবেলের হিসাবানুযায়ী এই সংঘ মৌর্য্যযুগের পূর্ব্বে বা উত্তরে মৌর্য্যশাসন স্থাপন সময়ে গঠিত হয়। এতদ্বারা বোধগম্য হয়, দ্রাবিড়-ভাষীরা তৎকালে উন্নততর জাতি ছিল।

শেষের সংবাদ এই, সঠিক ঐতিহাসিকযুগে দক্ষিণের বেশীর ভাগ স্থল মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। দক্ষিণে অশোকের খোদিত-লিপিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সময়কার সামাজিক ব্যবস্থাবিষয়ে আমরা অন্ধকারে অবস্থিত। কিন্তু কথা এই স্থলে উঠে, পুরাণাদিতে যে অগস্ত্যের বিন্ধ্য পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া দক্ষিণে গমন উল্লিখিত হইয়াছে, রামায়ণে পুলস্ত্য ঋষির পুত্র বিশ্রবা রাবণের মাতাকে বিবাহ করে ইত্যাদির অর্থ কি? কিছুদিন ধরিয়া সাম্রাজ্যবাদীয় প্রচেষ্টার ফলে, দক্ষিণে "দ্রাবিড় স্বদেশ প্রেম" উদ্ভূত হইয়াছে; ইহা "দ্রাবিড় কৃষ্টি" সৃষ্টি করিয়াছে, রামায়ণোক্ত স্থানসমূহ দক্ষিণে সনাক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এমন কি "লঙ্কাও" দক্ষিণ ভারতে অনুমিত হইয়াছে; রাবণ শব্দ দ্রাবিড় 'ইরাবন' (Iraivan বা Ieiravan) শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়। ইরাবন অর্থে "রাজা ভগবান" ইহাও স্থির হইয়াছে। রাজা বা ঈশ্বর পদবাচক দ্রাবিড় 'ইরাইবন' শব্দ হইতেই সংস্কৃত রাবণ শব্দ কল্পিত হইয়াছে। (৬৪)

অগস্ত্যকুল ঋকবেদের ঋষি গোষ্টি; তাহারা অনেকগুলি সূক্ত রচনা করিয়াছে। কিন্তু বেদে অগস্ত্যের দক্ষিণে গমনের উল্লেখ নাই; পরে তাহার নাম দক্ষিণের সহিত বিজড়িত করা হয়। রামায়ণে কথিত

(৬৪) J. R. A. S. 1914. P. 285; Pargiter: "Ancient Indian Historical Tradition" P, 121.

হইয়াছে, অগস্ত্য আশ্রম দণ্ডকারণ্যের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। সুন্দরকাণ্ডে তিনিই রাবণের জন্ম বৃত্তান্ত এবং দিক্‌বিজয়ের কথা রামের কাছে বর্ণনা করেন। অবশ্য এই কাণ্ডটি রামায়ণে পরে সংযোজিত হয়। পুনঃ যবদ্বীপে এক সময়ে (৭০০-৮০০ খৃঃ) 'অগস্ত্য ধর্ম্ম' প্রচলিত ছিল, (৬৫) তাহার প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক সময়ে তাহার পূজা হইত। পুনঃ অগস্ত্যের সমুদ্র শোষণের কথা পুরাণাদিতে আছে। পুরোহিততন্ত্রের এইসব গাল-গল্পের কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। তবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রসারের সময়ে যখন ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়, তৎকালে বৈদিক গল্প লইয়া পুরাণাদি রচিত বা নূতনভাবে সঙ্কলিত হইতে থাকে। এই সময়েই উত্তরাপথবাসীদের দ্বারা দক্ষিণে "শান্তভাবে প্রবেশ" (peaceful penetration) হয়। এই সময়ের উত্তরের ব্রাহ্মণ্যবাদীয় কৃষ্টির বাহনরূপে বৈদিক ঋষি অগস্ত্যের নাম উল্লিখিত হয়। যাহাই হউক, রামায়ণ পাঠে আমরা বোধগম্য করি, দক্ষিণের অগস্ত্য উত্তরের ব্রাহ্মণ্যবাদীয় কৃষ্টির প্রতীক (culture hero) বলিয়া কল্পিত হয়। যখন আর্য্যভাষীরা সমুদ্র পারে গিয়া যবদ্বীপে উপনিবেশ করিল, তখন অনার্য্যভাষীদের কাছে আর্য্যভাষীয় কৃষ্টির প্রতীক অগস্ত্যকেও লইয়া যায়। ক্রমে তিনি তথাকার একজন দেবতা হন, যেমন অসভ্য উত্তর-ইউরোপীয়দের কাছে যে প্রথমে খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার করিয়াছে, সেই দেশের patron sintরূপে পরে পূজ্য হন।

পরে গুপ্তযুগে, যখন একজন Benevolent despotরূপ আদর্শ প্রয়োজন হয় তখন ব্রাহ্মণ কবি রাম legend সৃষ্টি করেন। রামও একজন culture hero কিন্তু conquering hero (বিজয়ী বীর)।

৬৫। Bijouraj Chatterjee. India and Java. Pt. 1. P. 36.

অগস্ত্য এবং অন্যান্য ঋষিদের শান্তভাবে প্রবেশ দ্বারা দক্ষিণাপথে ব্রাহ্মণ্যবাদ সুদৃঢ় হয় নাই। এইজন্য অগস্ত্যের complementরূপে ব্রাহ্মণদের শত্রু-বিনাশকারী রামের প্রয়োজন হয়। পরে, ব্রাহ্মণ্যবাদের বিজয়স্রোত যখন সমুদ্রের পরপারে যাইল, অগস্ত্যও সমুদ্রশোষণ করিয়া যবদ্বীপে যাইলেন, রামও সমুদ্রকে তাড়না করিয়া পার হইয়া শত্রু বিনাশ করিয়া লঙ্কা জয় করেন। এক্ষণে পৌরাণিক এবং রামায়ণের গাল-গল্প বাদ দিয়া দক্ষিণাপথের সামাজিক ও কৃষ্টির অনুসন্ধান করিতে হইবে।

এই বিষয়ে এইটুকুই শেষ কথা ভারতের ইতিহাসে আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছি, ততদূর আমরা আর্য্য-কৃষ্টি হয় জৈনধর্ম্ম বা ব্রাহ্মণ্যবাদরূপে দক্ষিণে বিরাজ করিতে দেখি।

এইস্থলে আমরা এই তথ্য পাই, সুদূর দক্ষিণে দ্রাবিড়-ভাষীদের একটা রাজনীতিক সংঘ ছিল, তাহা কলিঙ্গ রাষ্ট্রের ভয়ের কারণ ছিল; পরে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের ভিতর দক্ষিণের "অপরান্ত" স্থান ব্যতীত সমগ্র দেশ অশোকের শাসনাধীন ছিল; পরে কলিঙ্গ রাজ খারবেল এই স্থান জয় করেন। তাঁহার সময় নগর-নিগম, রাষ্ট্রীয়-নিগম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ছিল। তিনি অনেক কারুকার্য্যপূর্ণ দুর্গের চূড়া (Tower) নির্ম্মাণ করেন; এই কর্ম্মের জন্য একশত মিস্ত্রীর বাসস্থান প্রদান করেন, তাহাদের ভূমির খাজনা মাফ করিয়া দেন। শেষে তিনি নিজেকে রাজর্ষি বসুর সন্তান বলিতেছেন। এই চেদীরাজ বসু ঋকবেদের চেদীরাজ কসু হবেন যিনি ব্রাহ্মণদের অনেক দান করিয়াছেন।

এতদ্বারা কলিঙ্গে আমরা উত্তর-ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতিক ব্যবস্থা দেখিতে পাই। ইহার পর আসে, অন্ধ্র রাজারা, তাহাদের বিষয় কিছু জানা যায় না। (৬৬)

৬৬। ইতিহাসে একটা নূতন নাম উঠিলেই পুরাণ ও স্মৃতিকারেরা

অন্ধ্রদের বর্ণসঙ্কর জাতির মধ্যে গণ্য করিয়াছে (১০।৩৬)। বাঙ্গলার পাল রাজাদের খোদিতলিপিতে দান ঘোষণা করিবার সময় "অন্ধ্র চণ্ডাল পর্য্যন্তান্" এই শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্বারা অনুমিত হয় যে অন্ধ্ররা পতিত ও অস্পৃশ্য জাতির মধ্যে গণ্য হইত। ভাগবৎ পুরাণে বলিতেছে: "কন্ববংশের সুশর্ম্মাকে হত্যা করিয়া তাহার ভৃত্য অন্ধ্রজাতীয় শক্তিশালী বৃষল (বৃষলো বলী) কিছুকালের জন্য মহীভোগ করিবে" (১২।১, ২০)। এতদ্বারা অন্ধ্রদের শূদ্র তুল্য পরিগণিত হইত। হয়তঃ দক্ষিণের কোন কৌম এই সময়ে রাজনীতিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহারা গোঁড়া পুরোহিত-তন্ত্রের নিকট ঘৃণ্য হইত। প্রাচীন স্মৃতিকারেরা দক্ষিণের লোকদের উপর ঘৃণাই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে (বৌধায়ন ১।১।২৯)। ব্যাস বলিতেছে, "অঙ্গ, বঙ্গ, অন্ধ্র এবং অন্যান্য ম্লেচ্ছ জাতিদের দেশে যাইবে না। আর যাইবে না যথায় কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে না" (স্মৃতি-চন্দ্রিকা ধৃত ব্যাস বচন ১, পৃঃ ২২)।

কিন্তু অনুমিত হয় যে অন্ধ্র রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিল; কারণ তাহারা অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিল। মৎস্য-পুরাণ (১৪৪, ৪৩ক) এবং ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ (২।৩১, ৬৭ খ) "শূদ্র-যোনয়" রাজাদের দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনের কথার উল্লেখ করিয়াছে। খোদিত-লিপিতেও দৃষ্ট হয়, অন্ধ্র রাজারা বৈদিক "অশ্বমেধ" ও "গবময়নম্" যজ্ঞ করিতেছেন। (৬৭) এইস্থলে ইহাও স্মরণ করিতে হইবে যে ব্রাহ্মণ্য পুরাণসমূহে নন্দ ও মৌর্য্য

চতুবর্ণের বাহিরে মিশ্রিত জাতি বলে আখ্যা দিয়াছে। যেমন ইংরেজ লেখকেরা মধ্যযুগীয় ভারতীয় জাতিগুলিকে বৈদেশিক বংশজাত বলিয়া ধার্য্য করিতেন।

৬৭। Ind. Antiquary. vol. XLVIII. 1919. P. 77

সম্রাটদের শূদ্র বলিয়া পরিগণিত করিয়াছে। নন্দ হইতে অন্ধ্র পর্য্যন্ত শূদ্র রাজাদের রাজত্বকালে বৈদিক ধর্ম্ম এবং বর্ণাশ্রম পদ্ধতি বিপর্য্যস্ত হয়। পুরোহিত-তন্ত্র তাহাদের পুস্তকসমূহে চেঁচাইয়াছে, ইহা "কলি বৃদ্ধির ফল" (কুর্ম্ম-পুরাণ, ২৯, ১৩; মৎস্য ১৪৪, ৪০ ; বায়ু ৬৮, ৬৪ প্রভৃতি)। এই আক্ষেপে আমরা বোধগম্য করি, তখন অবৈদিক ধর্ম্মসমূহ বৃদ্ধি পাইতেছে, বর্ণাশ্রম উলট-পালট হইতেছে। শূদ্র রাজা হইতেছে এবং বৈদিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে, তদ্রূপ যবন রাজা তিমিত্র (Demetrius) বৈদিক যজ্ঞ করিতেছে ; পরম ভাগবত হেলিওডোর (Heliodoros) নিজেকে বাসুদেব ভক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছে এবং গরুড়-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতেছে। (৬৮)

এই যুগটি ভারতের একটি অন্ধকার (Daemarung) যুগ। ভারতীয় অভিব্যক্তির কটাহে নূতন কোম সকল নিক্ষিপ্ত হইয়া নূতন ঐতিহাসিক জাতি সব সৃষ্ট হইতেছে। এই সময়ে ভারতীয় রাজনীতির শক্তিকেন্দ্র দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছে; কারণ উত্তর কুসানবংশের প্রভাবাধীন। তাহারাও বৌদ্ধ হইয়াছে এবং তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করিয়া অশ্বঘোষ দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান শাখার সৃষ্টি করিয়াছে। এই সময়ে দৃষ্ট হয় উত্তরাগত যবন ইন্দ্রাগ্নিদত্ত বৌদ্ধস্তূপ স্থাপন করিতেছে; শক অগ্নিবর্ম্মার কন্যা বিষ্ণুদত্তা এবং গণপক বিশ্ব বর্ম্মণের মাতা বৌদ্ধস্তূপে দান করিতেছে। এই সময়ের হিন্দু সমাজের চিত্র যাহা ব্রাহ্মণ্য পুরাণসমূহে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহা বৌদ্ধজাতকসমূহের সহিত মূলক পার্থক্য নাই। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট ছক ধরিয়া সমাজ বিবর্ত্তিত হইতেছে না (ইহা কখনও এই ছক ধরিয়া চলে নাই)।

৬৮। D. R. Bhandarkar. Arch. Survey of India. Annual Report. 1914-15. P. P. 77 78.

উভয় দলের পুস্তকের বর্ণনায় সাদৃশ্য আছে; তবে জাতক স্বভাবসিদ্ধ ঘটনার বর্ণনা করিয়াছে। পুরোহিততন্ত্র ইহা কলির দৌরাত্ম্য বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছে। (৬৯) ইহাই হইল খৃঃ ২০০ শতাব্দী পর্য্যন্ত সামাজিক বর্ণনা। এই যুগে দক্ষিণে আমরা অ-ব্রাহ্মণদেরই সমাজে আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখি।

তৎপর আমরা "অন্ধ্রভৃত্য" শতবাহন রাজাদের. মহারাষ্ট্রে রাজত্ব করিতে দেখি। প্রচলিত ঐতিহাসিক পাঠ্য-পুস্তকসমূহে "অন্ধ্র" এবং "অন্ধ্রভৃত্য" রাজাদের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু আমরা পুরাণে সেই পার্থক্য পাইতেছি। অন্ধ্রভৃত্য শতবাহনেরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন এবং ধর্ম্ম স্থাপয়িতা বলিয়া গর্ব্ব করিতেছেন। একটী নাসিক গুহালিপিতে বলিতেছে: সিরিসতকর্ণি গোতমীপুত্র যিনি শতবাহন বংশের গৌরব পুনঃ স্থাপন করেন (৭০) (তিনি) এক বীর, এক ব্রাহ্মণ "(২ সংখ্যা লিপি)।

পুনঃ ইনি গুজরাট মালবের পারদ খরহট রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন। ইনি নিজেকে বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে ত্রিবাঙ্কুর পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন। নাসিক প্রশস্তিতে ইনি একজন সমাজ-সংস্কারক রূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। "তিনি ক্ষত্রিয়দের গর্ব্ব ও অহঙ্কার চূর্ণ করেছেন। দ্বিজদের এবং কুটুবীদের (কৃষক গৃহস্থ) স্বার্থের উন্নতি সাধন করেছেন এবং চতুর্বর্ণের মিশ্রণ বন্ধ করেছেন"। (৭১)

৬৯। এই বিষয়ের তুলনামূলক বর্ণনা Dr. R, C. Hazra's "Studies in Pauranic Records on Hindu Rites and Customs" 210—214 দ্রষ্টব্য।

৭০। EP. Ind. vol. VIII. No. 8. The Inscriptions in the caves at Nasik.

৭১। EP. Ind. vol. VIII, No. 6.

এই লিপিদ্বারা আমরা বোধগম্য করি যে, এই সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় রাষ্ট্র উদ্ভূত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণবর্ণের আধিপত্য এইস্থানে বিরাজ করিতেছে। ইহা ২০০ খৃষ্টীয় শতাব্দীর কথা। অন্যপক্ষে, আমরা রুদ্রদমনের জুনাগড় পর্ব্বতলিপিতে সংবাদ পাই: "মহাক্ষত্রপ রুদ্রদমন সুদর্শন-হ্রদ পুনঃ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তিনি দুইবার দক্ষিণাপথের রাজা শতকর্ণিকে পরাজিত করিয়াছেন; কিন্তু নিকট আত্মীয়তাবশতঃ তাহাকে ধ্বংস করেন নাই" (৭২)। অন্যত্র বর্ণিত আছে, রুদ্রদমনের কন্যার সহিত সতবাহন রাজা পুলুমায়ীর বিবাহ হইয়াছিল। এইপ্রকারে দৃষ্ট হয়, পারদ রাজবংশীয় কন্যার সহিত ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজার বিবাহ হইতেছে।

আশ্চর্য্যের কথা এই, সতবাহন রাজারা ব্রাহ্মণ্যবাদীয় হইলেও নাসিক লিপিসমূহে দৃষ্ট হয়, তাহাদের দান সব বৌদ্ধমঠে প্রদত্ত হইতেছে। সতবাহন বংশের রাজত্ব সময় পর্য্যন্ত আমরা ব্রাহ্মণ্যবাদীয় কোন মন্দির বা দেবমূর্ত্তি এবং এই মন্দিরকে কোন গ্রামদানের উল্লেখ খোদিত-লিপিতে পাই না। এতদ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, ব্রাহ্মণ্যবাদ—যাহাকে আজকাল "হিন্দুধর্ম্ম" বলে—তখন পর্য্যন্তও প্রতিমাপূজা বা পৌত্তলিকতাতে অনুরক্ত হয় নাই। এই যুগেই বাৎসায়ন তাঁহার "কামসূত্র" নামক পুস্তক রচনা করেন। বাৎসায়ন এই সময়কার ধনী "নাগরক" শ্রেণীর উল্লেখ করেন। ইহারা লোকায়ৎ মতের অনুরাগী ছিল। এতদ্বারা অনুমিত হয়, ধনীরা স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া ব্যক্তিত্ববাদী ও নাস্তিক ছিল। ইহার সপ্তম অধ্যায়ে তিনি দক্ষিণের এক অদ্ভুত শারীরিক ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা ইহুদি ও মুসলমানের "সুন্নৎ"-এর (Circumcision) ন্যায় প্রতিভাত হয়। ইহা নিশ্চয়ই দক্ষিণের ঔপনিবেশিক ইহুদি জাতির কাছ হইতে গৃহীত হইয়াছে। খৃষ্টীয়

৭২। EP. Ind. vol. VIII. No. 6

শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতেই ইহুদিরা দক্ষিণ-ভারতে বসবাস করিতেছিল। পুনঃ, দক্ষিণের আরবেরা (হিমরাইট বা সাবাইয়ান) বহু পূর্ব্ব হইতেই পশ্চিম-ভারতে আগমন করিত। কচ্ছপ্রদেশের ভূজ নামক স্থানে প্রাপ্ত প্রস্তরলিপিগুলির দ্বারা ইহুদি ও আরবদের পশ্চিম-ভারতে যাতায়াতের প্রমাণ দেয়। (৭৩)

পুনঃ জনশ্রুতির শকারি শালীবাহন রাজা এই সহবাহন বংশের প্রতীকরূপে কল্পিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। এই "একব্রাহ্মণ" রাজবংশে অব্রাহ্মণ নাগ-রক্ত মিশ্রিত ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন (৭৪) এবং এই ব্রাহ্মণবংশে পারদদের রক্ত প্রবেশ করে।

সহবাহনদেব রাজ্য প্রায় ৩০০ খৃঃ ভাঙ্গিয়া যায়। তৎপর মহারাষ্ট্রে আভীর ঈশ্বর সেনের নাম দৃষ্ট হয়। পতঞ্জলিতে আভীরদের নামোল্লেখ আছে। রামায়ণ ও মহাভারতে তাহাদের "দস্যু" বলা হইয়াছে। ২—৩ খৃষ্টীয় শতকে আভীরদের পশ্চিম-ভারতে শক রাজাদের সেনাপতির কার্য্য করিতে দেখা যায়। ইহার অব্যবহিত পরে, মহাক্ষত্রপ ঈশ্বর দত্ত আহিরের নাম দৃষ্ট হয়। বোধ হয় ইহারাই সতবাহন বংশের বিলোপ-সাধন করে।

এই সময়কার নাসিক গুহালিপিগুলির মধ্যে আমরা এই সংবাদ পাই: রাজা ঈশ্বর সেন আভীরের নবমবর্ষ রাজ্যকালে উপাসক শকানী বিষ্ণু-দত্তা, গণপক বিশ্ববর্ম্মণের মাতা এবং গণপক রেভিলের স্ত্রী, যিনি

৭৩। EP. Ind. XXI. No. 54. Three Shemitic Inscriptions from Bhuj.

৭৪। H. C. Raychaudhury : op. cit, P. 280.

অগ্নিবর্ম্মণ শকের কন্যা. সর্ব্ব সম্প্রদায়ের ভিক্ষুরা যাহারা ত্রিরশ্মি পর্ব্বতের মঠে বাস করেন, তাঁহাদের ব্যবহার্থ ঔষধ গোবর্দ্ধনে স্থিত শ্রেণীদের (Guilds) হস্তে দান ন্যস্ত করিলেন। (৭৫) পুনঃ আর একটি লিপি বলিতেছে: গোতমী পুত্র শ্রীয়ান-সতকর্ণির রাজত্বকালের সপ্তম বৎসরে উত্তরের যবন (ওটরহাস যোনাকস) ধর্ম্মদেবের পুত্র ইন্দ্রাগ্নিদত্ত তিরহানু পর্ব্বতে একটি চৈত্যগৃহে এবং চৌবাচ্চা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। (৭৬) পুনঃ শক দমাটিকা ভূদিকা লেখক এবং বিষ্ণুদত্তের পুত্রের দানোল্লেখ আছে। পুনঃ, খোদিত-লিপিতে দেখা যায় শকেরা হিন্দুদের ন্যায় গোত্র পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য তাহাদের আর্য্য গোত্র নয় (৭৭)।

এইসব লিপি এবং উদাহরণ দ্বারা আমরা দেখি, মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের পর, ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বনীতির বস্তুতান্ত্রিক প্রভাববশতঃ, রাজনীতিক-সামাজিকক্ষেত্রে ঘন ঘন পট পরিবর্ত্তন হইতেছে। শূদ্র, বৈদেশিক শক, অনাচরণীয় আভীর ইহারা ক্রমপর্য্যায়ে রাজত্ব করিয়াছে এবং তদ্দ্বারা নিজেদের সামাজিক পদ উন্নীত করিয়াছে। দ্রষ্টব্য এই, এই স্থলের শকেরা ও যবনেরা বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্ত ছিল। কিন্তু ইহার উত্তরে উজ্জয়িনীর পাশ্চাত্য শকরাজ্যের শক-পারদ শাসকশ্রেণী ব্রাহ্মণ্য-বাদীয় হইয়াছে। আমরা আর একটি নাসিক গুহালিপিতে (৭৮) সংবাদ পাই যে, দিনিকের পুত্র উষবদত; যিনি ক্ষহরাট ক্ষত্রপ নহপানের জামাতা, তিনি একলক্ষ গরু দান করিয়াছেন, বারাণসীতে তীর্থ করিয়াছেন ও ধন দান করিয়াছেন, তিনি দেবতাদের ও ব্রাহ্মণদের ষোলটি গ্রাম দান করিয়াছেন, তিনি সম্বৎসরে একলক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছেন, তিনি প্রভাসতীর্থে আটজন ব্রাহ্মণ-স্ত্রীকে দান করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া গোবর্দ্ধনের ত্রিরশ্মী পর্ব্বতে এই গুহা এবং চৌবাচ্চা

৭৫-৭৬, ৭৮-৮০। EP. Ind. vol. VIII. No, 15, P. 89 : No. 8.

নির্মাণ করাইয়াছেন। তৎপর তিনি প্রভাসতীর্থের পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া ৩০০০ গরু এবং একখানি গ্রাম দান করিয়াছেন। (৭৯)

পুনঃ আর একটি গুহাতে আমরা সংবাদ পাই : "স্বস্তি! উষবদতের স্ত্রী এবং রাজা নহপানের কন্যা দথমিত্তার দান এই গুহা। (৮০) এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে বৈদেশিকেরা পূর্ণভাবে হিন্দু হইয়াছিল।

নাসিক গুহাস্থিত এইসব লিপি পাঠ করিয়া আমরা বোধগম্য করিতে পারি যে, শকেরা মহারাষ্ট্রে বসতি করিয়াছিল (৮১)। পশ্চিমের শক রাজত্ব এই প্রদেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল। এই প্রদেশের মস্তকের উপরেই শক—পারদদের কতিপয় শতাব্দীব্যাপী রাষ্ট্র ছিল। এইজন্য আশ্চর্য্য নয় যে, জাতিতাত্ত্বিক Crookes মারাঠাদের শকবংশীয় বলিয়াছেন এবং রিসলী এই প্রদেশের লোকদের Scytho-Dravidian আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

মোগল সেনার বিরুদ্ধে মারাঠা সৈন্যদের যুদ্ধকৌশল ইরাণের প্রাচীন পারদদের ন্যায় ছিল। শত্রুকে আক্রমণ করিয়া পশ্চাদপসরণ করা, পরে তাহাকে আক্রমণ করিয়া বিপর্য্যস্ত করা—ইহাই ছিল মধ্য-এশিয়াসম্ভূত পারদ-রণ-কৌশল (Tactics)। পারদেরা রোমানদের বিপক্ষে এই কৌশল প্রয়োগ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিল। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সৈন্যদল যখন বাল্‌খ্‌ আক্রমণ করে, তখন সেই স্থলের তুর্কীরা এই কৌশল অবলম্বন করে। মোগল সৈন্য আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলে, "ইহা যে

P. 94 : No. 16. P. 95 : Nos. 10—11. (99) D. N. Sircar : Select Inscriptions দ্রষ্টব্য।

৮১। অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলেন, মহারাষ্ট্রের অভিজাতেরা দক্ষিণে জমিদারশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল ; Land Problems of India. PP. 30-31 দ্রষ্টব্য।

মারাঠাদের কৌশলের ন্যায়" (যদুনাথ সরকার Life of Aurangzeb দ্রষ্টব্য)। তিরোরীর রণক্ষেত্রে সাহাবুদ্দিন ঘোরী এই প্রকারের কৌশলে পৃথিরাজের সৈন্যদলকে পরাস্ত করে। এই কারণেই হয়ত ক্রুকস্ উপরোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা Diffusion of culture দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে। মারাঠারা এবং তুর্কীরা পারদদের কৌশলের জের টানিতেছিল।

প্রায় ৩১০ খৃঃ শতবাহন রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া যায়। এই সময়ে দক্ষিণে নানা দ্রাবিড় কৌম মস্তকোত্তলন করে, তন্মধ্যে মাহিষ্যক বা মাহিষ্য নামক একটি দ্রাবিড় কৌম ছিল (৮২)। স্মৃতিতে ইহাদের বর্ণসঙ্কর বলিয়া পরিগণিত করা হয়। এই সময়ে অন্ধ্রদেশে (বর্ত্তমানের মহারাষ্ট্র প্রদেশ প্রাচীন অন্ধ্ররাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল) কিলকিলা যবন, গর্দ্দবিল, বাহলীক, আভীর, শক প্রভৃতি অনেক বৈদেশিক কৌম আসিয়া রাজত্ব করে (বিষ্ণুপুরাণ, ৪, ২৪, ১৬)। (৮৩) ইহারা একই সময়ে রাজত্ব করিতে থাকে ; যে কৌম যে ভূখণ্ড দখল করিতে থাকে সেই স্থলেই তাহার রাজত্ব হয়, কেহই সার্ব্বভৌমত্ব স্থাপন করিতে পারে নাই (৮৪)। উত্তরে কুসান সম্রাট বাসুদেবের

৮২। D. N. Sircar : "Successors of the Satavahanas" P. 16 n, I. H. Q Sep, 1940, P 560ff দ্রষ্টব্য। আশ্চর্য্যের কথা ; বাঙ্গলায় পরাশর দাস, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি সমবৃত্তিধারী জাতিরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় এক সম্মেলন করিয়া নিজেদের কৈবর্ত্ত নামের পরিবর্ত্তে "মাহিষ্য" নাম গ্রহণ করেন। এক মাহিষ্য অধ্যাপক বন্ধুই লেখককে ইহা অবগত করান।

৮৩। Rapson Cat. of Ind. Coins in the Brit. Museum. Introduction, P. 45.

৮৪। V. Smith : "The Early History of India. 4th ed. P. 290.

মৃত্যুর পর এবং দক্ষিণে সতবাহন রাজাদের পতনের পর, ভারত একটি অন্ধকার যুগ দ্বারা সমাচ্ছন্ন হয়। এই সময়েই উত্তর-পশ্চিম হইতে নানা বৈদেশিক কৌমসকল ভারতে প্রবেশ করে এবং নানাস্থানে খণ্ডরাজ্য স্থাপন করে। ইহাদের প্রদত্ত খোদিত-লিপিসমূহ অথবা মুদ্রিত টাকা আবিষ্কৃত হইতেছে, সেইজন্য পুরাণসমূহের উক্তি নিছক কল্পনা নহে। পুরাণসমূহ এই সময়ের দুর্দ্দশার কথা উজ্জলভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ (৪, ২৪, ১৮-২৫) বলিতেছে, ইহা কলিযুগের ফল। পুরাণসমূহের আক্ষেপ এই যে, জাতিবিহীন, ও অসৎ চরিত্র বিদেশীয়দের সংসর্গে ভারতীয়দের শ্রৌত ও স্মৃতির ধর্ম্মে আস্থা নাই, অসৎচরিত্রতা বিস্তার লাভ করিতেছে, বর্ব্বরেরা রাজাদের ও বিশুদ্ধ জাতদের পৃষ্ঠপোষকত্ব পাইয়া বিপরীত আচরণ করিয়া লোকদের ধ্বংস করিতেছে, ধন এবং ধর্ম্মভাব প্রতিদিন ক্ষয় পাইতেছে, সম্পত্তি দ্বারা লোকের পদ নিরূপিত হইতেছে; ধর্ম্মের উৎস হইতেছে সম্পত্তি; ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতই তাহার পরিচয়ের লক্ষণ, বাহ্যিক চিহ্ন দ্বারাই বিভিন্ন বর্ণ নিরূপিত হয়। স্নান করিলেই হয় শুদ্ধি; পরস্পরের সম্মতিই বিবাহ বলিয়া গণ্য হয়; ভাল বস্ত্র মর্য্যাদার পরিচায়ক হয়, দূরের জল বা মন্দির তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য হয়।

এই অবস্থার চিত্রণ দ্বারা আমরা বুঝি যে, বৈদেশিকেরা শাসকশ্রেণী রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের অনুকরণে লোকে শ্রৌত ও স্মৃতি-বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছেন; চাতুর্বর্ণের কঠোরতা ও বর্ণাশ্রমের শুদ্ধাচারিতা বিনষ্ট হইয়াছে; ধর্ম্ম বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ ও চিহ্নদ্বারাই সম্পন্ন হয়। এক-কথায়, পুরোহিততন্ত্রীয় আচার অবহেলিত হয়; ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য নাই।

এই বৈদেশিক প্রভাব আমরা পুরাণসমূহের আক্ষেপে যে প্রকারে নিরীক্ষণ করি, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যেও এই যুগের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। নানা ধর্ম্মসম্প্রদায় নিজের প্রাধান্য স্থাপনে সচেষ্ট থাকে, অ-বৈদিক ও

অ-বর্ণাশ্রমীয় পাশুপথ ও ভাগবৎ সম্প্রদায়দ্বয় (৮৫) এই বৈদেশিকাক্রমণের ফলে নৈষ্ঠিক হিন্দু ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া পুরোহিত-তন্ত্র দ্বারা গণ্য হয়। ভারতে ধর্ম্মের ভবিষ্যত তাহাদের হস্তেই ন্যস্ত হয়। এই যুগে একটি স্মৃতি রচিত হয়, নাম "যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা"। ইহার রচনার কাল খৃঃ দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত ধার্য্য হয়। ৺রাম-গোপাল ভাণ্ডারকার ইহার শেষোক্ত তারিখ নির্দ্ধারিত করেন। জয়শওয়ালের মতে এই সংহিতা শকদের উত্তরে রাজত্বকালে রচিত হয়, কোন আইনজ্ঞ বলেন, ইহার সতবাহনদের সভায় লিখিত হয়। ভাণ্ডারকারের মতানুসারে, ইহা শক ও যবনদের রাজত্বকাল গত হইলে রচিত হয়। এই সংহিতাতে পিতামহের সম্পত্তিতে অর্থাৎ ভূমি, উপাত্ত (corody) ও দ্রব্যে পিতা এবং তাহার পুত্রের সমসাম্য (২,১২২) বলিয়া উল্লিখিত আছে, ইহার অর্থ একজনের অস্থাবর সম্পত্তিতে তাহার পুত্রের এবং পৌত্রের সমানাধিকার। বহুপরে, সম্ভবতঃ খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে বিষ্ণুসংহিতাও এই মত প্রকাশ করে। এতদ্বারা অনুমিত হয়, এই প্রকারের সম্পত্তিতে বংশগত সমানাধিকার (Family collectivism in property) বা পৈতৃক সম্পত্তিতে গোষ্ঠীর সংযুক্ত অধিকার (Joint ownership) যাহা মধ্যযুগের জার্ম্মানীতে ছিল এবং চীনে আজও আছে ; আর, কোন কোন আদিম জাতিদের মধ্যে আছে, (৮৬) তাহা বৈদেশিক প্রভাবের ফল। ইহা বৈদিক সাহিত্য, মনু, নারদ প্রভৃতি হিন্দু ব্যবহারের বিরুদ্ধে মত। এই দুই স্মৃতি দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয়, হিন্দুর আইনও নূতন ধারা অবলম্বন করিতেছে।

৮৫। পরে পাশুপত "শৈব" এবং ভাগবৎ "বৈষ্ণব" সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত হয়।

৮৬। Lowie : Primitive Society.

এই অন্ধকার যুগের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বনীতির ফলস্বরূপ একটা সম্মেলন প্রকাশ পায়। মধ্য-ভারত হইতে ভারশীব রাজবংশের উত্থান হয়। ইহারা নাগ বংশীয় বলিয়া পরিচিত ছিল। ইহারা "ক্ষত্রিয়" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিত। প্রাচীন ক্ষত্রিয় বংশের রক্ত ইহাদের ধমনীতে ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ছোটনাগপুরের নাগবংশীয় রাজপুতেরা তাহাদের সম্পর্কীয় বলিয়া পরিচয় দেয়। হয়ত তাহারা নূতন সৃষ্ট ক্ষত্রিয় (৮৭) যাহা যুগে যুগে বিবর্ত্তিত হয়। বিষ্ণুপুরাণে "নবনাগ ও বিন্ধ্যশক্তি" নামে দুইটি রাজবংশের উল্লেখ আছে। খোদিত লিপিদ্বারা তাহারা ভারশীব ও ভাকাটাকা বংশবলে নির্দ্ধারিত হয়।

পুনঃ এই সময়ের ভাকাটাকারাও (খৃঃ ২৮৪—৩৪৮) শৈবধর্ম্মের লোক ছিল। বিন্ধ্যশক্তি (৮৮) নামক এক ব্রাহ্মণ দ্বারা এই বংশ স্থাপিত হয়। ইহার পুত্র গোতমীপুত্র ভারশীব রাজা ভবনাগের কন্যাকে বিবাহ করে। পুনঃ অমরাবতীতে প্রাপ্ত একটি লিপিতে সংবাদ পাওয়া যায় যে, দ্রাবিড় দেশে "পাকোটাকা" বলিয়া একটি কৌম ছিল, এবং ভাকাটাকা হইতেছে হয়ত রাজার বা সর্দ্দারের ব্যক্তিগত নাম (৮৯)। এই কৌমটী মধ্য ভারতে আসিয়া বাস করে এবং তাহাদের রাজার নামে পরিচিত হয়। ঐতিহাসিকদের অনুমান উভয়ের মধ্যে ভাকাটাকারাই বেশী শক্তিমান। ইহারা "বর্ণাশ্রমধর্ম্ম" পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে। বিন্ধ্যশক্তি রাজারা নানা বৈদিক যাগযজ্ঞ করে এবং পরের যুগের কদম্ব ও পল্লবদের

৮৭। Sarat Ch, Roy : "Man in India", vol. XIV No. 3 and 4, P 305.

৮৮। মধ্য ভারতে বিন্ধ্যশক্তি বলে এক গ্রাম এখনও আছে।

৮৯। Ep Ind. vol. xv, No, 13, Some Unpublished Amravati Inscriptions. by R. P. Chanda.

ন্যায় "ধর্ম্ম মহারাজ" উপাধি ধারণ করেন। তাহারা অহংকার করিত যে তাহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মসংস্কারকারী (৯০)।

ভাকাটাকা রাজ ২য় প্রবর সেনের চমক নামক স্থানে প্রাপ্ত লিপিতে বলিতেছেন, তিনি এক সহস্র ব্রাহ্মণকে গ্রাম দান করিয়াছেন। পুনঃ তিনি মহেশ্বরের উপাসক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছেন আর বলিতেছেন, ১ম রুদ্রসেন—যিনি মহা-ভৈরবের ভক্ত এবং ভারশীবদের মহারাজা ভবনাগের কন্যার পুত্র, যে বংশ শিরে লিঙ্গ বহন করিয়াছিল বলিয়া দেবতার প্রসাদে উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল, যাহারা স্বীয় কপোল ভাগীরথীর জল দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিল, যাহা তাহারা বীর্য্য দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং যাহারা দশাশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া স্নান করিয়াছিল, যিনি গোতমী পুত্রের সন্তান, যিনি ভাকাটাকা মহারাজ ১ম প্রবর সেনের পুত্র, যিনি অগ্নিস্তোম, অপ্তোর‍্যাম, উকথ্য, সোদাসিন, অতিরাত্র, বাজপেয়, বৃহস্পতিসব্য, সত্যসক্র যজ্ঞসমূহ করিয়াছিলেন এবং চার অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার গোত্র বিষ্ণুবৃদ্ধ—তিনি চর্ম্মনিকা নামক গ্রাম এক-সহস্র বিভিন্ন গোত্রের ব্রাহ্মণদের দান করিয়াছিলেন। এই দান চতুর্বেদী ব্রাহ্মণেরা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং সর্ত্তাধীন ছিল, যথা: কর দিতে হইবে না, রাজসিপাহীরা বা ছত্র ধারকেরা প্রবেশ করিবে না (অচাটভাট প্রবেশ) "অপরাম্পরা গোবলীবর্দ্দ" বিষয়ে কোন অধিকার নাই, তদ্রূপ ফল, মধু, গোচারণ ভূমি, চামড়া, কাঠকয়লা, লবণ ক্রয় জন্য খনি প্রভৃতির উপর দান গ্রহীতাদের অধিকার থাকিবেনা, বেগার খাটা (Forced Labur) হইতে ইহা মুক্ত, গুপ্তধন এবং ভূমির অভ্যন্তরস্ত বস্তুর উপর অধিকার থাকিবে এবং "ক্লিরপ্ত ও উপক্লির্বপ্ত" "বিষয়েও অধিকার থাকিবে। (৯১)

৯০। Sircar's Select Inscriptions : ch. iii. No. 59.

৯১। C. C. I. vol. III. P. 240-241.

এই তাম্রলিপিটির বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। ইহাতে সমসাময়িক রাজবংশদ্বয়ের পরিচয়, সম্বন্ধ, ধর্ম্ম এবং তখন হইতে ভূমি-ভাগ বিষয়ে সামন্ততান্ত্রিক-অর্থনীতিক রীতি প্রভৃতির সংবাদ পাওয়া যায়। এই লিপি আমাদের যুগের গতির দিক নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। ভারত সামন্ততন্ত্রীয় সভ্যতার পর্য্যায়ে প্রবেশ করিতেছে। যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়া কাণ্ড-সম্বলিত বৈদিক ধর্ম্ম আবার মস্তকোত্তলন করিতেছে। এই সময় হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম নবকলেবর ধারণ করিয়া আবার জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইতেছে। এই দুই ব্রাহ্মণ্যবাদীয় শৈব ধর্ম্মাবলম্বী রাজবংশ গুপ্ত যুগের পথ-প্রদর্শক হয়। দক্ষিণের ও মধ্য-ভারতের বনানী হইতে নব-ক্ষত্রিয় এবং ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় রাজবংশ পুরোহিততন্ত্রের রক্ষক হয়। সাতবাহনেরা "এক ব্রাহ্মণ" হয়েও বৈদিক ক্রিয়াতে অনুরক্ত ছিল না; কিন্তু এই যুগে তাহা দৃষ্ট হয়। পুনঃ, লিপিসমূহ পাঠে দৃষ্ট হয় যে, এই দুই রাজবংশের শাসনকালে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই সময়কার খোদিতলিপিসমূহে প্রথম সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে ব্রাহ্মণ্যবাদীয়-দের দ্বারা মূর্ত্তিপূজা হইতেছে। জৈন ও বৌদ্ধদের দেখাদেখি, ব্রাহ্মণ্য-বাদীয়েরাও মূর্ত্তিপূজায় অনুরক্ত হইতে থাকে।

দক্ষিণাপথে এই প্রকারে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানের সহিত এই ধর্ম্মের রাজারা শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে, সুদূর দক্ষিণের পল্লবেরা, মহাভারতের অশ্বত্থামার বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। (৯১) পল্লবেরা অতএব ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়; তাহারা ইরাণের পহ্লব জাতীয় নহে। এই সময়ে এক ব্রাহ্মণ ময়ূরশর্ম্মণ কদম্ব রাজবংশ স্থাপন করে। ইহারা রাজা হইয়া "বর্ম্মণ" উপাধি ধারণ করে, যথা কাকুস্থ

৯১। S. I. I. vol. I. Pt. I. No 32, P. 28.

বর্ম্মণ। (৯৩) পুনঃ, আরও যেমব রাজবংশ উত্থিত হইতে লাগিল তাহারা পৌরাণিক বীরদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল যথা: চালুক্য—ইহারা অর্জ্জুনের বংশধর, কেরলরাজ রবিবর্ম্মা যদুবংশীয়, চোল বংশ ইক্ষাকু বংশীয়। (৯৪) চের ও পাণ্ড্য রাজবংশ তদ্রূপ পরিচয় প্রদান করে। পরের যুগের রাষ্ট্রকুটরাও যদুর (৯৫) বংশধর বলিতে থাকে।

দক্ষিণ ব্রাহ্মণ্যবাদের জন্য বিজীত হইলে, যে সব রাজবংশ উত্থিত হইতে লাগিল তাহারা এই প্রকারে হয় বৈদিক ব্রাহ্মণের বংশধর, না হয় রামায়ণ মহাভাবতের বীরদের বংশধর বলিতে লাগিল। ভাকাটাকা ও সমুদ্র গুপ্তের বিজয় দ্বারা দক্ষিণাপথ ব্রাহ্মণ্যবাদেব পদানত হয়। পুনঃ ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ভারশীব, ভাকাটাকা এবং পল্লবদের শাসন পর্য্যায়ক্রমে ঘটিতে থাকে। এই উপায়ে দক্ষিণ-ভারত ক্রমাগত গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদের চাপ পাইতে থাকে। এই প্রকারে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহ্য দক্ষিণে বিশেষভাবে লোক মধ্যে উত্থিত হয়। তৎপর, দক্ষিণ, গুপ্ত-সম্রাটদের করদ ছিল। এই সময়েব গঙ্গাবংশও ব্রাহ্মণ বংশীয় ছিল।

এই প্রকাবে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যবাদীয় রাজবংশসমূহ সনাতন-সমাজ ব্যবস্থা দক্ষিণে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করে। পুনঃ, ব্রাহ্মণ রাজবংশীয় রাষ্ট্রসমূহ দ্বারা ব্রাহ্মণেরা শাসকশ্রেণীরূপে বিবর্ত্তিত হয়। ইহার ফলে, ব্রাহ্মণ বংশসমূহ দক্ষিণের অভিজাত শ্রেণীরূপে প্রকট হয়। তাহারা স্বতন্ত্রভাবে থাকিত এবং রাজবংশের সহিত বিবাহাদি করিত এবং তদ্দ্বারা দক্ষিণাপথকে হিন্দু-ভারতের অন্তর্গত করিয়া দেয়। এবম্প্রকারে, প্রাগৈতি-

৯৩। EP. Ind, vol. VIII. No, 5; Kielhorn's Inscriptions of Southern India. No. 603.

৯৪। B. N. Datta : Studies in Indian Social Polity, P. 227 দ্রষ্টব্য।

৯৫। EP. Ind. vol. XVIII, No. 26.

হাসিক যুগ হইতে ঐতিহাসিক বস্তুতান্ত্রিক দ্বন্দবাদের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-ভারত নানা কৌম, নানা জাতি ও নানা ধর্ম্মের বাদবিসম্বাদের কটাহে দ্রবীভূত হইয়া ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সম্মেলনে উপনীত হয়। এখন হইতে ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণে শাসকশ্রেণী হয় এবং সনাতনীয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মও তাহার "বর্ণাশ্রম" এবং "আচার" লইয়া রাজশক্তির সাহায্যে অব্রাহ্মণ শ্রেণীদের বশ্যতাস্বীকার করায়। এই সময়কার ব্রাহ্মণ্যবাদের দাম্ভিকতা ও অনুদারতার দৃষ্টান্ত: ১১৮০ শকাব্দে মন্দিরে রাজা গম্ভীরের দান কালে উল্লেখ আছে যে, আজীবক ও উবচ্ছদের উপর ট্যাক্স আদায় করা হয়। (৯৬) আজীবকেরা বুদ্ধের সময়ের উলঙ্গ সন্ন্যাসী, যাহাদের অস্তিত্ব আমরা দক্ষিণে চোল রাজাদের সময় পাই, আর উবচ্ছ হইতেছে যোনক অর্থাৎ যবন। তৎকালে ইহা মুসলমানদের প্রতিহ প্রয়োগ হইত। উত্তরে যেমন কান্যকুব্জের রাজা গোবিন্দ চন্দ্র "তুরস্ক দণ্ড" রূপ (৯৭) কর আদায় করিতেন, দক্ষিণের রাজাও তদ্রূপ মুসলমানদের কাছ হইতে ট্যাক্স আদায় করিতেন। ইহা মুসলমানী জিজিয়াকরের ন্যায়। উপরন্তু, ব্রাহ্মণ্য অনুদারতা আর্য্য-ধর্ম্মীয় আজীবক সন্ন্যাসীদেরও এই বিষয়ে ক্ষমা করে নাই।

এতক্ষণে আমরা বাল্মীকি রচিত রামায়ণের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে সক্ষম হই। ভাকাটাকা গুপ্ত যুগের কোন সময়ে রামায়ণ রচিত হয়। অবশ্য রামগাথা তাহার অগ্রে ছিল। ৺দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন, দক্ষিণেও রাবণ গাথা ছিল। জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্র বাল্মীকিকে গালাগালি দিয়াছেন যে, তিনি মিথ্যাবাদী, রাবণকে অন্যায়ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। রাবণ একজন ভদ্র জিন ভক্ত ছিল এবং দক্ষিণে অনেক জৈন মন্দির স্থাপন করিয়াছিল (জৈন রামায়ণ, একাদশ শতাব্দী)। কৌটিল্যে রাবণ দ্বারা

৯৬। S. I. I. Vol. I, Pt. II, No. V, P. 82.

৯৭। EP. Ind. Vol. XI, No. 3.

পরস্ত্রী হরণের কথা আছে। তাহা হইলে কি একটা রাবণ-গাথা দক্ষিণে ছিল? সেন মহাশয় বলিয়াছেন, উভয় গাথা মিলিয়া বাল্মীকির রামায়ণ হইয়াছে। (৯৮)

যাহাই হউক, অগস্ত্য ও অন্যান্য ঋষিদের দক্ষিণের অরণ্যানী মধ্যে বাল্মীকির আনয়ন অর্থে অনুমান হয় তথায় অনার্য্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রচারের রূপক ব্যাখ্যা, আর যোদ্ধা রামকে দক্ষিণে আনয়ন করে তথাকারবাসীদের ধ্বংস কবার অর্থ দাঁড়ায় এই, রাজশক্তির সহায়তায় তথাকার অব্রাহ্মণ শূদ্র ও অন্যান্যদের পিটিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করান। ইতিহাসের দ্বন্দ্ববাদ ক্রমাগতই তাহার কার্য্য করিয়া যাইতেছে। দক্ষিণে যখন পুরোহিত-তন্ত্র দাম্ভিকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া জাতি বিশেষদের অস্পৃশ্য করিতেছে, উত্তরে তখন হিন্দুজাতির পতন হইয়াছে। বহির্দ্দেশ হইতে মুসলমান-তুরুক আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়াছে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছে। এই তুরুকদের মধ্যে আলাউদ্দিন খিলিজি নামক রাজা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া দক্ষিণ বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। এই কার্য্যে তাহাব সহায় হয় গুজরাটের একজন স্বধর্ম্মত্যাগী অস্পৃশ্য মাহার বংশীয় হিন্দু যাহার মুসলমান নামকরণ হইয়াছিল মালিক কাফুর। (৯৯)। ইনিই ১৩০৬-১৩১৩ মধ্যে দক্ষিণ বিজয় করেন, মন্দিরাদি ভগ্ন করেন।

পুনঃ মুসলমান-তুর্কী দ্বারা দক্ষিণ আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হওয়ায় লোকে সন্ত্রস্ত ও চিন্তান্বিত হয়। ফলস্বরূপ, হরিহর ও বুক্ক দ্বারা তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণে একটী হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়। কথিত হয়, এই দুই ভ্রাতা যাদববংশীয়। (১০০) এই কার্য্যে সায়ন নামে একজন

৯৮। D. N. Sen : History of the Ramayanas.

৯৯। আবুলফজলের "আকবরনামা"।

১০০। EP. Ind. vol. XV, No. 2.

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিশেষ সহায়তা করেন। এই সময়েই দিল্লীর সম্রাটের বিপক্ষে বিদ্রোহ করে বিজিত দেবগিরির মুসলমান আমীরগণ তুঙ্গভদ্রার উত্তরে বাহমনী রাজ্য স্থাপন করেন। দক্ষিণের এই হিন্দুরাজত্ব কালে বিজয়নগর সাম্রাজ্য বলিয়া বিখ্যাত হয়। হিন্দু কৃষ্টি ও ধর্মের রক্ষাস্থল হয় এই রাষ্ট্র। এই সাম্রাজ্য জন্ম হইতে তাহার ধ্বংস পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদের দ্বারাই পরিচালিত ও পুষ্ট হয়। (১০১) এই বিস্মৃত হিন্দু সাম্রাজ্য বিষয়ে একটী বিশিষ্ট ঘটনা এই: পর্ত্তুগীজ পর্য্যটক Paes বলিতেছেন যে, তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে বিজয়নগরের সৈন্যদলে বন্দুকধারী সিপাহী ("musqueteers with their musquets and blunderbusses") ছিল (১০২)। পুনঃ এই সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নরপতি কৃষ্ণদেব রায় রায়চুড় (Raichur) যুদ্ধে বিজাপুরের সুলতানকে পরাজিত করিবার কালে তোপ (canon) ব্যবহার করিয়াছিলেন। (১০৩) আমাদের পাঠ্যপুস্তকে লিখিত হয়, মোগল সম্রাট বাবরই প্রথম ভারতে যুদ্ধে তোপ ব্যবহার করেন। কিন্তু, এই ইউরোপীয় পর্য্যটকের উক্তি এই ভ্রম নিরসন করিতেছে। পুনঃ অন্যত্রও আমরা তোপ ব্যবহারের কথা বাবরের আগের মুসলমান যুগেও পাই।

এই সাম্রাজ্যের আর একটী ঘটনা যাহা পুরোহিত-তন্ত্রের বিদ্যাবুদ্ধি ও মনস্তত্ত্বের পরিচায়ক তাহা এই: সম্রাট ২য় দেবরায় পুনঃ পুনঃ বাহমনী সুলতানের কাছে পরাজিত হইয়া তাঁহার সভাতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের আহ্বান করিয়া বলিলেন: "আমার এই কর্ণাটক দেশ লোক ও ধনে পরিপূর্ণ, তথাপি আমি কেন মুসলমানদের কাছে হারিতেছি। একবার

১০১। B. K. Esvara Dutt: "Studies in Vijayanagara Polity. I. A. H. R. S. 1930.

১০২—৩। Sewell: "A Forgotton Empire." P. 277; 342.

কেবল সুবিধা করিতে পারিয়াছিলাম"। ইহাতে ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "ঘোর কলি, যবনেরা প্রবল থাকিবে" ইত্যাদি। অন্যপক্ষে, বাস্তবক্ষেত্রের কর্মী ক্ষত্রিয়েরা বলিলেন: "They are more valorous, their arrows are blinding" (শত্রুরা বেশী সাহসী, তাহাদের তীর সকল লোককে অন্ধ করিয়া দেয়।)। রাজা ক্ষত্রিয়দের কথা শুনিলেন এবং একদল "দক্ষিণী" মুসলমান সৈন্য যাহারা বাহমনী রাজ্যের চাকরী ছাড়িয়া ছিল, তাহাদের স্বীয় সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিয়া নেন (১০৪)।

এই ব্রাহ্মণ্যমনস্তত্বই আরব আক্রমণের সময়ে প্রকট হইয়াছিল, লক্ষ্মণসেনের সভাতেও হইয়াছিল। "প্রতাপাদিত্যচরিত" নামে একটী সংস্কৃত পুস্তকে এই কথাই আছে। যখন প্রতাপাদিত্য মানসিংহকে বলিলেন, তিনি হিন্দু হইয়া কেন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনে বাধা দিতেছেন—তখন শেষোক্ত বলেন,"ঘোর কলি, দিল্লীতে আসুন" ইত্যাদি। (১০৫) এই দুই উত্তর মধ্যে প্রথমোক্তটি অন্ধ আদর্শগত বিশ্বাসপ্রসূত (Ideational ignorance), দ্বিতীয়টি, তুলনামূলক অভিজ্ঞতা (Empirical know-ledge) প্রসূত।

দক্ষিণাপথের বৈশিষ্ট্য এই, উত্তরে যখন রাজশক্তি যথেচ্ছাচাররূপ ধারণ করিয়া লোকপ্রিয় সমস্ত অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান হয় পরিবর্ত্তিত করিতেছে, না-হয় নিষিদ্ধ করিতেছে, না হয় ধ্বংস করিতেছে, তখন দক্ষিণে এইগুলির অনেকটি প্রচলিত ছিল।

১০৪ W. Talboys Wheeler: History of India.

১০৫। যখন তরুণ বৈপ্লবিকেরা গুপ্তভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন করিতেন, তখন অনেকস্থলে এই কথাই শুনেছিলেন, ঘোর কলি, কলি কাটিলে স্বাধীনতা আসিবে।

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, উত্তরে গ্রাম-সমিতি ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়াছে, ঐতিহাসিক যুগে তাহাদের বিষয়ে বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু দক্ষিণে, অন্ধ্রভৃত্য রাজাদের নাসিকে খোদিত-লিপিতে আমরা শ্রেণীসমূহের (Guilds) সংবাদ পাই। (১০৬) পরের যুগে লিপিসমূহে গ্রামদান বা অন্য প্রকারের অধিকার প্রদানকালে আমরা নিগম-সভা (city-corporation) (১০৭) মণ্ডলী, গ্রাম-সভা, (১০৮) জাতি-মণ্ডলী, (১০৯) ("মহাজন" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী এবং "নাডু" অর্থাৎ অ-ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী) সামন্ত-তন্ত্রীয় আওয়াব, নানা প্রকারের বিধিনিষেধ, বেগারখাটা, বিবাহের জন্য রাজাকে কর (Marriage Fee) প্রদান করা প্রভৃতি প্রথা দৃষ্ট হয়। (১১০)

দক্ষিণের আর একটী সংবাদ যাহা কোচিন রাষ্ট্রে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে চতুর্দ্দশ—পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্থানীয় খৃষ্টিয়ান (১১১) এবং ইহুদিও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিক পদ্ধতি মধ্যে জীর্ণিভূত হইয়াছে।(১১২) কেরলরাজ বীর রাঘব খৃষ্টিয়ান ব্যবসায়ীকে "মণিগ্রামম" (১১৩) উপাধি

১০৬। EP. Ind. vol. VIII No. 8.

১০৭। S. I. I. vol III. pt. III. No. 267.

১০৮। S. I, I, vol, III. pt III. N. 111, P. 246.

১০৯। EP. Ind. vol XXI. No. 29. P. 76

১১০। S. I, I. vol. III. Pt. III. No. 151.

১১১। EP. Ind. vol IV. No. 41.

১১২। EP. Ind. vol III. P. 67.

১১৩। শ্যামদেশস্থ হিন্দু যুগের খোদিত লিপিত "মণিগ্রামম" উপাধি প্রদত্ত হইত। P. N. Bose : "The Indian Colony of Siam", পৃঃ ২১ দ্রষ্টব্য।

প্রদান করিয়াছেন, এবং রাজা ভাস্কর রবি বর্ম্মা ইহুদি ইসুপ্‌ ইরাব্বানকে "অঞ্জুভন্নম" উপাধি দিয়াছেন।

দক্ষিণাপথের আর একটী বিশিষ্ট দান হইতেছে "মীতাক্ষরা" নামক নব্য আইন যাহা আজকাল বেশীরভাগ ভারতে হিন্দুর দায়াধিকার ব্যবস্থা। আমরা পূর্ব্বেই এই বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের মত বলিয়াছি। তাহার কয়েক শতাব্দী পরে দক্ষিণে মহারাষ্ট্র প্রদেশের রাষ্ট্রমধ্যে বিশ্বরূপ নামক একজন সন্ন্যাসী যিনি রাজসভার সহিত সম্পর্ক রাখিতেন, তিনি যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার "বালক্রীড়া" নামক একটী টীকা লিখেন। বিশ্বরূপের সময় (৭৫০—১০০০খৃঃ) বলিয়া নিরূপিত হয়। (১১৪) তাঁহার পুস্তকে সিন্ধু আক্রমণকারী আরবদের (তাজিক) উল্লেখ করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের ২।১২২' শ্লোকের টীকাকালে তিনি বলেন, বিষয়ে স্বামিত্ব বিভাগদ্বারা সৃষ্ট হয় না। বরং যাহা পূর্ব্বে ছিল তদ্দারাই উদ্ভূত হয়। (১১৫)। এতদ্বারা জন্মগত অধিকার মতটি প্রথমে উদ্ভূত হয়। এতৎব্যতীত ২।১১৮ শ্লোকের টীকাকালে তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, পিতা তাঁহার সম্পত্তি তাহার পুত্রদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিভাগ করিয়া দিতে পারেন।

ইহার পর আসেন বিজ্ঞানেশ্বর। ইনি ১০৭০-১১০০ খৃঃ বর্ত্তমান ছিলেন। কাহারও মতে তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও ছিলেন। ইনি চালুক্য রাজার (১০৭৬-১১২৬ খৃঃ) ব্যবহার সচিব ছিলেন। ইনিও একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। ইনিও বিশ্বরূপের ন্যায় মত প্রকাশ করেন যে, জন্ম দ্বারাই স্বামিত্বের অধিকার সৃষ্ট হয়। তিনি পৈতৃক বিষয়ের বিভাগ নিষিদ্ধ করেন এবং সগোত্রীয়দের মধ্যে দায়াধিকার আবদ্ধ করেন। তৎপর তিনি বলেন, আইন হইতেছে লৌকিক (secular) উৎপত্তির ফল।

১১৪-১৫। Kane: vol, I, P. 261, 259.

তাঁহার মতে রক্ত-সম্পর্কের নৈকট্যের দ্বারা দায়াধিকার নির্দ্ধারিত হয়। ইহার লিখিত আইন পুস্তককে "মীতাক্ষরা" বলে।

বিজ্ঞানেশ্বরের জন্মদ্বারা পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার নিরূপণ রূপ মতটি বৈদিক এবং আর্য্যপ্রথাবিরোধী। যাজ্ঞবল্ক্যকে নিকারণ করিয়া তিনি এই মত জাহির করেন। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রের দোহাই না দিলে তাঁহার মত টিকে না। এইজন্য পরবর্ত্তীকালের বাঙ্গালার রঘুনন্দনের পন্থার ন্যায় তিনি সর্ব্ব প্রাচীন স্মৃতি গৌতমকে আশ্রয় করেন। তিনি বলেন, গৌতম বলেছেন, "জন্মদ্বারাই সম্পত্তির স্বামিত্ব নিরূপিত হইবে, যেমন মাননীয় গুরু বলিতেছেন"। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালার "দায় ভাগ" আইন গ্রন্থের টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার এবং অচ্যুত ধরাইয়া দিলেন যে এই শ্লোক আসল পুস্তকে নাই, ইহা "অমূল"। আসলে, "অমূলক" এবং অজ্ঞাত রচনাকারের উদ্ভট শ্লোকসমূহ দ্বারা বিজ্ঞানেশ্বর প্রমাণ করিতে চাহিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বেও এই মত আচার্য্যেরা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই মতটি হিন্দুর সামন্ত যুগেই সৃষ্ট হয়। নবম-দশম শতাব্দী হইতে মেধাতিথি, শ্রীকর প্রভৃতি এই মত জাহির করিতে থাকেন।

পৈতৃক বিষয়ে জন্মগত অধিকার, মধ্যযুগের জার্ম্মাণীর আইনে প্রচলিত ছিল। চীনে পৈতৃক সম্পত্তিতে গোষ্ঠীগত অধিকার (Joint-proprietorship) আছে কিন্তু বিজ্ঞানেশ্বরের মত সম্পূর্ণভাবে অবৈদিক এবং অভারতীয়। হয়ত পশ্চিম-ভারতে যে সব শক, পারদ, হুন প্রভৃতি মধ্য-এশিয়াগত বৈদেশিকেরা আসিয়াছিল, তাহারা হিন্দু হইয়া তাহাদের আচার এবং প্রথা অটুট রাখিয়াছিল, তাহাই কালক্রমে স্থানীয় প্রথা বলিয়া গ্রাহ্য হয়। ইহার নজীর আমরা জৈমিনির পূর্ব্ব-মীমাংসাতে পাই। তিনি "শব্দ-ব্রহ্ম" বিষয়ে আলোচনাকালে বলিয়াছেন, যেসব ম্লেচ্ছ শব্দ তাহা

অগ্রাহ্য হইবে, যথা: "পিলু"। পালরাজাদের অনুশাসনে আমরা "মহাপিলুপতি" শব্দ পাইতেছি, কিন্তু আসলে ইহা আরবী শব্দ, অর্থ হস্তী। জৈমিনি বলিতেছেন: শাস্ত্রীয় ব্যাপার বৈদেশিক শব্দদ্বারা বুঝাইলে, তাহার বৈদেশিক অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। এতদ্বারা হিন্দুর মধ্যে বিদেশী প্রভাব প্রমাণিত হয়। কুমারিল ভট্ট জৈমিনির এই শ্লোকের টীকাকালে বলিতেছেন, "যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে বিকৃত আর্য্য শব্দসমূহের ব্যবহার স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়; তাহা হইলে, যজ্ঞের এইসব অনুষ্ঠান ম্লেচ্ছ ভাষাতে চলিবে না কেন এই তর্কের বিপক্ষে কোন প্রতিবাদ না থাকায় ইহা গ্রাহ্য হয়। এই প্রকারেই "পিক", "নেম" এবং অন্যান্য শব্দগুলি পণ্ডিতদের দ্বারা নিষ্পত্তি হয় (তন্ত্রবার্ত্তিকা-বারাণসী সংস্করণ; পৃঃ ১৫৮)। এতদ্বারা আমরা দেখিলাম যে, পিল, পিক, নেম প্রভৃতি বৈদেশিক শব্দও ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে হিন্দুর দ্বারা তৎকালে ব্যবহৃত হইত।

তৎপর কুমারিল বলিতেছেন: "চোদিতম" শব্দ অর্থে শিক্ষা দিয়াছিল (taught) বা নিযুক্ত হইয়াছিল, বা একটী সমষ্টিগত প্রতিষ্ঠানে (corporation) অন্তর্ভূত হইয়াছিল (incorporated)। যে সব বিষয়গুলি প্রথমে ম্লেচ্ছ দ্বারা স্থিরীভূত হইয়াছিল, তৎপর আর্য্যদের দ্বারা জ্ঞাত হয় কিংবা যাহারা উভয় ভাষাই জানে তাহাদের দ্বারা জ্ঞাত হয়" (তন্ত্রবার্ত্তিকা, পৃঃ ১৫৮)।

কুমারিলের এই আলোচনা দ্বারা আমরা নির্দ্ধারণ করি যে, মধ্য যুগে স্মৃতিসমূহের নিষেধ সত্বেও হিন্দুদের অনেকে ম্লেচ্ছ ভাষা শিক্ষা করিত এবং অনেক ম্লেচ্ছ ব্যবহারও হিন্দু সমাজের কুক্ষীগত হইয়াছিল। কুমারিলের এই আলোচনার শেষকালে আইনজ্ঞ ৺কিশোরীলাল সরকার বলিয়াছেন: উপরোক্ত তর্ক দ্বারা স্পষ্টভাবে বোধগম্য হয় যে, প্রকৃতি একটী ক্রিয়াপদ

বিষয়েই আবদ্ধ নয়, ইহা যথার্থভাবে নির্দেশ দিতেছে যে, ম্লেচ্ছ প্রথাসমূহ মঞ্জুর হইবে যদি তাহা বেদ-গ্রাহ্য হয় ("The above clearly shows that the question is not simply a verbal one, it really relates to the adoption of mleccha usages as valid when such usages are referred to in the Shastras (১১৬)।

বেদগ্রাহ্য করিবার জন্যই সম্ভবত মধ্যযুগে যাজ্ঞবল্ক্য ও বিষ্ণু-সংহিতাতে এই বৈদেশিক প্রথার মূলটি বীজরূপে প্রবিষ্ট করান হয়, পরে বিজ্ঞানেশ্বর অমূল ও উদ্ভট শ্লোক সমূহদ্বারা এই মতকে শাস্ত্রীয় ও লোকাচারসম্মত বলিয়া প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করেন।

ঐতিহাসিক বস্তুতান্ত্রিক দ্বন্দ্ববাদ সংস্কৃতিকে কতটা প্রভাবান্বিত করিতে পারে তাহা নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারাই বোধগম্য হয়। শক-পারদগণ ভারতের উত্তরে এবং পশ্চিমে যে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল তাহাতে দ্বৈরাজ্য প্রথা ছিল অর্থাৎ দুইজন রাজা একযোগে শাসন করিত। পুনঃ, উত্তর-পশ্চিম এবং সুদূর দক্ষিণের রাজ্য যৌবরাজ্য প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথাদ্বয় অনুসারে রাজার সহিত তাহার ভ্রাতা, পৌত্র কিংবা ভ্রাতুষ্পুত্র শাসন-কার্য্যে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিত কিংবা সংযুক্তশাসকরা নিম্নস্তরের সহযোগীরূপে কার্য্য করিত। (১১৭)

পুনঃ, প্রথম জগতব্যাপী যুদ্ধের পরে, ইরাণে যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান হইয়াছে তাহার আবিষ্কৃত মসলা হইতে অধ্যাপক ডেলা বোয়াস্ (১১৮) যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে তিনিও উপরোক্ত তথ্য

১১৬। K. L. Sarkar: "Tagore Law Lectures", 1905.
১১৭। H. C. Roychowdhuri: "Political History of Ancient India".
১১৮। N. C. Delaboise: "A Political History of Parthia", 1938, p. 63.

সমর্থন করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, পারদরা পূর্ব্বদিকে "পহ্লব" নাম গ্রহণ করে এবং পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ ভারতে শক ও পহ্লব একত্র প্রাপ্ত হয়। ভারতে রাজকর্ম্মচারীরা সম্ভবত শক এবং পারদ দ্বারা গঠিত হইত (রুদ্র দমনের জুনাগড়লিপি তাহার প্রমাণ)। সাধারণতঃ রাজ-পদাভিষিক্ত তিনজন লোক একই সময়ে পূর্ব্ব-ইরাণ ও উত্তর পশ্চিম-ভারতে শাসন করিত; ইরাণে একজন 'রাজার রাজা', তাহার সঙ্গে তাহার বংশের কম বয়সের (junior) একজন লোক সংযুক্তভাবে রাজ্য শাসন করিত (যুবরাজ ?); ভারতে আব একজন "রাজার রাজা" থাকিত। সাধারণতঃ ইরাণের যুবরাজ পরে ভারতের বড় রাজা হইত।

এইসব ঐতিহাসিক তথ্যদ্বারা আমরা অনুমান করিতে পারি, যাজ্ঞ-বল্ক্য ও বিষ্ণুর পিতামহের সম্পত্তিতে পিতা-পুত্রের সমসাম্য অর্থাৎ মেইন যাহাকে বলিয়াছেন Joint-ownership তাহা কি প্রকারে উদ্ভিত হয়। পুনঃ আমরা রামায়ণে বর্ণিত যৌবরাজ্য প্রথা কি প্রকারে আর্য্য-পদ্ধতিতে আসে তাহাও আমরা আজ বুঝিতে পারি।

পুনঃ মথুরাতে প্রাপ্ত তাম্রলিপিতে মহাক্ষত্রপ রাজুলের পট্টমহিষী ছিলেন "যুবরাজ খারাওষ্টর" কন্যা। এতদ্বারা বৈদেশিকদের মধ্যে যুবরাজ প্রথার দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত কওয়া গেল (১১৯)। শেষে, গুপ্তযুগে উৎকট মূল-গত জাতীয়তাবাদ (Racial Nationalism) উদ্ভূত হইলে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য দ্বারা ৩৮৮ খৃঃ এই বিদেশীয় জাত রাষ্ট্র বিধ্বংসীকৃত হয় এবং শকরাজা ৩য় রুদ্রসিংহকে বিনাশ করা হয়। (১২০) 'কন্তু এতদ্বারা প্রমাণ হয় না যে, মধ্য ও পশ্চিম ভারতে শক ও পারদদের হিন্দু সন্তানেরা ভারত হইতে অন্তর্দ্ধান করে। খোদিত লিপিসমূহের পাঠ

১১৯। C. I. I. vol II. pt. I, P. 4৹. ১২০। Hem Roy-

দ্বারা দৃষ্ট হয়, উত্তরের বৈদেশিকেরা সাধারণতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং ভারতাভ্যন্তরের বিদেশীয়েরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। উত্তরের "কামগুলীয় (১২১) পুত্র "মণিগুল" (১২২) প্রভৃতি নামও আজ তাহাদের বংশধরেরা মুসলমান হইয়াও বহন করিতেছে, যথা : 'বাদসাগুল', 'আলীগুল' ইত্যাদি। পামীর উপত্যকার পূর্ব্ব অধিবাসী কাফির বা সিয়া পোশ জাতির এক অংশের নাম "কামগুল"। ইহারা আজ পলায়ন করিয়া চিত্রালে বসবাস করিতেছে। (১২৩) ইহাদের মধ্যে নীলচক্ষু, কটা চুল, উজ্জ্বল গৌরবর্ণের লোকও প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১২৪) বালটীস্থানের বালোটীরা গৌরবর্ণের; তাহাদের নামের সহিত শক Balotoi (বালোটীরা) জাতির সাদৃশ্য আছে। (১২৫) এইজন্য অনুমিত হয়, তাহারা শক বালোটীদেরই বংশধর। (১২৬)

কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরে যাহারা বাস করিয়াছিল তাহারা খাঁটি ব্রাহ্মণ্যবাদীয় হইয়াছিল (১২৭) এবং ব্রাহ্মণ্য পদ্ধতি অনুসারে স্বীয় বংশের গোত্র ও পদ্ধতি উদ্ভূত করিয়াছিল। (১২৮) ইহা আশ্চর্য্যের কথা নয় যে, তাহাদের রীতিনীতি হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, পরে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারেরা তাহা গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছিল। এই প্রকারেই অনেক অ-বৈদিক আচার-ব্যবহার ও বিশ্বাস আজ গোঁড়া হিন্দুয়ানী বলিয়া স্বীকৃত হয়।

পুনঃ, গুপ্তযুগের পরে, মধ্য-ভারতে হূনেরা একটী রাষ্ট্র সংস্থাপন করিয়াছিল। তাহারা ব্রাহ্মণ্যবাদীয় হইয়াছিল এবং রাজপুতদের উত্থানের

choudhuri. op cit. P. P 388, 339. (১২১-২২)। C. I. I. vol. II pt. I. পৃঃ ১১০, ৮২. (১২৩) Robertson : Kaffiristan ; Blomberg Chitral. 1031. (১২৪) B. S. Guha : Ethnological Report Census, 1931. (১২৫) Ptolemy's Map on India 11. (১২৬) Haddon : Races of Man. (১২৭) E.P India vol. viii, Pt 1 No 6. (১২৮) D. C Sircar : Selected Inscriptions.

সময়ে তাহাদের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। (১২৯) কালিদাসের টীকাকার মল্লিনাথ (রঘুবংশম, ১৪ কাণ্ড) হুনদের "ক্ষত্রিয়" জাতি বলেন। বাঙ্গালার পালরাজাদের সৈন্যদলে হুন-সিপাহী বা "রাজভৃত্য" থাকিত (খোদিত লিপি দ্রষ্টব্য)। দেবপাল দেব হুনরাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। (১৩০) হুন-রাজবংশীয় ভাস্কর নামক কবি "হরকেলী নাটক" পুস্তক সংস্কৃতে লিখিয়াছিলেন। (১৩১) এক্ষণে কথা এই, এইসব জাতি গেল কোথায়? ইহা স্বীকার করা যায় না যে, ভারতের উত্তর, মধ্য ও পশ্চিমে যেসব অ-ভারতীয় লোকদের নাম প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে বাহির হইতেছে, তাহাদের সকলেই ব্যক্তিগতভাবে ভারতে আসিয়াছিল। যখন উত্তরে এবং পশ্চিম ও মধ্যভাগে কতিপয় শতাব্দী ধরিয়া বৈদেশিক বংশোদ্ভবেরা রাজ্য জয় করিয়াছিল, তখন ইহা স্বতই গ্রহণীয় যে তাহাদের শক্তির উৎসস্বরূপ একটা স্বজাতীয় দল বা কৌম পৃষ্ঠপোষকরূপে তাহাদের পশ্চাতে ছিল। আজ তাহাদের পৃথক অস্তিত্ব নাই। কাজেই তাহারা গেল কোথায়?

রাজপুত জনশ্রুতি বলে, আবু পর্ব্বতে বশিষ্ঠ ঋষি জৈনদের সংহার জন্য একটা যজ্ঞ করেন; তাহা হইতে "অগ্নিকুল" রাজপুতদের পূর্ব্বপুরুষগণ উত্থিত হয়। এই প্রবাদটি মহামতি টড তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকে প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, শক, হুন প্রভৃতি বিদেশীয়েরা এই যজ্ঞ দ্বারা শুদ্ধিকৃত হইয়া "রাজপুত" হিন্দু হয়।

ঐতিহাসিক বৈদ্য ইহা অস্বীকার করেন। কিন্তু এই যজ্ঞের জনশ্রুতি আমরা খোদিত-লিপিসমূহে পাই। (১৩২) পুনঃ খোদিত-লিপিতে

১২৯। EP. Ind. vol ii. No. 23; বিক্রমাঙ্কদেব চরিত, ১ম খণ্ড, ১০২-১০৩ পৃঃ। (১৩০) EP. Inod. vol ii, P 163. (১৩১) India Ant. vol. XX P. 201 ff. (১৩২) EP. Ind. vol. viii. P 201; Vol. xiv. P 295 ff; vol ix. P. 10 ff.

আমরা এই সংবাদ পাই যে, বিখ্যাত রাজপুত বংশসমূহ হয় ব্রাহ্মণের ঔরসোদ্ভব (চিতোর রাণাবংশ) বা ব্রাহ্মণ বংশীয় (পাঞ্জাবাংশের হিমালয়-স্থিত কতিপয় রাজপুত রাজবংশ) বা অন্য জাতীয় লোক বংশোদ্ভব (গহড়ওয়ালী চোহান) বা অগ্নিকুলোদ্ভব (অগ্নিকুল রাজপুত বংশসমূহ) প্রমর বা পরামার, পরিহাড়, (প্রতিহার) (১৩৩)।

পুনঃ টড "হূন" নামক একটি রাজপুত কৌমের নামোল্লেখ করেন। বৈদ্য ইহাও অস্বীকার করেন এবং বলেন ইহা "হূন" নয়, "হূল"। (১৩৪) কিন্তু তিনি ইহাও বলিতেছেন যে "কুমারপাল চরিত" গ্রন্থে (চন্দ্র গহড়ওয়াল দ্বারা ১০৮০—১১৩০ খৃঃ বিরচিত) ছত্রিশ ক্ষত্রিয় রাজকুল মধ্যে "হূন" নামের উল্লেখ আছে। বিভিন্ন খোদিত-লিপিতে হূনরাজের উল্লেখ আছে (উদিপুর. প্রশস্তি) (১৩৫)। চারণেরা এবং জৈন পুস্তকসমূহে হূনদের "ক্ষত্রিয়" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা হইলে প্রশ্ন এই, এই সব ক্ষত্রিয়েরা কাহারা? তাহারা নিশ্চয়ই প্রাচীন ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব নয়। ইহাদের নাম আমরা প্রচীন পুস্তকে পাই না। অন্যপক্ষে খোদিত-লিপি সমূহে আমরা যে সংবাদ পাই তদ্বারা বোধগম্য করি যে, এক সময়ে নব-ক্ষত্রিয় কুলসমূহ সৃষ্ট হইয়াছিল।

১৩৩। B. N. Datta: Studiea in Indian Social Polity PP, 249—261.

১৩৪। Vaidya: History of the Mediaeval India, voi. IV, PP. 22—26.

১৩৫। EP Ind. vol. I, no 28.

একবারে আমরা বোধগম্য করি ভাকাটাকা-গুপ্তযুগে বর্ণাশ্রমীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নবকলেবর ধরিয়া পুনরুত্থান করিলে ঐতিহাসিক-দ্বন্দ্ববাদ অনুসারে সমাজ-শরীরও ক্রমশ নূতনভাবে পুনর্গঠিত হইতে থাকে। ইহারই ফলে, অব্রাহ্মণ ও অক্ষত্রীয় গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পর, নূতন ক্ষত্রিয় রাজকুল-সমূহ সৃষ্ট হইতে থাকে। শ্রেণী-সংঘর্ষের ফলে, আবহমান কালই হিন্দু সমাজের নিম্নস্তর হইতে লোকসংঘ ক্রমাগত উপরে উত্থিত হইতেছে এবং স্বীয় ক্ষমতানুসারে সমাজে একটা নির্দিষ্ট পদ গ্রহণ করিতেছে। খোদিত-লিপিসমূহ হইতে দৃষ্ট হয়, দক্ষিণ-ভারতেই নানা প্রকারের নূতন শ্রেণী-বিন্যাস ও রাজকুলসমূহ উত্থিত হইতেছে। এই নূতন শাসকের দল, লোকচোক্ষে নিজেদের শ্রদ্ধাস্পদ করিবার জন্য মহাভারত ও রামায়ণ নামক মহাকাব্যদ্বয়ের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বীরদের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিতে থাকে। এই প্রকারেই পল্লব রাজারা অশ্বত্থামার ও এক অপ্সরার সন্তান বলিয়া নিজেদের জাহির করে; রাষ্ট্রকূট রাজারা যদুবংশীয় সাত্যকীর বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। (১৩৬) অন্য পক্ষে, এই রাষ্ট্রকূটদের উত্তরের শাখা যোধপুর ও বিকানীরের রাঠোর রাজারা নিজেদের শিব ও শক্তি দেবতাদের বংশোদ্ভব বলে। ইহা কিন্তু বিকানীরের কেল্লায় প্রাপ্ত রাজা রায়সিংহজীপ্রদত্ত বংশ তালিকা যাহাতে রাঠোরদের চন্দ্রবংশীয় শান্তনুর সন্তান বলা হইয়াছে, তাহা খণ্ডন করে (১৩৭)।

এই সব কল্পিত বংশ-তালিকা পাঠে আমরা নির্দ্ধারণ করি যে, মধ্য-যুগের শেষভাগে শ্রেণী-সংঘর্ষ দ্বারা নিম্নস্তর হইতে লোকসমূহ শাসক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজেদের বংশ-মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য মহাকাব্যদ্বয়

১৩৬। EP. Ind. vol. ix. No 4. p. 26.

১৩৭। P. L. Paul, in I, H.Q vol xii 1936. P. 145.

হইতে স্বীয় স্বীয় উৎপত্তির দাবী করিতে থাকে. এবং পুরোহিততন্ত্র ঐতিহাসিক বস্তুতান্ত্রিক অবস্থাকে স্বীকার করিয়া তাহাদের এই দাবী গ্রাহ্য করে বা তাহাদের জন্য বংশ-তালিকা সৃষ্ট করে। ইহার বহু পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের একজন পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা কুমারিলভট্ট প্রশস্ত ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, রাজা হইলেই ক্ষত্রিয় হয়। এই প্রকারে ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে ডায়লেকটিক দ্বন্দ্ববাদ তাহার সংঘর্ষ দ্বারা নূতন সমাজ এবং শাসক-শ্রেণী বিবর্ত্তিত করে। তুর্কি-আক্রমণের পরে এই বিবর্ত্তন ব্যাহত হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়

মোগল পরযুগ

মধ্যযুগের ভারত

আমরা এখন ভারতের ইতিহাসের ষোড়শ শতাব্দীতে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। এই কালকে ভারতের মধ্যযুগ বলা হয়। এই সময়কার ভারত ব'ললে উত্তরের সর্ব্বগ্রাসী মোগল সাম্রাজ্য, দাক্ষিণাত্যের তিনটি মুসলমান রাজ্য ও তাহার দক্ষিণে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ—হিন্দু রাজত্ব।

এই সময়ে মোগলদের শাসন-পদ্ধতি অনুযায়ী কৃষকদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করা ছিল আমলাতন্ত্রের কার্য্য। এই কার্যের সুবিধার জন্য অনেক স্থানে "জমিদার" বলিয়া লোক নিযুক্ত করা হইত; ইহারা কৃষক ও

সম্রাটের মধ্যবর্ত্তী লোক। ইহারা কিন্তু রাজবংশীয় বা সর্দ্দার গোছের লোকের ন্যায় ছিল না। এই যুগের যত বিদেশী পর্য্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা এই দেশের জনসংখ্যা অত্যধিক বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের বর্ণনা পাঠে এই ধারণা হয় যে, তখনকার ইউরোপীয় দেশসমূহের তুলনায় বাঙ্গলা, উত্তর-পশ্চিম গুজরাট এবং দক্ষিণ-ভারত বেশ জনাকীর্ণ ছিল (১)।

এই সকল জনপদের লোকদের অর্থনীতিক অবস্থার পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক মোরল্যাণ্ড বলেন যে, সেই সময়ে মধ্যবিত্তশ্রেণী বিশিষ্টভাবে ছিল না, ইহার সংখ্যা অতি সামান্য ছিল (২)। আকবরের সময়ের পঞ্চাশ বৎসর পর ফরাসী পর্য্যটক বার্ণিয়ে বলিয়াছেন, "দিল্লীতে মধ্যবিত্ত স্তরের লোক নাই; একজন মানুষকে হয় অতি উচ্চপদস্থ হইতে হইবে, না হয় দারিদ্র্যে জীবন যাপন করিতে হইবে। মোরল্যাণ্ডের মতে এই সময়ে আজকালকার ন্যায় আইন-ব্যবসায়ীর দল ছিল না, পেশাদার শিক্ষকের দল হয়ত মুষ্টিমেয়; সংবাদপত্রসেবী কিংবা রাজনীতিকের দল ছিল না, ইঞ্জিনিয়ার এবং আজকালকার রেলওয়ে কর্ম্মচারীর দল ছিল না, পোষ্ট ও সরকারী জল বিভাগ, ফ্যাক্টরী এবং বড় কারখানায় কর্ম্মপ্রাপ্ত লোক ছিল না। আধুনিক জমিদারের দল বড় কম ছিল, হয়ত পৈত্রিক সঞ্চিত সম্পত্তি ভাঙ্গিয়া খাওয়ার লোকও কম ছিল। এইগুলির পরিবর্ত্তে ছিল কতকগুলি সরকারী পদের অধীনস্থ বা নির্ভরশীল গোষ্ঠী।

এই চিত্র মধ্যযুগীয় অবস্থার বর্ণনার সহিত মিলে। এই ভিত্তির উপরের যে শাসনপ্রণালী স্থাপিত হইয়াছিল তাহাও সেই যুগের অবস্থার অনুযায়ী। ভারতের হিন্দু অংশ, বিজয়নগর রাজ্যের ভূমি জনকতক সম্ভ্রান্ত লোকের

১। W. H. Moreland—India at the death of Akbar, P,13.

২। ঐ ঐ ঐ ঐ P,26.

মধ্যে বিভক্ত ছিল। ইউরোপীয় পর্য্যটক নুনিজ বলেন, সম্ভ্রান্ত লোকেরা (nobles) খাজনা প্রদানকারীদের (renters) ন্যায়; ইহারা রাজার নিকট হইতে সমস্ত জমি গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রতি বৎসর রাজাকে তাহার প্রাপ্য বলিয়া ষাট লক্ষ মুদ্রা খাজনা প্রদান করে। সমস্ত জমির আদায় ১২০ লক্ষ; ইহা হইতে ৬০ লক্ষ রাজাকে দিয়া বাকীটা তাহার সৈন্যদের মাহিয়ানা ও হাতীর খরচের জন্য রাখে। এইসব রাখা তাহাদের বাধ্যতা-মূলক ছিল। এইজন্য জনসাধারণ বিশেষ দুঃখভোগ করে; কারণ যাহারা জমি ভোগ করে তাহারা বড় অত্যাচারী (৩)।

বিজয়নগর ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্যগুলির অবস্থা অনুসন্ধান করিলে ষোড়শ শতাব্দীর শাসনপ্রণালীর সংবাদ মিলে না। বার্বোসা যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা বাহমনী রাজত্বের শেষকালের সংবাদ। তিনি বলিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যের সমস্ত রাজ্য মুসলমান সামন্তদের মধ্যে বিভক্ত ছিল; রাজা শাসনের কোন সংবাদই রাখিত না। এই অবস্থা পরের খণ্ডীকৃত রাজ্যগুলির ছিল কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু সন্দেহাতীতরূপে বলা যাইতে পারে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোলকোণ্ডার সম্ভ্রান্তেরা অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করিত। থেবেনো নামক জনৈক ইউরোপীয় পর্য্যটক মোগল সীমান্ত অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিবার সময় শেষোক্ত স্থানের খাজনা-আদায়কারীদের ঔদ্ধত্য দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হন। এই সকল জমি সম্ভ্রান্তেরা রাজার নিকট হইতে পায়, রাজা যে সর্ব্বাধিক দর দিত তাহাকে অথবা তাহার কোন প্রিয়পাত্রকে খাজনায় জমি দিত। সম্ভ্রান্তেরা ইহার জোরে জোর-জুলুম করিয়া প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিত, এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের দুর্ব্বলতাবশতঃ তাহারা রাজধানীতেও মধ্যে মধ্যে উৎপাত

৩। Moreland—India at the death of Akbar, P 32.

করিত। মোরল্যাণ্ড অনুমান করেন, বোম্বাই হইতে পূর্ব্বদিকে একটি অক্ষাংশ লাইন (latitude) টানিলে তাহার দক্ষিণের ভারতের অংশ সম্রান্ত শ্রেণীর লোকদের দ্বারাই শাসিত হইত (৪)।

মোগল সাম্রাজ্যে সরকারী পদগুলি "কাচ্চা" ভাবে, অর্থাৎ অস্থায়ীভাবে প্রদর্শন করা হইত, এবং আকবরের সময় বিভাগীয় শাসন-প্রণালী অঙ্কুর প্রাপ্ত হইয়াছে। আকবর তাঁহার সাম্রাজ্যকে সুবায়, অর্থাৎ প্রদেশে বিভক্ত করেন, সুবার শাসনকর্ত্তা শাসন-পদ্ধতির প্রত্যেক বিভাগের জন্য দায়ী থাকিত। সুবায় শাসনের unit ছিল জেলা—ইহার একজন সামরিক কর্ম্মচারী (ফৌজদার) ও একজন বিভাগীয় কর্ম্মচারী (আমল গুজার) ছিল (৫)।

আইন-বিভাগ এই সময় বিশেষভাবে বিবর্ত্তিত হয় নাই, ব্যক্তিগত নালিশ রাজা কিংবা সম্রাট শুনিতেন। আকবর "কাজী" বা "মির আদল" নামে আইন-বিভাগীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন, কিন্তু বোধ হয় তাহারা কেবল মুসলমান আইন-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন বিচার করিত। ইহাদের যে বিচারের পূর্ণাধিকার ছিল না তাহা আকবরের গভর্ণরদের আইন বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার অনুজ্ঞায় (আইন-আকবরী, তর্জ্জমা, ২, ৩৭, ৩৮) বোঝা যায়। পর্য্যটকেরা বলেন, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা সহর-কোটালের সম্মুখে কার্য-নির্ব্বাহক (executive) কর্ম্মচারীদের দ্বারা সম্পন্ন হইত। এই প্রথা বিজয়নগর হইতে উত্তর পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল (৬)।

এই সময়ে উৎকোচ গ্রহণ প্রথা ভারতের সর্ব্বত্রই ছিল। লিখিত আইন (constitutional law) ছিল না; হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্ম্ম, আইন, লোকাচার (custom) এবং ব্যক্তিগত খেয়াল প্রভৃতি দ্বারা

৪—৫। Moreland—India at the death of Akbar, P. 33.

৬। Moreland—India at the death of Akbar, P. 34.

কর্ম্মচারীরা বিচার করিত। শাসনতন্ত্র সুদৃঢ় না হইয়ে চারিদিকে ডাকাইতের উৎপাত হইত। ফিচ্ (১৫৮৩—৯১ খৃঃ) বাঙ্গালায় হুগলীতে আসিবার কালে জঙ্গল দিয়া আসিয়াছিল, কারণ রাজপথে ডাকাইতের উৎপাত ছিল (৭)। দেশের মধ্যে ব্যবসায়ের জিনিষ-পত্র লইয়া যাইবার জন্য শুল্ক প্রদান করিতে হইত। এইসব সত্বেও ব্যবসায় চলিত; কারণ এই সব খরচা বিক্রেতা মাল-ক্রেতার ঘাড়ে চাপাইত। এই সময়ে—"যে যত পাব শোষণ কর", এই প্রথা প্রচলিত ছিল; এইজন্য লোকে ধনী হইলেও ধন গোপন করিয়া রাখিত। এই সকল কারণ বশতঃ মূলধনী প্রথায় (capitalist basis) শিল্প ও বাণিজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হওয়া অসম্ভব ছিল। এই সময়ে শিল্পশ্রমের উৎপাদন (industrial production) বৃহৎভাবে হইত ও তাহা দামী ছিল, কিন্তু এই কর্ম্ম শিল্পীদের হাতেই ছিল, বোধ হয় তাহারা সওদাগর ও মধ্যবর্ত্তী লোকদের দ্বারাই অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্ম করিত (৮)। এই শিল্পীরা ব্যক্তিগত-ভাবে এত ক্ষুদ্র ছিল যে কর্ম্মচারীদের লোলুপদৃষ্টি এড়াইয়া যাইত। কর্ম্মচারীর নগদ মাহিয়ানার পরিবর্ত্তে "জায়গীর" পাইত। দেখা গিয়াছে, ইহাই প্রাচীন কাল হইতে ভারতে প্রথারূপে চলিতেছিল। আকবর ইহার পরিবর্ত্তে নগদ মাহিয়ানা দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের সময় পুরাতন প্রথা পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত হয় (৯)। এই কর্ম্মচারীরা অধিকাংশই বিদেশী ছিল। আবুল ফজল আমীর ও মনসবদারদের যে-তালিকা রাখিয়া গিয়াছেন, ব্লকম্যান উহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। উক্ত বিশ্লেষণ পরীক্ষা করিয়া মোরল্যাণ্ড বলেন,

৭। Moreland—India at the death of Akbar, P. 45.

৮। ঐ ঐ ঐ ঐ P, 51.

৯। ঐ ঐ ঐ ঐ P. 38.

কর্ম্মচারীদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন বিদেশী গোষ্ঠীজাত। ইহাদের গোষ্ঠী হয় হুমায়ুনের সঙ্গে ভারতে আসিয়াছিল, না হয় আকবরের সিংহাসন প্রাপ্তির পর দরবারে আসিয়া জুটিয়াছিল; অবশিষ্ট শতকরা ৩০ জন ছিল ভারতীয়; ইহার মধ্যে আবার অর্দ্ধেকের উপর মুসলমান এবং অর্দ্ধেকের কম হিন্দু (১০)।

উপরোক্ত শ্রেণীসমূহ ব্যতীত অন্যান্য পেশার শ্রেণীর সন্ধান করিলে দেখা যায়, শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংখ্যা বড় কম ছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী ফকিরের দল আজকালকার মতই ছিল। পর্য্যটকেরা দেশের বিভিন্ন স্থানে তাহাদের সংখ্যার প্রাচুর্য্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১১)। এই সময় মন্দিরগুলি ভারতের সর্ব্বত্র দেবোত্তর জমি ভোগ করিত, মুসলমানেরাও ইসলামীয় শাসকদের নিকট জমি দান পাইত। আকবরের পূর্ব্বে ইসলামীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যে সব জমি পাইয়াছিল উহা তাঁহার রাজস্বের অনেকটা খাইয়া ফেলিত।

এই সময়ে গোলাম রাখার প্রথা প্রচলিত ছিল, ধনীর প্রচুর গোলাম থাকিত। আইন-আকবরীতে উক্ত প্রথা স্বীকৃত হইয়াছে। আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়া হইতে অত্যধিক সংখ্যায় গোলাম আমদানী করা হইত, এবং ভারতের অভ্যন্তর হইতে গ্রাম্যাদি লুণ্ঠনপূর্ব্বক গোলাম সংগ্রহ করা হইত। এতদ্বারা এত অন্যায় অত্যাচার উৎপীড়ন অনুষ্ঠিত হইত যে, আকবর তাঁহার সৈন্যদের উক্ত কর্ম্মে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন (১২)। এতদ্ব্যতীত দুর্ভিক্ষের সময় লোকে নিজেদের পুত্র

১০। Moreland—India at the death of Akbar, P, 60.

১১। ঐ ঐ ঐ ঐ. P. 85.

১২। Akbarnama—translation ii, 246.

বিক্রয় করিত। সাধারণতঃ ছেলেদের চুরি করিয়া বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লইয়া অথবা ক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হইত। এই সকল বিষয়ে বাঙ্গালারঃ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বদনাম ছিল। বাঙ্গালা হইতে খোজা গোলাম (eunuchs) সংগ্রহ করা হইত (১৩)। ইহার কারণ—একে বাঙ্গালী রণভীরু জাতি, তারপর তাহাকে নপুংসক করিয়া দিলে স্বভাবতঃই সে আরও শান্ত প্রকৃতির লোক হইবে।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে এই তথ্য পাওয়া যায় যে, ভারতীয় সমাজে দুইটি স্তর ছিল—ধনী ও গরীব। ইহার মধ্যে ধনী ও তাহাদের চাকরের দল এবং সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকের দল কোন উৎপাদনশীল শ্রম করিত না। তাহারা যে আয় বরবাদ করিত তাহা অবশেষে কৃষক, শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের ঘাড়ে পড়িত।

শ্রমিকের অবস্থা

আকবরের সময়ের শ্রমজীবীশ্রেণীসমূহের কি অবস্থা ছিল তাহার অনুসন্ধান কালে আমরা দেখিতে পাই যে, এই সময়ে গ্রামে একটা বড় জমি-শূন্য শ্রমজীবিশ্রেণী ছিল। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ভারত এই প্রকারের লোক দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। ইহারা এই সময়ে সার্ফ (serf) ছিল কিংবা সেই অবস্থা হইতে সদ্য মুক্ত হইয়াছে।

১৩। বাঙ্গলা যে খোজা সংগ্রহ করিবার একটি বড় কেন্দ্র ছিল তাহা Marco Polo (Yule, ii, 115), Barbosa (P 363), Pyrard (translation, i, 332) প্রভৃতি পর্য্যটকেরা উল্লেখ করিয়াছেন, এবং আইন-আকবরী (Ain-i- Akbari) গ্রন্থে বাঙ্গালা প্রদেশ বিবৃতিকালে উল্লেখ আছে (translation, ii, 1227).

এই শ্রেণী আকবরের সময়ে বিদ্যমান ছিল, অথবা তাহার পরে উদ্ভূত হইয়াছে (১৪)। সম্ভবত গ্রাম্য অর্দ্ধ-গোলামিত্ব একটি পুরাতন প্রথা, যাহা আকবরের পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল। এই যুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই সামাজিক প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান ছিল। মোরল্যাণ্ডের এই মন্তব্য ইংরেজ গভর্ণমেন্টের Report on Slavery-র উপর স্থাপিত। ইহাতে অনুসন্ধানকারীরা (Commissoners) পুরা গোলামী (regular slavery) এবং কৃষি সম্বন্ধীয় গোলামী (agricultural bondage) সম্পর্কে পৃথকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এই অনুসন্ধানের ফলে গ্রাম্য অর্দ্ধ-গোলামিত্ব (serfdom) কিম্বা তাহার চিহ্ন সর্ব্বত্র পাওয়া যাইত। বাঙ্গালার কতগুলি জেলা হইতে এই সংবাদ আসে যে, কৃষি-গোলামেরা জমির সহিত সাধারণতঃ বিক্রীত হইত! দেখিয়া বোধ হয় স্যার উইলিয়াম ম্যাকনটেন ইহা নিম্নোক্ত আইন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন যে, পুরুষানুক্রমিক সার্ফেরা স্থাবর পৈতৃক সম্পত্তি বিষয়ক আইনের অধীন। সার এডওয়ার্ড কোলব্রুক বলেন, তাঁহার সময়ে পুরুষানুক্রমিক সার্ফদের উপর বিহারের জমিদারের অধিকার প্রায় অপ্রচলিত হইয়াছিল। এই বিষয়ের অনুসন্ধানকারীগণ "উত্তর-পশ্চিমের কোন কোন অংশে (United Provinces) উক্ত প্রথা দেখিতে পান নাই, কিন্তু নবাবের শাসন কালে প্রত্যেক সম্পত্তিতে লগ্ন (স্থিত) লোকেরা অনেকটা অর্দ্ধ-গোলাম (adscripti glabae) বলিয়া বিবেচিত হইত।" আজিমগড়ে নিম্ন-শ্রেণীর গ্রামবাসীদের এখনও (কমিশনের অনুসন্ধান কালে) জমিদারের "ব্যক্তিগত অনেক কার্য্য করিয়া দিতে হয়...আগেকার গভর্ণমেণ্ট- সমূহের সময়ে...তাহারা অর্দ্ধ-গোলাম (predial) ছিল।" কুমাউনে স্বাধীন

১৪। Moreland—India at the death of Akbar, P. 112—113.

শ্রমিকের কার্য্য পাওয়া অসম্ভব ছিল, কিন্তু "লাঙ্গলের গোলাম" এবং বাড়ীর গোলামের মধ্যে পৃথক করা হইত। আসামে গোলামকে দিয়া খাটান হইত; কৃষি কর্ম্মে স্বাধীন শ্রমিককে লাগান হইত না। মাদ্রাজে রাজস্ব বিভাগ (Board of Revenue) সংবাদ দেয় যে, "সমস্ত তামিল দেশ, মালাবার (১৫) ও কানাড়াতে শ্রমজীবিশ্রেণীদের বেশীর ভাগ অতীত কাল হইতে দাসত্বে আবদ্ধ আছে। কুর্গে স্মরণাতীত কাল হইতে অৰ্দ্ধ-গোলামী প্রচলিত আছে, বোম্বাইয়ের বড় সংবাদ নাই, কিন্তু সুরাট ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে অৰ্দ্ধ-গোলামিত্বের অস্তিত্বের সংবাদ দেয় (১৬)। বাঙ্গালায়ও গোলামী-প্রথা প্রচলিত ছিল, পূর্ব্ব-বঙ্গের "নফরজাতি" তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ (১৭)। এই সকল তথ্য দেখিয়া মোরল্যাণ্ড অনুমান করেন, ব্রিটিশ রাজত্ব প্রচলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবং আকবরের সময়েও একটা গোলামশ্রেণী গ্রাম্যজীবনের প্রচলিত পদ্ধতির অন্তর্গত ছিল। এই পদ্ধতি মাল দিয়া (production)

১৫। বার্বোসা এবং ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর লেখকেরা মালাবারে চাষী ও শ্রমিকদের গোলাম (Serf) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

১৬। Moreland—India at the Death of Akbar, P 113—114.

১৭। বাঙ্গলায় "সার্ফত্ব" এখনও একপ্রকার চলিত আছে। একজন কৃষক কোন লোকের নিকট হইতে টাকা ধার নিয়া তৎপরিবর্ত্তে যতদিন না উত্তমর্ণের এই ঋণ পরিশোধ হয় ততদিন বিনা বেতনে তাহার বাড়ীর চাকর হিসাবে থাকে। কিন্তু পুনঃ টাকার প্রয়োজন হইলে আবার এই প্রকারে খাটিয়া দেনা শোধ দেয়। এইপ্রকারে তাঁহার জীবন মুক্তির আস্বাদ পায় না।

মাহিয়ানা দেওয়ার রীতি দ্বারা অধিকন্তু সমর্থিত হয়। এই রীতি বিগত শতাব্দীতে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল, এবং এখনও ইহা অন্তর্হিত হয় নাই।

মোরল্যাণ্ড অথবা Report on Slavery লেখক কমিশনারেরা "ব্যক্তিগত কার্য্য" বা মাহিয়ানার পরিবর্ত্তে ফসল নেওয়ার প্রথার পশ্চাতে যে মধ্যযুগীয় Manorial system আছে তাহা তাঁহারা ধারণা করিতে পারেন নাই। ভারতেও সামন্ততন্ত্রীয় জমিদার প্রথার সঙ্গে এই পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে পরে আলোচিত হইবে।

কৃষকের সাধারণতঃ এই অবস্থা; কখন কখন এখানে সেখানে উন্নতি লাভ করিত। Report on Slavery সাক্ষ্য দেয় যে, স্থলবিশেষে সার্ফগণ নিজেদের এক টুকরা জমি রাখিতে পারিত, উক্ত জমি তাহারা অবসর সময়ে চাষ করিত।

শ্রেণীগত জীবনের অবস্থা

উপরোক্ত অর্থনীতিক ভিত্তির উপর সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সমাজে সম্ভ্রান্ত (nobles) ও দরবারী লোকেরা দুই হাতে খরচ করিত। সকলেই সম্রাট ও রাজাদের সর্ব্ব বিষয়ে অনুকরণ করিত; দরবারী কর্ম্মচারীরা তাহাদের আয় খরচা করিয়া উড়াইত। এইজন্যই 'নবাবী করা" প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে! তখন ব্যবসায়ে টাকা খাটান বড় কম হইত, কারণ বাণিজ্যে মূলধন খাটান বিপজ্জনক ছিল। এই জন্য যে টাকা ব্যয়িত হইত না তাহা নগদ অথবা গহনা তৈয়ার করিয়া লুক্কায়িত রাখিয়া সঞ্চয় করা হইত। সঞ্চিত ধন রাজা কাড়িয়া লইত বলিয়া লোকে তাহা গুপ্তভাবে রাখিত!

এই সময়ের ধনীরা খুব জাঁকজমকের সহিত বাস করিত,—অনেক চাকর, লস্কর রাখিত। এই প্রথা ভারতের সর্ব্বত্র এবং সকল ধর্ম্মের লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই জাঁকজমকের ফলে ওমরাহগণ ধন-হীন হইয়া পড়িত। তাঁহারা নির্ধন হইয়া পড়িলে কৃষকদের শোষণ করিত। সাজাহানের রাজত্বের শেষভাগে ফরাসী পর্য্যটক বার্ণিয়ে ভারত ভ্রমণকালে গণসমূহের দুর্গতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ধনীরা যখন ধন উড়াইত তখন মধ্যবিত্তশ্রেণীর অবস্থা ছিল কিরূপ? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে তাহাদেব সংখ্যা বড় কম ছিল এবং তাহাদেব বিষয়ে সংবাদও কম পাওয়া যায়। বোধ হয় তখনকার কেরাণী প্রভৃতির জীবন-যাত্রা প্রণালী আজকালকাব কেরাণী জীবন হইতে পৃথক নয়! এই সময়কার লিখিত বিবরণ যাহা সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর লোকদেব দ্বারা লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, তাহাদের জীবন আদৌ স্বচ্ছন্দ ছিল না।

এই সময়ের সওদাগরদের অবস্থার বিষয় খুব কমই জ্ঞাত হওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে অনেক ধনী ছিল, গড়পড়তা আয় (average income) বোধ হয় তেমন একটা খুব বেশী কিছু ছিল না (১৮)। ধনী সওদাগরদের ধনের বাহার দেওয়া বিপজ্জনকই ছিল; তাহা হইলে রাজা তাহাদের স্পঞ্জের মতন শুষিয়া নিবে! এইজন্যই বার্ণিয়ে বলেন, ধনীরা গরীব সাজিয়া থাকিত। বোধ হয়, এই অভ্যাসই আজকাল অনেক সওদাগরের গরীবানা চাল-চলন রাখার কারণ! কেবল পশ্চিম কূলের মুসলমান ব্যবসাদারেরা ভাল খাইত ও পরিত। ইহার হেতু,—এই সকল মুসলমান সওদাগরেরা নানা অধিকার ভোগ করিত, তাহাদের উপর কোন প্রকার উৎপাত হইত না।

১৮। ডেলা ভাল নামক একজন পর্য্যটক সওদাগরদের আর্থিক অবস্থার অনিশ্চয়তার প্রমাণও দিয়াছেন (Della Valle—P 134).

নিম্নশ্রেণীর অবস্থা

বিভিন্ন পর্য্যটক ও ভারতীয় লেখকদের বর্ণনা হইতে আমরা নিম্নশ্রেণীর অবস্থা বুঝিতে পারি। এই সকল লেখকেরা বলেন, বাঙ্গালা প্রদেশ ব্যতীত বাকি দেশটা মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে, তজ্জন্য অধিক মৃত্যু সংখ্যা, সন্ততিগণকে বিক্রয় করিয়া ফেলা এবং নর-মাংস ভক্ষণ (১৯) সংঘটিত হয় (২০)। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে এইসব দুর্ভাগ্য আপনিই জুটিত,—অবশ্য দুর্ভিক্ষ সচরাচর হইত না। এতদ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে গণসমূহের সঞ্চিত অর্থ কিছু থাকিত না বলিয়াই দুর্ভিক্ষের সময় তাহারা নানা বিপদে পড়িত (২১)। ষোড়শ শতাব্দীর প্রাক্কালে বার্ব্বোসা করমণ্ডল তীরভূমীর বিষয় বলিয়াছেন, এই দেশে সর্ব্ব বিষয়ে প্রাচুর্য্য থাকিলেও বৃষ্টিপাত না হইলে দুর্ভিক্ষে বেশী লোকের মৃত্যু হইত এবং এক টাকার চাইতেও কম মূল্যে সন্ততিগণ বিক্রীত হইত! ইহার পঁচিশ বৎসর পর কোরিয়া এইস্থানেই জনশূণ্যতা ও নরমাংস ভোজনের সংবাদ দেন; ইহার দশ বৎসর পর বাদাওনী আগ্রা ও দিল্লীর নিকটবর্ত্তীস্থলে এই প্রকার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। এই

১৯। Letourneau বলেন, লোকে অভাবের তাড়নাতেই নরমাংস ভক্ষণে বাধ্য হয়। এই বিষয়ে তিনি নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন (তাঁহার Anthropophagie পুস্তক দ্রষ্টব্য)। Black Death এর সময় ইউরোপে নরমাংস খাদ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে (Sorokin – The Sociology of Revolution, P. 152 দ্রষ্টব্য)। Crusaderরা যুদ্ধে তুর্কি শত্রুর মাংস খাইত (The National History of France, P. 119.)

২০। Moreland—India at the death of Akbar, P, 266.

২১। More'and – India at the death ef Akbar P. 266.

শতাব্দীতে উত্তর ভারতেরও এই দুর্দ্দশা হয় (২২)। ইহাতে এই মনে হয় যে লোকে নিজেদের আহার্য্য সংগ্রহের জন্য ঋতুর উপর নির্ভর করিত, এবং বৃষ্টিপাত না হইলে তাহাদের আর্থিক দুর্দ্দশা হইত।

পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে নিকিটিন নামে একজন রুশ পর্য্যটক বলিয়াছিলেন, দেশটি জনাকীর্ণ; যাহারা গ্রামে থাকে তাহারা অতি দুঃখে জীবন যাপন করে; কিন্তু অভিজাতেরা অত্যন্ত ধনী এবং বিলাসিতায় আনন্দলাভ করে (২৩)। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে বার্বোসা মালাবার কূলের (২৪) লোকদের দারিদ্র্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন এবং ঐ স্থানের কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর লোক অত্যন্ত গরীব ছিল। ইহাদের কতক লোক বিক্রয়ার্থে কাঠ ও ঘাস সহরে আনয়ন করিত, অন্য লোকে বন্য ফলমূল ও পশুর মাংস খাইয়া লজ্জা নিবারণের জন্য গাছের পাতা জড়াইয়া জীবন ধারণ করিত। বার্থেমাও এই প্রকারের ধারণা আমাদের প্রদান করিয়াছেন। বিজয়নগরের সাধারণ লোকের সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, "তাহারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে, কেবল শরীরের মধ্যস্থলে এক টুকরা কাপড় জড়াইয়া রাখে।"

দক্ষিণ-ভারতের নিম্ন-শ্রেণীর লোকদের দুঃখ-দুর্দ্দশার বিষয় যাহা বিদেশী পর্য্যটকেরা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা আজ পর্য্যন্তও সত্য। এই

২২। Moreland—India at the death of Akbar, P 266.

২৩। Translation of Nikitin in Major's "India in the Fifteenth Century, P 14.

২৪। সেতুবন্দ রামেশ্বর হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব্ব-উপকূলের কৃষক ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদের নগ্ন-দারিদ্র্য লেখক যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাহা তিনি জীবনে আর কোথাও দেখেন নাই।

শ্রেণীগুলি সভ্যতার যে-স্তরে অবস্থিত আছে তাহা নগ্ন দারিদ্র্যের জন্ত কতকটা দায়ী। অবশ্য সভ্যতা অর্থনীতিক অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করে। ইহাদের অর্থনীতিক পরিস্থিতি পুরোহিতদের আশীর্ব্বাদে চিরস্থায়ী হইয়াছে! একটা লোকসমষ্টির আথিক অবস্থার উন্নতি না হইলে তাহার সভ্যতার উন্নতি হয় না, কিন্তু ভারতের গণশ্রেণীরা সভ্যতার উন্নতির পথেই অভিশপ্ত হইয়া "পতিত" হইয়া আছে। এইজন্যই ভারতের পতিতদের নগ্ন দারিদ্র্য চিরকাল বিদেশীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

বার্থেমা ও বার্ব্বোসার পঁচিশ বৎসর পর পেয়স ও নুনিজ নামক পর্টুগিজ পর্য্যটকেরা বিজয়নগর ভ্রমণ করিয়া যে-অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা সেওয়েলের ভাষায়, "হিন্দু গভর্ণমেণ্টের অধীন সম্ভ্রান্ত লোকদের দ্বারা দক্ষিণ-ভাবতের রায়তেরা ভীষণভাবে অত্যাচারিত হইত। দুইজন পর্য্যটক পরস্পর স্বাধীনভাবে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে এই বোঝা যায় যে, গণসমূহ নিষ্পেষিত হইত এবং অত্যন্ত দুঃখ ও দারিদ্র্যে জীবন যাপন করিত" (২৫)। এই বিষয়ে বিভিন্ন পর্য্যটকদের প্রদত্ত বিবরণ হইতে আর উদ্ধৃত না করিয়া স্তার টমাস রো-এর কথা পর্য্যাপ্ত হইবে: "ভারতের লোকেরা মাছ যেমন সমুদ্রে বাস করে সেই প্রকারে বাস করে—বড়গুলি ছোটদের খাইয়া ফেলে। প্রথমে জোতদার (farmer) কৃষককে লুণ্ঠন করে, ভদ্রলোক (তালুকদার বা জমিদার) জোতদারকে লুণ্ঠন করে, বড় ছোটকে লুটিয়া লয়, রাজা সকলকে লুণ্ঠন করে"।

বাঙ্গালায় ইংরেজদের বাণিজ্য বিষয়ে কি সুবিধা আছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের সার মর্ম্ম এইরূপ: বাজার কেবল "ভদ্রলোকদের মধ্যে

২৫। Sewell—"Vijaynagar, a Forgotten Empire."

গণ্ডীভূত; ইহারা আবার সংখ্যায় অতি অল্প—অধিকাংশ অধিবাসীরা অত্যন্ত গরীব (২৬)। এই প্রদেশের অধিবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আবুল ফজল বলেন, "এক রকম চটের কাপড় (sack cloth) রঙ্গপুরে উৎপন্ন হইত।" এতদ্বারা অনুমান হয় যে পাট হইতে এক প্রকারের কাপড় প্রস্তুত হইত। কারণ পাটের কাপড় উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত গরীবদের নগ্নতা নিবারণ করিত। বাঙ্গলার সম্বন্ধে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ফিচ্ বলেন, গৌড়ের পুরাতন রাজধানীর নিকট তাণ্ডাতে "লোকে কোমরে একটু কাপড় জড়াইয়া নগ্ন হইয়া থাকে"; চট্টগ্রামের নিকট বাকোলার লোকদেরও সেই অবস্থা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। আর রাজধানী সোণারগাঁ'-এর লোকদের বিষয় তিনি বলিয়াছেন, "সম্মুখে (শরীরের গুপ্তাংশে) অল্প কাপড় পরে, বাকী শরীর উলঙ্গ থাকে" (২৭)। এই বর্ণনাগুলি আইন আকবরীর সহিত মিলে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে সুসা নামে পর্টুগীজ ঐতিহাসিক বাঙ্গালার জনসংখ্যা বেশী ছিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (২৮)। সর্ব্বশেষ বাবরের নিজ কথা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করা যাউক: চাষী ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা উলঙ্গ থাকে। লজ্জা নিবারণের জন্য নাভি কুণ্ডলের নিম্নে তাহারা "লাঙ্গোটা" নামে একটা আচ্ছাদন বাঁধে। স্ত্রীলোকেরা একটা কাপড়ের (লুঙ্গী) অর্দ্ধেক কোমরে জড়ায় আর বাকি অর্দ্ধেক মাথায় দেয়।" এই বর্ণনাই পর্য্যাপ্ত, ইহা কম বেশী পরিমাণে আজও সত্য। অবশ্য বর্ত্তমান ভারতের স্থান বিশেষে সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে পরিচ্ছদ, আসবাবপত্রাদি সাধারণ লোকে বেশী ব্যবহার করিতেছে।

২৬। Morelend—India at the death of Akbar, P 269.
২৭। Moreland—India at the death of Akbar, P 276.
২৮। Steven's Translation of "The Portuguese Asia," i, 415.

বাঙ্গালার মধ্যযুগের অবস্থার বিষয়ে ৺দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন—"এই কালে বাঙ্গালী খাইয়া পরিয়া বেশ সুখী ছিল (২৯)। গৃহজাত দ্রব্যেই দৈনন্দিন অভাবগুলি একরূপ সুন্দরভাবে মোচন হইত, বাজারের ব্যয় কিছুই ছিল না বলিলেই চলে।" মধ্য-যুগের মাৎস্ক-স্থারের অবস্থার মধ্যে তিনি যে সত্যযুগের কল্পনা করিয়াছেন ইতিহাস তাহার কোন সাক্ষ্য প্রদান করে না। যদি অভাবের জন্ম সর্ব্ব বিষয়ে ভোগ-বিরহিত হইলেই "স্বর্ণ-যুগের" সুখ ভোগের কল্পনা করা যায়, যদি "সত্যযুগ" অর্থে সভ্যতা-বিরহিত বর্ব্বরাবস্থা, যখন লোকে Domestic economy রূপ (যাহা প্রয়োজন তাহা স্বহস্তে সৃষ্ট করা, এই অর্থনীতিক অবস্থা) অতি প্রাচীন কৌমগত অবস্থার স্তরে থাকে তাহাই হয়, তাহা হইলে অবশ্য আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে বাঙ্গালা তখন সভ্যতার সেই স্তর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; তখন একদিকে ধনের প্রাচুর্য্য অন্যদিকে নিত্য-বুভুক্ষা—এই বাঙ্গালী সমাজের অর্থনীতিক অবস্থা!

কবি কঙ্কণের চণ্ডীতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয় দেশের রাজনীতিক অবস্থার জন্ম লোকে সদা সশঙ্কিত থাকিত? মুসলমান শাসকেরা "জিম্মিদের" (বিধর্ম্মী প্রজা) সকল সময়ে ভাল করিত না, ইসলামীয় বিধান অনুসারে জিম্মিদের নানা দুরবস্থা করিত (৩০)। বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে উল্লেখ আছে, "কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুথু দেয় মুখে…বাছিয়া ব্রাহ্মণ পায় পৈতা যার কাঁধে।" পেয়াদাগণ নাগ-পাইলে হাতে গলায় বাঁধে"। মুকুন্দরাম যখন তাঁহার

২৯। দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩৫১ পৃঃ।

৩০। "গৌড়ের ইতিহাস"—১ম খণ্ড-এ "রাজকর্ম্মচারীগণের অত্যাচার" ও সেইস্থানে উদ্ধৃত ভবানী দাসের কবিতা দ্রষ্টব্য; ২৪৯—২৫১ পৃঃ।

কাব্যে নায়ক ধনপতি সওদাগরকে সিংহল যাত্রা করাইলেন তখন সওদাগরের ডিঙি এমন স্থানে আসিল যে "রাত্রি দিন বহে যায় হারমাদের (পর্টুগিজ বোম্বেটে) ডরে"। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কেতকীদাস-ক্ষেমানন্দের "মনসা মঙ্গল" বিরচিত হয়। ইহাতে কবি নিজের পরিচয় প্রদানকালে বর্ণনা করিয়াছেন যে, বলভদ্রের তালুকে তিনি বাস করিতেন। জমিদারের মৃত্যুর পর তালুকে গোলমাল হয়, "তাহার তালুকে বৈসে, প্রজা মাহি চাষ চসে শমন নগর কাঁথড়া। ...দিন কত ছাড়িয়া যাই, তবে সে নিস্তার পাই, সকলের তবে ভাল যায়। শ্রীযুক্ত আস্কর্ণরাএ, অনুমতি দিল তাএ, যুক্তি দিল পালাবার তরে"।

এই অত্যাচার যে কেবল মুসলমান কর্তৃক হিন্দুর উপর অনুষ্ঠিত হইত তাহা নহে, হিন্দুও হিন্দুর উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করিত! রামদাস আদকের "অনাদি-মঙ্গল" রচনার মূলে একটি গল্প আছে—হায়ৎপুরে চৈতন্য সামন্ত নামক এক দুর্দ্দান্ত তহশীলদারের অত্যাচারে অল্পবয়স্ক কবি কারারুদ্ধ হন...কবি পলাইয়া মাতুলালয়ে যাইতেছিলেন এমন সময় বাঘনান গ্রামের পথে এক সশস্ত্র সিপাহী তাঁহাকে বেগার ধরিবার জন্য আটকাইল; এবং সিপাহী বলিল, "আমার সম্মুখে যদি ফেল এই মোট। দ্বিখণ্ড করিব তোরে মারি এক চোট"। তারপর কবি ধর্ম্ম ঠাকুরের কৃপার পাত্র হয়। পুনঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চন্দ্রাবতী নাম্নী ময়মনসিংহের এক মহিলা কবি এক রামায়ণ রচনা করেন। স্বীয় পরিচয় প্রদানকালে তাহাতে তিনি বলিতেছেন, "ঘরে নাই ধান চাল, চালে নাই ছা (উনি)। আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পাখী॥ বাড়াতে দারিদ্র্য-জ্বালা কষ্টের কাহিনী। তার ঘরে জন্ম লৈলা চন্দ্রা অভাগিনী॥"

এই যুগে সাধারণতঃ পুরুষদের জুতা পায়ে দিবার প্রথা ছিল না, নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা "কুঞা" নামে একপ্রকার পট্টবস্ত্র পরিধান

করিত (৩১)। ইতিপূর্ব্বেই ইহা আমরা বিদেশী পর্য্যটকদের প্রদত্ত বিবরণাদি হইতে শ্রবণ করিয়াছি।

বিদেশীয় ও দেশীয় সাক্ষ্য প্রমাণাদি শ্রবণান্তর আমরা ইহা উপলব্ধি করি যে মধ্যযুগে বাঙ্গালার গরীবদের ও জনসাধারণের অবস্থা আদৌ ভাল ছিল না; তাহারা যে "খাইয়া পরিয়া বেশ সুখে ছিল" তাহা নিছক হাল ফ্যাসানের বুর্জ্জোয়া সাহিত্যিকদের কল্পনা মাত্র। গৌড়ের সুলতান ও তাঁহার বারভুঁইয়ারা ও জমিদারেরা, দিল্লীর বাদসাহ ও তাঁহার প্রাদেশিক সুবেদার ও ওমরাহের দল, বিজয়নগরের মহারাজাধিরাজ ও তাঁহার সামন্ত রাজারা ও পলিগারের (ভূস্বামী) দল হাসিয়া খেলিয়া খাইয়া বেশ সুখে ছিল, একথা স্বীকার করা যায়! কিন্তু মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজে বিশেষতঃ ভারতের অবস্থার যে বর্ণনা আমরা বিদেশী ও দেশীয় লেখকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের গরীব সাধারণ অতি দুঃখ-দারিদ্র্যে ও অত্যাচার উৎপীড়নের ভিতর জীবন যাপন করিত, এবং দারিদ্র্যের জন্য অনেকে অর্দ্ধ-দাসত্ব ও পূর্ণ-গোলামিত্বে পতিত হইত। আর সেই সময়ে গোলাম ও খোজা সংগ্রহ করিবার একটি বড় কেন্দ্র ছিল বাঙ্গালা (৩২)।

৩১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—৪০০ পৃঃ।

৩২। মধ্যযুগের সাধারণ অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ("মধ্যযুগে বাঙ্গলা"—৩১৪—৩৫৫ পৃঃ) বলেন, "এক শ্রেণীর সমালোচক সেকালের অবস্থা বড়ই সুখের ছিল কল্পনা করিয়া লইয়া ইহার পরিপোষক প্রমাণস্বরূপ বলিবেন……মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের কষ্ট ছিল না। কায়স্থের কথায় পাটোয়ারী হইতে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলের আনুমাণিক আয় ব্যয়ের একটা হিসাব দেখাইয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমর্থন চলিবে। কিন্তু সাধারণ ও নিম্ন শ্রেণীর লোকের

রাষ্ট্রে সামন্ততন্ত্র পদ্ধতি

মধ্যযুগীয় ভারতে সামন্ততন্ত্র প্রথা অভিব্যক্ত হইয়াছিল কি না সে বিষয়ে অনুসন্ধানের তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া আমরা যাহা পাই তদ্বারা ভারতে যে সামন্ততন্ত্রপ্রথা উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হিন্দুযুগ হইতে মুসলমান যুগের শেষাশেষি পর্য্যন্ত এই প্রথার সমস্ত লক্ষণ আমরা ভারতীয় রাষ্ট্র-পদ্ধতির অন্তর্গত হইতে দেখি। ফিউড্যালিসমের সমস্ত লক্ষণগুলির স্বরূপ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; তত্রাচ এককথায় ইহার অর্থ হইতেছে, ইহা জমি-বিলির একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি (৩৩)। এক্ষণে কথা এই—উক্ত পদ্ধতির উৎপত্তি কোন সময় আরম্ভ হয়। সমাজতত্ত্ব বলে যে সভ্যতার একটা স্তর হইতে আর একটা স্তরে

বিষয়ে এই সমালোচক কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবেন না। ভদ্রলোক সুখে থাকিলেই দেশের অবস্থা ভাল হইত! কিন্তু কৃষিজীবী লোকের বেলায় আর সে কথা বলা চলিবে না। কবিকঙ্কণের আত্মকথায় দেখা গিয়াছে, সাধারণ ব্রাহ্মণেরও সর্ব্বথা সুখ ছিল না। কাব্য-কথিত ভারুদত্তের শ্রেণীর কৃপা-ভিক্ষার্থী কায়স্থও অনেক ছিল; ঔষধের থলি বগলে বৈদ্যরাজ সম্বন্ধেও ঐ কথা। উচ্চ জাতির স্বাচ্ছন্দ্য ছিল স্বীকার করিলেও কৃষক এবং শ্রমজীবীর যে সুখ ছিল, ইহা কেহই প্রমাণ করিতে পারিবে না। যে কালে টাকায় পাঁচ মণ ধান্য বিক্রীত হইত, সেই সময়ে সাধারণ শ্রমজীবীর মজুরী চার পয়সারও কম ছিল; তখন তাহারা বস্ত্র ও গৃহের উপকরণ যে ভাল করিতে পারিত তাহা বলা চলে না। বাস্তবিক বিদেশীরা আসিয়া এই শ্রেণীর লোকের কষ্টই দেখিয়াছেন"।

৩৩। R. T. Davies—Mediaeval England, P 29.

যাইতে দীর্ঘকাল ব্যয়িত হয়। বিপ্লব বা প্রলয় ব্যতীত তাহা শীঘ্র সম্পাদিত হয় না, অভিব্যক্তির রাস্তায় অনেক সময় লাগে। এই যুক্তি অনুসারে আমরা দেখি যে, ভারতের সামন্ততন্ত্র-পদ্ধতির সমস্ত লক্ষণ বিবর্ত্তিত হইতে দীর্ঘকাল লাগিয়াছে। আর ইহা রাষ্ট্রে পরিবর্ত্তিত হইবার কালে সমাজ-শরীরে কি বিপ্লব ঘটাইয়াছিল তাহার সংবাদ কোথায় পাওয়া যাইবে? কৌম প্রথা ভাঙ্গিয়া কখন কেন্দ্রীভূত 'এক রাট' প্রথা উদ্ভূত হয় এবং কোন্ পরিবর্ত্তনের ফলে সামন্ততন্ত্রীয় প্রথা রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার অনুসন্ধান এখনও সম্যকরূপে হয় নাই।

কেহ কেহ বলেন, হিন্দুযুগে সামন্ততন্ত্র প্রথা ছিল না; তবে রাজপুতদের মধ্যে ইহার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উৎপত্তির কারণ অজ্ঞাত বলিয়া মনে করেন (৩৪)। আমাদের অনুমান হয়, এই যুক্তি সমীচীন নয়। হিন্দুযুগের শেষাশেষি রাজপুতদের উত্থানের সময়ে এবং মুসলমান যুগে রাজপুতনায় সামন্ততন্ত্রের লক্ষণগুলি স্পষ্ট প্রতীত হয় বলিয়া এবং ইহাদের সহিত ইউরোপীয় প্রথার সৌসাদৃশ্য পর্য্যবেক্ষণকারীর চক্ষে শীঘ্র পড়ে বলিয়াই এই অনুভূতির উদ্ভব হয়। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে, শুঙ্গ যুগ হইতে ধীরে ধীরে ইহার বিবর্ত্তন হইতেছে; পালরাজবংশের রাজত্বকালে বাঙ্গালায় সামন্ততন্ত্র ছিল, বাঙ্গলা সাহিত্যে তাহার উল্লেখও আছে—সেন রাজাদের সময়ও তদ্রূপ (৩৫)। পুনঃ সুদূর দক্ষিণের বিজয়নগর সাম্রাজ্যে এই প্রথা যে ভালভাবেই ছিল আমরা তাহার

৩৪। Dr. P. N. Banerjee—Public Administration in Ancient India, P 52.

৩৫। মধ্য যুগে বাঙ্গলা—১৮০-৯৩ পৃঃ। হিন্দুযুগের বাঙ্গলার লেখমালা দ্রষ্টব্য।

নিদর্শন পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। তৎপর মুসলমান যুগের প্রথমার্দ্ধে অর্থাৎ মোগল শাসন প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে এই প্রথা সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায় (৩৬)।

বৈদিকযুগে আমরা জমিতে ব্যক্তিগত স্বামিত্ব (individual ownership) প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখি (৩৭)। কিন্তু এই সঙ্গে জমিদার অভিজাত শ্রেণী (landed aristocracy) ও সামাজিক বৈষম্যের সন্ধানও পাওয়া যায় (৩৮)। এই সময়ে রাজা প্রজা হইতে "বলি" বা রাজস্ব চাহিত, কিন্তু তাহার ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী ভূস্বামী থাকার কোন নিদর্শন বেদে নাই (৩৯)। কিন্তু ক্রমশঃ একটা ভূ-স্বামীর দল উদ্ভূত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহা রাজাদের দ্বারা বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদের এবং শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদের গ্রাম প্রদান করার ফল স্বরূপ। ক্রমে সমাজে ধনী (ঋক ১, ৩১, ১২; ২, ৬, ৪; ১০, ১০, ৭) ও গরীবদের (১০, ১১৭) বিষয়ে বেদে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। প্রাচীনকালের অবস্থা বিষয়ে ডাঃ প্রাণনাথ বলেন, সমস্ত ভারতই অভিজাতদের করায়ত্ত হইয়াছিল। (৪০)

পরে মৌর্য সাম্রাজ্যকালে আমরা এক শ্রেণীর নিদর্শন পাইয়াছি যাহা কতকগুলি সর্ত্তে রাজার নিকট হইতে জমি ভোগ করিত। হয়ত এই

৩৬। গৌড়ের ইতিহাস—১ম খণ্ড, ২৬৮ পৃঃ।

৩৭। Dr. N. C, Bandyopadhyaya—Economic Life and Progress in Ancient India, vol. I, Pp. 102—103: Vedic Index—vol. I, P. 991, ৩৮। Dr. N. C. Bandyopadhyaya—op. cit vol. I, P. 182. ৩৯। Dr. N. C. Bandyopadhyaya—Ibid, op cit. vol., P. 187.

৪০। Dr. Prannath—Study in the Economic Condition of Ancient India," P. 130.

সর্ত্তই সামন্ততন্ত্রীয় প্রথার feudalism) প্রথম চিহ্ন, যাহা আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই। অশোকের সময়ে রাজাই জমির মালিক বলিয়া প্রতীত হয়। বোধ হয় স্বেচ্ছাচারী রাজারূপে প্রতিষ্ঠানটি (Kingship) উদ্ভূত হওয়ায় আইনের ফাঁক দিয়া রাজা জমির মালিকানা স্বত্ব গ্রহণ করে। ইহাই সামন্ততন্ত্রের প্রথম সোপান।

সামন্ততন্ত্রের প্রধান উপাদান হইতেছে জমির ভোগাধিকার রাজা হইতে ধাপে ধাপে কৃষকে উপনীত হওয়া (Sub-feudation of land)। খোদিত লিপিসমূহে আমরা স্তরসমূহের প্রচুর নিদর্শন পাই।

সামন্ততন্ত্রের অন্যতম একটি লক্ষণ "সার্ফ শ্রেণী"। প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান যুগের শেষকাল পর্য্যন্ত সময়ে ইহার ক্রমবিকাশ হয়—আমরা ভারতের ইতিহাসে তাহারও সন্ধান পাইয়াছি।

ফিউড্যাল পদ্ধতির আর একটী লক্ষণ manorial system. ইহার নিদর্শন ভারতে পাওয়া যায়। এই পদ্ধতি অনুসারে রাজা যেমন তাহার দরবারের সমস্ত কার্য্যের জন্য নগদ বেতন না দিয়া লোকদের জমি দান করিত এবং এই জমি ভোগের পরিবর্ত্তে তাহারা দরবারের প্রয়োজনীয় সমস্ত কর্ম্ম করিত, তদ্রূপ রাজার অধীনে সামন্তেরা এবং তাহাদের অধীনে ছোট ছোট জমিদারেরা পর্য্যন্ত এই পদ্ধতির নকল করিত। রাজার অধীনে ভূ-স্বামীদের বাটীকে ইউরোপের মধ্যযুগে manor-house বলিত। ইহা হইতে এই পদ্ধতির নামকরণ হইয়াছে। বাঙ্গলার "চাকরাণ জমি" ও বেহারের "চাকরাণা" ভোগ করার প্রথা এই পদ্ধতির নিদর্শন। রাজপুতনাতে এই পদ্ধতি এখনও পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে (৪১)।

৪১। টডের "Annals of Rajasthan" নামক পুস্তকে একটি গল্প উল্লিখিত আছে। তদ্দারা এই পদ্ধতি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। একবার উদয়পুরের এক মহারাণা কোন কারণবশতঃ তাহার গোয়ালার জমি

তথাকার একটি রাষ্ট্রের মহারাজা হইতে গ্রাম্য জমিদার পর্য্যন্ত সকলেই এই পদ্ধতির অনুসরণ করে। ইহা দ্বারা রাজা হইতে জমিদার সকলেই পুরোহিত, কামার, কুমোর, নাপিত, ধোপা, গোয়ালা প্রভৃতিদের জমি প্রদান করে এবং এইসব লোক জমি ভোগের বিনিময়ে বিনা বেতনে বা অর্থে ভূ-স্বামীর কাজ করিয়া দেয়।

ভারতের ইতিহাসের অর্থনীতিক ও সামাজিক বিশ্লেষণ করিয়া আমরা ফিউড্যালিসমের সমস্ত লক্ষণ নিরীক্ষণ করি, এবং তাহা একত্রিত করিয়া দৃষ্ট হয় যে, এই দেশের রাষ্ট্রে তাহার পূর্ণ বিবর্ত্তন হইয়াছে।

মধ্যযুগীয় আন্দোলন

মধ্যযুগে পূর্ব্বোক্ত রাজনীতিক, সামাজিক ও অর্থনীতিক পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের সমাজ অবস্থিত ছিল। তখন মুসলমান শাসনকালে ভারতীয় সমাজ অখণ্ড ছিল না, ববং ভারতে দুইটি সতত যোধ্যমান ও পরস্পর বিপরীত ভাবাক্রান্ত সমাজ সৃষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে অনেক হিন্দু নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিদেশীয় মুসলমানদের সঙ্গে মিশিয়া ভারতে মুসলমান সমাজের বৃদ্ধিসাধন করিতেছিল। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের জন্য প্রাচীন ভারতে উদ্ভুত সভ্যতার সমস্ত পদ্ধতি ইহারা ত্যাগ করিতেছিল বলিয়া হিন্দুসমাজের সহিত মুসলমান সমাজেব বিরোধ আরও দৃঢ়মূল হইয়াছিল। এই সময়ে হিন্দুধর্ম্ম ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং ইসলাম আন্তর্জ্জাতিকতার প্রতীক হইয়াছিল। সে সময়ে হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করিলে ভারতীয়

কাড়িয়া লইয়াছিলেন। পরে আহারের শেষে রাণা যখন দধি খাইতে চাহেন তখন ভাণ্ডারী বলিল, "মহারাজ, আপনি আপনার গোয়ালার জমি কাড়িয়া লইয়াছেন; সে দই দিবে কি প্রকারে?"

সভ্যতার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া "মুসলমান বেরাদারান" এই মনোভাব প্রকাশ করিত (৪২)। কারণ অন্য ধর্মের লোক মুসলমান হইলে তাহার একটা জাতিতত্ত্বীয় (Ethnological) পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। হালের আবিষ্কৃত "রসুল বিজয়" পুস্তকে এই পরিবর্ত্তন স্পষ্টভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে। এই অবস্থায় নিজেকে বাঁচাইবার জন্য হিন্দুসমাজও কমঠবৃত্তি অবলম্বন করে। হিন্দু জাতিভেদ, আচার-ব্যবহার, এমন কি. বাহ্যিক বেশভূষার দ্বারা নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। আত্মরক্ষার এই চেষ্টার ফলে এবং হাতে রাষ্ট্র না থাকায় শ্রেণী-সংগ্রাম এবং জাতি-সংঘর্ষ অপেক্ষা ধর্ম্ম-সংগ্রাম অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম্মীয় বনাম মুসলমান ধর্ম্মীয়দের সংগ্রাম ভারতের ইতিহাসে বিরাট আকার ধারণ করে। তত্রাচ শোষিত ও পতিতশ্রেণীর লোকেরা ইহার মধ্যেও নিজেদের যথাসম্ভব সুবিধা আদায় করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মুসলমান-ভারতে উত্তরের হিন্দু সমাজ মস্তিষ্কবিহীন হইয়া কেবল আত্মরক্ষার কার্য্যে

৪২। আরব ঐতিহাসিকদের দ্বারা মহম্মদ বিনকাসেমের সিন্ধু-বিজয়ের পরের পরিস্থিতি বিষয়ে লিখিত একটি পুস্তকে উল্লিখিত আছে যে, আরব নেতা একজন ব্রাহ্মণকে কয়েদ (আটক) করে এবং তাহাকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করে! পরে সেই ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব মনিব এক রাজার সহিত মুসলমান নেতার সন্ধি স্থাপিত হয়। রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-কালে সেই ব্রাহ্মণকে দেখিতে পায়। কিন্তু সে রাজাকে দেখিয়া আর পূর্ব্বের ন্যায় উঠিয়া সসম্মানে অভিবাদন করিল না! রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেই ব্রাহ্মণ উত্তরে বলে, "তুমি কাফের এবং আমি মুসলমান হইয়াছি; তোমার নিকট আমি আর মস্তক অবনত করিতে পারি না।" এই গল্প সম্বন্ধে Elliot—"History of India দ্রষ্টব্য।"

নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিল, তজ্জন্য রাষ্ট্রীয় সামাজিক সংগঠন কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার মধ্যে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা সমাজের যে পুনঃ-সংগঠন করা সম্ভব হইয়াছিল তাহা বাঙ্গালার সামন্ত রাজা ও জমিদারদের সহায়তাতেই সম্ভবপর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় (৪৩)। মোগল শাসনের পূর্ব্বে বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজ যে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ন্যায় ছত্রভঙ্গ ও মস্তিষ্ক-বিহীন হয় নাই তাহার প্রমাণ বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ্যবাদীয় হিন্দু সমাজের গঠন এবং মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন জাতির "মেল বন্ধন" "একজাত্রি করণ" "সমীকরণ" প্রভৃতি এবং নূতন সমাজ-পদ্ধতির প্রচলন। মুসলমান শাসনকালেই বাঙ্গালার বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের বিবর্ত্তন পূর্ণতা লাভ করে। এতদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, এই প্রদেশের হিন্দু-সমাজ মস্তিষ্ক-বিহীন হয় নাই। বাঙ্গালার সামন্ত রাজারা এবং ক্ষণিকের জন্য স্বাধীন হিন্দু নরপতিদের উত্থান এই কর্ম্মকে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বাঙ্গালার হিন্দুরা নিশ্চেষ্ট ও মস্তিষ্ক-বিহীন হয় নাই বলিয়াই বাঙ্গালায় শ্রেণীসমূহ এত ওলট-পালট হইয়াছে। বৌদ্ধযুগের অনেক শ্রেণী পতিতদের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছে, অনেক নূতন শ্রেণী উত্থিত হইয়াছে, অনেক নূতন জাতি সৃষ্ট হইয়াছে—বৌদ্ধ বাঙ্গালার সভ্যতার সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে। আর বিশেষ আন্দোলন উদ্ভূত হইয়াছিল সুদূর দক্ষিণে বিজয়নগর সাম্রাজ্যে। এই সুদূর দক্ষিণে স্বাধীন রাষ্ট্রের আশ্রয়ে বৈদিক কৃষ্টির অনুসন্ধান করিয়া তাহার অনুশীলন হইতেছিল এবং দক্ষিণ-ভারত বৌদ্ধ ও জৈনদের সহিত কলহ করিয়া বেদান্তবাদের নামে বৈদিক-ধর্ম প্রসূত ব্রাহ্মণ্যবাদকে আবার আক্রমণশীল করিয়া তুলিতেছিল।

৪৩। গৌড়ের ইতিহাস—১ম খণ্ড, ১৪৬—১৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য; হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখনীও দ্রষ্টব্য।

ভারতের যখন এই অবস্থা তখন অধঃপতিত শ্রেণীগুলি কি করিতেছিল তাহার অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বৌদ্ধ ও জৈনেরা ব্রাহ্মণদের দ্বারা ভাল চক্ষে নিরীক্ষিত হইতেন না। ব্রাহ্মণ্য-বাদীদের পুনরুত্থানকালে তাঁহারা নানা প্রকারে নির্য্যাতিত হইতেন। দক্ষিণে বেশীর ভাগ সময়ে ব্রাহ্মণ রাজত্বের জন্যই বোধ হয়, ব্রাহ্মণ্যবাদ বিশেষ গোঁড়া ও অত্যাচারী হয়। দ্রাবীড়ভাষী জাতিদের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আশ্রয়ে আনয়নরূপ অনুকম্পার প্রতিফলস্বরূপ ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য অতি নিষ্মম হয়। আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ত্রিবাঙ্কুর ও মালাবার দেশে অতি ভীষণভাবে অব্যাহত রহিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে যে অত্যাচারিত ও শোষিতেরা অস্থির হইয়া তাহার একটা প্রতিকারের প্রচেষ্টা করিবে তাহা অসম্ভব নয়। দক্ষিণে প্রাচীনকাল হইতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মীয় লোকসমূহ ছিল; কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি বৌদ্ধদের হাতে আসে নাই বলিয়া বোধ হয় তাহাদের ধর্ম্ম বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। সুদূর দক্ষিণে বৌদ্ধযুগের পূর্ব হইতেই ব্রাহ্মণ্যবাদ দৃঢ়মূল হইয়াছিল, বোধ হয়, সেখানকার লোকেরা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসার প্রচেষ্টায় বাধা প্রদান করিয়াছিল (৪৪)। ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানের ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম (৪৫) সেখান হইতে লোপ হইয়াছে, কিন্তু জৈনধর্ম্ম কিছুদিনের জন্য রাজশক্তি করায়ত্ত

৪৪। চোল রাজাদের রক্তপাত দ্বারা জৈনধর্ম্মের বিলোপ সাধনের চেষ্টা করার প্রমাণ আছে। Vaidya—Vol. iii, P 408. পুনঃ সিংহলের বৌদ্ধরাজা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ্যবাদীয় শিবমন্দিরসমূহ ভাঙ্গিয়া দিবার সংবাদ আমরা সাহিত্যে পাই। "মহাবংশ" দ্রষ্টব্য।

৪৫। S. K. Aiyangar—Some Contributions of South India to Indian Culture, PP 29—58.

করার ফলে আজও স্বীয় ভক্তদের মধ্য দিয়া জীবিত আছে, যদিও তাহারা মুষ্টিমেয়।

মধ্যযুগে ভারত যখন নূতন পদ্ধতির কটাহে দ্রবীভূত হইতেছিল তখন একটি আশ্চর্য্য অনুষ্ঠান নিরীক্ষিত হয়—সর্ব্বত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে একটা উদার ধর্ম্মমত উদ্ভূত হয় এবং ক্রমে তাহা ভারতব্যাপী হয়। এই নূতন ধর্ম্মে পতিত ও নিপীড়িতেরা স্থান পায়।

যখন সামন্ততন্ত্রীয় সমাজ অভিজাতদের অধীনে থাকিয়া গরীব ও পতিতদের নিষ্পেষণ করিতেছিল তখন পতিতেরা যে নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়াছিল তাহা নহে। উত্তর-ভারতে পতিতদের অনেকে সাম্যবাদীয় ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল। সামাজিক অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া তাহারা যখন একদিকে স্বীয় সমাজে নিজেদের উত্থানের উপায় নাই দেখিল, অন্যদিকে মুসলমান শাসকেরা বিজাতীয় হইয়াও সাম্যের পথ দিয়া নিজেদের সমাজে আসিতে আহ্বান করিল, তখন একদল পতিত সেই আশ্রয়স্থলে গিয়া দাঁড়াইল আর একদল হিন্দু সমাজের মধ্যে যে সংস্কার-আন্দোলন হইতে আরম্ভ হইল তাহার মধ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। পণ্ডিতেরা বলেন, ইসলামের আক্রমণের ফলেই হিন্দু সমাজে সংস্কার-আন্দোলন উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ সাম্যবাদীয় ইসলামের আক্রমণের প্রতিক্রিয়ার ফলেই হিন্দুসমাজে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়।

আশ্চর্য্যের কথা, সাম্যবাদীয় হিন্দু প্রতিক্রিয়া বৈষম্যপূর্ণ হিন্দু দক্ষিণে প্রথম আরম্ভ হয়। যখন অভিজাতেরা শঙ্করের মতকে নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থ পরিপুষ্টিকর বলিয়া গ্রহণ করিতেছিল, বিজয়নগরের সম্রাট বক্কারায়ের অধীনে হেমাদ্রি স্মৃতির নূতন অর্থ করিয়া বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার পরিপোষকতা করিতেছিল, আর সেই সাম্রাজ্যের সহায়তায় সায়নাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য প্রভৃতি বেদ ও প্রাচীন সংস্কৃত ধর্ম্মপুস্তকের টীকা করিয়া বৈষম্যপূর্ণ

ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনঃ প্রচলনে সহায়তা করিতেছিল, তখন সুদূর দক্ষিণেই হিন্দুর মধ্যে সাম্যবাদের ভেরী বাজিয়া উঠে। ইহার অব্যবহিত পূর্বেই দক্ষিণ শ্রীরঙ্গম মন্দির পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তন্মধ্যে রঙ্গনাথ ঠাকুরের মূর্তি পুনঃ-সংস্থাপিত, হয় (৪৬)। এই দেবতার উপাসক বৈষ্ণব চূড়ামণি বেদান্তদেশিক, বিজয়নগর সম্রাটের দরবারে থাকিবার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া রামানুজের উপদেশ অনুসরণ করিয়া দক্ষিণ-ভারতের বৈষ্ণবধর্মের শেষ রূপ পরিগ্রহণে সবিশেষ সহায়তা করেন (৪৭)।

সুদূর দক্ষিণে তামিল সাহিত্যের প্রারম্ভে ভক্তিমার্গীয় শৈবধর্মের প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে মাণিকভাসাগারের তিরুভাসাগাম, তিরু ভাবাইপ্পা এবং তিরু পাল্লাণ্ডু নামক বিখ্যাত ধর্মপুস্তক রচিত হয়। কাহার কাহারও মতে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে মাণিকভাসাগার প্রকট হন। ইনি সিংহলাগত বৌদ্ধদের তর্কে পরাস্ত করেন। ইহার পর দ্বাদশ শতাব্দীতে "বীরশৈব" নামে আক্রমণশীল শৈব মত এই দেশে উত্থিত হয়। তেলিঙ্গানার কাকটিয়া দেশেই এই মত প্রথম প্রকট হয় (৪৮)। কোথা হইতে শৈবধর্ম এই নূতন তেজ প্রাপ্ত হয় তাহার স্পষ্ট নিদর্শন নাই; তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, রাজেন্দ্র চোল বাঙ্গালা আক্রমণকালে কতকগুলি শৈব ব্রাহ্মণ সেখান হইতে স্বদেশে লইয়া যায় (৪৯); আবার কাকাটিয়া ১ম রুদ্রদেবের রাজত্বকালে বুণ্ডেখলণ্ড হইতে লোক গিয়া এই দেশে

৪৬-৪৭। S. K. Aiyangar—Some Contributions of South India to Indian Culture, PP. 308, 311-312.

৪৮। S. K. Aiyangar—op cit. P 247.

৪৯। EP. Rep. 1917, Secs 30—37; Aiyangar—op cit, P 246

বসবাস করে (৫০)। রাজেন্দ্র চোলের সময়ে কোশলের জঙ্গল ব্রাহ্মণ ঔপনিবেশিকদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। ইহারা আর্য্যাবর্ত্তের উপর গজনীর মামুদের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে এই স্থানে আশ্রয় নেয় (৫১)। মামুদের ভারতে শেষ আক্রমণ ও রাজেন্দ্র চোলের এই স্থান আক্রমণ (১০২৪—২৫) একই বৎসরে হয়। বোধ হয় এইসব বিতাড়িত ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণের এই হিন্দু রাজত্বের দ্বারা দ্রাবিড় দেশে অতিথিরূপে গৃহীত হন। তৈলঙ্গ দেশের গোলাকি মঠ, বুন্দেলখণ্ডের দাহালা হইতে আগত শৈব ব্রাহ্মণ দ্বারা স্থাপিত হয় (৫২)। ইহাদের নিকট হইতে নব-শৈব মত সংগঠিত হওয়ার উদ্দীপনা প্রাপ্ত হয়।

এই বীর শৈবধর্ম্ম জাতিভেদ বর্জ্জন প্রভৃতি কতকগুলি সামাজিক সংস্কার সাধন করে। (৫৩) এই ধর্ম্ম আন্দোলন কিন্তু দুই ভাগে বিভক্ত হয় —স্থিতিশীল (conservative) ও চরমপন্থীয় (radical)। প্রথমোক্তটি ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া হয়; অপরটি জাতিভেদ বর্জ্জন করে। এই শেষোক্ত ভাগটি বাসব কর্ত্তৃক সংগঠিত হয়; এবং ইহা "লিঙ্গায়েৎ" নামে আজ পর্য্যন্ত পরিচিত হইতেছে। বাসব দেবতার প্রসাদের নূতন অর্থ প্রদান করিয়া তাহার মাহাত্ম্য বাড়ান (৫৪) এই সম্প্রদায় জাতিভেদ বর্জ্জন করে এবং বলে যে ব্রাহ্মণদের কোন বিশিষ্ট পবিত্রতা নাই এবং সকলেই চরমস্থানে পৌঁছিতে পারে। যখন বৈষ্ণবেরা বর্ণাশ্রমের গণ্ডী পরিত্যাগ করিতে পারিল না সেই সময়ে বাসব জাতিভেদ ত্যাগ করে এবং তাহার সময়ে তাহার দলে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের বিবাহও সম্পন্ন হয় (৫৫)।

৫০-৫১। S. K. Aiyangar—op. cit. pp 247; 260.
৫২। Ibid, op. cit.
৫৩। EP. Ind. vol. v, no E. P 239
৫৪। EP Ind. vol. XXI. No 2.
৫৫। C. V. Vaidya—vol. ii, Pp 420—422.

বাসব সাধনাক্ষেত্রে সন্ন্যাস ও ত্যাগ ভাব বর্জ্জন করে এবং বলে যে প্রত্যেকে নিজের পরিশ্রমের রোজগার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে এবং কখন ভিক্ষা করিবে না (৫৬)। এই আইন তাহাদের পুরোহিত-জঙ্গমদের উপরও বলবৎ হয়। বাসবই প্রথম ভারতীয় ধর্ম্মনেতা যিনি শ্রমের যথার্থ সম্মান প্রদান করেন এবং ভিক্ষা করিতে বারণ করেন। তিনিই একমাত্র ধর্ম্মপ্রচারক যিনি বলিয়াছেন, কেবল কায়িক শ্রম (কায়ক) দ্বারা কৈলাস যাইতে পারে! আজ পর্য্যন্ত কর্ণাটকের কৃষক ও ব্যবসায়ী লোকদের মধ্যে লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় দলে ভারী।

এতদ্ব্যতীত এই সম্প্রদায় নিজের গায়ত্রী এবং বংশগত গোত্র-প্রবর পৃথক করিয়া লইয়াছেন (৫৭)। বাসব উপদেশ দিতেন যে, সকল জাতিই লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। ইহা ছাড়া, এই সম্প্রদায় বিধবাদের বিবাহ দেয় এবং মৃত দেহের কবর দেয় (৫৮)। এই সম্প্রদায় কালচুরীর রাজা বিজ্জল দ্বারা বিশেষভাবে নির্য্যাতিত হয় এবং তাহাদের নেতারা নিহত হয় (বাসব পুরাণ ও চন্নাবাস পুরাণ দ্রষ্টব্য) (৫৯)।

এতদ্বারা আমরা দেখি যে, মুসলমান আক্রমণের পরে এই সম্প্রদায় সম্ভবতঃ উত্তর-ভারতের লোকদের দ্বারা উদ্দীপনা পাইয়া একটা নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠন করে এবং ইহার মধ্য হইতে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সংস্কারগুলি বাদ দেয়। কিন্তু কালক্রমে ইহার মধ্যেও জাতিভেদ উদ্ভূত হইয়াছে; ইহাদের আচার্য্য ও জঙ্গমেরা ব্রাহ্মণের স্থান গ্রহণ করিয়াছে (৬০)।

ইহার সম-সাময়িককালে আর একটি ভক্তিবাদী সম্প্রদায় দক্ষিণে উত্থিত

৫৬। S. K. Aiyangar—op cit, p 286.

৫৭, ৫৮-৬০। C. V. Vaidya—vol. ii Pp 422, 423.

৫৯। vide Wurth in Ind Bo Br—R As Loc vol VIII Pp. 15-87; 98-221.

হয়; ইহারা বৈষ্ণব নামে পরিচিত হয়। "আলওয়ার" আখ্যা প্রাপ্ত ধর্ম্ম-প্রচারকেরা এই মত প্রচার করিত। ইঁহারা বলিতেন, যাঁহারা নৈষ্ঠিক পদ্ধতিতে স্থান পায় না তাহারাও মুক্তি পাইবে। এতদ্বারা তাহারা বৌদ্ধ, জৈন, এমন কি, আগমবাদী শৈবদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া লোকদের নিজেদের দলে টানিয়া আনিতেন। এই মতটি প্রথমে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উদারভাব মাত্র ছিল। এই বৈষ্ণব দলের বারজন সাধুর মধ্যে সকল জাতির লোক ছিল, তন্মধ্যে নাম-আলওয়ার শূদ্রজাতীয় ছিলেন; ইনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু ছিলেন। এই সংখ্যার মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ছিলেন। একজন সাধু প্যারিয়া (অস্পৃশ্য) জাতীয় ছিলেন; ইঁহার নাম ছিল যোগীবহ। বোধ হয়, ইনি পরবর্ত্তীকালের সাধু ছিলেন (৭১)।

অবশেষে শিষ্য-পরম্পরায় যমুনাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের নেতা হন। ইনি প্রথম চোল রাজাদের সময়ে যখন ধর্ম্ম সম্পর্কীয় তর্কে দেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল তখন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পৌত্রীর পুত্রই বিখ্যাত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক রামানুচার্য্য (৭২)। ইনি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মায়াবাদী বৈদান্তিকদের মত খণ্ডন করিয়া বেদান্তের নূতন ব্যাখ্যা দেন; ইহাকে বৈশিষ্টাদ্বৈত মত বলে। রামানুজ বলিলেন, সমাজে মানুষের যে-স্থানই থাকুক, যদি সে ধার্ম্মিক জীবন যাপন করে তাহা হইলে সে অন্যান্য লোকের ন্যায় ঈশ্বরের নিকট সমানভাবে দাঁড়ায় (৭৩)। ইনি বৈষ্ণব ধর্ম্মকে দক্ষিণে পাকা ভিত্তিতে সংস্থাপিত করেন এবং নিজে শূদ্র ও পতিতদের সাদরে আহ্বান করেন। তাঁহার সময়ে আভিজাত্য ব্রাহ্মণ্যবাদ একটা ধাক্কা খায়। এই সময়ে বৈষ্ণব ও শৈবেরা বৌদ্ধ ও জৈনদের বিরুদ্ধে জোর প্রচার-কার্য্য চালাইয়াছিল (৭৪)।

৭১—৭৪। S. K. Aiyangar—Some Contributions of South India to Indian Culture, pp. 282, 285, 291.

রামানুজের দক্ষিণের একজন বৈষ্ণব-শিষ্য ব্রাহ্মণ গোঁড়াদের অত্যাচারে পলায়ন করিয়া উত্তরে কাশীতে বাস করেন। ইনিই রামানন্দ এবং উত্তরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারক হন। জনশ্রুতি এই—ইনি নিরাকার-বাদী ছিলেন এবং জাতিভেদ মানিতেন না। ইনিই "রামায়েৎ" সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। তাঁহার শিষ্য ছিলেন বিখ্যাত জোলা (তাঁতি) কবীর।

জনশ্রুতি এই—কবীর মুসলমানবংশীয় ছিলেন (গুরু গ্রন্থসাহেবে তাঁহাকে স্পষ্টই মুসলমানবংশীয় বলা হইয়াছে) (৬৫), তিনি একটি নিরাকার ও জাতিভেদ-বিহীন সম্প্রদায় স্থাপন করেন। কবীর দুই ধর্ম্মের লোকদের একত্রিত করিবার চেষ্টা করেন। এইজন্য প্রবাদ এই, তাঁহার মৃত্যুর পর দুই ধর্ম্মের লোকেরা তাঁহাকে নিজেদের বলিয়া দাবী করে! তৎপর, এই যুগে ব্রাহ্মণ তুলসীদাস রামভক্তি বিষয়ে প্রচার করেন বা উহার প্রসারে সহায়তা করেন। (ইনি বর্ণাশ্রমপন্থী ছিলেন) দাদু নামক জনৈক অব্রাহ্মণ (ইনিও ধুনিয়া জাতীয় ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন বলিয়া প্রতীত হয়) (৬৬)। কবীরের ন্যায় একটি নিরাকার এবং জাতিভেদ-বিহীন সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। পঞ্জাবে এই সময়ে অব্রাহ্মণ নানকও একটি নিরাকারবাদী ও জাতিভেদ-শূন্য শিখধর্ম্ম সৃষ্টি করেন। এই মধ্যযুগে বাঙ্গালায় আমরা চৈতন্যের আবির্ভাব নিরীক্ষণ করি। চৈতন্যের যুগে গুজরাটে বল্লভাচার্য্যের বেদান্তের দ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করিয়া একটা বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্থাপন করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে তিনি শেষে পুরীতে শ্রীচৈতন্যের মন্ত্রশিষ্য হইয়াছিলেন। এই যুগে দক্ষিণে বেদান্ত দেশিকের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মধ্বাচার্য্য

৬৫। রামকুমার বর্ম্মা—হিন্দু সাহিত্যকা আলোচনাত্মক ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

৬৬। ক্ষিতি মোহন সেন—"দাদু"।

উদয় হইয়া বেদান্তের আর একটি ব্যাখ্যা দেন এবং বৈষ্ণবধর্ম্মীয় একটি সম্প্রদায় গঠন করেন। প্রবাদ এই, বাঙ্গালার বৈষ্ণব 'পণ্ডিত বলদেব' বিদ্যাভূষণ নিজে বেদান্তের একটি টীকা করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা মধ্বাচার্য্যের টীকা মানিয়া নেন। মহারাষ্ট্র প্রদেশও নূতন ধর্ম্ম আন্দোলনের ঢেউ এড়াইতে পারে নাই; তথায় নামদেব, জ্ঞানদেব প্রভৃতি ধর্ম্মোপদেশক উদয় হন এবং এই যুগের দুইশত বৎসর পর গরীব ও শূদ্র সাধক তুকারাম বৈষ্ণব ধর্ম্মের জোর প্রচার করেন।

নূতন ধর্ম্মের এই ঢেউ হিন্দুর অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। অনেক অজ্ঞাতনামা মহিলার সহতীর্থ হইয়া রাজপুত কন্যা মেবারের রাজবধূ মীরাবাঈ এই ধর্ম্মের সাধক হইয়া বৃন্দাবনে গিয়া বাঙ্গালী বৈষ্ণবাচার্য্যের (রূপ গোস্বামী) সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাধকরূপেই পরলোক গমন করেন।

মুসলমান আক্রমণের পরে, এইসব সংস্কারান্দোলনসমূহ সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতির বিপক্ষেই উত্থিত হয়। গণশ্রেণীয় লোকেরাই এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। ইহা ধর্ম্মের নামে শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনা করে। এই সব আন্দোলন আভিজাতীয় পদ্ধতির বিপক্ষে পরিচালিত হইয়াছিল, সেই জন্য অনেক সুফী ও উদার মুসলমানও ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। এইসব আন্দোলন দ্বারা হিন্দু ও মুসলমান সাধারণতঃ একত্রিত করার প্রচেষ্টা হয়। তখনকার যুগের মাপকাঠিতে এই আন্দোলনের অনেকগুলি ঘোর বৈপ্লবিক ছিল।

ভারতব্যাপী বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার পর বৌদ্ধদের আর সংবাদ পাওয়া যায় না। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে, তাহারা কোথায় গেল? পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, তাহারা হয় এই উদার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত হইল, না হয় মুসলমান হইয়া গেল। অনেকের মতে মুসলমান আক্রমণে

বৌদ্ধেরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্ম্মূল হয়। বোধ হয়, বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণ্য-বাদীয়দের ন্যায় মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহারা সর্ব্বত্র রাজশক্তি বিহীনতার জন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য ব্রাহ্মণ ও মুসলমান উভয়ের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। লামা তারানাথ বলেন, মুসলমান তুরস্কের আক্রমণের পর, গোরক্ষনাথের যোগী শিষ্যেরা (নাথ-সম্প্রদায়) তীর্থিক (ব্রাহ্মণ্যবাদী) রাজাদের নিকট সম্মান পাইবার জন্য 'ঈশ্বর-পূজক' হয়, যেহেতু তাহাদের মতে এতদ্বারা তাহারা তুরস্কদের অত্যাচারের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে। তিনি আরও বলেন যে, কেবল নটেশ্বরের ক্ষুদ্রদলটি বৌদ্ধমতে অটুট ও অটল রহিল।(৬৭) তারানাথ তাঁহার অন্য পুস্তকে বলিয়াছেন, তীব্বতীয় ভাষায় গোরক্ষনাথের জীবনবৃত্তান্ত বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই। গোরক্ষনাথও তাঁহার সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্যবাদীয় মতের দিকে ঝুঁকিয়াছিল বলিয়াই কি লামাদের এই ক্রোধ ? (৬৮)

বৌদ্ধ গণ-সমূহের মুসলমান হওয়া সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই; মুসলমানেরা ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখে নাই; সকলেই তাহাদের নিকট বুদপরস্ত (পৌত্তলিক) হিন্দু! কিন্তু বৌদ্ধ সাধারণ যে উদীয়মান বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে আশ্রয় লইয়া আত্মগোপন করে তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের কালে ইহা দৃষ্ট হইতেছে যে, বৌদ্ধ গণসমূহ হিন্দু সমাজের নানাস্থানে

৬৭। "Geschichte des Buddhism"—translated by Schiefner, PP 255-256),

৬৮। B. N. Dutta. "Mystic Tales of Lama Taranatha." P 58,

নানাভাবে লুকাইত আছে ; আর যেখানে পতিত বা অস্পৃশ্য জাতিদের মধ্যে নূতন ধর্ম্ম-আন্দোলন হইয়াছে সেখানেই বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায় (৬৯)। মহারাষ্ট্র দেশে এবং গোদাবরী তীরবর্ত্তী জনপদ-সমূহে "বিঠোবা" এবং "বিঠ্ঠল" দেবতার পূজা' অক্ষয়কুমার দত্তের মতে বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ-চিহ্নরূপে বিদ্যমান আছে। অবশ্য এই দুই ঠাকুর বৈষ্ণব মতে পূজিত হয় (৭০)। এই প্রকারে স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ময়ূরভঞ্জে গুরুবাদী মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাববিশিষ্ট একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন (৭১)। তাহা ছাড়া, কটক ও পুরী জেলার সরাকী ও রাঢ়ের তাঁতিরা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয়। উড়িষ্যার বৌদ্ধেরা রাজা প্রতাপ রুদ্রের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অনেকে চৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করে ; কিন্তু তাহারা অন্তরে অন্তরে বৌদ্ধই ছিল। অচ্যুতানন্দ, বলরাম দাস, জগন্নাথ এবং চৈতন্যদাস প্রভৃতি বড় বৈষ্ণব সাধক এই প্রকারেরই ছিলেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব-নেতা সনাতন গোস্বামীর শিষ্য অচ্যুতানন্দ তাঁহার শূণ্য-সংহিতায়

৬৯। Nagendranath Vasu—"Modern Buddhism and its followers in Orissa"—Introduction by H. P. Sastri দ্রষ্টব্য।

৭০। পাণ্ডারপুরের বিঠ্ঠল দেবতার পূজা নামদেব ও জ্ঞানেশ্বরের ভক্তিমার্গ অনুযায়ী হয় এবং জাতিভেদ রাখিয়াও বিঠোবার পূজায় সকলের অধিকার আছে। ঠাকুরের কাছে সকলে সমান ও ভক্তিদ্বারা মুক্তিলাভ হয়—ইহাই এই পূজা-পদ্ধতির বিশ্বাস। এই দেবতার পূজা পুরীর জগন্নাথের ন্যায়। (C. V. Vaidya—Vol II, P 427)।

৭১। Nagendranath Vasu—Medern Buddhism and its followers in Orissa, P 26.

নিজেই বলিয়াছেন দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণকালে রাত্রিতে বুদ্ধ তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া বলেন, "কলিযুগে আমি আবার বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হইয়াছি। কলিযুগে তোমাদের মনের বৌদ্ধ সংস্কার প্রচ্ছন্ন রাখিতে হইবে (৭২)।

উড়িষ্যার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম খৃঃ ১৮৭৫ সালে পুরীর দিব্যসিংহের সময়ে "মহিমাধর্ম" নামে ভীমভইয়ের নেতৃত্বাধীনে আবার মাথা তোলে। এই ভীমভই নিম্নজাতীয় লোক ছিল এবং দাস্যবৃত্তি করিত। ইনি বলিতেন, "তিনি স্বর্গ হইতে বাণী শ্রবণ করিয়াছেন যে মহিমা ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইলে জগন্নাথ যে যথার্থ বুদ্ধ ইহা লোকের নিকট পুনঃ প্রচারিত হইবে।" এইজন্য তিনি ত্রিশটি গ্রামের লোকসমূহকে সশস্ত্র দলবদ্ধ করিয়া পুরী আক্রমণ করিতে যাত্রা করেন। পুরীর রাজা দিব্যসিংহ সংবাদ পাইয়া নিজ লোকজন ও পিপলীর ইংরেজ পুলিশ লইয়া ভীমের অপেক্ষায় রহিলেন। ভীম পুরীতে পদার্পণ করায় উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। অবশেষে ভীম তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা যে অসম্ভব তাহা বুঝিতে পারেন এবং তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন—অহিংসাই তাঁহার ধর্ম্মের প্রথম মন্ত্র, এইজন্য তাহারা অপরকে হিংসা করিয়া পাপ করিবে না; আর জগন্নাথ বুদ্ধরূপে পুরী ত্যাগ করিয়াছেন এবং এখন তিনি বুঝিয়াছেন যে বুদ্ধের অভিপ্রায় নয় যে তাঁহার মূর্ত্তি আবার লোকগোচর হয়। এই উক্তির ফলে মহিমাধর্ম্মীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে, কতকগুলি কয়েদ হয়, কয়েদীরা ইংরেজ গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয় (৭৩)। ইহার পর

৭২। H. P. Sastri—Introduction to Nagendranath Vasu's "The Modern Buddhism and its followers" in Orissa, P 126.

৭৩। Nagendra Nath Vasu—The Modern Buddhism and its followers in Orissa, Pp 165—166.

তাহারা অত্যাচারের ভয়ে পলাইয়া গড়জাৎ মহলগুলির পর্ব্বত ও জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

এই ধর্ম্মের একটি আশ্চর্য্য নিয়ম এই যে, স্বজাতিরা (ভিক্ষু) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও চণ্ডালদের নিকট হইতে ভিক্ষা করিবে না, কারণ শাস্ত্র তাহাদের অপবিত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে (৭৪)। ইহারা ছোট ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু "নব (নয় প্রকার) শূদ্রেরা" প্রভুর বিশ্বাসী ভক্ত, তাহাদের ঘর হইতে সিদ্ধ ভাত ভিক্ষা নিলে পাপ হয় না (৭৫)। সর্ব্বশেষ বসু মহাশয় বলিয়াছেন, আমরা ইহা দেখাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছি যে, উড়িষ্যার গড়জাৎ মহলগুলির মহিমাধর্ম্মীরা বৌদ্ধ। মহাযানীদের মতন তাহারা,'বুদ্ধ আবার অবতীর্ণ হইবেন' এই বিশ্বাসে দিন কাটাইতেছে"(৭৬)।

এই প্রকারে দেখি, মুসলমান আক্রমণের পর ভারতের চতুর্দ্দিকে হিন্দু সমাজের ভিতরেই একটা অপেক্ষাকৃত সাম্যবাদীয় আন্দোলন উত্থিত হয়। এই আন্দোলন ভক্তি দ্বারা উপাসনা, ভগবানে নির্ভর, সকলের মুক্তি, জাতিভেদ অস্বীকার, অন্ততঃ ধর্ম্মক্ষেত্রে তাহার অস্বীকার, অহিংসা প্রভৃতি সাধারণ লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত। ভারতব্যাপী এই আন্দোলনটি বিভিন্ন প্রদেশে বাহ্যতঃ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন আকার ধারণ করিলেও, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, আসলে এক। পঞ্জাবের বাবা নানকের আন্দোলন উত্তরে রামানন্দের কর্ম্মফলের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিলেও তথায় ভারতব্যাপী বৈষ্ণব আন্দোলনের ধাক্কা (১০০০—১২০০ খৃঃ) পৌঁছিয়াছিল (৭৭)।

৭৪। "যশোমতি মালিকা" গ্রন্থ, ১৫২—১৫৩ পৃঃ।

৭৫। "যশোমতি মালিকা" গ্রন্থ, ১৫৪—১৫৬ পৃঃ।

৭৬। N. N. Vasu—P 180.

৭৭। C. V. Vaidya—Vol. II, P 413.

এই আন্দোলন বৌদ্ধ ও জৈনদের আপত্তির নিরাকরণ জন্য অহিংসাবাদ গ্রহণ করে, এবং তজ্জন্য পশু হত্যা দ্বারা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও মাংস ভোজন নিষিদ্ধ করে। এই জন্য পঞ্জাবে আজও নিরামিষ খাদ্যকে "বৈষ্ণব খাদ্য" বলা হয় এবং মাংসকে "মহাপ্রসাদ" (শাক্তের খাদ্য!) বলা হয়!

আর একটি লক্ষণ দ্বারা এই আন্দোলন বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়—উহা হইল ভক্তি দ্বারা উপাসনা। এই আন্দোলন সগুণ ব্রহ্মকে (Personal God), বিষ্ণু নামে বৈদিক নামকরণ করে, কিন্তু আসলে পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তের ভগবান রূপে খাড়া করে। এই দেবতা সগুণ, অর্থাৎ ভক্তের প্রার্থনা শুনিয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এই আন্দোলন শঙ্করাচার্য্যের 'নির্গুণ ব্রহ্ম' মতবাদকে খণ্ডন করিবা সাধারণের জন্য একটা Fighting God, অর্থাৎ ক্রিয়াশীল এবং যুধ্যমান দেবতা সৃষ্টি করে। এইজন্যই বৈষ্ণবের কৃষ্ণ বা বিষ্ণু, মুরারে মধুকৈটভারে, কংস-বিনাশকারী শ্রীকৃষ্ণ, রাবণ-নিধনকারী রাম, নবদ্বীপের কাজীর ত্রাস-সঞ্চারী নৃসিংহ প্রভৃতি রূপে কল্পিত হইতে লাগিল। তৎপর এই ঠাকুর ভক্তের জাতি বা বংশগরিমা গ্রাহ্য করে না; যে তাঁহাকে অবিচলিতভাবে বিশ্বাস করে ঠাকুর তাহারই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। বোধ হয়, ইসলামের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ এই ভক্তিবাদ উদ্ভূত হয় (৭৮)। ইসলামের অর্থ—ভগবানে আত্ম-

---

৭৮। অধুনা Archer নামীয় এক ইংরেজ লেখক ও জনকতক খৃষ্টান মিশনারী বলিতেছেন—দক্ষিণের "ভক্তিবাদ" তত্রস্থ খৃষ্টীয় ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বৈষ্ণবদের ভক্তিবাদ ও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বৃত্তান্ত সম্পর্কে গল্প, চতুর্ব্যূহ, 'তৎভাব' ও 'তৎসম' মত, কল্কি অবতার মত প্রভৃতির সঙ্গে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের (devotion), খৃষ্টের জন্মবৃত্তান্ত এবং মধ্যযুগীয় খৃষ্টান ধর্ম্ম যাজকের—'Homoiousian বা Homoousian'

সমর্পণ করিয়া কার্য্য করা, মুসলমান প্রত্যেক কথার জবাবে "ইনসল্লা" (যদি আল্লা ইচ্ছা করেন) বলেন, বৈষ্ণবও গীতোক্ত "ত্বয়া হৃষিকেষেন হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি" বলেন। এই প্রকারে নব-বৈষ্ণবধর্ম্ম আক্রমণকারী ইসলামের প্রতি প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া হিন্দু সাধারণকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য উদ্ভূত হইল।

এই নব-বৈষ্ণবধর্ম্ম ভারতের গণসমূহকে সম্পূর্ণরূপে আপনার করিয়া

(ভগবান, যীশু ও পবিত্রাত্মা এক ভাবের বা এক কিনা) তর্কের মত জগতের শেষদিনে খৃষ্টের শ্বেত-অশ্বারোহণপূর্ব্বক পৃথিবীতে পুনরাগমন প্রভৃতির মতের সহিত সাদৃশ্য আছে। মালাবার কূলে সিরিয় খৃষ্টীয় মণ্ডলী বহু পুরাকাল হইতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। উপরোক্ত মিশনারীদের মতে তাহাদের মত ও ভাব গ্রহণ করিয়াই দক্ষিণে বৈষ্ণব ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে। পুনঃ কেনেডি নামে এক ব্যক্তি বলেন, শকদের সহিত মধ্য এশিয়া হইতে খৃষ্টীয় গল্পগুলি ভারতে আসিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় পণ্ডিতদের মতে বৈষ্ণবদের মতগুলি ধার করা নয়, ভারতীয় ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত। এই বিষয়ে ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের 'Narada's Visit to Swetadwip' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য। এলবার্ট এডওয়ার্ড নামক জনৈক আমেরিক'ন লেখক বলেন, খৃষ্টধর্ম্মের অনেক মত, খৃষ্টের অনেক উপদেশ ও তাঁহার জীবন সম্পর্কিত অনেক গল্পও বৌদ্ধধর্ম্ম ও বুদ্ধের জন্ম সম্বন্ধীয় প্রচলিত গল্প হইতে ধার করা। Hopkins (India—Old and New) ইহা অস্বীকার করেন। আমাদের বোধ হয়, বৈষ্ণব ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়া কতকগুলি বিষয়ে ইসলামের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হয়, অর্থাৎ কতক বিষয়ে তাহার সাদৃশ্য অবলম্বন করে।

লইতে পারে নাই; কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদের গণ্ডী ইহা সম্পূর্ণভাবে ছাড়িতে পারে নাই। এই আন্দোলন উদার বুর্জ্জোয়াদের দ্বারা সৃষ্ট আন্দোলন; মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও পেটি-বুর্জ্জোয়াশ্রেণী (গরীব মধ্যবিত্তশ্রেণী) ইহার দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। পঞ্জাবের নানক সাহেবের শিখ ধর্ম্ম তত্রস্থ ইসলামের প্রতি বেশী প্রতিক্রিয়াশালী হইয়া বিষ্ণুপূজার বদলে "অলখ নিরঞ্জন" (নিরাকার ভগবান) উপাসনা করিতে শিখে এবং গুরু গোবিন্দের সময়ে জাতিভেদ বর্জ্জন করিয়া উহা পঞ্জাবের জাঠ-কৃষকদের মধ্যে প্রচারিত হয়।

এতদ্বারা ইতিহাসে এই দেখা যায় যে, যে-স্থানে ভক্তিবাদ জাতিভেদ বর্জ্জন করিয়াছে সেইখানেই ভক্তিমার্গীয় ধর্ম্ম কৃষকাদি গণসমূহের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। দক্ষিণের কৃষক "লিঙ্গায়েৎ" ও উত্তরের জাঠ "শিখ" উহার প্রমাণ। আর ইহাও এস্থলে দ্রষ্টব্য যে ভক্তিবাদ, এই দুইস্থানে বৈষ্ণবমার্গীয় রূপ ধারণ না করিয়া অন্য আকার ধারণ করিয়াছে।

নূতন ধর্ম্মের আন্দোলনের অর্থ

মুসলমান আক্রমণ হইতে ভারতের সর্ব্বত্র একদিকে যেমন হেমাদ্রি, বিজ্ঞানেশ্বর, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্থিতিশীল (Conservative) স্মৃতিকারেরা হিন্দু সমাজকে বাঁচাইবার জন্য কমঠ বৃত্তি অবলম্বন করিবার ব্যবস্থা করিলেন, অন্যদিকে একদল নেতা সমাজের বন্ধন কতকটা শিথিল করিয়া পতিতদের, এমন কি অহিন্দুকেও তাহার মধ্যে গ্রহণ করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। এই অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, বনিয়াদী স্বার্থের দল গোঁড়ামী অবলম্বন করিলেন, তাঁহারা উদার মতকে আমো আমল দেন নাই। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে—বীর-বৈষ্ণবদের একটা

সম্প্রদায় ব্রাহ্মণদের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিল; বাসবের চরমপন্থীয় মত (লিঙ্গায়েৎ) তাহারা গ্রহণ করিল না, আবার বাঙ্গালায় রঘুনন্দনের ব্যবস্থা (৭৯) বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পশ্চিম বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যেই গণ্ডীভূত হইয়া আছে; বাকী হিন্দু বাঙ্গালা অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থা বা বৈষ্ণব ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। আবার পঞ্জাবে চরম মত কৃষক জাঠেরাই গ্রহণ করে।

ইহার দ্বারা সামাজিক শ্রেণীগুলি কিভাবে এই সব অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, সামন্ততান্ত্রিক হিন্দু সমাজ, ব্রাহ্মণ্যবাদীয় বর্ণাশ্রম আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। দক্ষিণে বিজয় নগর সাম্রাজ্য তখন ব্রাহ্মণ্যবাদীয় বর্ণাশ্রম হিন্দুধর্ম্মের প্রতিভূ হইয়া উঠে। উৎকলের প্রতাপরুদ্র চৈতন্যের শিষ্য হইলেও ব্রাহ্মণ্যবাদীয় বর্ণাশ্রমী ধর্ম্ম আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকেন এবং সাম্যবাদী বৌদ্ধদের উপর উৎপীড়ন করেন। রাজপুতনায় ব্রাহ্মণ্যবাদ সুদৃঢ় থাকে। ইহার বাহিরে অভিজাতশ্রেণী সর্ব্বত্র সাধারণভাবে বর্ণাশ্রমের গণ্ডীর ভিতর থাকে—ইহা বনিয়াদী স্বার্থকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। বরং মুসলমান আক্রমণের জন্য "হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা" ও নিজেদের স্বার্থকে একীভূত করে। তখন হইতে জাতীয়তাবাদ অর্থে ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামিকে বজায় রাখা হয়! কিন্তু বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত বা গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের মধ্য হইতে

৭৯। অনেকের ধারণা নবদ্বীপের রঘুনন্দনের আচার ব্যবস্থা সমগ্র বাঙ্গালায় চলিতেছে; কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে উহা আদৌ সত্য নহে। পশ্চিম বাঙ্গালায় উপরোক্ত তিন জাতির বেশীর ভাগ মাত্র রঘুনন্দনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙ্গালায় বেশীর ভাগ স্থলে স্থানীয় ব্যবস্থা চলে—আবার বৈষ্ণবদের ব্যবস্থা আলাদা।

সংস্কারকগণ উদ্ভূত হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার কার্য্যে লিপ্ত হন। ইহাদের অনেকে ব্রাহ্মণ্যবাদের বনিয়াদী স্বার্থের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া "অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ইসলামীকরণ হইতে হিন্দুগণকে বাঁচাইতে হইবে, সেইজন্য যতটা সম্ভব তাহার spiritকে অনুকরণ করিয়া তদ্বারা হিন্দুকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা হয়, এবং সাধারণকে মুসলমানীকরণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করা হয়। আবার নিজেদের দল বাড়াইয়া সংখ্যাধিক্যের জোরে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বৌদ্ধ ও জৈনদের হজম করিবাব চেষ্টা করা হয়। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথায় তখন "ভিক্ষুশূন্য বৌদ্ধ-সমাজ এক প্রকার বে-ওয়ারিশ মাল। যে যাহাকে পাবে আপন দলভুক্ত করিতে লাগিল" (৮০)। আর পতিত গণসমূহের অবস্থা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—তাহারা হয় মুসলমান হইতে লাগিল অথবা লিঙ্গায়েৎ, শিখ বা চরমপন্থীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ কবিতে লাগিল; অথবা এ-সবেব অভাবে পতিত হইয়াই রহিল এবং অনেকস্থলেই "অস্পৃশ্য"শ্রেণীসমূহের দল বৃদ্ধি করিল।

মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক ইতিহাস

ঐতিহাসিকেরা ভারতের মধ্যযুগকে দুইভাগে বিভক্ত করেন—হিন্দু রাজত্বের শেষকাল এবং মুসলমান রাজত্বকাল। মুসলমান শাসনকালকে আমরা আবার দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছি—মুঘল-পূর্ব্ব যুগ এবং মুঘল-শাসন যুগ। বস্তুতপক্ষে হিন্দু রাজত্বের শেষভাগে যখন রাজপুতদের অভ্যুত্থান হয় সেই যুগ ও মুঘল-পূর্ব্ব মুসলমান যুগকে ভারতের সামন্ততান্ত্রিক

৮০। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ষট্‌ত্রিংশ ভাগ, ১ম ভাগ—"সভাপতির অভিভাষণ"।

এবং মধ্যযুগ বলা যাইতে পারে। এই সময়ে সামন্ততন্ত্র পূর্ণমাত্রায় প্রকট ছিল এবং জাতীয় অভিব্যক্তিও মধ্যযুগীয় ছিল। রাজপুতদের উৎপত্তি (৮১) যাহাই হউক না কেন তাহারা কৌম-প্রথার উপরে উঠিতে পারে নাই; কৌমগত বদলী-প্রথা (tribal feud), ব্যক্তিগত বদলী-প্রথা (blood feud) ও মৈত্র (blood bond), কৌমগত রাষ্ট্র (tribal state) এবং কৌমগত নীতির (moral code) উপরে উঠিয়া রাজপুতেরা একটা জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করিতে অক্ষম ছিল (৮২)। অতি প্রাচীন বৈদিক আর্য্যেরা যে প্রকারে কৌমগত রাষ্ট্র সংস্থাপন করিয়াছিল এবং কৌম পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ ছিল, রাজপুতেরাও তদ্রূপ সভ্যতার সেই রাজনীতিক স্তরে গণ্ডীভূত ছিল। ইহার অর্থ এই যে, ভারতের শাসকশ্রেণীগুলি সভ্যতার পথে পশ্চাদ্গামী হইয়াছিল। ভারত কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্য গঠন করিয়া একজাতীয়তা উপলব্ধি করিবার পর পুনঃ বর্ব্বর-যুগের কৌম প্রথায় ফিরিয়া যায়।

এইস্থলে ইউরোপের ইতিহাসের সহিত ভারতের ইতিহাসের সৌসাদৃশ্য আছে। ইউরোপ গ্রীসের সহর-রাষ্ট্রের বিবর্ত্তনের পর ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের উত্থান দেখে। পরে সভ্যতার কেন্দ্র পশ্চিমে অপসারিত হইলে রোমের কেন্দ্রীভূত আন্তর্জ্জাতিক সাম্রাজ্যের উত্থান দেখে। ইহার পর, উত্তরের বর্ব্বরেরা দক্ষিণে অভিযান করিয়া রোমের সাম্রাজ্য ও সভ্যতা বিনষ্ট করে। তাহার ফলে ইউরোপে "অন্ধকার যুগ"

৮১। এই বিষয়ে Dr. B. N. Datta—"The Rise of the Rajputs" in J. B. O. R. S. Vol. XXVII, 1941. Pt. I দ্রষ্টব্য।

৮২। এই বিষয়ে Dr. Ishwari Prasad—"History of Mediaeval India." Pp. 193—200 দ্রষ্টব্য।

(Dark age) আসে। সভ্যতার উপর হইতে অন্ধকারের আবরণ অপসারিত হইলে ইউরোপে উত্তরাগত বর্ব্বরদের দ্বারা প্রচলিত কৌম-প্রথা ও কৌমগত রাজনীতি বিরাজ করিতে দেখা যায়; ইহার পর, প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের সহিত সংস্পর্শে আসিয়া যে নূতন রাষ্ট্রীয় সংগঠন হয়, তাহাকে সামন্ততন্ত্রীয় সমাজ বলা হয়। এই সামন্ত-তন্ত্রীয় যুগের পর ইউরোপের পুনঃ জাগরণ হয় (Renaissance) এবং তাহা হইতে ইউরোপের বিবর্ত্তন হয়।

ভারতের ক্ষেত্রে প্রাচীন কৌম-রাষ্ট্র পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া মৌর্য্যদের কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য গঠিত হয়; পরে মধ্যে মধ্যে ভারত খণ্ড আকার ধারণ করিলেও হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত কৌম-রাষ্ট্র পদ্ধতি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে নাই। গুপ্তসাম্রাজ্যের পূর্ব্বে ও পরে উত্তর হইতে বর্ব্বর আক্রমণ হইলেও অন্ধকার যুগ আসে নাই, এবং কৌম প্রথারও পুনঃ উদয় হয় নাই। কিন্তু হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর দুই শতাব্দী বা ততোধিক কাল ভারতের "অন্ধকার যুগ" আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ এই সময়ের ইতিহাস বিশেষ পরিষ্কার নহে; সমাজে কি পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল তাহাও অজ্ঞাত। কিন্তু নবম শতাব্দী হইতে আমরা ভারতের সর্ব্বত্র খণ্ড রাজ্যের উত্থান লক্ষ্য করি। "রাজপুত" নামে একটি জাতি উত্তর-ভারতে উদয় হয় এবং তাহা নানাস্থানে বিভিন্ন কৌমের নামে কৌম-রাষ্ট্রসমূহ স্থাপন করে। পরে এই রাষ্ট্রসমূহে আমরা সামন্ততন্ত্র পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখি। এই পরিবর্ত্তনের যুগে নূতন ভাষাসমূহ ও নূতন ধর্ম্ম ভারতে উদ্ভূত হয়। ভারতের ইহা একটি সন্ধিক্ষণ; এই সন্ধিক্ষণেই মুসলমান-তুর্কের আক্রমণ হয়। তাহারা অর্থাৎ মুঘল-পূর্ব্ব মুসলমান শাসকেরা পূর্ব্বের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বহাল রাখে। কিন্তু পরে মুঘল যুগে কেন্দ্রীভূত শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়, হিন্দু ও

মুসলমানকে এক অর্থনৈতিক পদ্ধতি, এক রাষ্ট্র, এক দরবারী প্রথা, এমন কি, এক ভাষা (এই যুগেই হিন্দী ও ফার্সী মিলিয়া 'উর্দ্দু' ভাষার সৃষ্টি হয়। রামবাবু সাক্সেনা তাঁহার "History of Urdu Literature" পুস্তকে, উর্দ্দ ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, এতদ্বারা বিজিত হিন্দু বিজেতাকে পরাজিত করিয়াছে। ইহার অর্থ, হিন্দী উর্দ্দু রূপ পরিগ্রহ করিয়া বিদেশী রাজভাষা ফার্সীকে তাড়াইয়াছে।) সাম্রাজ্যের আমলাতন্ত্রের এক স্বার্থ, এমন কি সম্রাট আকবরের "দীন ইলাহি" (৮৩) নামে একটি নূতন ধর্ম্মমত দ্বারা ভারতে পুনঃ একজাতীয়তা বিবর্ত্তিত করার প্রচেষ্টা করা হয়। কিন্তু আওরঙ্গজেবের গোঁড়ামীর জন্য হিন্দুর পুনঃ জাগরণ হয়। পূর্ব্ব-কথিত হিন্দু ধর্ম্মের সংস্কার আন্দোলন এই পুনঃ জাগরণের সহায়তা করে। হিন্দুর এই পুনঃ জাগরণের ফলে এবং তৎকালীন মুসলমান শাসকদের অনুদারতার জন্য ভারতীয় একজাতীয়তা বিবর্ত্তিত হইবার পরিবর্ত্তে হিন্দু-জাতীয়তার উদয় হয়। ইহার ফল—বাঙ্গালায় হিন্দু জমিদারদের ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা, পঞ্জাবে শিখদের, মধ্যদেশে 'সৎনরামী' সম্প্রদায়ের এবং মহারাষ্ট্রে শিবাজীর অধীনে এবং রাজপুতনায় চিতোরের রাজসিংহ ও মাড়ওয়ারের দুর্গাদাস ও অজিত সিংহের অধীনে, মধ্যভারতে ছুর্জ্জনশালের অধীনে স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ হয়। ইহার মধ্যে ছুর্জ্জনশাল অজেয় ছিল; শিবাজী একটি স্বাধীন হিন্দু মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান। এইস্থলে ইহা জ্ঞাতব্য যে, মুসলমান রাষ্ট্রে মুসলমান ধর্ম্মীয়েরাই শাসকশ্রেণী সংগঠিত করিয়াছিল। মুঘল সাম্রাজ্যেও তাহাই। আইন-আকবরীর মনসবদারদের তালিকায় কতিপয় মাত্র হিন্দুর নাম আছে।

৮৩। আবুল ফজলের "আকবর-নামা" দ্রষ্টব্য।

হিন্দুর এই পুনরুত্থানের পর সম্রাট ফররোকশায়ারের সময়ে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় মুঘল সাম্রাজ্যকে "জাতীয়" রাষ্ট্র করিবার শেষ চেষ্টা করে। তজ্জন্য তিনি মহারাষ্ট্রকে শাহুর অধীনে স্বাধীন বলিয়া মানিয়া নেন, রাজপুতনার স্বাধীনতা স্বীকার করেন এবং ইহাদের সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের একত্রিত করিয়া বিদেশাগত "মুঘল" আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান। কিন্তু বিদেশী মুঘলদের প্রতিনিধি চিন কিলিচ খাঁ (হায়দ্রাবাদের নিজাম বংশের স্থাপয়িতা) সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া হত্যার পর মুঘল সাম্রাজ্যকে "জাতীয়" রাষ্ট্ররূপে বিবর্ত্তিত করিবার শেষ আশা নির্ম্মূল হয় (৮৪)। পরে মহারাষ্ট্রীয়েরা ভারতে অপ্রতিহত শক্তিশালী হয়; শেষে ভারতে ইসলামের ভবিষ্যত রক্ষার জন্য উত্তরের মুসলমান অভিজাতেরা সংঘবদ্ধ হন এবং আফগানীস্থানের আহমদশাহ আবদালীর সাহায্যে মুসলমান সংঘ পানিপথে মহারাষ্ট্রীয়দের নিখিল-ভারতীয় মহারাষ্ট্রীয়—হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপন প্রচেষ্টা বিফল করে। কিন্তু ইহার সাত বৎসর পর, উত্তর-ভারত মাধোজী সিন্ধিয়ার অধীনে আবার মহারাষ্ট্রীয়দের করতলগত হয়; দিল্লীর বাদসাহ সাহ আলম সিন্ধিয়ার হস্তের পুতুল হয়। কিন্তু সেই সময় পাছে মুসলমান সংঘের পুনরুদয় হইয়া মহারাষ্ট্র শক্তির প্রতিরোধ করে তাহার ভয়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা পুরাতন উদ্দেশ্য ত্যাগ করিয়া সাহ আলমের নামেই উত্তরে শাসন করিতে থাকে। এই সময়ে ইংরেজ ভারতে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। প্রবাদ আছে, মাধোজী সিন্ধিয়া দক্ষিণের টিপু সুলতানের সহিত সন্ধি করিয়া একটা নিখিল ভারতীয় সংঘ সংগঠন করিয়া ইংরেজদের বিপক্ষতাচরণ করিবার

৮৪। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্দেশ্য ও কর্ম্ম বিষয়ে কাফী খাঁ, Rapson এবং সরকারের "History of Aurangzeb" দ্রষ্টব্য।

ইচ্ছা প্রকাশ করিত। কিন্তু টিপুর মৃত্যুতে সিন্ধিয়া নিরাশ হইয়া পড়েন এবং তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে-চেষ্টাও অন্তর্হিত হয় (৮৫)।

অতঃপর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত মহারাষ্ট্রীয়দের ভারতের আধিপত্য লইয়া সংগ্রাম চলে (৮৬)। ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে মহারাষ্ট্রীয়েরা পরাজিত হইয়া "মৈত্র" রাজত্বে পরিণত হয়। ইহার পর থাকে পঞ্জাবের রণজিৎ সিংহের রাজ্য, তাঁহার মৃত্যুর পর উপযুক্ত নেতার অভাবে ইংরেজের সহিত সংগ্রামে সেই রাজত্বের ধ্বংস হয়। ইহার পর, ইংরেজ ভারতের সার্ব্বভৌমত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু তথাকথিত "সিপাহী বিদ্রোহ" দ্বারা ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতেরা নিজেদের নষ্টশক্তি পুনরায়ত্ত করিবার জন্য প্রয়াস পায়। অবশেষে পরাজিত হইয়া ভারতের অভিজাতেরা ইংরেজ-সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করে এবং পরে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের একটি অংশে পরিণত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী ঘটনা হইতেছে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠন। এই সময় হইতে নবোত্থিত ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণী জাতীয় কংগ্রেসকে নিজেদের রাজনীতিক মুখপাত্র করে। এ-বিষয়ে পরে আলোচিত হইবে।

৮৫। Malleson—"Last fight of the French in India." এই বিষয়ে Duff: History of the Mahrattas, vol. PP 465-466, হাইদার আলী দ্বারা সিন্ধিয়াকে উৎসাহিত করার কথা আছে।

৮৬। Ramsay Muir—Making of British India.

মধ্যযুগীয় শ্রেণীদের পরিস্থিতি

মধ্যযুগীয় অর্থনীতিক, সামাজিক, ধর্ম্মীয় ও রাজনীতিক ইতিহাসের আলোচনার পর শ্রেণীসমূহ এই পরিস্থিতির মধ্যে কিভাবে অবস্থিত ছিল তাহার অনুসন্ধান প্রয়োজন।

হিন্দুযুগের শেষে আমরা সামন্ততন্ত্র বিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়াছি। তখন ভারত কয়েকটি রাজত্বে বিভক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালা, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, দক্ষিণের দ্রাবিড়ভাষী দেশসমূহ প্রাদেশিক একজাতীয়তা লাভ করিয়াছিল, অর্থাৎ এই সকল প্রদেশের ভাষার পার্থক্যসহ এক একটি পৃথক রাষ্ট্রও উদ্ভূত হয়। তখন শাসকবর্গ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দেশের লোক ছিল; যেখানে ইহার অন্যথা হইয়াছে সেখানে রাজা বিপদের সময় লোকসাধারণের সহানুভূতি পায় নাই (৮৭)। এইসব স্থানের অভিজাতশ্রেণী স্থানীয় লোক ছিল; কাজেই তাহাদের স্বার্থও স্থানীয় গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অভিজাতবর্গ সামন্ততন্ত্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ বজায় রখিতেছিল। অতঃপর মুসলমানদের দ্বারা উত্তর-ভারত বিজিত হয়; মুসলমানেরা নিজেদের শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করে এবং স্বভাবতঃ বিজেতৃবর্গ নিজেদের একটা অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করে।

এই পরিস্থিতিতে দেশীয় শ্রেণীসমূহ কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা অনুধাবনের বস্তু। ইতিহাসে দেখা যায় যে, তুর্ক ও পাঠান শাসনের যুগে, অর্থাৎ মুঘল রাজত্বের পূর্ব্বে ভীষণভাবে মুসলমানকরণ চলিয়াছিল। তখন অনেক রাজপুত ও ব্রাহ্মণ মুসলমান হইয়াছিল। ইতিহাস বলে, স্বয়ং পৃথ্বীরাজের এক পুত্র (কেহ বলে ইনি

৮৭। গৌড়ের ইতিহাস—২য় খণ্ড, ৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

জারজ ছিলেন) মুসলমান হইয়া তুর্কদের অধীনে আজমীরের সিংহাসন গ্রহণ করেন। (কেহ কেহ বলেন যে, তিনি মুসলমান হন নাই—করদ-রাজা হইয়াছিলেন) (৮৮) আজ দেখা যায় পশ্চিম পঞ্জাবের রাজপুতেরা প্রায় সবই মুসলমান হইয়াছে। কাহার কাহারও মতে রাজপুত জাতির অদ্ধেক ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। পরলোকগত আমীর আলী বলিয়াছেন, রাজপুত ও ব্রাহ্মণদের পাঠানদের সহিত চরিত্রগত সাদৃশ্য থাকায় তাহারা পাঠান কৌম-পদ্ধতির মধ্যে গৃহীত হয় (৮৯)।

মুসলমান শাসনের যুগকে অখণ্ডভাবে ধবিলে শ্রেণী-সংঘর্ষের এই অবস্থা দেখা যায় যে, শাসকশ্রেণী মুসলমানদের দ্বারাই সংঘটিত হয় এবং দেশীয় অভিজাত ও উচ্চ জাতীয় অনেকে ধর্ম্মান্তব গ্রহণ করিয়া ইসলামীয়-পদ্ধতি মধ্যে তাহার পুরাতন স্থান পরিগ্রহ করে। ইহার অর্থ—বিজিত হিন্দু অভিজাতশ্রেণীয় লোক পরাধীনতার শৃঙ্খল এড়াইবার জন্য ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলমান অভিজাতশ্রেণীব মধ্যে স্থান পায়। ভারতেব সবত্র ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। ইসলাম পৃথিবীর সর্ব্বত্র একই প্রথা অবলম্বন করে, বিজীত দেশের বিধর্ম্মী (জিম্মী) রাজা বা অভিজাতেরা মুসলমান হইলে তাহারা স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিত (৯০)। এই

৮৮। Dr. Iswari Prasad—History of Mediaval India.

৮৯। Syed Amir Ali—The Mussalmans of India

৯০। পারস্যের পাহাড়ী "জারতুস্তী দিকানেরা" (সামন্ত জমিদার) প্রথমে আরবদের নিকট অজেয় ছিল। পরে একটি বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া খলিফা হারুণ-উল-রসিদ তাহাদের জয় করিয়া বলেন যে, যদি তাহারা মুসলমান হয় তাহা হইলে তাহারা স্বীয় জমিদারী ভোগ করিতে পারিবে ও পদ-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে। "দিকানেরা" এই

প্রকারে হিন্দু অভিজাতশ্রেণীর অনেকে মুসলমান হইয়া নিজেদের বাঁচায়। ইহারা বিজাতীয় অভিজাতদের সহিত নিজেদের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে একীভূত করিয়া দিয়াছিল। ইহার ফলে, কতকগুলি পরাক্রান্ত মুসলমান "সুলতানাৎ" (রাজত্ব) উদ্ভূত হইয়াছিল; ইহাদের স্থাপয়িতারা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণকারী হিন্দু ছিল। তৎপর একদল হিন্দু অভিজাত মুসলমান শাসনে চাকুরী করিয়া মুসলমান রাজার আমলাতন্ত্রের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার প্রমাণ বক্তিয়ার খিলজির সময় হইতে মুসলমান রাজত্বের শেষকাল পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। মানসিংহ, টোডরমল, যশোবন্ত সিংহ, জয়সিংহ প্রভৃতি খাপছাড়া উদাহরণ নয়। বিজাপুর সুলতানের অধীনে ভোঁসলে, ঘোড়পড়ো প্রভৃতি পরাক্রান্ত মারাঠা কর্ম্মচারী-গোষ্ঠী ছিল; গোলকোণ্ডা, আহমদনগর, বিদর সুলতানদের অধীনেও এই প্রকারের হিন্দু সেনাপতির ও অমাত্যের দল ছিল। এই শ্রেণী হিন্দুজাতির স্বার্থ দেখিত না, কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থই দেখিত। ইহারা "চাচা আপন বাঁচা" পন্থা অবলম্বন করিত; "আপন পদ-গৌরবকেই ইহারা সবচেয়ে বড় জিনিষ ভাবিত"। যখন প্রতাপসিংহ স্বীয় রাজত্বের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল তখন মানসিংহ, বীরবল বা টোডরমল্ল তাহার সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করে নাই;(৯১) তদ্রূপ দক্ষিণে শিবাজীর পিতা সাহাজী বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পথ অবলম্বন করিয়া স্বীয় জমিদারী ও পদ রক্ষা করে। ইউরোপের বোসনিয়া, হার্জিগোভিনার শ্লাভ ব্যারণেরা এই উপায়ে তুর্কীদের হাত হইতে নিজেদের বাঁচাইয়াছিল। ভারতে অনেক রাজপুত রাজাও এই প্রকারে নিজেদের বাঁচাইয়াছে।

৯১। সাহাজী বিষয়ে জনৈক লেখক বলিতেছেন, "But throughout his career we never find in him any higher ideas of nationality or religion. The only aim of his life seems to be to work for his master and aspire for his favours." D. B. Diskalkar in "Vijoyanagar Six century commemoration volume". P 122, 1936.

শেষ প্রতীক ধ্বংসে সাহায্য করেন। পরে যখন তাঁহার পুত্র স্বাধীন মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু রাজত্ব স্থাপনের প্রয়াস পান তখন সেই বংশের প্রতিদ্বন্দ্বী ঘোড়পড়ে বংশ তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল ; মানসিংহ ও টোডরমল্ল হিন্দু বাঙ্গালার ক্ষাত্রশক্তির সর্ব্বনাশ করিয়া দিয়াছিল। এই শ্রেণীর স্বার্থ ছিল,—গোলমালে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করা ; তখন "স্বজাতি" "স্বধর্ম্মীয়" প্রভৃতি কথার কোন মূল্য ছিল না। ভবানন্দ মজুমদার এবং চাঁচড়া ও সুসঙ্গের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতারা ও দিঘাপাতিয়ার দয়ারাম স্বাধীনতা-প্রয়াসী বাঙ্গালার হিন্দু ভৌমিকদের সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর ছিল। তখন স্ব-ধর্ম্মীয় সমশ্রেণীর সমস্বার্থ ছিল না ; তখন এই সব লোকদের মতলব ছিল "ছিন্ন ভিন্ন করে দে মা, লুটে পুটে খাই"! তৎপর বাকী থাকে যাহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই বা মুসলমান আমলাতন্ত্রের লোক বা অনুগ্রহ-প্রার্থী হয় নাই। ইহারাই স্বীয় ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া হিন্দুজাতীয়তাবাদী হইয়াছিল এবং সুবিধা পাইলে স্বাধীনতার জন্য চেষ্টিত হইত। প্রতাপাদিত্য কেদার রায়, সীতারাম এই শ্রেণীর লোক ছিল। অবশ্য ইহাদের প্রচেষ্টাও ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল (৯২)। ধর্ম্ম তাহার গৌণ উপলক্ষ মাত্র ছিল।

এই প্রকারে দেখা যায়, হিন্দু অভিজাতেরা মুসলমান শাসকশ্রেণীর সহিত একীভূত হইয়া সংগঠিত হয় নাই এবং হিন্দু অভিজাতেরাও সংঘবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করে নাই। এই যুগের হিন্দুর রাজনীতিক পরিস্থিতি বিষয়ে Lane- Poole বলেন—Thus the Moslems fought for a cause, while the Hindus had nothing better than class or class interests to uphold···

৯২। ৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—'মধ্যযুগের বাঙ্গলা' দ্রষ্টব্য।
শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত—"রামদাস ও শিবাজী" পৃঃ ৭৭।

National interests were frequently sub-ordinated to the interests of a section or class···The military system of the Hindus was out of date and oldfashioned ···The war between the two peoples was really a struggle between two different social systems. (Quoted by Dr. Iswari Prasad, Pp 199—200) এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। তৎকালীন এই দুই ধর্ম্মাবলম্বীদের যুদ্ধ দুইটি বিভিন্ন সামাজিক এবং তৎপ্রসূত প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হইয়াছিল। এই সময়ে মধ্যবিত্তশ্রেণী বিশিষ্টভাবে ছিল না— একথা ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের কার্য্যের কোন ইতিহাস নাই। আর পতিত গণশ্রেণী জড়ের ন্যায় পড়িয়া থাকিত; এবং মুসলমান শাসকের উৎপাতে হয় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিত, না হয় অদৃষ্ট ও পূর্ব্বজন্মকে ধিক্কার দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিত আর হিন্দু শাসকের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইলে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের নিকট পূর্ব্বজন্মের কৃত ফল, প্রাক্তন, রাজা ভগবানের প্রতিনিধি প্রভৃতির ব্যাখ্যাব মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আধ্যাত্মিকভাবে পরিপ্লুত হইয়া স্থাণুবৎ অবস্থান করিত। তবে অত্যাচার অসহ্য হইলে যে তাহারা "Jacquerie" (কৃষক-বিদ্রোহ) করিত তাহার প্রমাণ আছে (৯৩)। কিন্তু ভারতের জনসাধারণ বা গণসমূহ কখনও অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া বিপ্লব সাধন করে নাই। ইহার ব্যতিক্রম হইতেছে সংনরামী সম্প্রদায়, তাহারা গণশ্রেণীয় লোক ছিল, তাহাদের বিদ্রোহ ধর্ম্মের

৯৩। চেতোবর্দ্ধার শোভা সিংহের বা গদীদের নিয়া বিদ্রোহের মূলে জমিদারের প্রতি অসন্তোষ ছিল।

ব্যাপার ছিল (৯৩)। এই বিষয়ে জার্মাণ দার্শনিক হেগেল (Hegel বলিয়াছেন, ভারত কখন রাজনীতিক বিপ্লব করে নাই (৯৪)। ভারতীয়দের মনে antithesis (দ্বন্দ্বভাব) নাই বলিয়াই এই জড়ত্ব আসে। এই উক্তি কি যুক্তিযুক্ত নহে? ইহা ঠিক যে, ইহকালের সকল দুঃখকষ্ট ও সুখ পূর্বজন্ম, প্রাক্তন, ভাগ্য প্রভৃতির উপর নির্ভর করে এবং কর্ম্ম দ্বারা মানব তাহার জীবনের চেষ্টায় সীমাবদ্ধ—এই মত দ্বারা ভারতীয় হিন্দুর মনে পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থার বিপক্ষে কোন বিদ্রোহ উদয় হয় না, সে উপরোক্ত মতগুলি দ্বারা নিজের জীবনকে মানাইয়া নিস্তব্ধ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বহুদিন ধরিয়া পড়িয়া আছে। হেগেলের কথার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, তাহার মনে প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বভাব উদয় হয় না বলিয়াই সে নিশ্চেষ্ট থাকে।

এতদ্দ্বারা আমরা দেখিলাম যে হিন্দু অভিজাতশ্রেণী জাতীয়ভাবে বা স্বীয়ধর্ম্ম রক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত হইয়া সংঘবদ্ধভাবে বিজাতীয় বা বিধর্ম্মীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই। তাহারা স্বীয় শ্রেণী-স্বার্থ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া একযোগে কখনও কাজ করে নাই। পরাধীনতার জন্য শ্রেণীগত সংঘবদ্ধতার ভাবের অভাব হইয়াছিল। এই সময়ে হিন্দুস্বার্থের রক্ষক (champion) ক্ষত্রিয় স্থলাভিষিক্ত রাজপুত বীর, কিন্তু তাহার মধ্যে স্বদেশ প্রেম বা জাতীয়-ভাব ছিল না। 'যে-মনিবের নুন খাই তাহার গুণ গাই'—একমাত্র ভাব কার্য্যকরী ছিল। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত বৈদ্য বলিতেছেন—even among the Rajputs, neither patriotism nor nationality remained, but only the sentiment of loyalty···The only sentiment that remained or was

---

৯৩। কাফি খাঁ এবং Jaharlal Nehru—"Glimpses of World History" দ্রষ্টব্য।

৯৪। Hegel—Philosophy of History, ভারত অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

appealed to in the Rajput soldiers, was that of loyalty or service of the master whe paid him" (৯৫)।

এই স্বামী-ধর্ম্ম বা "নিমক হালালী (noblesse oblige) ভাবটি ইতি-পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি পৃথিবীর সকল দেশেই সামন্ততন্ত্রীয় প্রথায় উদ্ভূত হয়; সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতির ইহা একটি লক্ষণ। কিন্তু ভারতে এই লক্ষণটিকে ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িত করিয়া তাহাকে হিন্দুর মনে বদ্ধমূল করা হইয়াছে। এই লক্ষণটি অন্যান্য সামাজিক অথবা জাতীয় কর্ম্মের লক্ষণ হইতে বিচ্যুত করিয়া কেবল "নিমক হালালী" ভাবটি মনে জাগাইয়া রাখিলে তাহা ভাড়াটিয়া মনিবের কর্ম্মের পক্ষে সুবিধা হয় বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাহা স্বজাতির বা স্বসমাজের স্বার্থের পরিপন্থী হয়। এইজন্য ইতিহাসে দেখা যায় যে, প্রাচীন পারস্য সম্রাট দারায়ুসের সময় হইতে ভারতীয় যোদ্ধারা ভাড়াটিয়া (mercenary) হইয়া কর্ম্ম করিয়াছে। ইহারা যে-মনিবের নুন খায় তাহার প্রতি বিশ্বস্ত থাকে বলিয়াই বিদেশীয়েরা ইহাদের ভাড়াটিয়ারূপে স্বীয় সৈন্যদলে রাখে। এমন কি, গজনীর মামুদ যখন ক্রমাগত ভারত আক্রমণ করিতেছিল তখন মধ্য এসিয়ায় তাহার যুদ্ধে লড়িবার জন্য পঞ্জাব হইতে হিন্দু সৈন্যদল তথায় প্রেরণ করিয়াছিল।

ভারতে হিন্দুযুগে সামন্ততন্ত্র বিবর্ত্তিত হইবার সময়ে শাসকবর্গের যথেচ্ছাচারিতা কায়েমী রাখিবার জন্য রাষ্ট্র ও পুরোহিতশ্রেণী একত্র সম্মিলিত হইয়া গণশ্রেণীদের শোষণ ও দাবাইয়া রাখিবার জন্য যে-সব ফন্দি, অর্থাৎ ধর্ম্মমত অজ্ঞ লোকদের মধ্যে প্রচার করে তাহাই কালে হিন্দুজাতির বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হয়। এই মতগুলি শাঁকের করাতের ন্যায় উভয় দিক

৯৫। C. V. Vaidya—Vol. III, P 451.

দিয়াই কাটে। জনসাধারণকে নির্ব্বীর্য্য করিবার জন্য যে-সব মত উদ্ভূত করা হয় সেইগুলিই হিন্দুর জাতীয় বিপদের দিনে বিপরীত ফল প্রসব করে। পরাজিত জাতির লোকদের জাতীয় বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টায় উপরোক্ত মত দ্বারা প্রভাবান্বিত মনস্তত্ত্ব "যাহা হইবার তাহাই হইবে," "ঘোর কলি, প্রাক্তন কে খণ্ডাইবে"? (৯৬) প্রভৃতি বুলি দ্বারা নির্ব্বীর্য্য জাতিকে আরও অধিক নিশ্চেষ্ট করিয়াছিল। এতদ্বারা অবস্থাভেদ-জনিত কোন দ্বন্দ্বভাব হিন্দুর মনে উঠে নাই; সে বর্ত্তমানের ব্যবহারিক দুঃখ মানিয়া লইয়াছিল।

৯৬। ব্রাহ্মণদের লক্ষ্মণ সেনকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ভয় দেখাইবার কথা বাঙ্গালার ইতিহাসে খ্যাত আছে। এইযুগে তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কার রাজনীতিতে কতটা প্রতিবিম্বিত হয় তাহা সিন্ধুর দুইটি দৃষ্টান্তে জাজ্বল্যমানরূপে প্রতীয়মান হয়। সিন্ধুতে মহম্মদ-বিনকাসেমের সঙ্গে রাজার ভাই ও অনেক ঠাকুর (ক্ষত্রিয়) ও ব্রাহ্মণদের মিলিত হইবার একটি কারণ ইতিহাসে বলে যে, রাজা দাহিরকে জ্যোতিষেরা বলে যে, তাহার বৈমাত্রেয় ভগ্নী কর্ত্তৃক তাহার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা (আশঙ্কা) আছে। সেই বিপদ খণ্ডন করিবার জন্য দাহির বৈমাত্রেয় ভগ্নীকে শাস্ত্রমতে বিবাহ করে যদিচ তাহার সহিত বাস করিত না। ইহাতেই দাহিরের ভ্রাতা ও অন্যান্যেরা চটিয়া পরে কাসেমের সঙ্গে মিলে যাহাতে দাহির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ("চাক-নামা দ্রষ্টব্য)। অপর একটি দৃষ্টান্ত এই—মুসলমান বিজয়ের পর সিন্ধুর কোন রাজপুত রাজার সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ হইতেছিল। সেই সময় রাজা এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখে, মুসলমানেরা তাহার তাঁবুতে ঢুকিয়া তাহাকে কয়েদ করিবার জন্য আসিয়াছে! পাছে 'যবন' স্পর্শে তাহার জাতি নষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় রাজা স্বপ্ন ভঙ্গ

পুনঃ মধ্যযুগের হিন্দু আমলে, যথেচ্ছাচার ও একটি বিশিষ্ট যোদ্ধা ও শাসক জাতি বিবর্ত্তিত হওয়ায় গণসমূহ রাজ্যের উলট-পালট ও রাজবংশের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তনকে নির্ব্বাকভাবে দেখিয়াছিল। (৯৭) আমরা রাজপুত যুগে পূর্ব্বেকার গীল্ডগুলিকে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে অংশ গ্রহণ করিতে দেখি না, রাজ্য তখন রাজার সম্পত্তির ন্যায় গণ্য হইত, রাজা দেশের ভূমির মালিক ছিল; রাজপুত রাজ্য কৌমগত রাষ্ট্র ছিল। রাজ্য পরিচালনা করা রাজা ও তাঁহার বেতনভোগী মন্ত্রীদের কার্য্য, রাজ্য রক্ষা করা, রাজ পরিষদ, রাজার প্রসাদভোগী সামন্তবর্গ ও ভাড়াটিয়া সৈন্যদের কার্য্য, গণসমূহের সঙ্গে এই সব বিষয়ের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাহারা রাজকর দিবার জন্যই জন্মিয়াছে; যে বলবান হইয়া তাহাদের নিকট কর আদায় করিবে সে-ই রাজা। যথেচ্ছাচার-শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়া লোকদের মনকে এই প্রকারে রাজনীতি বিষয়ে উদাসীন করিয়াছিল। হিন্দু-রাষ্ট্রনীতি অনুসারে রাজা চিরকালই নির্ব্বাচিত হইত; যথেচ্ছাচারী হইবার কোন ক্ষমতা তাহার ছিল না (৯৮)। কিন্তু মধ্যযুগের ইতিহাসে দেখি "জোর যার মুল্লুক তার" প্রথাই চলিতেছিল, রাজা যথেচ্ছাচারী হইয়াছিল। এইজন্যই দিল্লী বা গৌড়ের সিংহাসনে কে বসিল ও তাহাকে কে তাড়াইল তাহার সহিত প্রজার কোন সম্পর্ক ছিল না—এ বিষয়ে কোন সহানুভূতি

হইলে দৌড়াইয়া গিয়া পাহাড় হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করে (Elliot-এর পুস্তক দ্রষ্টব্য)। নিখিলনাথ রায়ের "প্রতাপাদিত্য চরিতে" প্রতাপাদিত্যকে মানসিংহ 'ঘোর কলি', 'দিল্লীতে আসুন এবং বাদশাহের সহিত ভাব করুন' কথা আছে।

৯৭। এই বিষয়ে লেন-পুলের অভিমত দ্রষ্টব্য। D. I. Prasad, Pp-199-200.

৯৮। K. P. Jayaswal—Study of Hindu Polity.

প্রদর্শন. করিত না। (৯৯) সামন্ততন্ত্রীয় যুগে প্রজার রাষ্ট্রনীতিক সমস্ত অধিকার বঞ্চিত করিয়া তাহাকে শোষণের বস্তু করিয়া রাখিবার জন্য কেবল তাহার ধর্ম্মোন্মাদনা জাগাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহার ফলে, সে আজ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রনীতিক জীব না হইয়া ধর্ম্মোন্মত্ত জীব হইয়া আছে। মুসলমানেরা আসিয়া সেই ধর্ম্মেই আঘাত করে।' নগরকোট, সোমনাথ, কান্যকুব্জ ও বেনারসের মন্দিরগুলি লুণ্ঠিত ও দেবমূর্ত্তিসমূহ বিচূর্ণীকৃত হইলেও কোন অনৈসর্গিক কাণ্ড হইল না দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইল! ইহার ফলে, অনেকের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে আস্থা শিথিল হইয়া পড়ে (মুষ্টিমেয় আরব সৈন্য কর্ত্তৃক কাসেমের সিন্ধু-বিজয় দেখিয়া একদল ব্রাহ্মণ ইসলামে আস্থা-সম্পন্ন হয় এবং ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে)। হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে অনেক নিরাকারবাদী সম্প্রদায় উত্থিত হয়। (১০০)।

৯৯। মুসলমান শাসন বিষয়ে ডাঃ আসরাফ বলিতেছেন, "The village communities of Hindustan did not present any serious administrative problem to the sultans of Delhi". P 131,

১০০। হিন্দু দেবমন্দিরগুলি জনসাধারণকে শোষণের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজা এই প্রতারণা ও শোষণ কার্য্যের লাভের ভাগী হইত; ইহা আলবেরুণীর "Prologomena to India" পাঠে অবগত হওয়া যায়। সোমনাথের শিবলিঙ্গের অলৌকিকত্বের বুজরুগী মাহমুদের লোকেরা উহা ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই ধরিয়াছিল (Elliot—History of India দ্রষ্টব্য)। পরে সোমনাথ পুনঃ নির্ম্মিত হয়, আবার তাহা মুসলমানেরা ধ্বংস করে (Elliot দ্রষ্টব্য)। সোমনাথের মন্দিরের দেবতার অলৌকিক কর্ম্ম পারসিক কবি সেখ সাদী ধরিয়া ফেলিয়াছিল। যে ব্রাহ্মণ এই প্রতারণা করিত তাহাকে সাদী মারিয়া ফেলে ("বোস্তান" দ্রষ্টব্য)। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রই সাক্ষ্য দেয় যে মন্দিরের লভ্যাংশের একাংশ রাজার প্রাপ্য ছিল।

এই প্রকারে হিন্দু উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যখন বিভিন্ন স্বার্থের অনুসরণ করিতে থাকে তখন নির্জ্জীব গণশ্রেণীসমূহ নিশ্চেষ্ট থাকে। অবশেষে ধর্ম্ম-সংস্কারের আন্দোলনের ফলে দিল্লীর নিকটবর্ত্তী স্থানে ধর্ম্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণ করিয়া "সৎনরামী" বলিয়া একটী সম্প্রদায় আওরঙ্গজেবের শাসনকালে উদয় হইয়া দিল্লী পর্য্যন্ত হাঙ্গামা করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা পরাভূত হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকে গরীব ও নিম্নশ্রেণীর লোক ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দুর রাজনীতিক পুনর্জ্জাগরণ। এই সময়ে কোন কোন স্থলে ধর্ম্ম ও রাজনীতিক সংমিশ্রণ করিয়া হিন্দু-জাতীয়তাবাদ সৃষ্ট হয়। মহারাষ্ট্রে শূদ্র তুকারাম যখন বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার দ্বারা গণসমূহকে আলোড়িত করিতেছিল তখন ব্রাহ্মণবংশীয় স্বামী রামদাস হিন্দুজাতীয়তা সৃষ্টিকল্পে "মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম" পরিকল্পনা করিতেছিল। ইনি শিবাজীকে এই মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম সংস্থাপনের শাণিত অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেন। প্রবাদ আছে, এই কর্ম্মে সহায়তার জন্য তিনি পাহাড়িয়া মাওলেদের শিবাজীর দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যরূপে বিবর্ত্তিত করেন। এই যোগা-যোগের ফলে মহারাষ্ট্রে হিন্দু জাতীয়তাবাদের মহারাষ্ট্রীয় রূপ পরিগৃহীত হয়। শিবাজীর সহিত সকল জাতির লোক সম্মিলিত হয়। কিন্তু ইতিহাস বলে—অনেক বিশিষ্ট মারাঠা সামন্ত শিবাজীর বিপক্ষে ছিল, তাঁহারা শিবাজীর কর্ম্মকে ভোঁসলে বংশের রাজ্য সংস্থাপন প্রচেষ্টা বলিয়াই মনে করে। পরে শিবাজী কৃতকার্য্য হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহার কর্ম্মের ফল ভোগের জন্য শিবাজী প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে জোটে! শিবাজীর অথবা তাহার গুরুর নিখিল ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদ ছিল কিনা তাহা সন্দেহের কথা! শিবাজীর মুখ্য উদ্দেশ্য কি ছিল—তাহার স্বাধীন সিংহাসন স্থাপন বা হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করা তাহা তর্কের বিষয়। অবশ্য এই সময়ে মহারাষ্ট্রের বাহিরের কোন কোন হিন্দু ভাবুক

ইহাকে হিন্দু ধর্ম্মের রক্ষাকল্পে অভিযান বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। শিবাজীর গুণমুগ্ধ হিন্দী কবিভূষণ তাঁহার কবিতায় শিবাজীর কর্ম্ম-কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "কাশীকা কলাযাতি, মথরা মসজিদ হোতি, সুন্নত হতি সবাকার, আগর শিবাজী মহারাজ না হোতা প্রকাশ !"

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, শিবাজীর কার্য্য যদি হিন্দু-জাতীয়তাবাদের অঙ্গ হইত তাহা হইলে তাহার সৈন্যশ্রেণীতে পাঠান সিপাহী দল থাকিতে পাবিত না (১০১)! এই সময় হইতে মহারাষ্ট্র প্রাধান্যের শেষকাল পর্য্যন্ত পাঠানেরা মহারাষ্ট্র সৈন্যশ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়, এতৎব্যতীত আরব, হাবসী ও সিন্ধি সৈন্যদল এই সঙ্গে ছিল। (১০২) অন্যদিকে শিবাজীর বিপক্ষ দলে হিন্দু রাজপুতেরা ছিল। সিংহগড় বিজয় হইতেছে মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল কীর্ত্তি। তানাজি মালসুরে যখন এই দুর্গ আক্রমণ করেন তখন যে মোগল সৈন্যেরা প্রাণপণ করিয়া তাহার প্রতিরোধ করিয়াছিল তাহারা ছিল রাঠোর কৌমের রাজপুত!

আজকাল মহারাষ্ট্রীয় লেখকরা বলিতেছেন, শিবাজী প্রতিষ্ঠিত

১০১। S. N. Sen—'Administrative System of the Mahrattas', Pp 144-145; I. G. Duff "A History of the Mahrattas. vol, I Pp. 133—134.

১০২। I. G. Duff. op cit vol II Ed 1918, p 218; এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার পেশোয়া মধুরাওয়ের সরকারী তালিকা থেকে সামরিক কর্ম্মচারীদের নিম্নপ্রকারের সংখ্যানুপাত উদ্ধৃত করিয়াছেন: পেশোয়ার ৪৪৯ কর্ম্মচারীর মধ্যে ৯৩ ব্রাহ্মণ, ৮ রাজপুত, ৩০৮ মারাঠা, ৪০ মুসলমান। পৃঃ ২৪০।

মহারাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিখিল ভারতীয় হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপনের Policy ছিল, এবং তাহাদের "হিন্দু-পদ-পাতসাহী" (১০৩) স্থাপনের পরিকল্পনার কথা শোনা যায়, কিন্তু ইতিহাস তাহার বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করে। সত্য বটে শিবাজীর পৌত্র রাজা সাহুর দরবারে পেশওয়া বাজীরাও 'কুসতুন তুনিয়া' (কন্সটান্টিনোপল) পর্য্যন্ত হিন্দু পতাকা এককালে উড়িবে—এই আদর্শ সাহুর দরবারের হওয়া উচিত বলিয়া বক্তৃতা করিয়াছিল (১০৪)। কিন্তু তাহারা শেষ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুর আধিপত্যের চেষ্টা করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুকে (১০৫) তাহাদের সামিল করে নাই, বরং তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়াছিল (১০৬)। রাজনীতিক প্রয়োজনের জন্য তাহারা মুসলমানদের সহিত খুব ভাব করিয়াছিল। পাণিপথের যুদ্ধের প্রাক্কালে মহারাষ্ট্রীয়েরা জাঠ ও রাজপুতদের চটাইয়া তাহাদের সহানুভূতি হারাইয়াছিল। তৎপর মহারাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ ও মারাঠার দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল। শূদ্র কৃষক মারাঠারা সৈন্য হইয়া শিবাজীর অধীনে রাজত্ব স্থাপন করিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করে, তথন হইতে ব্রাহ্মণ ও মারাঠার শ্রেণীদ্বন্দ্ব বিশেষ-

---

১০৩। Savarkar—"Hindu Pada Padssahi" পুস্তক দ্রষ্টব্য।

১০৪। ৺সখারাম গণেশ দেউস্কর—"বাজীবাও'।

১০৫। I. G. Duff—"A History of the Mahrattas", vol, II Ed. P. 218. এই পুস্তকে গ্রন্থকার বলিতেছেন, "The extension of their sway carried no freedom even to Hindus, except freedom of opinion, and it rarely brought protection, or improved the habits and condition of the vanquished. P. 126-127.

১০৬। নবাবিষ্কৃত বাঙ্গালায় লিখিত 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' বর্গি হাঙ্গামার ভীষণতর বর্ণনা আছে।

ভাবে জাগিয়া উঠে। অনেক ঐতিহাসিক বলেন, পাণিপথের যুদ্ধে হারিবার ইহা একটি মূল কারণ। হোলকার ও গাইকোয়াড় এবং আরও অনেক মারাঠা সেনাপতি, প্রধান সেনাপতি ব্রাহ্মণ সদাশিব রাও (ইঁহার গুণগ্রাহীরা ইঁহাকে 'পরশুরাম' অবতার বলিত) ভাওয়ের উপর রাগ করিয়া নিষ্ক্রিয় ছিল (১০৭)! তাহাদের মনোভাব ব্রাহ্মণেরা মরুক! ভাও পূর্ব্বে হোলকারের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া ঘৃণাভরে বলিয়াছিল— Who cares to hear a goat-herd? (১০৮) রাণাডের মতে এই উভয় জাতির দ্বন্দ্ব মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের 'কাল' হইয়াছিল। ইতিহাস পাঠে ইহা বোঝা যায় যে, মহারাষ্ট্রীয় রাজত্ব ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তার প্রতীক ছিল না।

উত্তরে নানক প্রতিষ্ঠিত "শিখধর্ম্ম" মুঘলের অত্যাচারে গুরুগোবিন্দ সিংহ কর্তৃক জাতিভেদ-বিহীন "খালসা" সংঘে পরিবর্ত্তিত হয়। এই নূতন সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে,—কিন্তু মোগলের অত্যাচারের জন্য মুসলমান বিদ্বেষ পোষণ করে। জনশ্রুতি এই যে,—গো ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্যই আক্রমণশীল খালসা সংঘ সংগঠিত হয়। শিখদের মধ্যে প্রবাদ আছে, "আগর গুরু গোবিন্দ সিংহ নাহি হোতা প্রকাশ, হিন্দু ধর্ম্মকা হো যাতা নাশ!" আসলে হিন্দু-সমাজের মধ্য হইতে অস্ত্রধারী ধর্ম্মোন্মত্ত খালসা দল উদ্ভূত হইয়া মুসলমান সমাজের ধর্ম্মোন্মত্ত গাজীর দলের পাল্টা জবাব দিতে থাকে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এই দলকে হিন্দু-জাতীয়তাবাদের প্রতীক বলা যায় না, কারণ শিখেরা

১০৭। J. N. Sarkar—Fall of Moghul Empire, Vol. II দ্রষ্টব্য।

১০৮। Ranade—"Rise of the Marhatta Power" "Hindu Re-conquest of India" দ্রষ্টব্য।

বরাবর নিজের সম্প্রদায়ের জন্য কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। শিখদের একটি পুরাতন প্রবাদ বাক্যে উক্ত আছে—"রাজ করেগা খালসা, ইয়াগীস্থানে (১০৯) বাকি (আকি) না রহে কোই" (শিখ খালসাই রাজত্ব করিবে এবং স্বাধীন আফগান কৌমদের দেশে সকলে ধ্বংস হইবে)! এতদ্বারা এই সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তির স্বরূপটি প্রকাশ পায়। রামদাস স্বামীর "মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম"-এর ন্যায় গুরু গোবিন্দের খালসার শিখধর্ম্ম হিন্দুজাতির স্বাধীনতার প্রতিনিধিস্থানীয় হয় নাই, বরং প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের প্রতীক হইয়াছিল।

জাতিভেদ বর্জ্জন করিয়া গুরুগোবিন্দ শিখ ধর্ম্মকে কৃষক জাঠদের মধ্যে গ্রহণ করাইতে পারিয়াছিলেন এবং শিখধর্ম্মের আদর্শে প্রভাবান্বিত হইয়া এই শিখ গণশ্রেণীর মধ্যে স্বাধীন শিখ রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। পরে রণজিৎ সিংহ তাহার ফলভোগী হয়, কিন্তু তখন শিখ সমাজে একটি অভিজাতশ্রেণী উদ্ভূত হইয়াছে। এই অভিজাত-শ্রেণীর মধ্যে হিন্দুর জাতি মর্য্যাদার প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল! মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সময়ে পঞ্জাবে শিখ-জাঠ ও মধ্যপ্রদেশে হিন্দু-জাঠদের রাজনীতিক অভ্যুত্থানে, কৃষক জাঠজাতি পূর্ব্বে শূদ্র বলিয়া বিবেচিত হওয়ার জন্য রাজনীতিক ক্ষমতা পাইয়াও ক্ষেত্রী জাতীয় শিখ সর্দ্দারেরা সমাজে যে সম্মান পাইত জাঠ বা অন্য নীচু জাতিসমুদ্ভূত সর্দ্দার সে সম্মান পাইত না। প্রবাদ আছে, রণজিৎ সিং জাতিতে নিম্নশ্রেণীর

১০৯। বর্ত্তমান স্বাধীন আফগান রাষ্ট্র ও ভারতের সীমানার মধ্যবর্ত্তী স্থান—যেখানে আফ্রিদি, মাসুদ প্রভৃতি স্বাধীন পাঠান কৌমসমূহ বাস করে, তাহাকে "ইয়াগীস্থান" বলে।

"সাঁসি" (১১০) (মগু প্রস্তুতকারী জাতি, কিন্তু সুঁড়ির চাইতেও নীচু) ছিল। সেইজন্য ইহা লইয়া সামাজিক কটাক্ষপাত এখনও চলে।

ভূমিবিলি ব্যবস্থা

বৈদিক যুগের অর্থনীতিক অবস্থার বিষয়ে অনুসন্ধানকালে আমরা দেখিয়াছি যে, তৎকালে ভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল; প্রত্যেক লোক নিজের ভূমি চাষ করিত। কৃষিভূমি তৎকালে যে জনগত বা ভূস্বামীর সম্পত্তি ছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যৌথ কৃষির কোন চিহ্ন ঋকবেদে নাই, বরং ভূমিকে মাপদণ্ড দ্বারা বিভক্ত করার উল্লেখ আছে (১।১১০,৫)। পুনঃ অপালার প্রার্থনায় (৮।৯১,১৬) কৃষিভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়াই নির্দ্ধারিত হয়। আবার ঋকবেদের কৃষি সম্বন্ধে উক্তিসমূহ দ্বারা ইহাও বোধগম্য হয় না যে, একটী কৌম বা কুল একটি গ্রামের মালিক ছিল। গোচারণ জমিতে যে সব গরু চরিত তাহাদের পৃথক মালিক ছিল (১০।২৭৮)। এই যুগে যে কুলগত

১১০। Ibbetson—"Glossary of Punjab Tribes" পুস্তকে রণজিৎ সিংহকে ভট্টি রাজপুত এবং তাহাকে মহারাজ সাঁসির বংশধর বলা হইয়াছে। শিখদের নিকট হইতে লেখক উপরোক্ত কথাই শুনিয়াছেন। কেহ কেহ জাঠ সাঁসিদের 'thievish tribe' of Samsir জাতি বলেন— "Samsi tribe of Jats is akin to the "criminal tribe of that name though it produced the greatest of the Jats in the person of Maharaja Ranjeet Singh." H. A. Rose in Hasting's Encyclopaedia vol. VII. P. 489.

যৌথবাদ (clan communism) বা গ্রামগত যৌথবাদ (village communism) ছিল তাহার কোন প্রমাণ বেদে নাই। কেবল এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, গোচারণ-ভূমি এবং কূপ যাহা গ্রামের বাহিরে অবস্থিত থাকিত তাহা গ্রামের সাধারণের ব্যবহারের জন্য ছিল (১)। অন্য পক্ষে প্রমাণ আছে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির জ্ঞান টনটনে ছিল! দ্রব্য-সমূহের ব্যক্তিগত স্বামিত্বের কথা বিশিষ্টভাবে উল্লেখ আছে (১।১৭, ৬; ১০।১৯,৩; ১০।১৫৫, ৩)। পুরোহিতেরা যজ্ঞে মহার্ঘ্য দান পাইতেছে (১।১৮,৫)। এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে "মঘবন" নামে একটী ধনী শ্রেণী ছিল (১।৮৪,১৯; ১।১৩৩,৩)। পুনঃ ধনী শ্রেণীদের পর্য্যায় ছিল (১০।১১৭,৮)। এতদ্বারা আমরা শ্রেণীসমূহের অস্তিত্বের সংবাদ পাই। এইজন্য এক কবি দুঃখ করিয়া বলিতেছেন: "দুইটি হস্ত অতি সমান হইলেও সমান শক্তিধারী নয়, দুইটি গরু এক মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেও সমান প্রকারের দুগ্ধ দান করে না, দুইটি ভ্রাতা যমজ হইলেও সমান শক্তিশালী হয় না" ইত্যাদি (১০।১১৭,৯)। আবার পিতার মৃত্যুর পর, তাহার সম্পত্তি পুত্রদের দ্বারা বিভক্ত করা হইত (৩।৩১,২)।

এই প্রকারের ব্যক্তিত্বভাব পূর্ণ সমাজে কোন প্রকারের "কম্যুনিজম" আবিষ্কার প্রচেষ্টা বৃথা। অন্য পক্ষে, ঋকবেদে রাজার "অভিষেক"-সূক্তে রাজাকে জনপদের প্রভু বলা হইতেছে, আরও বলা হইতেছে, প্রজারা তাহাকে ইচ্ছা করুক (১০।১৭৩,১)। পুনঃ অথর্ব্ববেদের "অভিষেক"-সূক্তে রাজার কাছে "কর" বা "বলি" আসিবার উল্লেখ আছে এবং রাজাকে 'বিশ' সকলের প্রভু হইবার কথা আছে (৩।৪।১)। এতদ্বারা আমরা বোধগম্য করি যে, রাজা এবং প্রজা জনপদের প্রভু।

১। B. N. Datta: Dialectics of Land-Economics of India. PP. 4-7.

ঋকবেদের পরের যুগে, 'শতপথ-ব্রাহ্মণ' পুস্তকে, যজ্ঞকালে পুরোহিতদের দক্ষিণা দিবার সময়, তাহাদের ভূমি দানের কথার উল্লেখ আছে (১৩,৫. ২, ১৮)। এই দান ব্যাপারে একটী বিষয় উল্লিখিত আছে যদ্বারা এইকালের ভূমি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করে। রাজা রাজবংশীয়দের অনুমতি লইয়া ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে ভূমি দান করিতেছেন (৭।১,১,৪)। এতদ্বারা আমরা অনুমান করি, এই সময়ে শাসকগোষ্ঠীই ("রাজন্য") রাজ্যের ভূমির মালিক ছিল। ভূমির স্বামিত্ব তাহাদের ছিল। ইহার দ্বারা অনুমিত হয়, ঋকবেদে যেমন ভূমির স্বামিত্ব কৃষকের ছিল, ব্রাহ্মণ-যুগে এই স্বামিত্ব রাজবংশের হাতে আসিয়াছে।

এই কালের সাহিত্যে 'গ্রামকাম' (তৈত্তিরিয় সংহিতা ২।১,১,২; ৩,২; ৩,৯, ২); মৈত্রিয়ানী সংহিতা (২।১, ৯; ২, ৩; ৪।২ প্রভৃতি) নামক শব্দটি দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ, রাজার কাছে গ্রামপ্রার্থী। এতদ্বারা বোধগম্য হয়, রাজা তাহার প্রিয়পাত্র বা পুরোহিতকে গ্রামদান করিত। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বোধগম্য হয় যে, ঋকবেদের সময়ের কৃষক-ভূস্বামীর (peasant-proprietor) অবস্থা হইতে পরের যুগে ইতিহাসের দ্বন্দ্ববাদ দ্বারা তাহার অধিকার ক্রমশঃ সংকুচিত হইতেছে। পুনঃ গ্রামদান রূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা একটী মধ্যস্বত্বভোগীশ্রেণীর উদ্ভব হইতে দেখি। এতদ্বারা রাজা ও কৃষকের মধ্যবর্ত্তী স্তর গঠিত হইয়াছে। এই প্রকারে কৃষকের উপর একটী ভূস্বামীর দলের উদ্ভবের পরিচয় পাওয়া যায়।

বৈদিকযুগের পরে, "গৌতম-সংহিতা" (৪০০ খৃঃ পূঃ) সর্ব্বপুরাতন স্মৃতি বলিয়া গন্য হয়। ইনি বলিতেছেন: কৃষকেরা রাজাকে শস্যের $\frac{১}{১০}$, $\frac{১}{৮}$ কিংবা $\frac{১}{৬}$ অংশ ট্যাক্স হিসাবে প্রদান করিবে (১০।১৪,৩০,২৪); কারণ ট্যাক্স প্রদানকারীকে রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য (১০।১৩,৩০,২৮)।

এই প্রসঙ্গে ইনি বলিতেছেন: "ব্রাহ্মণ ব্যতীত রাজা সর্ব্ব বিষয়ের প্রভু (১১।১)। ইহার পর আসেন আপস্তম্ভ (৬০০-৩০০ খৃঃ পূঃ)। তিনি বলিতেছেন: "রাস্তা রাজার, কেবল ইহার উপর সাক্ষাৎকারী ব্রাহ্মণ ব্যতীত" (২।৫,১১, ৫)। এতদ্বারা দৃষ্ট হয়, ব্রাহ্মণ ব্যতীত সর্ব্বোপরি রাজাব যথেচ্ছাচারী ক্ষমতা বিবর্ত্তিত হইয়াছে। পুনঃ তিনি বলিতেছেন, "একজন লোক যদি কর্ষণেব জন্য ভূমি ঠিকা (lease) করে লয়, কিন্তু ইহাতে কার্য্য না করে এবং তজ্জন্য ভূমিতে ফসল উৎপাদিত না হয়, তাহা হইলে সেই ভূমিব মালিককে, যে পরিমাণে শস্য উৎপাদিত হইবার সম্ভাবনা ছিল, সেই পরিমাণে ক্ষতিপূরণ এই ঠিকাদার করিবে (২।১১,২৮,১)। এতদ্বাবা পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হয় যে, এই সময়ে ভূমি ঠিকা বা ভাড়া দেওয়া হইত। তৎপর তিনি বলিতেছেন, "কৃষক-চাকর যদি তাহার কর্ম্ম অবহেলা করে, তাহা হইলে তাহাকে চাবুক মারিবে" (২) (২।২৮,২)। এতদ্বারা আমরা অনুমান করি, সেই সময়ে একপ্রকারের সার্ফ বা দাস-খতকাবী লোক ছিল।

এইসব প্রাচীন পুস্তক দ্বারা আমবা বুঝি যে রাজা সর্ব্ববিষয়ের স্বামী, তিনি নানাপ্রকাবের কর (tax and revenues) লইতেছেন। ভূমির ঠিকেদাবি বা খাজনাকারী (Lease holder) এবং সার্ফ প্রথা বিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু এইসব স্মৃতি মৌর্য্য-যুগের সমসাময়িক অথবা পরের বলিয়া বেদ-পরযুগের যথার্থ প্রামাণিক সংবাদ দেয় না। এইজন্য অব্রাহ্মণ্য পুস্তকসমূহ দেখিতে হইবে।

বৌদ্ধ পুস্তকসমূহে আমরা দেখি বিভিন্ন বর্ণের কৃষিজীবীর উল্লেখ আছে (ব্রাহ্মণ কৃষকও আছেন)। অনেক কৃষিজীবী আছেন, যাঁহারা দিন-

২। বহুপরে সম্রাট আওরঙ্গজেব এই ধরণের অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন।

মজুর ও দাস-দ্বারা চাষ করাইতেন। (৩) ভূস্বামী শ্রেণীর উল্লেখ আছে (শুনিক জাতক)।

এই যুগে আমরা রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে সংঘ-রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রমাণ পাই। এই সময়ে অনেকস্থলে রাজা তাড়াইয়া ধনীতন্ত্রীয় সাধারণতন্ত্র (Republican oligarchy) বিবর্ত্তিত হইয়াছে। এইগুলিকে লক্ষ্য করিয়া কৌটিল্য বলিয়াছেন "রাজশব্দোপজীবিনঃসংঘ" আছে। শাক্যদের মধ্যে তিনজনের রাজা উপাধি ছিল। শাক্যরাষ্ট্র সম্বন্ধে রিস ডেভিডস্ বলিতেছেন, "শাক্যকুল তাহাদের ধান ক্ষেত এবং গরু-বাছুর দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। এই ধান-ক্ষেতের চতুপার্শ্বে গ্রামগুলি অবস্থিত থাকিত এবং গরুগুলা আশে-পাশের জঙ্গলে চরিত। এই জঙ্গলে কৃষককুল যাহারা শাক্যবংশীয় লোক, তাহাদের সমানাধিকার ছিল। প্রত্যেক গ্রামে শিল্পী থাকিত, সম্ভবতঃ তাহারা শাক্যবংশীয় নয়। উচ্চস্তরের ব্যবসায়ীদের নিজেদের পৃথক গ্রাম ছিল" (৪)।

এতদ্বারা দৃষ্ট হয় যে, এই সংঘ-রাষ্ট্রে সামাজিক স্তরভেদ ছিল এবং একই কুলের একদল রাজোপাধি ধারণ করিত, আর একদল কৃষক ছিল। এতদ্বারা মর্গানবর্ণিত কৌমগত কম্যুনিজমের সন্ধান ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পুনঃ আমরা শুনি, "গরুগুলা গ্রামের বিভিন্ন গৃহস্থের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল, কাহারও পৃথক গোচারণ-ভূমি ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে বা সমবায়যুক্ত মালিকদের নিজেদের ভূমি বেড়া দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইত না"। (৫)

এতদ্বারা আমরা বুঝি, গোচারণভূমি ঋকবেদের যুগের ন্যায়

৩। R. Fick. দ্রষ্টব্য; পৃঃ ২৪৭।

৪-৬। Rhys Davids: op cit. Pp 45 47, 48.

সাধারণের ব্যবহার্থে ছিল। তৎপর, আমরা কৃষিভূমিতে ব্যক্তিগত অধিকারী, এবং সমবায়যুক্ত-মালিক (Corporate proprietor) থাকিবার সংবাদ পাই। এই শেষোক্ত ব্যবস্থা বর্ত্তমানের উত্তর-ভারতে প্রচলিত আছে বলিয়া শোনা যায়। পুনঃ ডেভিডস্ বলিতেছেন, "ভূমিতে সমাজের বিপক্ষে ব্যক্তিগত স্বামিত্ব ছিল না। কোন অংশীদার, তাহার অংশ বাহিরের লোককে বেচিবার বা বাঁধা দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিল না। গ্রাম্য-সভার (Village council) অনুমতি ব্যতীত সে এই কার্য্য করিতে পারিত না।" কিন্তু ইহার বিপক্ষ দৃষ্টান্তও আছে যে স্থলে এই প্রথা ভঙ্গ করা হইয়াছে (বিনয় ২,১৫৮,১৫৯ ; জাতক ৪,১০৭)। ইহার দ্বারা আমরা বুঝি যে, শাক্যদের কেহ কেহ ভূমি সংযুক্তভাবে কর্ষণ করিত।

এইস্থলে বৈদিক "সভা"র প্রতিধ্বনি পাই, কিন্তু গ্রাম্য-অর্থনীতির উপর ইহার ক্ষমতার বিষয় পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হয় না। আমরা ইহা লক্ষ্য করিতেছি যে, ভূমির উপর কৃষকের পূর্ণ স্বামিত্ব ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইতেছে। শাক্য-রাষ্ট্রে দৃষ্ট হয় তাহার এই স্বামিত্বের অধিকারের ব্যবহার গ্রাম্য-সভার দ্বারা ব্যাহত হইয়াছে। তৎপর আমরা শুনি, "কোন ব্যক্তি ক্রয় করিয়া বা উত্তরাধিকারীসূত্রে সাধারণ তৃণ-ভূমি বা জঙ্গলের কোন অংশে নিজস্ব অধিকার স্থাপন করিতে পারিত না" (৬)।

এইসব সংবাদ দ্বারা আমরা বুঝি যে, শাক্যকুল রাষ্ট্রের সমস্ত ভূমির মালিক ছিল না। এইজন্য যাঁহারা বলেন, বেদ পরযুগে ক্ষত্রিয়কুলেরা 'কৌমগত কম্যুনিজম' জীবন যাপন করিত, তাঁহারা ঐতিহাসিক ঘটনা সঠিকভাবে পড়েন নাই বলিয়া মনে হয়। অন্যদিকে, মগধ ও কোশলে যথেচ্ছাচারী শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইতিহাসে কথিত হয়, কোশল-রাজ মগধরাজকে কন্যাদানকালে কন্যার খরচের জন্য (pin-money)

একটী গ্রাম দান করে। এতদ্বারা অনুমিত হয় বুদ্ধেরই সময়ে শাক্য-রাষ্ট্রের বাহিরে, রাজাই ভূমির মালিক ছিল। এই প্রকারে বৈদিক রাজা ও তাহার সমিতি এবং গ্রাম-সভার পরিবর্ত্তে, দ্বন্দ্বনীতিপ্রসূত যথেচ্ছাচারী রাজা আর ভূমির মালিকানাস্বত্ব রাজার হাতে গিয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। স্বাধীন কৃষকের স্থলে ভূস্বামী এবং অর্দ্ধদাস (সার্ফ) প্রতিষ্ঠান উদ্ভূত হইয়াছে।

ইহার পর আসে মৌর্য্য যুগ। এই যুগের অর্থনীতিক সংবাদ আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পাই। তিনি বলিতেছেন, "গ্রামগুলিতে একশত ঘর কৃষিজীবী শূদ্রবর্ণ(৭) দ্বারা পরিপুরিত হইবে। ইহাদের সীমানা হইবে এক বা দুই ক্রোশ পরিমিত স্থান এবং যাহাতে (ইহারা) পরস্পরের সাহায্য করিতে পারে এইভাবে সংস্থাপিত হইবে (২।১,৪৫)। তৎপর, তিনি বলিতেছেন, "যাহারা যজ্ঞ করে, ধর্ম্মগুরু, পুরোহিত এবং বেদজ্ঞ লোকেরা, যথেষ্ট শস্য উৎপাদনকারী এবং ট্যাক্স জরিমানা মাপযুক্ত ব্রহ্মদেয় ভূমিদান পাইবে" (অদণ্ড করাণি)। তৎপর তিনি চিকিৎসক, অশ্ববৈদ্য, স্থানিক, গোপ (গ্রাম্য হিসাব রক্ষক), হিসাব রক্ষক, অশ্ববশকারী, দূত প্রভৃতিকে ভূমিদান করিবার কথা বলিতেছেন। এই ভূমি তাহারা বিক্রয় বা বন্ধক দিতে পারিবে না (২।১,৪৬)। এইস্থলে দৃষ্ট হয় অনেক রাজকর্ম্মচারী কর্ম্মের জন্য ভূমি পাইতেছে কিন্তু ইহার উপর তাহাদের পূর্ণ অধিকার নাই। এতদ্বারা ভূমিতে রাজারই স্বামিত্ব অনুমিত হয়। পুনঃ তিনি বলিতেছেন, "কর্ষণোপযোগী ভূমি জীবন-স্বরূপ কর প্রদানকারীকে প্রদত্ত হইবে। যাহারা ভূমি কৃষির জন্য প্রস্তুত করিতেছে তাহাদের কাছ হইতে ভূমি কাড়িয়া লওয়া যাইবে না।

(৭)। জার্ম্মাণ অনুবাদক ইহা অনুবাদ করিয়াছেন, "শূদ্র এবং কৃষিজীবী লোক"।

যাহারা চাষ করে না, তাহাদের কাছ হইতে ভূমি কাড়িয়া লইবে এবং অন্যকে দিবে (২।১,৪৭)।

এইসব সংবাদ দ্বারা আমরা এই তথ্য পাই যে, এই সময়ে রাজাই পূর্ণভাবে ভূমির মালিক। রাষ্ট্রের ভূমি তাহার হস্তে, কৃষক কেবল জীবনব্যাপী ভোগাধিকারী (Life tenure)। এই সঙ্গে আমরা যুক্তভাবে চাষকারীর (Joint cultivator) সংবাদও পাই (১৭৫)। পুনঃ আমরা এই সংবাদ পাই যে, রাজার খাস জমিও (crown lands) ছিল (২।৬,৬০)। ইহার দ্বারা আমরা বুঝি, রাষ্ট্রের সব ভূমিই রাজার স্বামিত্বাধীন ছিল, তন্মধ্যে তিনি কিছু রাখিতেন, কিছু খাসে খাজনায় দিতেন। তৎপর, এই সংবাদও পাই যে এই খাসমহল, গোলাম, শ্রমিক ও কয়েদীদের দ্বারা কর্ষিত হইত (২৪।১১৫)। ইহা এক প্রকারের রোমান Latifundia ন্যায়।

ভূমিসংক্রান্ত কোন বিবাদ হইলে কৌটিল্য বলিতেছেন, যে ইহা নিকটবর্ত্তী স্থানের বা গ্রামের মোড়লদের (Elders) দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে হইবে (৩।৯,১৬৯)। এই তথ্য দ্বারা আমরা পূর্ব্বের গ্রাম্য-সভার ছায়ার সংবাদ পাই। তৎপর, রাজা ভূমি বিক্রয় ও ক্রয় করিত (৭।১১,২৯৭)। এইসব নজির দ্বারা আমরা রাষ্ট্রের ভূমিতে রাজার পূর্ণ মালিকানা-স্বত্ব দেখিতে পাই। একজন জার্ম্মাণ অনুসন্ধানকারী বলিতেছেন, "There was state-ownership of land with right of occupancy and transfer by sale, mortgage, etc, vested in the people for fiscal purpose (৮)। তাহা হইলে ইহাই সঠিক তথ্য যে রাজা (তৎ যুগে রাজা ও রাষ্ট্র এক বস্তু) ভূমির মালিক এবং লোকের সেই ভূমিতে কেবলমাত্র বাস করিবার অধিকার ছিল। পুনঃ এই অধিকার সে

৮। B. Breloer: "Kautiliya Studien". [Quoted by Shamasastry. P. XXXII.

বাধা দিতে, বেচিতেও পারিত। এই তথ্য দ্বারা দৃষ্ট হয়, ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বনীতি. বৈদিক স্বাধীন-কৃষক-ভূস্বামীর পদ থেকে তাহাকে এই যুগে নিজের জমির মালিকানাস্বত্ব হারাইয়া খাজনা প্রদানকারী হইতে হইয়াছে।

মৌর্য্য-পরযুগে মনু বলিতেছেন, যে ভূমি প্রস্তুতকারক সেই ভূমির মালিক (৯,৪৪)। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনুসংহিতার দুইটা স্তর আছে। তিনি বলিতেছেন, কৃষক ভূমির উৎপাদিত নীবারের ⅙ অংশ রাজাকে কর দিবে। রাজা স্বেচ্ছাচারী এবং ভগবানের প্রতিনিধি। কি সর্ত্তে কৃষক ভূমি কর্ষণ করিত (Tenure) সেই বিষয়ে মনুতে স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তাহাকে অনেক প্রকারের ট্যাক্স দিতে হইত। পুনঃ মনুতে ভাগ-চাষীর সংবাদ পাই (৯,৫২)। এই ভাগ-চাষীকে "অর্দ্ধ-শিরিণ" বলিত (বিষ্ণুসংহিতা ৫৭, ১৬)।

ইহার পরের যুগের বশিষ্ঠ সংহিতাতে "সামন্তশ্রেণীর" উল্লেখ আছে (১৬)। ইনি বলিতেছেন, "গৃহস্থদের দ্রব্যসমূহ রাজাধীন" (১৬)। ইনি বলিতেছেন, "কৃষির সুবিধার জন্য রাজা যে সব বৃক্ষ, ভাল ফল এবং ফুল দেয় না তাহা কর্ত্তন করিতে পারিবেন" (১৯)। এইস্থলে আমরা দেখি. রাজা কতটা কৃষিজীবীর অধিকার সঙ্কুচিত করিয়াছে। এতদ্বারা আমরা বোধগম্য করি ভারত সামন্ত যুগে প্রবেশোন্মুখ হইয়াছে।

পরের শতবাহন যুগে রাজা দান করা ভূমি পরিবর্ত্তন করিয়া আর একজনকে দান করিতেছেন, রাজা ভূমি সর্ত্তাধীন ভোগাধিকার (Immunity) প্রদান করিতেছেন (৯)।

তৎপর ভারশীব ভাকাটাকাযুগে যখন ৩০০ খৃঃ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রাজশক্তি লইয়া পুনরুত্থান করিতেছে, তখন দৃষ্ট হয় ভারত সামন্ততন্ত্ররূপ

৯। EP. Ind. Vol. VIII. Nasik Caves Inscriptions.

সামাজিক-অর্থনীতিক স্তরে প্রবেশ করিয়াছে রাজা নানাপ্রকারের নিষেধাজ্ঞা সহিত ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করিতেছে (১০)। এই সময়ে আমরা ভূমির উপর নানাপ্রকারের দৃঢ় রীতি ও নিষেধাজ্ঞা, বেগার খাটা (forced labour) প্রভৃতি প্রথা দেখি। ইহাতে দৃষ্ট হয়, রাজা ভূমির পূর্ণ ভোগাধিকার ব্রাহ্মণদের দেয় নাই। ইহাতে ইহাও দৃষ্ট হয় যে নানা প্রকারের আদায় (dues) ভূমি হইতে তোলা হইত। ভারতে এখন সামন্ততান্ত্রিকযুগ; নানাপ্রকারের 'আবওয়াব' 'আদায় হইতেছে এবং 'আংশিক' দান প্রদান করা হইতেছে।

তৎপর আসে গুপ্ত যুগ। এই যুগের যেসব খোদিত-লিপি বাঙ্গালায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, রাজাই স্পষ্টভাবে ভূমির মালিক। গুপ্তযুগে সামন্ততন্ত্র তাহার পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে ভূমি নানা সর্ত্তে প্রজাকে প্রদত্ত হয়। ভূমিব ভোগাধিকারও ধাপে ধাপে নামিয়া যায়। খোদিত-লিপিসমূহ পাঠে ভূমির উপব সার্ব্বভৌম রাজার স্বামিত্ব বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

কিন্তু এই যুগের পূর্ব্বে, জৈমিনি (২০০-২০০ খৃঃ) যখন বৈদিক যাগ যজ্ঞ রূপ ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কবিবার কালে তাঁহার "পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন" প্রণয়ন করেন, তখন তিনি একটি সূত্রে এই বাক্য প্রকাশ করেন, "সর্ব্বণ প্রত্যয়সিশিটত্বত" (৬।৭,৩)। ইহার অর্থ, "সকল সমান পদে দণ্ডায়মান" অর্থাৎ "ইহা সকলের পক্ষে সমান"। জৈমিনি বলিতে চাহিয়াছেন যে, ভূমি সকলের জন্য, ইহা কাহারও একমাত্র সম্পত্তি নহে। উপরোক্ত ভূমির মালিকানা স্বত্বের বিবর্ত্তনের ইতিহাসের সহিত তুলনা করিলে আমরা দেখি যে, তাঁহার ধর্ম্ম উদ্যোগ যেমন কাল-ব্যতিক্রম, তদ্রূপ ভূমিবিষয়ক তাঁহার অভিমতও তদ্রূপ কাল-ব্যতিক্রম। এই বিষয়ে

মন্থর স্থায় তাঁহার প্রাচীন ধারণা ছিল। বাস্তব ঘটনার সহিত এই উক্তির সামঞ্জস্য নাই।

গুপ্তযুগের সময়ে বা কিঞ্চিৎ পরে (৫০০ খৃঃ) শবর-স্বামী জৈমিনির টীকা লেখেন। তিনি উপরোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করেন, "ক্ষেত্রানাম ইসি-তরো মনুষ্য দৃশ্যন্তি"। ইহার অর্থঃ মানুষ তাহার ভূমির স্বামী বলিয়াই পরিদৃশ্য হয়। তৎপর তিনি বলিতেছেন, "যে ভোগের দ্বারা রাজা তাহার রাজ্যের ভূমির স্বামী, সেই ভোগের দ্বারাই অন্যেরাও তাহাদের ভূমির স্বামী"। পুনঃ তিনি বলিতেছেন, "দেশের একমাত্র রাজা হইয়া, তিনি কেবল শস্যের একটী নির্দ্দিষ্ট ভাগেব স্বামী, যেহেতু তিনি ধান্য প্রভৃতির রক্ষাকারী, তিনি ভূমির মালিক নন।"

মনু, জৈমিনি, শবর প্রভৃতি রাষ্ট্রে ভূমির ভাগ্যে দ্বন্দ্বজনিত পরিবর্ত্তন চলিতেছে দেখিয়া নিশ্চয়ই এই তিরস্কার করিয়াছেন।' ইহা সামন্ত ও ভূ-স্বামীদের লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। কিন্তু বৈদিক যুগ পর থেকেই কৃষক ভূমির মালিকানা-স্বত্ব হারাইতেছে, তাহার অধিকার সঙ্কুচিত হইতেছে। সে এখন নিজের ভূমিতে ভারবাহী পশু হইয়াছে। সামন্ত-যুগীয় নানাপ্রকারের কর, আবওয়াব তাহার ঘাড়ে চাপিতেছে।

এক্ষণে দেখা যাউক এই কালে স্মৃতিসমূহ এই বিষয়ে কি বলে। যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, বিষ্ণু কেবল রাজার কর্ত্তব্য বিষয়ে বলিয়াছেন, কিন্তু ভূমির মালিক কে, সেই বিষয়ে তাঁহারা নীরব। তৎপর খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে আসেন বৃহস্পতি। ইনি স্পষ্টভাবে বলিতেছেন, রাজাই ভূমির মালিক। ইনি কৃষকদের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই ; বরং তাঁহার লেখায় বোধ-গম্য হয় তিনি কৃষকদের কৃষিজমিতে তাহাদের কোন স্থায়ী অধিকার নাই বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পুনঃ, ইনি চাষ করিবার জন্য যে সমবায় (Co-operative system) উল্লেখ করিয়াছেন (১৪,২১-২৬)' সেই

বিষয়ে জলি বলেন, ইহা স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে তাহা যৌথভাবে জমি ভোগ প্রথা হইতে উত্থিত হয় নাই; কারণ বৃহস্পতি এই অর্থে অংশীদার মনোনয়নকালে বিশেষ সাবধান হইতে উপদেশ দিয়াছেন (১১)। এই জমি চাষের সমবায় প্রথা ব্যবসায় বিষয়ের প্রথা সংশ্লিষ্ট ব্যাপার।

গুপ্ত-পরযুগে উত্তরে সেনযুগ পর্য্যন্ত একই ক্রমবিকাশের ধারা চলিতেছে, রাজা ভূমির মালিক। নানাপ্রকারের ব্যবস্থা-প্রথা (Tenure) উদ্ভূত হইয়াছে। গ্রাম্য সভার অস্তিত্ব নাই, তবে তাহার অস্পষ্ট স্মৃতি গুপ্ত-পর-যুগের বাঙ্গালায় আবিষ্কৃত লিপিগুলিতে পাওয়া যায়।

দক্ষিণ-ভারতের অবস্থা যাহা খোদিত-লিপিসমূহে দৃষ্ট হয় তাহাতে ভূমির মালিকানা রাজারই দৃষ্ট হয়। কিন্তু চোল রাজত্বকালে "গ্রাম্য-সভার" উল্লেখ পাওয়া যায়। (১২) একটী লিপিদ্বারা মোটামুটি রকম অবস্থা বুঝা যাইবে (১৩)। রাজাবোধরাজ (৬০৯-১০ খৃঃ) একজন ব্রাহ্মণকে একটী গ্রাম দান করেন, তাহা বলিতেছেঃ "ইহা সর্ব্বজনবিদিত হউক! ধর্ম্মার্থে···আমরা 'উদ্রঙ্গ' (বাসকারী প্রজার উপর ট্যাক্স), (১৪) 'উপরিকর' (ঠিকে প্রজার উপর ট্যাক্স), সমস্ত শুল্ক এবং ট্যাক্স সহিত, দেয় কর্ম্ম (duty), বেগার খাটা, 'প্রতিভেদিকা' (অজ্ঞাত অর্থ) বিমুক্ত একটী

১০। C. C. I. vol. III, P. 242.

১১। Jolly : Recht und Sitte.

১২। S. I. I. vol III. pt. III. No 116, 168.

১৩। EP. Ind. vol. VI. No. 29.

১৪। এইসব স্থলে ইংরেজী শব্দ "ট্যাক্স" যাহা খোদিত-লিপিগত অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই দেওয়া হইল। সংস্কৃত "কর" ও "বলি" tax কি révenue এ বিষয়ে সন্দেহ ও বিতর্ক আছে।

গ্রাম ভূমিচ্ছিদ্র স্থায়ানুসারে দান করিতেছি। এই স্থলে সৈন্যদলের (Regular) ও তাহার বাহিরের (Irregular) সিপাহীর (চাট ভাট) প্রবেশ নিষেধ।" এই দানপত্রে আমরা দুই প্রকারের প্রজার নিদর্শন পাই। ইহাতে দৃষ্ট হয়, কৃষিজীবীর তাহার কৃষি জমির উপর কোন অধিকার নাই, সে খাজনা-প্রদানকারী প্রজা, তাহার জমি রাজা অন্যকে দান করিল। পুনঃ রাজা ভূমির উপর সুবিধা ভোগের কতকগুলি সর্ত্ত ত্যাগ করিল।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের কালে এই অভিব্যক্তিরই জের চলিতেছে। নানাপ্রকারের আবওয়াব আদায় করা হয়। বিবাহিত যুগলের অশ্বপৃষ্ঠে যাওয়া, এমন কি বিবাহের জন্য কর (marriage fee) আদায় করা হইত। (১৫) সামন্ততান্ত্রিক সর্ব্বপ্রকারের আদায় প্রজার কাছ হইতে গ্রহণ করা হয়। পাকা বাড়ী করিতে গেলে রাজাকে কর দিতে হয়। (১৬) অন্যত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এইসব বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

এই যুগে দক্ষিণে স্থায় একটী অনুষ্ঠান দ্রষ্টব্য যে, উত্তরের "তুরস্ক দণ্ড" দক্ষিণে আজীবক (বুদ্ধের সময়ের উলঙ্গ সন্ন্যাসী সম্প্রদায় যাহা দক্ষিণে মধ্যযুগেও বিদ্যমান ছিল), "উবচ্ছ" অর্থাৎ ম্লেচ্ছ, অর্থাৎ মুসলমান প্রভৃতিদের ট্যাক্স দিতে হইত। সামন্ততান্ত্রিক ভূমিবিলির ব্যবস্থা বিজয়-নগরের শেষদিন পর্য্যন্ত ছিল। (১৭)

উত্তর-ভারতে মোগল-পূর্ব্ব যুগে পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক অবস্থাই প্রচলিত ছিল। রাজাই ভূমির মালিক; মুসলমানেরা সিরিয়া, তুর্কীর স্থায়

১৫। EP. Ind. VI. No. 35.

১৬। B. N. Datta: Dialectics of Land-Economics of India দ্রষ্টব্য।

১৭। S. I. Inscriptions. vol, I. pt. II. No. 72. P. 108,

'ঠিকেদারী' প্রথা ভারতে প্রচলিত করেন। একজন একটা পরগণা বা জেলা ঠিকা লইত, ইহার খাজনা আদায় করিত এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করিত। একটা নির্দ্দিষ্ট হারের আদায় রাজাকে দিত। গৌড়ের সুলতান-যুগে বাঙ্গালায় এই প্রথা লক্ষিত হয়। ইহারা 'জমিদার' নামে খ্যাত হইত। বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহার নিদর্শন আছে (১৮)।

ভারতে মুসলমান-যুগের পূর্ব্বে যখন সামন্ততন্ত্র বিবর্ত্তিত হয়, তখন ভূমি ভোগের নানাপ্রকারের ব্যবস্থাও উদ্ভূত হয়। এইসব ব্যবস্থার (Tenure) নাম নিম্নলিখিত প্রকারের: (১) নিভি-ধর্ম্ম, (২) অক্ষয়-নিভি, (৩) অপ্রদা, (৪) নিভি ধর্ম্মক্ষয়, (৫) অপ্রদা-ক্ষয়, (৬) ভূমিচ্ছিদ্র, (৭) স্থল-বৃত্তি, (৮) পূর্ণদান (Free gift)। (১৯) এইস্থলে ইহাও বলা প্রয়োজন যে সামন্ততন্ত্রের আনুষঙ্গিক manorial system ও ভারতে বিবর্ত্তিত হয়। সর্ব্বত্র বিরাজিত "চাকরাণ" ভূমি তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করে।

পুনঃ খোদিত-লিপিসমূহে "অগ্রহার" রূপ গ্রামদানের কথা উল্লিখিত আছে। ইহা প্রাচীনকালের ইউরোপীয় Manor প্রথার ন্যায়। একটি অগ্রহার অর্থনীতি ব্যাপারে স্বায়ত্তশাসিত ছিল। দক্ষিণের বিশ্বেশ্বর গোলাকি (ত্রয়োদশ খৃঃ) ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। (২০) ইহা বিশ্বেশ্বর-শিব দুইটি গ্রাম লইয়া একটি অগ্রহার স্থাপন করেন। কথিত হয় এই 'গোলাকি" একজন মহা-কোশলেব ব্রাহ্মণ দ্বারা স্থাপিত হয়। কিন্তু অন্য পক্ষে কথিত হয় ইহা বিশ্বেশ্বর-শম্ভুনামক একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ দ্বারা

১৮। লেখকের "বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য।

১৯। এইগুলির অর্থ বিষয়ে লেখকের Dialectics of Land Economics of India P. 73 দ্রষ্টব্য।

২০। S. K. Iyangar: Some Contributions to South Indian Culture.

স্থাপিত (দুই স্থলেই দুই প্রকার নাম দৃষ্ট হয়)। (২১) রাজেন্দ্র চোল যখন-উত্তরে অভিযান করেন, তখন তিনি বাঙ্গালা ও মহাকোশল হইতে অনেক ব্রাহ্মণ দক্ষিণে লইয়া যান। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা তথায় তন্ত্রধর্ম্মের প্রচার করেন। বিশ্বেশ্বর-শম্ভু ইহাদেরই একজন। এই গোলাকি বিশ্বেশ্বর দেবতার নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই এই গোলাকির মালিক। এই স্থলে স্বর্ণকার, কংসকার, লৌহকার, সূত্রধার, প্রস্তরকার, খোদাই-শিল্পী, ঝুড়ি প্রস্তুত-কারক, কুম্ভকার, নাপিত, ব্রাহ্মণ, গায়ক, কায়স্থ (হিসাবরক্ষক), মুষ্টিযোদ্ধা এবং অন্যান্য চাকরসমূহ ভূমি- ভাগের পরিবর্ত্তে কর্ম্ম করিত। (২২)

এই প্রকারে ইতিহাসের দ্বন্দ্বজনিত বস্তুতন্ত্রবাদ দ্বারা ঋকবেদের ভূমির স্বাধীন মালিকের কৃষকাবস্থা থেকে ভূমি ধাপে ধাপে বিলি হইয়া এবং পর্য্যায়ক্রমে (Hierarchy) ভূস্বামী অর্থাৎ মধ্যস্বত্বভোগীয় শ্রেণীসমূহ উদ্ভূত হইয়া কৃষিজীবী একজন খাজনা-প্রদানকারী প্রজা ও কর্ষকে পরিণত হয়। হেনরী মেইন বহু পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন, ভারতে সামন্ততন্ত্র বিবর্ত্তিত হইবার রাস্তায় আসিয়াছিল, ইহা ইউরোপের ন্যায় পূর্ণভাবে বিবর্ত্তিত হয় নাই। কিন্তু অদ্য খোদিতলিপিসমূহ পাঠ করিয়া আমরা এই তথ্য পাই যে, সামন্ততন্ত্র পূর্ণভাবে ভারতে বিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ণমাত্রা গুপ্তযুগে প্রকাশ পায়। এই সামন্ততন্ত্রবাদের উৎপত্তি এবং তাহার পরিণতির মর্ম্ম ভালভাবে বুঝিতে না পারিলে, হিন্দু সমাজের জটিল জাতিভেদ সমস্যা ও প্রচলিত নানা রীতিনীতির উৎপত্তির রহস্য হৃদয়ঙ্গম

২১। History of Bengal, vol. I, Dacca.

২২। Malkhapuram Stone-pillar Inscriptions of Rudra-deva in A. H. R, S. vol. IV, Pts. 1—4; 1930. pp. 148-154; Inscriptions of the Madras Presidency. pp. 938. No. 316.

হইবে না। পুরোহিততন্ত্রের স্মৃতিগত ফতোয়া দ্বারা মধ্যযুগ হইতে বর্ত্তমানকালের হিন্দুসমাজের উৎপত্তি হয় নাই। ইহার পশ্চাতে সামন্ততন্ত্রীয় সামাজিক-অর্থনীতিক বিবর্ত্তনের ধারা বিদ্যমান আছে।

আশ্চর্যের কথা, এই যুগে পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহেও সামন্ততন্ত্র ও সমাজে জাতিভেদের ন্যায় শ্রেণীভেদ বিবর্ত্তিত হয়। পারদেরা ইরাণে এই প্রথা উদ্ভূত করে (২৩)। এই পারদরা "পহ্লব" নামে ভারতে পরিচিত হয়। ভারতে পহ্লব এবং শক একীভুত হয়। ইহারা উত্তরে এবং পশ্চিমভারতে বহুদিন পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল এবং হিন্দু হইয়া ভারতীয় সমাজে মিশিয়া গিয়াছিল। তাহাদের রীতিনীতি, আর এমন কি আইনও ভারতীয় সমাজে প্রবেশ লাভ করে। ইহা আজকাল স্বীকৃত হইতেছে। বৈদেশিক সংস্পর্শ ভারতীয় সমাজে অনেকদিন হইতেই হইতেছে। সংস্কৃতে প্রচলিত কতকগুলি শব্দ জৈমিনি "ম্লেচ্ছ" ভাষার শব্দ বলিয়াছেন যথা, "পিল"। ইহা আরবী শব্দ, অর্থ হস্তী। এই শ্লোকের টীকা কালে কুমারিলভট্ট তাঁহার তন্ত্রবার্তিকাতে বলিয়াছেন: "অশুদ্ধ আর্য্যশব্দ যজ্ঞের ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে এইসব ক্রিয়া ম্লেচ্ছ ভাষাতেই হইবে না কেন? ইহার বিপক্ষে প্রতিবাদ নাই বলিয়া ইহা গ্রাহ্য। এই প্রকারেই "পিক", "নেম" প্রভৃতি ম্লেচ্ছ শব্দগুলি পণ্ডিতদের দ্বারা গ্রাহ্য হয়, (তন্ত্র বার্তিকা, বানারসী সংস্করণ, পৃঃ ১৫৪)। তৎপর তিনি বলিয়াছেন, "চোদিতম" মানে শিক্ষিত হয় বা নিযুক্ত হয় বা একটি সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানে (Corporation) সংযুক্ত হয়। এই বিষয়গুলি প্রথমে ম্লেচ্ছদের দ্বারা স্থাপিত হয়, তৎপর আর্য্যরা বা যাহারা উভয় ভাষা জানে তাহারা জ্ঞাত

২৩। Delaboise: "History of Parthia"; Dhalla: Zoroastrian Civilization.

হয়। এতদ্বারা আইনজ্ঞ ৺কিশোরীলাল সরকার মহাশয় নির্দ্ধারণ করেন কুমারিলের এই মীমাংসা কেবল ক্রিয়াপদে আবদ্ধ নয়, ম্লেচ্ছ ব্যবহার গ্রহণ বিষয়েও বলিতেছেন (Tagore Law Lectures)। এই উপায়েই বিদেশীয়দের কাছ হইতে সামন্ত যুগে যাজ্ঞবল্ক্যে ও বিষ্ণুতে আসিয়াছে যে পিতামহের সম্পত্তিতে পিতা-পুত্রের সমসাম্য। ইহাই মীতাক্ষরায় প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহা আর্য্যকৃষ্টি বিবর্ত্তনের ফল নহে।

হিন্দুযুগের ভূমিবিলি ব্যবস্থা বিষয়ে আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, ভারতীয় কৃষক ক্রমে ক্রমে তাহার ভূমিতে স্বামিত্ব হারাইয়াছে। বৈদিক যুগের পর হইতে এই নূতন বিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। রাজাই ভূমির স্বামী হয়। আমাদের অনুমান, প্রাচীন মনু, জৈমিনি, শবরস্বামী এবং বহুপরে বিজয়নগরের মন্ত্রী সায়নাচার্য্য এই পরিস্থিতির পরিবর্ত্তে প্রাচীনাবস্থা স্মরণ করাইবার জন্যই কৃষক তাহার কৃষিজমির মালিক বলিয়াছেন। ইহা শুভভাবপ্রণোদিত প্রতিবাদ মাত্র। সায়ন যখন শবরস্বামীর উক্তির উপর টিপ্পনী করিয়া বলিলেন, "রাজার স্বামিত্ব হইতেছে দোষীকে শাস্তি দান করা এবং সৎকে রক্ষা করা। ভূমি তাহার সম্পত্তি নয়, যাহারা পরিশ্রম দ্বারা ভূমিতে শস্য উৎপাদন করে, সেই ফলের তাহারাই মালিক" (২৪) তখন স্বীয় সম্রাটের ভূমির ভাগ্য বিষয়ে যথেচ্ছাচারিতার বিপক্ষেই প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়।

অন্যপক্ষে আমরা বিজয়নগরের খোদিত-লিপিসমূহে রাজার স্বামিত্ব ও যথেচ্ছাচারিত্ব দর্শন করি। সায়নের মনিবের কার্য্যই তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করে। এই সময়ে বৈদেশিক পর্য্যটকেরা বিজয়নগরের অবস্থা বর্ণনা কালে বলিয়া গিয়াছেন, অভিজাতেরা ধনী এবং প্রাচুর্য্যের মধ্যে

২৪। Quoted by R. K. Mukherjee in Report of the Land Revenue Commission, Bengal, vol, II. P, 151.

বাস করে, আর নিম্নশ্রেণীর লোকেরা দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশাতে নিষ্পেষিত হয় (২৫)।

বর্ত্তমান ভারতে জমিদারী প্রথা ভাঙ্গিয়া দেওয়া নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর "ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা" হইয়াছে। এইজন্য ইংরেজ শাসনকাল হইতে ভূমিবিলি বিষয়ক সংস্কারকামী এই শ্রেণীর লোক বলিতেছেন, ভারতে বরাবরই কৃষক ভূমির মালিক ছিল, কেবল ইংরেজ গভর্ণমেন্ট তাহাদের জমির মালিকানা কাড়িয়া নিজেদের খয়ের খাঁ জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা কায়েমী করিয়াছে। এবম্প্রকারের মত এমন কি Floud Commission Reportএও ব্যক্ত হইয়াছে। ইঁহারাই উপরোক্ত প্রাচীন লেখকদের মতই উদ্ধৃত করিয়া নিজেদের দাবী সমর্থন করেন। কিন্তু অশোকের লিপি হইতে বিজয়-নগরের শেষদিন পর্য্যন্ত লিপিগুলি দ্বারা এই দাবীর বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে। এই স্থলে একটী ঐতিহাসিক তথ্য এই অনৈতিহাসিক রাজনীতিক মতবাদের উত্তর প্রদান করিতে ইচ্ছা হয়। বাঙ্গলার দায়ভাগকার জীমূতবাহন, যাজ্ঞবল্ক্যের "পিতামহের ভূমি, দ্রব্যতে পিতা ও পুত্রের সমসাম্য" (২।১২২) এই উক্তি বাঙ্গলায় বিবেচনাকালে বলিয়াছেন, "শত শত পুস্তক সত্বেও স্বামিত্ব রূপ বস্তুতন্ত্রের অন্যথা হয় না।" ইহার অর্থ পুত্র পিতৃ সম্পত্তির পুরা মালিক। এই বাস্তব ঘটনা বাঙ্গলায় দৃষ্ট হয়। এই উক্তি আমরা ভারতের মুসলমান-পূর্ব্ব সময়ে ভূমিবিলি সম্পর্কে প্রয়োগ করিয়া দেখি, বিভিন্ন লেখকের উক্তি সত্বেও দৃষ্ট হয় বাস্তবক্ষেত্রে ভূমিতে রাজার স্বামিত্ব রূপ বস্তুতন্ত্রের অন্যথা হয় না। মহামতি কোলব্রুক জীমূতবাহনের এই উক্তির ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন—A fact cannot be altered by a hundred texts। ভারতীয় জমির

২৫। Sewell : Forgotten Empire. Paes এবং Nuniz মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

মালিকানা সম্বন্ধেও ইহা তদ্রূপ। প্রাচীন লেখকদের উক্তি যে কেবল পুণ্য অভিসন্ধিপূর্ণ সদিচ্ছামাত্র (pious wish), খোদিত লিপিগুলি তাহার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। স্বীয় ভূমি হারাইয়া তদুপরি সামন্ততন্ত্রীয় অত্যাচার ও কদাচার ক্লিষ্ট কিম্বা নির্য্যাতিত, গৃহ কলুষিত, শোষিত ও কদাচারের প্রতীক "গুরুপ্রসাদী" প্রথা (Right of first night—যাহা নানাস্থানে এখনও প্রচলিত আছে) প্রভৃতির দ্বারা নিষ্পেষিত হইয়া ভারতীয় গণশ্রেণীসমূহ মানবতার স্তরের অতি নিম্নে অবনমিত হইয়াছে। ইহা অস্বীকার করার প্রয়োজন কি ?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বাঙ্গলার সমাজতত্ত্ব

(ক) হিন্দুযুগ

বাঙ্গালার সমাজতত্ত্ব বিষয়ে বুঝিতে হইলে এই প্রদেশের প্রাচীন জাতি-তত্ত্বের অনুসন্ধান প্রয়োজন। বহুপ্রদেশের প্রাচীন তত্ত্ব বিষয়ের অনুসন্ধান আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। বিভিন্ন স্থান হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আমরা এই জাতি-তাত্ত্বিক তথ্য পাই যে, বঙ্গ-বগদ-পৌণ্ড্র-চোয়াড় কৌমগুলি বর্ত্তমান বঙ্গভাষীদের আদিপুরুষ ছিল। কিন্তু পাল যুগের পূর্ব্বের অভিব্যক্তি দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সেই সময়ে বাঙ্গলা কৌমগত সভ্যতার স্তর উত্তীর্ণ হইয়া জনপদগত সংঘবদ্ধতার স্তরে উপনীত হইয়াছে। এইজন্য আমরা সমতট, রাঢ়, বরেন্দ্র প্রভৃতি জনপদের নামোল্লেখ পাই এবং লোকে রাঢ়ী, বারেন্দ্র বলিয়া পরিচিত হইত। কিন্তু পালরা তাহা ভাঙ্গিয়া বঙ্গপ্রদেশবাসীদের একজাতিত্ব-

রূপ (Nationhood) সভ্যতার স্তরে উন্নীত করেন। এইজন্যই সেই সময় হইতে অন্যপ্রদেশসমূহের খোদিত-লিপিতে বাঙ্গালার লোকদের 'গৌড়ান্' বা 'বঙ্গান্' এবং তাহার রাজাদের গৌড়েন্দ্র বঙ্গপতি, বলিয়া অভিহিত হইতে দেখি।

পালরাজাদের তাম্রশাসনে কদাচিৎ রাজকর্ম্মচারীদের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু রাজকর্ম্মচারী পদের বিস্তৃত তালিকার দ্বারা অনুমান করা যায় যে, "রাজপাদোপজীবী" অর্থাৎ রাজসরকারের চাকুরীজীবী লোক অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎ সময়ের শ্রেণী-বিন্যাসের সংবাদ পাইলেও জাতিগত (caste) সংবাদ পাইবার উপায় নাই। পূর্ব্বের সংগৃহীত তথ্যসমূহ হইতে আমরা এই সংবাদ পাই যে, বাঙ্গালায় পাল-পূর্ব্বযুগে সর্ব্ব বর্ণেরই লোক ছিল: বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ছিল, শস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় ছিল, ব্যবসায়ী বণিক ছিল, আর শূদ্রও ছিল; শেষে শূদ্রবংশীয় লোকও প্রকৃতিপুঞ্জ দ্বারা রাজপদে নির্ব্বাচিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমানের বিবিধ পেশাগত জাতি সম্বলিত হিন্দু সমাজের ক্রম-বিকাশের কোন সংবাদই আমরা পূর্ব্বের তথ্যসমূহ হইতে উদ্ধার করিতে পারি না; অথচ সেন-বংশের সময় হইতে নানাজাতির (Castes) সন্ধান পাওয়া যায়।

গুপ্তসম্রাটদের শাসনকালেব পর এবং পালরাজবংশের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে যে সব রাজাদের তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাতে আমরা নিম্নলিখিত সংবাদ পাই: কর্ণ সুবর্ণের রাজা জয়নাগের (১) শাসনে আমরা ব্রাহ্মণ, সামন্ত নারায়ণভদ্র, ব্যবহারী (উকিল) প্রভৃতি। সূর্য্য-সেন নাম এবং উক্ত রাজার টাকায় উপবিষ্ট লক্ষ্মীকে হস্তী জল বর্ষণ করিতেছে এইটি দৃষ্ট হয়। এই রাজার তারিখ ৫—৬ খৃষ্টাব্দ হইবে। তৎপর,

১। EP. Ind. vol 18, no. 7.

ফরিদপুর অনুশাসনগুলিতে সমাচারদেব (২), ধর্ম্মাদিত্য (৩), গোপচন্দ্র (৪), রাজাদের সংবাদপ্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদের তারিখ ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দের শেষ সময়। সমাচারদেবের লিপিতে আমরা ব্রাহ্মণ সুপ্রতিকস্বামী, গ্রামের মহোত্তর, কেশব, নয়নাগ প্রভৃতির নাম পাই। এই সময়ের কর্ম্মচারীদের নাম : বৎসকুণ্ডু, শুচীপালিত, বিহিত ঘোষ, সূর্য্য দত্ত, প্রিয় দত্ত, জনার্দ্দন কুণ্ডু প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। গোপচন্দ্রের লিপিতে নাগদেব, বৎসপালস্বামী নাম পাওয়া যায়।

তৎপর পূর্ব্ববঙ্গে খড়্গ, নাথ ও ভদ্র বংশীয় স্থানীয় রাজাদের লিপি পাওয়া যায়। (৫) ইহারা সামন্তরাজা ছিলেন। ইহারা ৭-৮ খৃষ্টাব্দে আবির্ভুত হয়। ইহার পর চন্দ্রবংশে (৬) পূর্ণচন্দ্র, সুবর্ণ চন্দ্র, ত্রৈলোক্যচন্দ্র ১০ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়। ইহারাও ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন। তৎপর ১০৪৯ খৃঃ শ্রীহট্টের গোবিন্দ কেশব (৭) রাজত্ব করেন। ইহার লিপিতে আমরা গোপ, বংশ প্রস্তুতকারী, ভট্ট ব্রাহ্মণ, রজক, নাবিক, হস্তীদন্তের কারিকরের উল্লেখ পাই। কিন্তু সেন বংশের পূর্ব্বের লিপি-সমূহে আমরা কৌম বা জাতির উল্লেখ পাই না, কেবল পেষাগত লোকের উল্লেখ পাই।

২। Ibid, no 11.

৩। D. N. Sircar. Select Inscriptions, no, 43.

৪। Ibid.. No. 45.

৫। I, H. Q. P. L. Paul. North Eastern India in vol, no. 12-36.

৬। R. D. Banerjee ; Rampal plate of Srichandra in Ashutosh Silver Jubilee vol. Orientalia, p. III. p221.

৭। EP. Ind. vol. 19. no 49.

খোদিত-লিপিসমূহে দৃষ্ট হয় যে, গুপ্তযুগ হইতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে লোকে বঙ্গে নানা কর্ম্ম উপলক্ষে আসিত। সম্রাট ভানুগুপ্তের রাজত্বকালে অযোধ্যা হইতে অমৃতদেব নামক এক "কুল-পুত্র" বঙ্গে আসিয়া শ্বেতবরাহ স্বামীর মন্দির সংস্কার জন্য রাষ্ট্রের নিকট ভূমি ভিক্ষা করিতেছেন (৮)। অষ্টম শতাব্দীতে অযোধ্যা হইতে উদয়-মন প্রভৃতি বণিক ভ্রাতৃত্রয় তাম্রলিপ্তে বাণিজ্যার্থ আসিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন পথে হাজারীবাগ জেলার তিন গ্রামের অধীশ্বর রাজা আদিসিংহের গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করেন। (৯) পুনঃ ধর্ম্মপালদেব লাট দেশীয় ব্রাহ্মণকে "শুভস্থলী" নামকস্থানে প্রতিস্থাপিত করিয়াছেন (১০)। তৎপর মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ "চন্দবার" (Chandwara. U. P) বিনির্গত ভট্ট নির্ব্বোক শর্ম্মণকে গ্রাম দান করিয়াছেন (১১)। ইহার পরের কালে, রাজা ভোজবর্ম্মা মধ্যদেশ বিনির্গত সাবর্ণ গোত্রীয় পীতাম্বরদেব শর্ম্মণকে উত্তর রাঢে সিদ্ধল গ্রামে (বীরভূম জেলার সিধলা গ্রাম) বসবাস করাইয়াছেন (১২)। ইহার পরের কালে বিজয়সেন মধ্যদেশ বিনির্গত কান্তিজোঙ্গীয় রত্নাকরদেব শর্ম্মণের প্রপৌত্র উদয়করদেব-শর্ম্মণকে কণক তুলাপুরুষ মহাদান উপলক্ষে হোম কর্ম্মের জন্য

৮। EP. Ind. vol. IV, no 5, The five Damodarpur hates Inscriptions.

৯। EP. Ind. vol. IV, no. 29. Dudhpani Rock Inscriptions of Udaymana.

১০। গৌড়লেখমালা—খালিমপুর-লিপি।

১১। Inscriptions of Bengal, vol, III : Ramganj plate of Iswaraghosh.

১২। Ibid.—Belava copper-plate of the Boojavarman.

সমতটে ভূমি দান করিয়াছেন (১৩)। শক্তিপুরে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনের লিপিতে দৃষ্ট হয় যে, বল্লালসেন হরিদাস নামক এক গয়াল ব্রাহ্মণকে গ্রাম দান করিয়াছিলেন (১৪); এতদ্বারা দৃষ্ট হয় যে, পশ্চিম হইতে ব্রাহ্মণেরা আসিয়া রাজার অনুগ্রহভাজন হইয়া গ্রাম বা ভূমিদান পাইতেছেন। অতঃপর জনশ্রুতি বলে, শশাঙ্ক বঙ্গদেশে শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠা করেন (১৫)। পুনঃ কুল-পঞ্জিকা অনুসারে সরযূ পারী গ্রহবিপ্র ব্রাহ্মণেরা নবদ্বীপ জেলায় তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় (১৬)। আবার পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের কুলজী গ্রন্থানুসারে, বর্ম্মণবংশীয় রাজা শ্যামলবর্ম্মণ কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া 'সাকুণ-সত্র' যজ্ঞ করেন (১৭)।

পুনঃ পুঁথিও আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাতে তুরস্ক আক্রমণের ভয়ে ভীত হইয়া কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণের বাঙ্গালায় হরিবর্ম্মা দেবের রাজ্যে বসবাস করিবার কথাও উল্লিখিত আছে (১৮)। আবার অনেক ব্রাহ্মণ কুন্তলদেশ (মহারাষ্ট্র) ও দক্ষিণ-ভারত (দ্রাবিড়) হইতে আসিয়াছেন (বল্লাল চরিত দ্রষ্টব্য)। বৈষ্ণব সাহিত্য বলে পঞ্চাশ শতাব্দীতে রূপ ও সনাতন গোস্বামীর স্বজাতি কর্ণাটক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের দ্বারা গঙ্গাতীরে

১৩। Ibid. Barrackpur copper plate of Vijayasena.

১৪। EP. Ind, vol, XXI, Saktipur copper-plate of Laksmansena.

১৫। ৺নগেন বসু—ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৮৬।

১৬। কুমুদনাথ মল্লিক—নদীয়া কাহিনী, পৃঃ ১৩৭।

১৭। নগেন্দ্রনাথ বসু—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ২য় ভাগ। পৃঃ ২৪-২৯।

১৮। ঐ, ঐ পৃঃ ৬৯।

১৯। নগেন্দ্রনাথ বসু—"কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয় (Kayastha Ethnology) পৃঃ ১০২-১৮৪।

বাসস্থল পান। প্রথমোক্তদের "পাশ্চাত্য" ও পরোক্তদের "দাক্ষিণাত্য" বৈদিক ব্রাহ্মণ বলা হয়। তদ্রূপ একদল বঙ্গভাষী ব্রাহ্মণ মৈথিলী ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। এইসব তথ্যদ্বারা আমরা উপলব্ধি করি যে, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানাশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাঙ্গলায় আসিয়া বসবাস করিয়া বর্ত্তমানের "বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ" হইয়াছেন।

তদ্রূপ কুলপঞ্জিকাসমূহ বলে, পশ্চিম হইতে নানা জনের (tribe) কায়স্থরাও বাঙ্গালায় আসিয়া বসবাস করিয়া বর্ত্তমানের "বাঙ্গালী কায়স্থ" হইয়াছেন। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদের বঙ্গে আগমন বিষয়ে পশ্চিমে দৃঢ় প্রবাদ প্রচলিত আছে। কুলজী গ্রন্থসমূহ হইতে উদ্ধার করা যায় যে, পশ্চিমে প্রচলিত কয়েকটি কায়স্থ জনের লোকেরা বঙ্গে বসতি করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানের বাঙ্গালী কায়স্থদের আদিপুরুষেরা কেহ অম্বষ্ঠ, কেহ মাথুর, কেহ সূর্য্যধ্বজ, কেহ করণ (শ্রীকর্ণ), কেহ অগ্নিকুল, কেহ রাজধানা, কেহ শাকসেনা (শৈক-সেনা) প্রভৃতি জনগত ছিলেন। (১৯) অবশ্য খোদিতলিপিসমূহে কায়স্থ জাতির কাহারও আগমনের উল্লেখ নাই। কিন্তু হর্ষবর্দ্ধনের পর হইতে নিখিল-ভারতীয় শিলা ও তাম্রলিপিসমূহ মধ্যে আমরা "রাজপুত্র" ও "কায়স্থ" শব্দ প্রাপ্ত হই। কিন্তু তাহা রাজপাদোপজীবীদের পদের নাম মাত্র। তদ্রূপ পালবংশীয় নয়পাল দেবের প্রস্তরলিপিতে (২০) "বাজী বৈদ্যের" (অশ্ব চিকিৎসক) উল্লেখ আছে। সেই প্রকারে ১১৬৭খৃঃ পরমার্দ্দিদেবের সেমড়া-লিপিতে (২১) "কুটুম্বি কায়স্থ দূত বৈদ্যমহত্তরা অন্ধ্র চণ্ডাল পর্য্যান্তান্‌..." শ্লোকে কায়স্থ ও বৈদ্য শব্দদ্বয়ের উল্লেখ পাওয়া। যায়। কিন্তু

২০। গৌড়লেখমালা দ্রষ্টব্য

২১। EP. India, vol. IV, no 20.

এইগুলি রাজকীয় পদের পরিচয় মাত্র। পূর্ব্বের এইসব পদ দ্বারা বর্ত্তমানের কোন বিশিষ্ট জাতি (caste) বুঝায় না।

পুনঃ, সাঁচী স্তূপের লিপিতে (২২) আমরা কতকগুলি পেশার নাম পাই: 'সোতিক' (সৌত্রিক-তন্তুবায়), 'বড়কি' (বর্দ্ধকি-সূত্রধর), 'রাজুক' (রাজকর্ম্ম সংক্রান্ত লেখক)। গুপ্তযুগের এবং তৎপরকালের লিপিসমূহেও আমরা 'তৈলিক শ্রেণী' শব্দ পাই; (২৩) তদ্রূপ রেশম বস্ত্র বয়নকারী শ্রেণী (২৪), 'মালিক শ্রেণ্যা (২৫) প্রভৃতির সংবাদ পাই। খোদিতলিপিসমূহে guild-কে শ্রেণী বলা হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে ও স্মৃতিসমূহে তাই। প্রক্ষণে ইতিহাস আলোচনাকালে আমরা দেখিয়াছি যে প্রাচীনকাল হইতে পেশাগুলি "শ্রেণী" নামে গিল্ড প্রতিষ্ঠানে সংঘবদ্ধ হইয়াছিল এবং সাহিত্য হইতে ইহাও অবগত হওয়া যায় যে, প্রাচীন ইউরোপীয় গিল্ডের ন্যায় প্রত্যেক শ্রেণীর একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিল। তাহা পরে শ্রেণীর পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া গণ্য হয়, যথা: চিত্রগুপ্ত, ধন্বন্তরী, বিশ্বকর্ম্মা ইত্যাদি। পরে, দশম ও একাদশ খৃষ্টীয় শতকের সময় হইতে আমরা শ্রেণীগুলি বংশগত জাতিতে বিবর্ত্তিত হইতে দেখি। গুজরাটের চালুক্যদেবের একাদশ শতাব্দীর লিপিসমূহে (২৬) আমরা "কায়স্থান্বয়প্রসূত মহাক্ষপটলিক ঠাকুর শ্রীকুমার সুত" (৩ সংখ্যা), "কায়স্থান্বয়প্রসূত ঠাকুর সাতিকুমার সুত সোম সিহেন"

২২ EP. Ind. vol, II. no. 31.

২৩ C. I. I, vol, III. no. 16.

২৪ Ibid. no. 18.

২৫ EP, Ind. vol, 1. no 20.

২৬ Indian Antiquary vol. 6, 1877, Eleven land grants of the Chalukyas of Anahalwad.

(৫ম সংখ্যা), "কায়স্থ্যাম্বয় কাঞ্চন" (১ম সংখ্যা) প্রভৃতির পরিচয় পাই। এতদ্বারা দৃষ্ট হয় যে, এই সময়ে কায়স্থ বৃত্তি বংশগত হইয়াছে এবং কায়স্থের সন্তান কায়স্থ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। অন্যান্য পেশাগুলি কখন বংশগত হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না; কিন্তু লোকনাথের লিপি দৃষ্টে ইহা নির্দ্ধারিত হয় যে, সপ্তম শতাব্দীতেও জাতি (caste) বংশগত হয় নাই।

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা অনুমান করিতে পারি যে, বাঙ্গলায় ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় পেশাসমূহ বহুপরে বংশগত হইয়াছিল। এইজন্য পালযুগে রাজপাদোপজীবী পদসমূহ জাতিবাচী বলিয়া গণ্য করা ভুল হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ টঙ্কদাস "কায়স্থ" ছিলেন। ৺শাস্ত্রী এবং প্রাচ্য-বিদ্যার্ণব মহোদয়দ্বয় তাঁহাকে কায়স্থজাতীয় বলিয়াছেন। কিন্তু লামা তারানাথ (মাণিকের খনি দ্রষ্টব্য) বলিয়াছেন, টঙ্কদাস সম্রাট ধর্ম্মপালের "কায়স্থ বৃদ্ধ" (Chief secretary) ছিলেন। এতদ্বারা নির্দ্ধারিত হয় যে, নবম শতাব্দীতেও পেশা জাতিতে পরিণত হয় নাই। তদ্রূপ, বিখ্যাত লুইপাদও উড্ডানের (কাবুল অঞ্চল) রাজা সামন্ত শুভের 'কায়স্থ' ছিলেন। কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয় বর্ণের এক রাজবংশীয় ব্যক্তি ছিলেন (মাণিকের খনি দ্রষ্টব্য)।

গুপ্তযুগে আমরা খোদিতলিপিতে বাঙ্গলায় শ্রেণীসমূহের (guilds) আভাস পাই; বহু পরের বর্ম্মণ ও সেনদের লিপিতে "মহাগণস্থ" শব্দ পাওয়া যায়। এতদ্বারা গ্রাম বা নগর সংঘের নেতা (Head of a village or town Corporation) বলিয়া অনুমান করা হয়। 'গণ' শব্দে প্রাচীনকালের শ্রেণীসমূহের (a federation or different groups or communitees) সংঘ বুঝাইত। এইসব উল্লেখ দ্বারা স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, গুপ্তযুগের পূর্ব্বেই বাঙ্গলার পেশাসমূহ সংঘবদ্ধাবস্থায় বিবর্তিত

হইয়াছে। পরে বিবর্ত্তনের ধারায় অন্য স্থানের ন্যায় বাঙ্গলাতেও পেশা-গত শ্রেণীগুলি বংশানুক্রমিক জাতিতে পরিণত হয়। সেনযুগে এই অবস্থায় আমরা তাহাদের অবলোকন করি। বাঙ্গলার সামাজিক গ্রন্থসমূহ সেনযুগ হইতেই লিখিত হইয়াছে বলিয়া ধার্য্য করা হয়। এই সময় হইতেই আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ("ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" দ্রষ্টব্য), কায়স্থ ও অন্যান্য জাতিদের সংবাদ পাই।

বল্লালচরিতে একটা তথ্য ভালভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে যে, রাজাই (রাজশক্তি) একটা জাতি বা লোকসমষ্টির সামাজিক পদ নির্দ্দেশ করিতে পারে। বাঙ্গলার তৎকালীন সামাজিক স্তরসমূহের মর্য্যাদা সেন রাজারাই নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। সেন রাজারা বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অন্তর্গত বর্ণাশ্রমীয় রাষ্ট্র সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাষ্ট্র আজকালকার কথায় Authoritarian state ছিল। যথেচ্ছাচারী রাজা সর্ব্বোপরি, তাহার সহিত সমবায়ে সংযুক্ত একটা আমলাতন্ত্রও ছিল। পুরোহিততন্ত্রের প্রভাব অপ্রতিহত। রাজা এবং পুরোহিততন্ত্রের বিপক্ষে কাহারও দণ্ডায়মান হইবার ক্ষমতা ছিল না। রাজপুরোহিত রাজসভাসদের অন্যতম, ব্রাহ্মণ প্রধান-ধর্ম্মাধিকরণ (জজ) নামে নিযুক্ত হইতেন (সেন-লিপি দ্রষ্টব্য)। এই জন্যই সেনযুগে কৌলীন্য-প্রথা প্রবর্ত্তন, নানাজাতির উত্থান ও অবনমন প্রভৃতি কুলজীগ্রন্থে ও জনশ্রুতিতে কথিত হয়। পুনঃ, কুলজীগ্রন্থে ইহাও উল্লিখিত আছে যে, বল্লালের যথেচ্ছাচারিতার জন্য অনেকে তাহার উপর সন্তুষ্ট ছিল না, বল্লালচরিত ইহার উল্লেখ করিয়া তাহাকে গালাগালিও করিয়াছে! ইহা অনুমিত হয় যে, রাজার স্বেচ্ছাচারের সমর্থনের জন্য অর্থাৎ রাজশক্তির সহায়ক স্বরূপ 'কৌলীন্য-প্রথা' উদ্ভূত করা হয়। কিন্তু কৌলীন্য-প্রথা কবে

প্রচলিত হয় তাহার কোন নজীর নাই। বোধ হয়, পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় ইহা বাঙ্গলার সমাজে পূর্ব্ব হইতেই ছিল, তৎপরে ইহা নূতনভাবে সংগঠন করা হয়। কর্ণাটকাগত সেন-রাজবংশের বৈশিষ্ট্য ছিল, বাঙ্গলার বিগত ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি অস্বীকার করিয়া বঙ্গরাষ্ট্রকে কল্পিত বৈদিক আদর্শে পুনঃ আনয়ন করান। সেনলিপিসমূহে আমরা এইসব সংবাদ পাইঃ সামন্তসেন (?) শেষ বয়সে গঙ্গাতীরস্থিত তপোবনসমূহ পরিভ্রমণ করিতেন। এই তপোবনসমূহ যজ্ঞের ঘৃতের সুগন্ধে পরিপূর্ণ থাকিত (দেওপাড়ালিপি, ৯ শ্লোক)। বিজয়সেনের রাজত্বকালে তাঁহার দয়ায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এত ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন যে, ইহাদের স্ত্রীদিগকে নাগরিকগণের রমণীদের দ্বারা মুক্তা, মণি, রৌপ্যমুদ্রা, অলঙ্কার প্রভৃতির সহিত তুলাবিচি, শাকপত্র, দাড়িম্ববিচির পার্থক্য বুঝান হইত! (২৩ শ্লোক) তিনি যজ্ঞ করিতে কখন শ্রান্ত হইতেন না (২৪ শ্লোক)। আবার, তপোবনসমূহে মৃগশিশুরা তপোবন নারীদের স্তন্যদুগ্ধ পান করিত এবং শুক পক্ষীরা সমস্ত বেদ জানিত (দেওপাড়া-লিপি, ৯ শ্লোক)। পুনঃ, হৃতরাজ্য লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশব সেনের যজ্ঞাগ্নির ধুম চারিদিকে এমনভাবে বিকীর্ণ হইত, যেন সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া যাইত (এদিলপুর লিপি, ১৯ শ্লোক)। এতদ্বারা মনে হয় যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানকালে কালিদাস ও ভবভূতি যে তপোবন আদর্শের ওকালতি (Propaganda) করিয়াছেন ও যে সব চিত্র তাঁহাদের পুস্তকে প্রদর্শন করিয়াছেন, সেন রাজবংশ কাল ও পাত্র অস্বীকার করিয়া যেন বঙ্গে তাহা কার্য্যকরী করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গলার এইসব জাতির উদ্ভব বিষয়ে ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একটি অভিনব ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মুসলমানেরা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের "হিন্দু" অর্থাৎ ভারতীয় বলিয়া অভিহিত করিত।

মুসলমানেরা বৌদ্ধ সংঘারামসমূহ ধ্বংস করিয়া ভিক্ষুদের বিনাশ করে ও তাহাদের গ্রন্থাগার পুড়াইয়া দেয়, মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গলায় বিলুপ্ত হয়, সংঘারামের সম্পত্তিসমূহ মুসলমান বিজেতারা বাজেয়াপ্ত করিয়া নেয়। (এই সমস্তই ঐতিহাসিক সত্য। নালন্দা বিক্রমশীলা পাহাড়পুরের চতুঃপার্শ্বে কেবল মুসলমানের বাস)। এই সময়ে বৌদ্ধ নেতারা হয় নিহত হন বা বিদেশে পলায়ন করেন (তারানাথ তাঁহার ইতিহাসে মগধ হইতে এই পলাতক শ্রমণদের নামের তালিকা দিয়াছেন)। এই সুযোগে ব্রাহ্মণেরা ভারতীয় বা হিন্দু-সমাজের কর্ত্তা হইয়া বসেন। যাহারা তাহাদের পুরাদস্তুর আনুগত্য স্বীকার করিল তাহাদেরই ব্রাহ্মণেরা স্বীয় সমাজে গ্রহণ করিয়া "নবশাখা" নাম প্রদান করেন। আর যাহারা নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখিল তাহারাই "অনাচরণীয় জাতি" রূপে গণ্য হইতে লাগিল। (২৭) অন্যত্রও তিনি বলিয়াছেন, মুসলমান আক্রমণের ফলে "নেতাবিহীন বৌদ্ধ সমাজ বেওয়ারিশ মাল" হয়। বাঙ্গালীকে একদিকে ইসলাম টানিতে লাগিল, অন্যদিকে আগমবাগীশ প্রভৃতি তান্ত্রিক নেতারা এবং চৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রভৃতি গোস্বামী শিষ্যেরা আকর্ষণ করিতে লাগিল। ফলে বাঙ্গালী জাতি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। (২৮)

শাস্ত্রিজীর মতের মূল কথা এই যে, বাঙ্গলা পূর্ব্বে বৌদ্ধপ্রধান ছিল। কিন্তু (হুয়েন সাং-এর উক্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই তথ্য

২৭। Shastri—Introduction to Modern Buddhism and its followers in Orissa" by N. N. Basu.

২৮। ।সভাপতির অভিভাষণ, সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা, ১০ম সংখ্যা, ১৩৩৬।

পাইয়াছেন বলিয়া দাবী করিয়াছেন) এবং বৌদ্ধেরা হালের মুসলমান ও খৃষ্টানদের ন্যায় পৃথক সমাজ গঠন করিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধ-সাহিত্যে আমরা কোন প্রমাণ পাই না যে, বৌদ্ধ-গৃহস্থ পৃথক সমাজ সংগঠন করিয়াছিল। বরং সাহিত্য বলে যে, গৃহস্থেরা 'উপাসক' হইয়া স্বীয় সমাজেই থাকিত; এবং পালযুগের লিপিতে আমরা বৌদ্ধ রাজাদের ব্রাহ্মণগণ দ্বারা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার নিয়ামক ('বর্ণান্ প্রতিষ্ঠাপয়তা স্বধর্ম্মে'—দেবপালদেবের মুঙ্গের-লিপি), বর্ণাশ্রমের আশ্রয়স্থল (৩য় বিগ্রহপালদেবেব লিপি) বলা হইয়াছে। পুনঃ ব্রাহ্মণের যজ্ঞস্থলে শূর-পালদেব পবিত্র (শান্তি-) বারি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে (গরুড়স্তম্ভ লিপি), মদনপালদেবের পট্ট মহাদেবী চিত্র-মতিকা, বেদব্যাস-প্রোক্ত সমুদয় মহাভারত পাঠজন্য ভগবান বুদ্ধ ভট্টারককে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীবটেশ্বর স্বামী শর্ম্মণকে গ্রাম দান করিতেছেন (মনহলি লিপি)। আবার খোদিত-লিপিতে এই সংবাদও প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, পাল রাজারা ব্রাহ্মণ্যবাদীয় রাষ্ট্রকূটদের সহিত বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করিতেছে। পুনঃ কাশী ও কান্যকুব্জের রাজা জয়চন্দ্রের মহিষী বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁহার নিজের গুরুও বৌদ্ধ সাধু ছিলেন। আবার জয়চন্দ্র স্বয়ং তান্ত্রিকবৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এইসব তথ্য আমরা খোদিত-লিপিসমূহ হইতে প্রাপ্ত হই।

আমরা ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি যে, গৃহস্থ বৌদ্ধরা মনুর আইনই মানিতেন অর্থাৎ civil law উভয়েরই এক; কেবল শ্রমণদের জন্য পৃথক সংঘের আইন (ecclesiastical law) ছিল। পুনঃ, সাহিত্যে ইহাও দৃষ্ট হয় যে, লোকে একসঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় দেবতা ও বুদ্ধকে পূজা করিতেছে (কাদম্বরী দ্রষ্টব্য) এবং ব্রাহ্মণবংশীয়া এক স্ত্রীলোকের (জঃ ম) তিনপুত্র বুদ্ধ, বিষ্ণু, মহাদেব উপাসক ছিল, অথচ একত্রে ব্রাহ্মণ্য সমাজে

তাহারা বাস করিতেছে। (২৯) আবার পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণবের দল বুদ্ধকে নারায়ণের অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। পুনঃ, আমরা সাহিত্য হইতে এই সংবাদ পাই যে শাস্ত্রীজি যে সব জাতিকে হিন্দু সমাজের 'নবশাখ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, পুরাতন সংস্কৃত পুস্তকসমূহে তাহাদের 'নবশায়ক' (তীর) বলা হইয়াছে। 'শব্দকল্পদ্রুম' নামক বিখ্যাত মহাকোষে নিম্নলিখিত সংবাদ আমরা পাই ঃ "নবশায়ক ঃ (পুং) নবধা গোপাদি জাতি বিশেষঃ। নবশাক ইতি ভাষা। যথা, গোপমালী তৈলী তন্ত্রী মোদককার কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কঃ। ইতি পরাশর সংহিতা" (১ম খণ্ড, ৫০০ পৃঃ)। মুদ্রিত পরাশরস্মৃতিতে ইহার উল্লেখ নাই। বল্লালচরিতেও এই সব জাতিদের "নবশায়ক" নামে অভিহিত করিয়াছে। আসলে সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশে বাঙ্গলায় 'নবশাক' হইয়াছে। তৎপর বিভিন্ন স্মৃতি ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এই সব জাতিদের নাম বিক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। পুনঃ, আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, খোদিত-লিপিসমূহ মধ্যে এই সব জাতির মধ্যে গুটিকতকের নাম "শ্রেণী" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গলার বাহিরেও এই সব জাতি বিদ্যমান আছে। সেই জন্য আমরা ইহাদের উৎপত্তি প্রাচীন "শ্রেণী" (guild) হইতেই ধার্য্য করি। তবে সামাজিক মর্য্যাদা শ্রেণী-সংঘর্ষ (Class-conflict) ও রাজশক্তির উপর নির্ভর করে এবং বাঙ্গলার জনশ্রুতি বলে, রাজা কোন জাতিকে নামাইয়াছেন, কাহাকে উত্তোলিত করিয়াছেন। ইহাই হইতেছে হিন্দু-বাঙ্গালীর সমাজতত্ত্বের মূলতথ্য।

তৎপর শাস্ত্রীজী মুকুন্দরামের "বর্ণ-বিপ্র হয় মঠ-স্বামী" বলিয়া

২৯। S. C. Das.—Index to Sumpa Khan P. al joi's History of Buddhism in India, P. 77.

বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন, বর্ণ-বিপ্রেরা বৌদ্ধ পুরোহিত ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণদের ন্যায় বৌদ্ধদের মধ্যে "পুরোহিত" নামধেয় একটি ধর্ম্ম-যাজকশ্রেণীর কথা বৌদ্ধ-সাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বৌদ্ধ-গৃহস্থেরা বর্ণাশ্রমের মধ্যেই বাস করিত এবং প্রয়োজন হইলে সংঘারামে গিয়া পূজা করিয়া আসিত আর ভিক্ষুদের কাছ হইতে মন্ত্র বা "শীল" গ্রহণ করিয়া গৃহেই "উপাসক"রূপে বাস করিত। কাজেই ব্রাহ্মণ পুরোহিতের ন্যায় একটা বৌদ্ধ পুরোহিতশ্রেণীর অস্তিত্ব ঐতিহাসিক প্রামাণাভাব। পুনঃ "বর্ণব্রাহ্মণ" অর্থাৎ তথাকথিত অসৎ-শূদ্রদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত ভারতের সর্ব্বত্রই আছে; তাহাদেরও কি বৌদ্ধ পুরোহিত হইতে উদ্ভূত বলিয়া ধার্য্য করা হইবে? অন্যদিকে সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত "প্রেম বিলাস" নামক বৈষ্ণবসাহিত্যে উল্লিখিত হইয়াছে, বর্ণ ব্রাহ্মণেরা শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব, তাহারা অভাবে পতিত হইয়া তথাকথিত নিম্নজাতিদের পৌরহিত্য গ্রহণ করিয়াছে। তবে দুই একটি তথাকথিত জাতির কথা এই স্থলে উল্লেখযোগ্য, যথা, ডোমদের পুরোহিত যাহাদের "ডোম পণ্ডিত" বলা হয় তাহাদের কি ব্রাহ্মণ বলিয়া গণনা করা হইবে? যোগীদের (নাথধর্ম্ম) দুই একটি পুরোহিতশ্রেণীয় বংশ "শিবগোত্রীয় সামবেদী ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, (পশ্চিম বঙ্গে ইহাদের শ্রেণীগত বিশিষ্ট পুরোহিত নাই) তাঁহারা কি ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইবেন? শাস্ত্রীজী বলিয়াছেন, সিতলা প্রতিমার পূজকেরা আজকাল ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, কিন্তু আসলে ইহারা "ধর্ম্মঘোরীয়া যোগী" (৩০)। ইঁহারা কি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইবেন? আসলে যাঁহারা তথাকথিত অসৎ শূদ্রদের পৌরহিত্য করেন, তাঁহারা অনেকেই চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী পদবীযুক্ত তৎ

৩০। Sastri's Introduction to the Modern Buddhism and its followers in India, P. 17.

শ্রোত্রীয় বংশোদ্ভব। এই জন্য তাঁহাদের বৌদ্ধপুরোহিতজাত বলিয়া গণ্য করা যায় না।

শাস্ত্রীজী যে হিয়ান সাঙের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গলাকে তৎকালে বৌদ্ধপ্রধান স্থান বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন সেই লোকেরই উক্তির দোহাই দিয়া অন্যত্র বলিয়াছেন, "হিয়ান সাঙের সময় বিহারের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ কি? (৩১) পুনঃ, বাঙ্গলার সমাজের পুনর্গঠন বিষয়ে এই শেষ কথা যে, যদি ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদের "হিন্দু" করিল তাহা হইলে কে এবং কোন্ রাজার সময়ে তাহা সংঘটিত হইল? রাজশক্তি ব্যতিরেকে পৃথিবীর কোথায়ও সমাজ-বিপ্লব সাধিত হয় নাই, ভারতেও তাহার নজীর নাই। মুসলমান আধিপত্যের যুগে ইহা একেবারেই সম্ভব নহে। পুনঃ, এই পরিবর্ত্তন মগধে ও মিথিলাতে কেন সাধিত হইল না? বরং আমরা দেখি যে, পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গলায় নানা শ্রেণী ছিল, ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বঙ্গেও শ্রেণীগুলি জাতিতে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হয় এবং সেনরাজাদের নেতৃত্বে কতকগুলি জাতি নূতন মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়। শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত "History of Bengal" vol. I পুস্তকে দৃষ্ট হয় "বৃহৎ ধর্ম্মপুরাণ" ও "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ" গ্রন্থদ্বয়ে বাঙ্গলার জাতিসমূহের যে মর্য্যাদা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান কাল হইতে বিভিন্ন। প্রথমোক্ত পুরাণে অব্রাহ্মণদের ৩৬ জাতিতে বিভক্ত করিয়াছে। পুনঃ তাহাদের "শূদ্র" বলা হইয়াছে। ইহাদের উত্তম অথবা মধ্যম ও অধম বা অন্ত্যজ বলা হইয়াছে।

বল্লালসেনের সময় হইতেই বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের নূতন সমীকরণ (লেখক ইহাকে Second Social Integration বলেন) আরম্ভ হয়.

৩১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—"বঙ্গদর্শন" "ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ" ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৫, ১২৮৪ শ্রাবণ।

এবং চৈতন্য রঘুনন্দনের সময়ে তাহার সমাপ্তি হয়। এই স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, "স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যতা", "অনাচরণীয়তা" প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মূল সুদূর অতীতে নিহিত আছে। ইহা অতি প্রাচীন কৌমগত সংস্কার এবং তৎসঙ্গে শ্রেণী-স্বার্থ সম্মিলিত হইয়া ইহার বর্ত্তমানের রূপ প্রদান করিয়াছে। অব্রাহ্মণ্য ও অসংজাতি অতএব অস্পৃশ্য, এই সংস্কারের মূলে উপরোক্ত কারণসমূহ নিহিত আছে। "বৌদ্ধ" বলিয়াই পতিত এই কথা ঐতিহাসিক সত্য নহে। এই জন্যই আমরা বলিতে বাধ্য যে, শাস্ত্রীজির বাঙ্গলার সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অযৌক্তিক ও অপ্রামাণিক।

শেষে একটা কথার উল্লেখ এই স্থলে না করিলে আমাদের ব্রাহ্মণ্য-বাদীয় বাঙ্গলার ইতিহাস আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে; ইহা হইতেছে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ-ব্রাহ্মণের আগমনের প্রবাদ। ইহার মূলের সত্য আবিষ্কৃত হয় নাই, প্রবাদগুলিও পরস্পর-বিসম্বাদী। আদিশূর বলিয়া কোন রাজার নাম আবিষ্কৃত হয় নাই, যদিচ শূরবংশের অস্তিত্বের প্রমাণ শিলালিপিতে ও সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বর্ম্মণবংশীয় হরিবর্ম্মের মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট বালবালভী ভুজঙ্গের মাতা ছিলেন বন্দ্য-ঘটিয় ব্রাহ্মণ (বন্দ্যোপাধ্যায়) কন্যা (৩২ শ্লোক)। (৩২) এতদ্বারা দৃষ্ট হয় যে একাদশ শতাব্দীতে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের গাঁই-পদ্ধতি পুরোহিত-দিগের মধ্যে বিবর্ত্তিত হইয়াছিল। আর পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণেরা শ্যামল-বর্ম্মার যজ্ঞের পুরোহিতদের বংশধর বলিয়া দাবী করেন। সুতরাং এই যজ্ঞের কাহিনীর উপর রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষ পঞ্চজনের আগমনের গল্পের ভিত্তি স্থাপন করা অসম্ভব। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, "এই প্রবাদের মূলে

৩২। Inscriptions of Bengal vol. III; Bhubanessur Inscription of Bhatta Bhavadeva.

সত্য আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়; কারণ শ্যামলবর্ম্মার প্রসঙ্গে দৃষ্ট হইয়াছে যে কুলশাস্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় সত্যের উপর স্থাপিত।" (৩৩) আমরা কিন্তু ইহার ঐতিহাসিকতার কোন প্রমাণ পাই না; বরং এই প্রকারের প্রবাদ লেখক আসামে ও উড়িষ্যায় শ্রবণ করিয়াছেন; মহাকোশলেও (C. P.) এই প্রবাদ আছে। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয় বলিয়াছেন, এই প্রকারের প্রবাদ ভারতের পঞ্চ প্রদেশে প্রচলিত আছে। প্রবাদের মূলে অন্য কোন তথ্য নিহিত থাকিতে পারে। হয়ত রাজা যশোধর্ম্মণ কল্কী জয়সোয়াল মহোদয়ের মতে যশোধর্ম্মণ জীবৎদশাতেই ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাছে দেবত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার "Hindu polity" P. 165, pt.1 দ্রষ্টব্য, ইনিই বোধ হয় কল্কী অবতার রূপেব প্রতিমূর্ত্তি (prototype.) হইয়াছিলেন, বৌদ্ধদের হস্ত হইতে কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া চারিদিকে ব্রাহ্মণদের বৈদিক ধর্ম্ম প্রচাবার্থ লোক পাঠাইয়াছিলেন। তাহা হইতেই এই গল্পের সৃষ্টি হইতে পাবে। এই সঙ্গে পঞ্চ কায়স্থের কান্যকুব্জ হইতে আগমনের কথা উঠে। এই স্থলেও প্রমাণের অভাব এবং কুলুজীগ্রন্থ-সমূহে বিসম্বাদী সংবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

উপরোক্ত দুই জাতি ব্যতীত কতিপয় অন্যজাতিও পশ্চিমাগত বলিয়া দাবী করে। আসল কথা এই, প্রাচীনকাল হইতে মগধ ও মধ্যদেশ হইতে লোকে বাঙ্গলায় আসিয়া বসবাস করিতেছে; ইহারই ফলে বাঙ্গলাভাষা মগধী প্রাকৃতভাষাসম্ভূত বলিয়া গণ্য হয়; যদিচ ভাষা-তত্ত্ববিদেরা ইহার মধ্যে অনার্য্য ভাষার শব্দও পান। আর, খোদিত-লিপিসমূহে আমরা মধ্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণদের বাঙ্গলায় বসবাসের প্রমাণ পাইয়াছি। এই প্রদেশে যখন শ্রেণীসমূহ জাতিতে পরিণত

৩৩। বঙ্গের ইতিহাস—১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৪।

হইতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্রীয় রাজশক্তির সহায়তায় সমাজে স্বীয় প্রতিপত্তি অনুযায়ী মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতে লাগিল তখন নিজেদের আভিজাত্য সৃষ্টি করিবার জন্য নানা কাল্পনিক গল্পের অবতারণা করিয়া তাহা প্রবাদের রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। ইহার মধ্যে শ্রেণীস্বার্থ বিশেষ লীলা করিয়াছে। সেইজন্যই নানা বিসম্বাদী গল্পের প্রচলন। এইসব প্রবাদ বিষয়ে আমরা এইটুকু গ্রহণ করিতে পারি—ইতিহাসে যখন দৃষ্ট হইতেছে পালবংশের পরের রাজবংশগুলি বিদেশাগত বলিয়া নিজেদের দাবী করেন এবং অনেক বিদেশাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাঙ্গলায় আগমনের কিংবদন্তী এইদেশে আছে তদ্বারা আমরা এই বোধগম্য করি যে, বাহির হইতে আগত লোকগুলি সমস্বার্থের সমবায়ে একটা শাসকশ্রেণীয় আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, মধ্যযুগের সর্ব্বত্রই এই প্রকারের ঘটনা হইয়াছে। মুসলমান যুগেও ইহাই ঘটিয়াছিল এবং বিদেশাগত মুসলমানেরাই ভারতে মুসলমান সমাজে কৌলীন্য পাইয়া অভিজাতবর্গের সৃষ্টি করিয়াছে। বাঙ্গলায় ইহাই ঘটিয়াছিল। এই জন্যই কর্ণাটকাগত সেনদের ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা বিদেশাগত ব্রাহ্মণদের বংশধর বলিতেন এবং তাহাদের সান্ধি-বিগ্রহিক মন্ত্রীরা কায়স্থ পদবীধারী ব্যক্তি ছিলেন, আর তাঁহাদের বংশধরেরা পরে কান্যকুব্জাগত বলিয়া বৈশিষ্ট্যের দাবী করেন, এবং তৎকালীন রাজনীতিক সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী কিংবদন্তীও সৃষ্টি করেন।

মুসলমান যুগ

অতীতের গর্ভ থেকে বাঙ্গলার সমাজ-পদ্ধতি ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইয়া পালযুগের পর থেকে কথঞ্চিৎভাবে লোকের চক্ষুগোচর হইতে থাকে। এক্ষণে, সেন রাজত্বের অবসানের পর, মধ্যযুগীয় রঙ্গমঞ্চে

রাজনীতিক পটের ঘন ঘন পরিবর্ত্তনের মধ্যে বাঙ্গলার সমাজে শ্রেণীসমূহের অবস্থা কি হইতেছিল, তাহা অনুসন্ধান ও পর্য্যালোচনা করিলে ইতিহাসে দেখা যায় যে, মুসলমান বিজয়ের পর একদল অভিজাত বিজেতৃবর্গের সহিত নিজেদের স্বার্থ মিলাইয়া দিয়াছিল। সেনরাজারা অবশেষে পূর্ব্ববঙ্গে নিজেদের অপসারিত করিয়া নেয়। সমগ্র ভারতে এই সময়ে যে অভিব্যক্তি হইতে লাগিল বঙ্গেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। হিন্দু অংশে রাজশক্তি ক্রমাগত বিপর্য্যস্ত হইত, ব্রাহ্মণেরা নিজেদের প্রাধান্য বাড়াইতে লাগিল, বাঙ্গলার হিন্দু রাজা দনুজমাধব তাহাদের "সমীকরণ" (৩৪) করেন। ব্রাহ্মণ্যবাদীয় হিন্দুরাজ্যে ব্রাহ্মণেরা অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু রাজবংশের শেষ রাজাকে (৩৫) তাহাদিগকে লইয়া অনেক ভুগিতে হইয়াছিল। যখন চন্দ্রদ্বীপের রাজা দনুজমর্দ্দনদেব বঙ্গজকায়স্থদের 'সমীকরণ' করেন তখন সাতাশ ঘর কায়স্থ ছাড়া বাকি সব রাজপুত। দ্বিজবাচস্পতির ভাষায় (এতদ্ভিন্নাঃ রাজপুত্রাঃ ন কায়স্থাঃ . কদাচন)। (৩৬) এতদ্বারা বুঝা যায় যে ক্ষত্রিয় বা রাজপুত্র (রাজপুত) নামধারী লোকেরা কায়স্থ সমাজে মিশিয়া গিয়াছিল। কায়স্থজাতির বংশ-তালিকা মধ্যে তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। এই ব্যাপার এখনও চলিতেছে! সেইজন্য "রাজন্যবর্গ" নামধারী ক্ষত্রিয় জাতীয় কেহ আর বঙ্গের সমাজে রহিল না (৩৭)।

৩৪-৩৫। গৌড়ের ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড।

৩৬। দনুজমর্দ্দন বিষয়ে ৺নগেন্দ্র নাথ বসু কৃত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস," "রাজন্য-খণ্ড," "বঙ্গজকায়স্থ খণ্ড" দ্রষ্টব্য।

৩৭। Fick-এর মতে 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া একটা পৃথক জাতি প্রাচীন কালে ছিল না; কতকগুলি ক্ষত্রিয় রাষ্ট্রগোষ্ঠী ছিল। এই গোষ্ঠীর

এইজন্য বাঙ্গলার রাজনীতিক ভাগ্যবিবর্ত্তনের বিপর্য্যয়ের সময়ে দেশে যখন মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের হিড়িক চলিল, তখন ব্রাহ্মণেরা স্বভাবত হিন্দুধর্ম্মের এবং তজ্জন্য হিন্দুজাতির রক্ষাকর্ত্তারূপে প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। এই সময় হইতে সমাজে ব্রাহ্মণজাতির আধিপত্য বিশেষভাবে বাড়িতে লাগিল বলিয়া অনুমিত হয়। পরে রঘুনন্দন (৩৮) যখন বিধান দিল বাঙ্গলায় কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র জাতি আছে, তখন স্বভাবতই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য বিশেষভাবে দৃঢ়মূল হয়।

অবর্ত্তমানে ক্ষত্রিয় জাতি অন্তর্ধান করে, যেমন মহারাষ্ট্র ও বাঙ্গালা প্রভৃতি স্থানে। অন্যপক্ষে চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তীকালে লিখিত "সেখ শুভোদয়া" পুস্তকে "রাজপুত্র" এবং প্রেম-বিলাসে 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রী' জাতীয় লোকদের অস্তিত্বের উল্লেখ আছে।

৩৮। রঘুনন্দনের এই বিধান বিষয়ে ৺নগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন, "পাছে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য সন্তান মস্তকোত্তলন করেন এই আশঙ্কায় স্মার্ত্ত-সমাজকল্পিত 'যম বচন' (৺পঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও বঙ্গবাণী প্রেস হইতে প্রকাশিত সঙ্কলন মধ্যে এই শ্লোক নাই) উদ্ধৃত করিয়া সকলকে জানাইয়া দিলেন—এই জঘন্য কলিতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুইটি মাত্র জাতি বিদ্যমান, ("যুগে জঘন্যে দ্বে জাতি ব্রাহ্মণশূদ্র এবতে") [বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, অনুক্রমণিকা, পৃঃ ২] কিন্তু এই 'যমসংহিতা' আদৌ প্রামাণিক পুস্তক নহে। প্রামাণিক স্মৃতি ও পুরাণসমূহে এই প্রকারের উক্তি নাই। কলিকালে কেবল আদি (ব্রাহ্মণ) ও অন্ত্য (শূদ্র) বর্ণ আছে (কলাবাদ্যন্তয়োঃস্থিতিঃ)—এই শ্লোক সম্বন্ধে শ্রীযুত বৈদ্য বলেন—তিনি অনুসন্ধান করিয়াও ইহার মূল আবিষ্কার করিতে পারেন নাই (C. V. Vaidya—History of Mediæval Hindu India. Vol. II,

পাল রাজাদের সময় হইতেই ব্যক্তিগতভাবে অনেক ব্রাহ্মণ রাষ্ট্রে উচ্চপদ পাইয়াছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যসমূহ পাঠ করিয়া ইহাই অনুমান

P 312)। বারাণসীর কমলাকর ভট্ট তাঁহার "শূদ্র কমলাকর" পুস্তকে উপরোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু কোথা হইতে তিনি উহা পাইয়াছেন তাহা না বলিয়া শুধু বলিয়াছেন, "কোন" পুরাণে (পুরাণান্তরে)! চতুর্দ্দশ শতাব্দীর নাগোজী ভট্টের "উদ্যোত" টীকার "ছায়া" রচয়িতা ষোড়শ শতাব্দীর বৈদ্যনাথ মহাদেব পায়াস্তন্তে উক্ত টীকার উপর মন্তব্য প্রকাশকালে বলিয়াছেন—"উদ্যো তকারের মতে ভাষ্য (পতঞ্জলীর) "ব্রাহ্মণ" অর্থে উপলক্ষণ দ্বারা তিন বর্ণকেই বুঝাইয়াছে; এই জন্য শ্লোকটির অর্থ এই যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের বেদ শিক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু আমরা মনে করি, এই শ্লোকে কেবল ব্রাহ্মণদিগকেই বুঝাইয়াছে। কারণ ইহা দ্বারা এই নির্দ্দেশ করিতে চায় যে "কলিযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি নাই। কলিতে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণ আছে" (C. V. Vaidya—History of Mediaeval Hindu India, Vol. II. Pp. 312—313). এই প্রকারে এই শ্লোকটি বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইতেছে, কিন্তু কেহই ইহার উৎপত্তির মূল বলিতে পারেন না! বৈদ্য বলেন, বোধ হয়, ১৩০০—১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই শ্লোক সৃষ্ট হইয়াছিল (C. V. Vaidya—History of Mediaeval Hindu India, Vol. II. P. 134)।

নাগোজি ভট্টের বংশধর পূর্ব্বোক্ত কমলাকর ভট্ট বলিতোছন, "কিন্তু ভগবত পুরাণে ৯ম স্কন্ধে কলিযুগে ক্ষত্রিয়ের অভাবেয় কথাই বলা হইতেছে, পুনঃ দ্বাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে, শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপী এবং মরু, ইক্ষাকুবংশীয় এই দুই জন মহাযোগবল-সম্পন্ন হইয়া কলাপ গ্রামে বাস

হয় যে, সাধারণতঃ কায়স্থ এবং ব্রাহ্মণ জাতীয় লোক দ্বারা আমলাতন্ত্র পরিপূর্ণ ছিল (নয়পাল দেবের লিপিতে বাজী বৈদ্যের অশ্ব-চিকিৎসক) করিবে।' "কলির শেষে এই দুইজন বাসুদেব কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আবার বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচার করিবে।" আর এক পুরাণে বলা হইয়াছে 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র এই চারি বর্ণের মধ্যে প্রথম ত্রিবর্ণ হইতেছে দ্বিজ। সকল যুগেই এইগুলি বর্ত্তমান থাকে, কেবল কলিতে প্রথম ও শেষ বর্ণ বিদ্যমান থাকে।' তাহা হইলে দ্বিজগণের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে বর্ণ-শঙ্করের কথা কি প্রকারে উঠে? এই সন্দেহ ঠিক নয়, কারণ বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে, 'কলিযুগে কতকগুলি বীজরূপে থাকে' এবং মৎস্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে 'ওই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণ যাহারা কলির শেষে বীজরূপে থাকিবে তাহারা ইহাদের সঙ্গে কৃতযুগের প্রারম্ভে মিশ্রিত হইবে।' এই দুই উক্তি দ্বারা আমাদের শ্রদ্ধেয় পিতা বলেন, কলিযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আছে যদিচ তাহারা প্রচ্ছন্নভাবে স্ব-কর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া আছে" (C. V. Vaidya—History of Mediaeval Hindu India, Vol II. P 315)

এখানেও কোন্ ধর্ম্মপুস্তকে "কলাবাদ্যন্তয়োঃস্থিতি" শ্লোক উক্ত হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করা হয়নি। কেবল কোনও স্মৃতিতে উক্ত আছে —কেবলমাত্র তাহাই বলা হইয়াছে। ইহাতেই অনুমান হয়, রঘুনন্দনের বেদে সতীদাহের সমর্থনের শ্লোকের ন্যায় এ ব্যাপারও একটা জুচ্চুরি মাত্র। এইস্থলে উল্লেখযোগ্য যে এই নাগোজী ভট্টের বংশধর গাগা ভট্ট শিবাজীকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়া বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডাদি সম্পন্ন করিয়া রাজ্যাভিষেক করেন (S. N. Sen—Siva Chhatrapati, P, 259—261; J. N. Sarkar—Sivaji and His times, Pp 271—272).

কথা উল্লেখিত আছে। (গৌড়লেখমালা ৯ সংখ্যক লিপি পৃঃ ১১০—১১১)। সেন রাজাদের সান্ধি-বিগ্রহিকদের পদবীর অনেকগুলি পদবী বর্ত্তমানের কায়স্থ জাতির মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবশ্য, এই পদবীর অনেক গুলি অন্যান্য জাতিদের মধ্যেও পাওয়া যায়। কিন্তু তৎকালীন বাতাবরণের মধ্যে এই পদবীগুলি কায়স্থ জাতীয় বলিয়াই অনুমান হয়। তবে দিব্বোকের দৃষ্টান্তে ইহাও বুঝা যায় যে কৈবর্ত্ত জাতীয় লোকও উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। সেন রাজাদের সময়ে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতীয় উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই আমলাতন্ত্র গঠনে বিশেষ ভাগ গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কায়স্থ শ্রেণী ও ব্রাহ্মণেরা (৩৯) পালরাজাদের সময় হইতে গৌড়ের মুসলমান রাজাদের সময় পর্য্যন্ত রাজসরকারে চাকুরী করিত। সেন যুগে কায়স্থবংশীয়দের রাজকর্ম্মে দৃষ্ট হয়। এইজন্য মুসলমান রাজত্বের সময়ে কায়স্থ ও গৌড়ের সন্নিকট বলিয়া বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বিশেষভাবে গৌড়ের দরবারের প্রসাদভোগী ছিল। রাজন্য

৩৯। 'কায়স্থ' ও 'বৈদ্য', শব্দ তখন জাতিবাচক ছিল কি পদবাচক ছিল তাহা বিচার্য্য বিষয়ই উপরে উক্ত হইয়াছে। টঙ্কদাস রাজার "বৃদ্ধ কায়স্থ" ছিল (Mystic Tales of Lama Taranatha, P. 43); কিন্তু এই কর্ম্মচারীর পদ দ্বারা তাহার জাতি (caste) বুঝা যায় না। অনেক বৌদ্ধ সাধুর নামের শেষে 'গুপ্ত' শব্দটি পাওয়া যায়; যথা—ততাকর গুপ্ত, বুদ্ধনাথ গুপ্ত অভ্যয়ঙ্কর গুপ্ত, শুভকর গুপ্ত ইত্যাদি (Mystic Tales of Lama Taranatha পুস্তক দ্রষ্টব্য)। এই সম্পর্কে ৺শাস্ত্রীর Introduction to Buddhism in Orissa দ্রষ্টব্য)। ইহাতে বাঙ্গালার বৈদ্যজাতির উৎপত্তি বিষয়ে তিনি একটা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

বলিয়া পৃথক একটি জাতির অভাবে এবং প্রাচীন সামন্তদের দল মুসলমানযুগে বিনাশপ্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যজাতীয় লোক দ্বারাই বাঙ্গলার হিন্দুসমাজের সাধারণতঃ উচ্চজাতি গঠিত হয় বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার মধ্যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা গৌড়ের সুলতানদের স্বার্থের সহিত বিশেষভাবে নিজেদের মিশাইয়া দিয়াছিল। তজ্জন্য বেশীর ভাগ হিন্দু জমিদার এই দুই জাতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিল। গৌড়ের সিংহাসনের অধীনে চাকুরী করিয়া ইহারা এত সুবিধা করিয়া নিতে পারিয়াছিল বলিয়াই স্বাধীন রাজা গণেশ (৪০) এবং একটাকীয়ার জমিদারদের ও জমিদার কংস নারায়ণের এবং ভুঁইঞারাজদের উদয় সম্ভব হইয়াছিল।

এই সময়ের হিন্দু আভিজাতদের মধ্যে কেহ কেহ মুসলমানের স্বার্থের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছিল। অনেকে রাজা গণেশের পুত্র যদু (জেলালুদ্দীন) এবং কালাচাঁদ ওরফে রাজু ওরফে মহম্মদ ফারমুলী ওরফে কালাপাহাড়ের ন্যায় মুসলমান হইয়া বিজেতৃবর্গের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল, অথবা দনুজ- মর্দ্দন ও মহেন্দ্রের (৪১) ন্যায় নিজের নামে টাকা চালাইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া হিন্দু-স্বাধীনতা প্রয়াসের প্রতীক হইয়াছিল।

৪০। পূর্ব্বে রাজা গণেশকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলা হইত। এক্ষণে একদল ঐতিহাসিক তাঁহাকে উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ দত্ত খানবংশীয় বলিয়াছেন। এই বিষয়ে বহু বাদানুবাদ আছে। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শেষোক্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন। কংশনারায়ণ একটাকীয়ার জমিদার বংশের (কেহবা তাহাকে তাহপুরের বলেন) ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন।

৪১। এই দুই রাজার সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ ঐতিহাসিকেরা এখনও পান নাই ; তবে ইহাদের নামাঙ্কিত অনেক মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাঙ্গলার আভিজাতেরাও অখণ্ড জাতীয়তাভাব বিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই—একজাতীয়তাবাদ তখন ভারতে অজ্ঞাত ছিল। ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন জমিদার স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল।

অতঃপর দেখা গেল, মোগল আক্রমণের সময় বাঙ্গালার সমস্ত জমিদারেরা কায়স্থজাতীয় (ইহা "আইন-আকবরীতে" উক্ত আছে)। কায়স্থেরা পাল রাজাদের আমল হইতে পাঠান সুলতানদের সময় পর্য্যন্ত আমলাতন্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়া নিজেদের প্রতিপত্তিশালী করিয়া তোলে ; তজ্জন্য বাঙ্গলায় কায়স্থদের সামাজিক স্থান ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কায়স্থদের হইতে পৃথক (৪২) ! ইহার অর্থ, আর্থিক প্রতিপত্তি পাইয়া বাঙ্গলার কায়স্থেরা শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া সমাজের উচ্চস্তবে আরূঢ় হইয়াছে।

এই সময়ে বাঙ্গলার হিন্দু বার-ভূঁইঞার বেশীর ভাগ লোক কায়স্থ ; তাহারা পাঠনদের সহিত মিলিত হইয়া অথবা একাকীই স্বাধীনতার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। আর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা গৌড়ের সুলতানদের স্বার্থের সহিত একীভূত হইয়াছিল—একথা ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই পাঠান এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সম্মেলনকে (৪৩) ভাঙ্গিয়া

৪২। কবিকঙ্কণের "চণ্ডী" কাব্যে কালকেতুর মুখ দিয়া কবি কায়স্থকে রাজপুতাপেক্ষা বড় বলিয়াছেন :

"হোয়ে তুই রাজপুত বলিস্ কায়স্থ সুত
নীচ হয়ে উচ্চ অভিলাষ।"

অথচ এই পুস্তক কবি বাঙ্গলার তদানীন্তন গভর্ণর মানসিংহকে উৎসর্গ করিয়াছেন।

৪৩। প্রতাপাদিত্যের পিতা শ্রীহরিকে 'আইন আকবরী'তে, "The other self of Daud Khan" বলা হইয়াছে।

মোগলদের বাঙ্গলা জয় করা বড় শক্ত হইয়াছিল। সেইজন্য মানসিংহ এই দুইটি হিন্দুজাতির শক্তি বিনষ্ট করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টান্বিত হন। তিনি বাঙ্গলার শ্রেণীসংঘর্ষের মধ্যে ইন্ধন দিয়া নূতন শ্রেণী সৃষ্টি করিয়া পুরাতন শ্রেণীগুলিকে ভাঙ্গিবার জন্য চেষ্টা করেন।

বাঙ্গলার মুসলমান ও হিন্দু অভিজাতদের সমস্বার্থজনিত একতাভঙ্গ করিবার জন্য মোগল শাসকেরা মোগল জাতীয় লোকদের জায়গীর দিয়া একটি নূতন মুসলমান অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করে। পরে মানসিংহ বাঙ্গলার বাহির হইতে হিন্দু আনয়ন করিয়া তাহাদের জমিদারী প্রদান করে এবং পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের জমিদারী দান, ব্রহ্মোত্তর জমি দান প্রভৃতি দ্বারা বিশেষভাবে আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়া এই একতা ভঙ্গ করেন (৪৪)। এতদ্বারা তিনি মোগলের পক্ষপাতী একটি হিন্দু অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করেন। বাঙ্গলার বর্ত্তমান হিন্দু অভিজাতদের মধ্যে অনেক বংশই মানসিংহের অনুকম্পায় উন্নীত হইয়াছে এবং এই অনুগ্রহ লাভের জন্য রাঢ়ী ব্রাহ্মণেরা মানসিংহের এত স্তুতিগান করিয়াছিল (৪৫)। ইহারা ভুলিয়া গেল, মানসিংহ বিদেশী ও বিধর্ম্মী মোগলের চাকর এবং কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্য স্বদেশীয় ও স্বধর্ম্মীয় ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, প্রতাপাদিত্যের পতনের মূলে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদের দ্বন্দ্ব ছিল। প্রবাদ আছে, প্রতাপাদিত্যের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিয়া রাজ্যাভিষেকের জন্য ব্রাহ্মণেরা চটে। এমন কি, পরে তাহার ভৃত্য ব্রাহ্মণেরাও তাহার বিপক্ষ দলে গিয়া জুটিয়াছিল! উদাহরণতঃ—"বুঝিয়া অহিত গুরু পুরোহিত মিলে মানসিংহ সনে" (অন্নদামঙ্গল)। পুনঃ কেদার

৪৪। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মেলনের অভিভাষণ।

৪৫। "মধ্যযুগে বাঙ্গলা" দ্রষ্টব্য।

রায়ের শত্রুতা করিবার জন্য যথেষ্ট ব্রাহ্মণ ছিল, এমন কি, বিধবা সোনামণিকে (৪৬) ঈশাখাঁর হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য ষড়যন্ত্রকারী ছিল জনৈক ব্রাহ্মণ, আর চাঁদ রায় জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে নিহত হয়। অন্যদিকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ অভিজাতদের মধ্যে কেহ কেহ মোগল সেনাপতির হস্তে নিগৃহীত হন: "পাঠানদের সাহায্যকারী বলিয়া রাজা টোডরমল ইহাদেব (একটাকীয়া ভাদুড়িদের) বিষয়ের অধিকাংশ বাজেয়াপ্ত করিয়া লন" (৪৭)।

এইরূপে হিন্দু ও পাঠান অভিজাতদের একতাভঙ্গ করিয়া বাঙ্গলায় মোগলেরা নূতন অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করে। মোগল আমলের পর হইতে বাঙ্গলায় কায়স্থদের সে প্রতাপ ইতিহাসে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। মোগলযুগে আমরা বড় বড় ব্রাহ্মণ ও পশ্চিমাগত হিন্দু জমিদারদের দেখিতে পাই। এই সময় হইতে বাঙ্গলার জমিদারদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

মোগলযুগে সীতারাম ও উদিত নারায়ণের বিদ্রোহ হইয়াছিল। কিন্তু

৪৬। ইশা খাঁ কর্ত্তৃক 'সোনামণি হরণ' কুহেলিকাপূর্ণ। ময়মনসিংহ গীতিকায় অন্য কথা আছে। আবার মুসলমান লিখিত তৎকালীন ইতিহাসসমূহে কেদার রায়ের সঙ্গে ইশা খাঁর বংশের বন্ধুত্বের উল্লেখ আছে। কেদার রায়, ইশা খাঁ এবং তাঁহার পুত্রদের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া মোগলের বিপক্ষতাচারণ করিতেন। এই বিষয়ে "Hindusthan Standard" সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ (পূজাসংখ্যা), শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দের "Isakhan Masnad—I—Ali and Raja Pratapaditya" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪৭। "গৌড়ের ইতিহাস"—২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৫।

এই দুইজনের বিদ্রোহ জাতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টা অথবা জাতীয়তা স্থাপনের প্রয়াস নয়। সত্য বটে, উদিত নারায়ণের "নবাব সরকারের অধীনতা-শৃঙ্খল ছেদনের তীব্র বাসনা জাগিয়া উঠে (৪৮); এবং সীতারাম "স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের জন্য আয়োজন করিতেছিলেন" (৪৯)। কিন্তু এইসব বিদ্রোহ বা স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন প্রচেষ্টা শ্রেণীগত বা জাতিগত চেষ্টা নহে—ইহা ব্যক্তিগত চেষ্টা; এইজন্যই এই সকল প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। এমন কি "মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম" প্রচারের তেজে শিবাজী তাঁহার স্বজাতীয়দের মধ্য হইতে যে সহানুভূতি পাইয়াছিলেন বাঙ্গলার হিন্দু ভৌমিকেরা তাহা একেবারেই পান নাই। মহারাষ্ট্র ও পঞ্জাবে স্বাধীনতাকামী হিন্দুরা যখন "মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম" ও "খালসা ধর্ম্ম" প্রচার করিতেছিলেন বাঙ্গলায় তখন বৈষ্ণবদের "সহজিয়া প্রেমধর্ম্ম" ও "কিশোরী ভজন" চলিতেছে এবং অভিজাতদের মধ্যে তান্ত্রিক "পঞ্চমকার" সাধনা চলিতেছে! শোভা সিংহের (৫০) এবং রহমৎ খাঁর

৪৮—৪৯। "বাঙ্গালার ইতিহাস—নবাবী আমল" দ্রষ্টব্য।

৫০। শোভা সিংহের বিদ্রোহকে "বাগদী বিদ্রোহ"ও বলা হয়। এই বিদ্রোহের রোমান্টিক ঘটনা হইতেছে, বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ কর্ত্তৃক রহমৎ খাঁর স্ত্রী লালবিবির অপহরণ, এবং তাহাকে বিষ্ণুপুরে স্থাপন করিয়া রাজা কর্ত্তৃক লালগড়, লালবাঁধ নির্ম্মাণ। কথিত আছে, লালবিবির গর্ভে রাজার এক পুত্র হয়, কিন্তু হিন্দুরা এই পুত্রকে হিন্দু করিয়া নেয় নাই, এবং তাহার প্ররোচনায় যখন রাজা ব্রাহ্মণদের জাতি মারিবার চেষ্টা করেন তখন রাণী পট্টমহিষীর অনুজ্ঞায় রাজা নিহত হন এবং ক্ষিপ্ত জনসাধারণ লালগড় ভাঙ্গিয়া দেয়! লালবিবি ও তাহার পুত্রের বিষয়ে জনশ্রুতি একদম নীরব! পর্য্যটকেরা এখনও এইসব

এই বিদ্রোহকেও বাঙ্গালী গণসমূহের স্বাধীনতা প্রচেষ্টা বলা যায় না। ইহা সত্য বটে, ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু-অভ্যুত্থানের চেষ্টা ভারতের সর্ব্বত্র নানা সময়ে হইয়াছে, কিন্তু বিজয়নগর সাম্রাজ্য ও শিবাজীর রাজ্য স্থাপনের পশ্চাতে সেইসব স্থানের লোকদের যে সহানুভূতি ও সাহায্য ছিল, সমগ্র উত্তর-ভারতে (মেবার ব্যতীত) তাহার অত্যন্ত অভাব ছিল।

ইংরেজ আধিপত্যের যুগ

ম্যাসিডোনীয়দের দ্বারা ভারত আক্রমণের সময় হইতে ভারতবর্ষ সুবর্ণভূমি বলিয়া ইউরোপের কৌতূহল আকর্ষণ করিত। ভারতবর্ষের বাণিজ্যকে করায়ত্ত করিবার জন্য পশ্চিমের প্রত্যেক বড় জাতিই চেষ্টা করিয়াছে। মধ্যযুগে তুর্কজাতির দ্বারা পশ্চিম-এশিয়া বিজিত হইলে ভারতীয় বাণিজ্য ইউরোপীয়দের হাত হইতে চলিয়া যায়। লেভান্ট (সিরীয় উপকূল) হইতে তুর্ক গভর্ণমেণ্টকে অত্যধিক মাশুল (শুল্ক) দিয়া ভারতীয় পণ্য কেনা ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। এই সময় হইতে তাহারা ভারতে যাইবার সিধা রাস্তা খুঁজিতেছিল। অবশেষে ইটালীয় নাবিক কলম্বাস্ স্পেনের রাজার সাহায্য গ্রহণ করিয়া ভারতের জলপথের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন; কিন্তু তাঁহার জাহাজ একটা নূতন জগতে গিয়া উপনীত হইল! এই নূতন জগতের পরে নামকরণ হয় "আমেরিকা"। শেষে পর্টুগালরাজ প্রেরিত ভাস্কোডাগামা

ধ্বংসস্তূপ বিষ্ণুপুরে দেখেন, কিন্তু কোন হিন্দু সোনামণি ও লালবিবির ঘটনায় রোমান্স দেখিতে পান না; তাঁহারা ইহার মধ্যে কেবল সাম্প্রদায়িকতাই দেখেন! এই বিষয়ে A. P. Biswas—History of Bishnupur Raj দ্রষ্টব্য।

ভারতের জলপথ খুঁজিতে গিয়া মালাবার উপকূলে পৌছায়। সেইদিন হইতে ইউরোপীয় বণিকদের সহিত ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হইল। পর্টুগিজদের অনুকরণে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকেরা ভারতে আগমন করে। তাহারা সকলে East India Company সংগঠন করিয়া ভারতে বাণিজ্য করিতে আসে। ইহাদের মধ্যে পর্টুগিজ ও ডাচেরা এই উপলক্ষে প্রাচ্যের অনেকস্থানে রাজ্য স্থাপন করে এবং সেই সকল স্থানে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করে। এই সকল ব্যাপারে সর্ব্বপ্রথম পর্টুগিজ ও স্পানীয় অগ্রণী ছিল; তাহারা উভয়েই গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক ছিল এবং পোপের আধিপত্য মানিত। এই উভয় জাতিই প্রথমে এশিয়া ও আমেরিকা লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয় এবং তজ্জন্য তাহাদের মধ্যে বিবাদ হইত। অবশেষে পোপ একটা meridian ধরিয়া উভয় জাতির আধিপত্যের জন্য ভাগাভাগী করিয়া দেয়। এই সর্ত্তের জোরে পর্টুগিজেরা ভারত ও প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জে স্বাধিকার বিস্তার করিবার জন্য প্রচেষ্টা করে। পরে হল্যাণ্ড স্বাধীন হইলে ডাচেরা ভারতে আসে। তাহারা পোপের ধর্ম্ম মানিত না; বলিয়া যেখানে ইচ্ছা গমন করিত। ইহাদের দেখাদেখি ফরাসী ও ইংরেজ জাতির বণিকেরা ভারতে আগমন করে। ক্রমে এই সকল ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়—প্রাচ্যে আধিপত্য লইয়া যুদ্ধও হয়। অবশেষে ফরাসী জাতীয় বণিকেরা উত্তর আমেরিকা ও ভারতে প্রবল হইয়া উঠে। ফরাসীরাই প্রথমে ভারতীয় লোককে ইউরোপীয় প্রণালীতে সামরিক শিক্ষা দ্বারা পল্টনে "সিপাহী" নিযুক্ত করা প্রথা সৃষ্টি করে এবং ইউরোপীয় অস্ত্র-শস্ত্রের ও সামরিক কৌশলের নিকট ভারতীয়দের পরাজয় তাহারা প্রথমই দেখায়! ফরাসীরাই প্রথমে ভারতীয় আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে; পরে ইংরেজেরা তাহার অনুসরণ করে। এমন সময় ছিল যে, ইউরোপীয়দের

মধ্যে ফরাসীদেরই ভারতে বেশী ক্ষমতাশালী হইবার আশঙ্কা ছিল। তাহারা দেশীয় রাজগণের সৈন্যদের ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়া চারিদিকে তাহাদের অধীনে দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদল গঠন করিতে লাগিল। কিন্তু ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যে সকল যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল তাহাতে ফ্রান্সের সামন্ততন্ত্রীয় শাসকবর্গ বিদেশের উপনিবেশসমূহকে সাহায্য দানের উপকারিতা উপলব্ধি না করিয়া তাহাদের উপযুক্ত সাহায্য প্রদান করে নাই। আর ইংলণ্ডে নবোত্থিত বুর্জ্জোয়াশ্রেণী বিদেশে বাণিজ্য উপলক্ষে উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল বলিয়া ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্ট আমেরিকা ও ভারতে তাহাদের স্বজাতীয়দের সাহায্য প্রদান করে। ইহার ফলে উত্তর-আমেরিকা ও ভারতবর্ষে ফরাসী আধিপত্যের অবসান হয়। ফরাসী অভিজাতশ্রেণী বিদেশে ব্যবসায়ী শ্রেণীর উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বোঝে নাই বলিয়াই ভারত ও উত্তর আমেরিকা তাহাদের হস্তচ্যুত হয়। আর ইংলণ্ডের ক্রমওয়েলের বিপ্লবের পর ব্যবসায়ী (বুর্জ্জোয়া) শ্রেণী গভর্ণমেণ্টে ঢুকিয়া বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেছিল। তাহারা ভারতে আধিপত্য স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়াছিল বলিয়াই ভারতের মানচিত্র এতদিন "লাল রং" ধারণ করিয়াছিল। ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যার ও শ্রেণী সংঘর্ষের পরিণামের ইহা একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন!

অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যকালে পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙ্গলার নবাবী মসনদ হইতে সিরাজদৌল্লাকে অপসারিত করে এবং মিরজাফরকে তৎস্থলাভিষিক্ত করিয়া ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুবে বাঙ্গলার কর্ত্তা হয়। পরে কয়েক বৎসর বাদে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর বাদশাহ সাহ আলমের নিকট ১৭৬৫ খৃঃ সুবে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার

দেওয়ানী পদ পায়। ইতিপূর্ব্বেই সৈন্যাদি সাহায্যে দেশরক্ষার ভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নবাবের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল। তৎকালীন বাঙ্গালার নবাব নজমুদ্দৌল্লাও নাকি এইসব বন্দোবস্তের পর বলিয়াছিল, "বাঁচা গেল, এখন যথেচ্ছা বাইজী রাখিয়া সুখে কালক্ষেপ করিতে পারা যাইবে" (৫১)।

এই প্রকারে অকর্ম্মণ্য ভারতীয় অভিজাতদের হাত হইতে শাসন দণ্ড গ্রহণ করিয়া ইংরেজ বুর্জ্জোয়া কোম্পানীর দল ভারতে পাকাপোক্ত হইয়া বসিল। ক্রমে ডালহৌসীর annexation policy দ্বারা ভারতের স্বাধীন, অর্দ্ধ-স্বাধীন ও করদ রাজারা উৎসাদিত হয়। অবশেষে রণজিৎ সিংহের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ইংরেজ কোম্পানী জয় করিলে ভারতবর্ষের মানচিত্র লাল রং প্রাপ্ত হয়। এই annexation policy দ্বারা ভারতীয় সামন্তশ্রেণী ভীত হয়; সামন্ত রাজারা ক্রমাগত সিংহাসনচ্যুত হইতে থাকায় তাহাদের মধ্যে বিভীষিকা উপস্থিত হয়। ইহারই ফলে, তথাকথিত "সিপাহী বিদ্রোহ" উপস্থিত হয়। এই বিদ্রোহের মূলে সিংহাসনচ্যুত হিন্দু ও মুসলমান সামন্ত রাজগণ ছিল; নিজেদের অধিকার ও ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য তাহারা নিজেদের মধ্যে একতা স্থাপন করে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেশীয় সিপাহীদের অজ্ঞতার সুবিধা ও সুযোগ গ্রহণ করিয়া "চর্ব্বি দেওয়া টোটা ব্যবহার করিতে দিয়া তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার চেষ্টা চলিতেছে" বলিয়া তাহাদের ধর্ম্মান্ধতা ক্ষেপাইয়া তোলা হয়। কিন্তু তিন বৎসর পর বিদ্রোহ নির্ব্বাপিত হয়, বিদ্রোহী সামন্ত ও জমিদারবর্গ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

এই বিদ্রোহকে জাতীয়তাবাদীরা "জাতীয় স্বাধীনতা সমর" আখ্যা প্রদান করেন। কিন্তু অযোধ্যা প্রদেশ ব্যতীত ইহা অন্যত্র জাতীয়

৫১। "বাঙ্গলার ইতিহাস—নবাবী আমল" দ্রষ্টব্য।

আকার ধারণ করে নাই। বস্তুতঃ ইহা ভারতীয় ফিউডাল অভিজাতদের ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে অজ্ঞ জনশ্রেণীকে exploit করিয়া অভিজাতশ্রেণী স্বার্থ সম্পাদন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল (৫২)। শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী যাহা ইংরেজ রাজত্বের ফলে সবে উদ্ভূত হইতেছিল তাহা এই বিদ্রোহে যোগদান করে নাই। বরং তখনকার অনেক শিক্ষিত লোক এই চেষ্টাকে পুরাতন মধ্যযুগীয় ব্যবস্থাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা বলিয়া অভিহিত করিত।

ভারতের বর্ত্তমান যুগ

ইংরেজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে ইউরোপের উনবিংশ শতাব্দীর শ্রমশিল্প-বিপ্লবের (Industrial Revolution) ঢেউ ভারতে আসে। পূর্ব্বে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিযোগিতা ও আইনের জন্য দেশীয় প্রাচীন শিল্প বাণিজ্য লুপ্ত হয় (১)। পরে ভারতের কাঁচা মালকে

৫২। প্রবাদ আছে, বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে বিদ্রোহী হিন্দু ও মুসলমান মিলিয়া বাদশাহ নির্ব্বাচন করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর মুসলমানেরা "মোগল সাম্রাজ্য আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল" বলিয়া ঘোষণা করায় রাজপুত ও শিখেরা এই ব্যাপার হইতে হটিয়া যায়, এই বিষয়ে Lord Roberts-এর Memoirs দ্রষ্টব্য; নানাসাহেবের মারাঠা দল ও যেসব অভিজাতদের ইংরেজের উপর রাগ ছিল তাহারাই এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। এই বিদ্রোহের কোন জাতীয় আদর্শ ছিল না।

১। Prithwish Chandra Roy—Poverty Problem of India.

কলের দ্বারা ব্যবহার্য্য পণ্য প্রস্তুত করিবার জন্য ইংরেজ বণিকেরা নূতন উদ্ভাবিত ইউরোপীয় কলকারখানা এই দেশে স্থাপন করিতে লাগিল। ক্রমে দেশীয় বণিকেরাও ইহার অনুকরণ করিয়া কলকারখানা স্থাপন করে। এইরূপে ভারতে শ্রমশিল্পযুগের অভ্যুদয় হয়। আজ ভারতবর্ষ শ্রম-শিল্পযুগীয় বিপ্লবের প্রথম স্তরে আছে বটে কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে (২)। অর্থনীতি বিশারদগণ বলেন, কয়লা ও লৌহ এক মূলধনীর অধীনে একস্থানে আসিলে দ্বিতীয় যুগের প্রবর্ত্তন হয়। তখন শ্রমশিল্পযুগ পূর্ণমাত্রায় প্রবর্ত্তিত হয়। ভারতে এই লক্ষণ স্থানীয় ভাবে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক্ষণে, অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি হইলে দ্বিতীয় যুগের বিকাশ হইবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক যে শাসনপদ্ধতি ও সভ্যতা এই দেশে প্রচলিত হয় তদ্দ্বারা একটি বৃহৎ মধ্যবিত্তশ্রেণী ভারতের সর্ব্বত্র উদ্ভূত হইতেছে। বাঙ্গলাতেই এই শ্রেণী সর্ব্বপ্রথম সৃষ্ট হয়। ইংরেজ সওদাগরের বেনিয়ান, দালাল, উকিল, ব্যারিষ্টার, মোক্তার, ডাক্তার, কেরাণী, শিক্ষক, সাহিত্যসেবী, সংবাদপত্রসেবী, নাট্যকার, নানা প্রকারের কারবারী লোক, জমির মধ্যবিত্তশ্রেণী বিবর্ত্তিত করে। অর্থনীতিতে এই বৃহৎ শ্রেণীকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা হয়—অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্তশ্রেণী (Upper Bourgeoisie) ও গরীব মধ্যবিত্তশ্রেণী (Petty-Bourgeoisie)

এই নবোদ্ভূত মধ্যবিত্তশ্রেণীর জগতের প্রতি ধারণা ও আদর্শ স্বভাবতই পুরাতন সামন্ততন্ত্রীয় আদর্শ হইতে পৃথক। ইহার প্রথম প্রতিনিধি ছিল রাজা রামমোহন রায়। তিনি ফরাসী বিপ্লবের দর্শনশাস্ত্রের রসে আপ্লুত ছিলেন। ফরাসী বিপ্লব ইউরোপে বুর্জ্জোয়া আদর্শকে সমূর্ত্ত করে। রামমোহন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে জন্মগ্রহণ করিয়া মধ্যবিত্তশ্রেণীর

২। Govt's. "Wheatly Commission Report" দ্রষ্টব্য।

আদর্শ প্রথমে ভারতে প্রচার করেন। ফরাসী বিপ্লবের মতকে তিনি ধর্ম্ম সংস্কারে নিয়োজিত করেন। পরে কেশবচন্দ্র সেন এই আদর্শকে বিষদ-ভাবে ভারতে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আদর্শের ভিত্তি হইতেছে ডেমো-ক্রাসি, ব্যক্তিত্ববাদ, intuitionবাদ। ইহাই ইংলণ্ডে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রচলিত বুর্জোয়া আদর্শের ভিত্তি ছিল। কেশবচন্দ্র সেই আদর্শ এই দেশে আনয়ন করিয়া এখানকার নবোদ্ভূত মধ্যবিত্তশ্রেণী মধ্যে রোপণ করেন। তখন ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গলায় একটা মধ্যবিত্তশ্রেণী বিবর্ত্তিত হইয়াছে; সেইজন্যই এই মধ্যশ্রেণীয় আদর্শ তদ্বারা গৃহীত হয়। কিন্তু কেশবচন্দ্র, রামমোহনের ন্যায় তাঁহারা বুর্জ্জোয়া আদর্শকে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার মধ্যে আবদ্ধ রাখেন। তখন মধ্যবিত্তশ্রেণী ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অনুগ্রহ পাইতেছিল, তখনও দেশীয় ও ইংরেজ বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্বভাবের উদয় হইবার হেতু উদ্ভব হয় নাই। লর্ড-কর্ণওয়ালিশ প্রতিষ্ঠিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (Permanent settlement) জন্য বাঙ্গলার জমিদারশ্রেণী গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহভোজী ছিল; আবার এই প্রথার উপর নির্ভরশীল একটি বৃহৎ মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী এই সঙ্গে উদ্ভূত হয়। এইজন্য ইহাদিগের রাজনীতিক্ষেত্রে আসিয়া ইংরেজী বুর্জ্জোয়া গভর্ণমেণ্টের সহিত দ্বন্দ্ব করিবার কোন হেতু ছিল না; বরং তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য "British Indian Association" স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু দেশীয় বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে তাহাদের মুখপাত্র-রূপে ও নেতারূপে রামগোপাল ঘোষ উদ্ভূত হন। ইনি একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন; ইনিই "জাতির" (nation) মুখপাত্র হইয়া গভর্ণমেন্টের কার্য্যের সমালোচনা করিতেন। তথাকথিত "Black Act" পাশ হইবার কালে উহার বিরুদ্ধে ইঁহার বক্তৃতা খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

কিন্তু শীঘ্র মধ্যবিত্তশ্রেণী রাজনীতিক আসরে অবতীর্ণ হয়। মধ্যবিত্ত-শ্রেণী সেকালে প্রবর্ত্তিত আধুনিক শিক্ষালাভ করিয়া চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দেখিল যে তাহারা ইংরেজ মধ্যবিত্তশ্রেণী অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, অথচ তাহাদের দেশের শাসনকার্য্যে তাহাদের কোন স্থান নাই। এই সময়ে ইংলণ্ড হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত একদল যুবক দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহাদের উপরোক্ত আকাঙ্ক্ষার ফলে ১৮৮৪ খৃঃ India League গঠিত হয় এবং পরে Indian Association কলিকাতায় স্থাপিত হয়। এই সংঘ মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় (৩)। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা ইটালীর জাতীয় বিপ্লবের নেতা ম্যাট্‌সিনির "Italia uni" (যুক্ত ইটালী) আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া "সংযুক্ত ভারত" সৃষ্টি করিবার জন্যই India League (নিখিল ভারতীয় সংঘ) প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময়ে ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য একটি সমিতির বিশেষ আয়োজন অনুভূত হয়। কাজেই "ভারতীয় সংঘও" স্থাপিত হয় (৪)। পরে ভারতের অন্যান্য স্থানে ইহার শাখা স্থাপিত হয়। মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ প্রচেষ্টার জন্য একটা আন্দোলন সৃষ্টি করিবার মূলে কেশবচন্দ্র সেনের শিষ্যগণ এবং বিভিন্ন প্রদেশের সমাজ-সংস্কারকেরা একযোগে কাজ করেন। তাহার ফলে ১৮৮৪ খৃঃ Indian National Congress সংগঠিত হয়।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতের সমস্ত প্রদেশসমূহের মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর মোড়লদের লইয়া সংগঠিত হয়। তখনকার ভারতীয় বুর্জ্জোয়াদের মনোবৃত্তি ইহাতে প্রকটিত হয়। অর্থনীতিক্ষেত্রে ভারতীয় বুর্জ্জোয়ারা

৩। Surendranath Banerjea—A Nation in Making.
৪। Ibid.

তখনও ভারতে ইংরেজ বণিকদেরপ্রতিদ্বন্দ্বী হয় নাই। এইজন্য কেবল কিছু সুবিধা (Privileges) গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাঁহারা "আবেদন ও নিবেদনের থালা" মাথায় করিয়া রাজদরবারে যাইতেন।

এই কংগ্রেস গঠনের মতলবটা প্রথমে তদানীন্তন ভাইসরয় (সম্রাটের প্রতিনিধি) লর্ড ডাফরিন হইতে আসে এবং সরকারী চাকুরী হইতে অবসরপ্রাপ্ত কতিপয় ইংরেজ ইহার প্রধান উদ্যোক্তা হন।

কিন্তু ভারতে শ্রমশিল্পের বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের সঙ্গে এবং মধবিত্ত-শ্রেণীব শিক্ষা ও অর্থনীতিক বিবর্ত্তনেব সঙ্গে রাজনীতিতে বথরা লইবার বিশেষ প্রয়োজন এই শ্রেণীর হয়। তখন ভারতীয় শ্রমশিল্পেব উপর শুল্ক থাকায় তাহা ল্যাঙ্কাসায়ারের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিতেছিল না। ভাবতীয় শ্রমশিল্প তখন ইংরজ Free-Trade ও শুল্কের চাপে পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিতেছিল না; সেইজন্য তখনকার ভারতীয় অর্থনীতিবিশাবদ (৫) ও বাজনীতিকদের দাবী উত্থিত হইতেছিল—চাই Protection, দেশীয় শিল্পকে বাঁচাইতে হইবে। এই অর্থনীতিক কারণে ভারতীয় বুর্জ্জোয়াশ্রেণী মানসিক সাহসসম্পন্ন হয়। এমন সময়ে লর্ড কার্জ্জন ১৯০৬ সালে বাঙ্গলাদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেয়। তজ্জনিত যে-বিক্ষোভ বাঙ্গলায় সৃষ্টি হয় তাহাকে রাজনীতিক্ষেত্রে কার্য্যকরী কবিবাব জন্য ইংরেজ পণ্যের বিপক্ষে boycott (বর্জ্জন) ও "স্বার্থত্যাগ করিয়া স্বদেশী গ্রহণ" করিবার প্রস্তাব কংগ্রেসে উপস্থাপিত করা হয়। বাঙ্গলা এই রাজনীতিক অস্ত্র গ্রহণ করে; কিন্তু কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনে কেবল শেষোক্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

৫। Ranade—Economics of British India; রমেশচন্দ্র দত্তের গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য।

বঙ্গভঙ্গজনিত বিক্ষোভের সময় কংগ্রেস আন্দোলনের মধ্যে "চরম-পন্থীয় দল" দেখা দেয়। এই দল পরে ভারতের সকল প্রদেশে আবির্ভূত হয়। উক্ত দল বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর চরমপন্থীয় আদর্শবাদী ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অর্থনীতিক কারণে তখন বুর্জ্জোয়ারা রাজনীতিকক্ষেত্রে সাহসী হইয়া নিজেদের দাবী বাড়াইয়াছে। এই দল সেই শ্রেণীরই মুখপাত্র হয়; ইহা "Autonomy" বা "Home Rule" (স্বায়ত্ত শাসন) রাজনীতিক আদর্শ হিসাবে ধার্য্য করে। ইহাতে প্রাচীনপন্থী নেতৃবর্গ যাহার বেশীর ভাগ জমিদার ও প্রাচীনপন্থী ধনীদের তরফদারী করিত, তাহাদের সহিত নূতন দলের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ১৯০৬ খৃঃ কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের সভাপতি বৃদ্ধ নারৌজির "Swaraj is our goal" (স্বরাজ আমাদের আদর্শ)–জাতীয় আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করাতেও উভয় দলের বিবাদ মিটে নাই। সুরাটে ১৯০১ খৃঃ কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া দুই দলে বিভক্ত হয়। অবশেষে ১৯১৭ খৃঃ কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে ভারতীয় সর্ব্ব-রাজনীতিক দলের সম্মেলন হয়। সেই সময়ে বিশ্বব্যাপী মহাসমরের চাপে ইংরজে গভর্ণমেণ্টের ভারতীয় সচিব এই যুদ্ধে ভারতের সহায়তার বিনিময়ে স্বায়ত্তশাসন মিলিবে, এই ইঙ্গিত করেন। তাহাতে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের বুর্জ্জোয়ারা প্রলুব্ধ হইয়া নিজেদের মধ্যে—কার্ল মার্ক্সের ভাষায় যাহাকে "Swindle of brotherhood" বলা হয় তাহা সংস্থাপন করে। ইহার অর্থ, হিন্দু ও মুসলমানেরা সরকারী চাকুরী ও কাউন্সিলে প্রতিনিধি সংখ্যার ভাগ- বাঁটোয়ারা নিজেদের মধ্যে ঠিক করিয়া নেয়; ইহাই Lucknow Pact। এই প্যাক্ট (যুক্তি) করিয়া হিন্দু ও মুসলমান, নরমপন্থীয় ও চরমপন্থীয় প্যান ইসলামিষ্ট ও ন্যাশনেলিষ্ট সকল প্রকারের বুর্জ্জোয়া দল "ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদাভেদ নাই" বলিয়া সম্মিলিতভাবে স্বায়ত্তশাসনের (Home Rule) দাবী করিলেন।

কিন্তু যখন Montague Reforms প্রদত্ত হইল, তখন নরমপন্থীয়, অর্থাৎ বনিয়াদী স্বার্থের বুর্জ্জোয়া দল কংগ্রেস আন্দোলন হইতে সরিয়া পড়েন। তাঁহারা মণ্টেগু সংস্কারকে গ্রহণ করিয়া নব-প্রবর্ত্তিত শাসন-ব্যবস্থায় ঢুকিয়া উহাকে কার্য্যকরী করিবার জন্য প্রয়াস পায়। আর ঠিক সেই সময়ে পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের অবসানে Treaty of Sevres দ্বারা তুর্ক-সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। ইহাতে ভারতীয় প্যান্-ইস্লামী মুসলমানের দল "খেলাফৎ" নষ্ট হয় দেখিয়া সবিশেষ শঙ্কিত ও ভীত হইয়া পড়েন। এই সময়েই আবার Amritsar massacre সংঘটিত হয়। এইসব ঘটনার যোগাযোগের ফলে ভারতে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া হিন্দু ও মুসলমান চরমপন্থিগণ "খেলাফৎ" ও "স্বরাজের" দাবী একত্রিত করিয়া পুনঃ সম্মিলিত হইয়া "ভ্রাতৃত্বের জুয়া-চুরী" স্থাপন করে। কংগ্রেসেব লাহোর অধিবেশনে গভর্ণমেণ্টের সহিত অসহযোগ কবিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সময়ে ভারতীয় রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চের পট ঘন ঘন পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। চরমপন্থীয়দের পুরাতন নেতা বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুর পর মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ কবেন। তিনি টলষ্টয় ও পুরাতন ইংরেজ Christian Socialist-দের আদর্শে অনুপ্রাণিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। এইজন্য টলষ্টয়ের অহিংসাবাদ এবং রাস্কিনের দলের কুটীর শিল্প পুনঃ প্রচলনের আদর্শ শ্রীযুক্ত গান্ধী ভারতীয় অসহযোগ আন্দোলনে প্রয়োগ করেন। এই সঙ্গে গণসমূহের ধর্ম্মান্ধতা এই আন্দোলনের সহিত সংযোজিত হয়। এই সকল ঘটনার সংযোগে ১৯২১খৃঃ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ভারতে ছয় মাসের ভিতর প্রবল আকার ধারণ করেন।

অসহযোগ আন্দোলনে বুর্জ্জোয়ার দল কংগ্রেস পরিত্যাগ করে; কেবল

এই দলের চরমপন্থীয় কয়েকজন ইহার মধ্যে থাকিয়া ইহাকে পরিচালনা করিতেন। ইহা পেটি-বুর্জ্জোয়া (গরীব মধ্যবিত্তশ্রেণী) শ্রেণীর লোকদের দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিত এবং স্বরাজ-সংগ্রামে মধ্যবিত্তশ্রেণীর হালে পানি পায় না জানিয়া গরীব :কৃষক ও শ্রমজীবীদের এই আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। ইংরেজ জাতির সহিত সর্ব্ব-প্রকারে অসহযোগ করিলেই অতি অল্পদিনের মধ্যেই স্বরাজ পাওয়া যাইবে—এই প্রলোভনটি নেতারা সাধারণকে দেখান। আর মুসলমান সাধারণকে বলা হয় যে 'সেভরেস সন্ধি'র দ্বারা পবিত্র খেলাফতের প্রতি যে অন্যায় করা হইয়াছে তাহার সংশোধনের জন্য এই আন্দোলন চরম অস্ত্র। এই প্রকারে চরমপন্থীয় বুর্জ্জোয়ারা নিরক্ষর নির্ব্বাক ভারতীয় গণশ্রেণীকে রাজনীতিতে যোগদান করিবার জন্য প্রলুব্ধ করে। গণশ্রেণীর রাজনীতিক আসরে আগমন এই প্রথম। তাহাদের exploit করিয়া নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থ উদ্ধার করাই বুর্জ্জোয়াদের ছিল উদ্দেশ্য।

অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হইয়া গেল। মতিলাল নেহেরু ও চিত্তরঞ্জন দাস "স্বরাজ্য দল" সংগঠন করেন। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের ফতোয়া নিয়া ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে গিয়া গভর্ণমেন্টের :বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা তাহাকে অচল করা। এই "স্বরাজ্য-পার্টি" খাঁটি বুর্জ্জোয়াদের দ্বারা সংগঠিত হয়। স্বরাজ্য-পার্টির আদর্শ অনুযায়ী কংগ্রেস আট কি নয় বৎসর কাজ করিতে থাকে। ইতিমধ্যে ইউরোপের শ্রমিক-আন্দোলনের ধাক্কা ভারতে আসিয়া লাগে। ১৯২১ সালে একটি Trade Union Congress (ভারতীয় শ্রমজীবী মহাসভা) ভারতে সংস্থাপিত হয়। এই প্রকারে ভারতে শ্রমজীবীদের আন্দোলনের একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতে থাকে।

কিন্তু ভারতীয় শ্রমিকদের এই নূতন আন্দোলন প্রথমে জাতীয়তাবাদী ও কংগ্রেসের নেতাদের কর্তৃত্বাধীনে থাকে। জাতীয়তাবাদী বুর্জ্জোয়ারা

শ্রমিক ও কৃষকদের তাহাদের রথে বাঁধিবার জন্য চেষ্টা করে। শ্রমজীবীদের বুর্জ্জোয়া জাতীয়তাবাদের আদর্শে পরিচালিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হয়। কিন্তু শ্রমিক-সংঘগুলি ক্রমশঃ জাতীয়তাবাদী বুর্জ্জোয়াদের আধিপত্য হইতে বাহির হইতে থাকে। শ্রমিক আন্দোলনে আবার নরমপন্থীয় ও চরমপন্থীয় এবং জাতীয়তাবাদী এই তিন দল উদ্ভূত হয়।

ইতিমধ্যে ১৯২৯ খৃঃ জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে "পূর্ণ স্বরাজ্যে"র আদর্শ গ্রহণ করা হয় এবং সেই আদর্শকে সমূর্ত্ত করিয়া তুলিবার জন্য ৺গান্ধীজী "আইন-অমান্য আন্দোলন" আরম্ভ করেন। এই আন্দোলন প্রায় এক বৎসর খুব জোরেই চলে। ইহাতে শ্রমজীবীদের আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ভারতের শ্রমিজীবীরা এই আন্দোলনে যোগদান করে নাই, কেবল গুজরাটের বারদৌলি তালুক ও বাঙ্গলার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক ও কাঁথিতে যেসব কৃষিজীবী এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল তাহাদের অর্থনীতিক দুরবস্থার সহিত আইন-অমান্য আন্দোলন সংযোজিত করিয়া গভর্ণমেণ্টের কর (tax) বন্ধ করিলে তাহা (tax) হইতে রেহাই পাইবে, এমন কি কংগ্রেস এই সংগ্রামে জয়যুক্ত হইলে তাহাদের প্রচুর সুবিধা হইবে—এই প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া সেখানকার কৃষিজীবীরা এই আইনঅমান্য আন্দোলনের সহিত তাহাদের চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ করিবার আন্দোলনও সংযোজিত করিয়া দেয়। এই কৃষিজীবীদের মধ্যে সকলে আবার কৃষকও নয়,—অনেকে জোতদার অর্থাৎ মধ্যস্বত্বভোগীও ছিল।

আবার বোম্বাইয়ে কতকগুলি বেকার শ্রমিকদের দৈনিক বেতন দিয়া বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের জন্য পিকেটিংএর কার্য্যে তথাকার জাতীয় কংগ্রেস লাগাইত। এতদ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, আইন অমান্য আন্দোলনে গণসমূহ শ্রেণী হিসাবে যোগদান করে নাই। জাতীয় কংগ্রেস গণসমূহের দাবী-

দাওয়ার কথা আদৌ গ্রাহ্য করে না। কংগ্রেসে যখনই কোন মৌলিক অধিকারের কথা উঠিয়াছে তখনই ধনী শ্রেণীদের স্বার্থ বাঁচাইয়া সেই মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই জন্যই করাচীতে গৃহীত Fundamental Rights (মৌলিক অধিকার) মধ্যে শ্রমিক ও মূলধনীর সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

করাচী অধিবেশনের সময় জাতীয় কংগ্রেস উহার নেতা গান্ধীকে ইংলণ্ডের "দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে" (Second Round Table Conference)-এ যোগদান করিয়া কংগ্রেসের দাবী উপস্থাপিত করিবার ক্ষমতা প্রদান করে। সেখানে কংগ্রেস নেতা, নরমপন্থীয় নেতৃবৃন্দ এবং মহম্মদ আলী প্রমুখ মুসলমান দল একই দাবী উপস্থিত করে। তাঁহারা সকলে Substance of Independence (স্বাধীনতার সার বস্তু) রূপ প্রতিশ্রুতি ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট হইতে চাহে। কিন্তু ভারতীয় বাণিজ্যের Safeguard (রক্ষাকবচ) কোন্‌দিকে প্রযোজ্য হইবে, এই লইয়া গান্ধীজী ও অন্যান্য বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের মতের অমিল হয়। এই অমিলের ফলে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের সহযোগিতা করা একেবারেই ব্যর্থ হয়। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর গান্ধীজী পুনঃ জেলে নিক্ষিপ্ত হন। পরে মুক্তি-লাভ করিয়া 'হরিজন' আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশনের ফলে ইংলণ্ডের প্রধান রাজ-মন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ডকর্ত্তৃক সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানকল্পে Communal Award নামে এক ঘোষণা প্রদত্ত হয়। উহাতে মুসলমানদের যেমন ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে পৃথক আসন প্রদান করা হয় তেমন হিন্দু সমাজের তথাকথিত তপশীলভুক্তদেরও পৃথক আসন দেওয়া হয়। এতদ্বারা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের স্বার্থে বিশেষ আঘাত পড়ে।

কারণ যদি সমাজের প্রায় অর্দ্ধেক অংশ তাহাদের প্রভাব ও আওতা হইতে বাহির হইয়া যায় তাহা হইলে মুষ্টিমের বুর্জ্জোয়াদের স্থান কোথায় হইবে? ইহার প্রতিকারকল্পে ‘পুনা প্যাক্ট’ হয়, তাহাতে উচ্চবর্ণের হিন্দু ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে একটা ঘরোয়া ভাগ-বাটোয়ারা নির্দ্দিষ্ট হয় এবং ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী উহা তাঁহার award মধ্যে মানিয়া লইয়াছেন।

তথাকথিত অনাচরণীয়দের রাজনীতিক্ষেত্রে পৃথকীকরণের ফলে উচ্চবর্ণের লোকদের কি সর্ব্বনাশ হইবে তাহা জাতীয়তাবাদী বুর্জ্জোয়ারা বুঝিতে পারিয়া কংগ্রেসের মূলধনী নেতারা গান্ধীজীকে তাহাদের মুখপাত্র করিয়া অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য “হরিজন আন্দোলন” আরম্ভ করেন এবং ইহা এখন (বাং ১৩৪৯ সাল) নামমাত্র আছে। কিন্তু বনিয়াদী স্বার্থের লোকেরা, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামীর মুখপাত্র “বর্ণাশ্রমীরা” ইহার বিশেষভাবে প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে ও করিতেছে। তাহারা বলিতেছে, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন আন্দোলন শাস্ত্রানুমোদিত নয়! অবশ্য এস্থলে বক্তব্য এই যে, গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনে কোন সামাজিক বা অর্থনীতিক কর্ম্মপদ্ধতি নাই, কেবল অস্পৃশ্যকে জলচল করিয়া তাহার সহিত ব্যবধান ভাঙ্গিয়া দেওয়াই হইতেছে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস আবার পুরাতন পন্থায় চলিবার উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছে। নূতন রাজনীতিক সংস্কার যাহা প্রদত্ত হইবে তাহার প্রতিকূলতাচরণ করা কংগ্রেসের কর্ম্মপদ্ধতি মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট একটি নূতন শাসন-প্রণালী প্রদান করে; তখন কংগ্রেস টালমাটাল করিয়া অবশেষে অনেক প্রদেশে শাসন-যন্ত্রটি গ্রহণ করে। শেষপর্য্যন্ত বর্ত্তমান যুদ্ধারম্ভে উহা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসে এবং পুনঃ একপ্রকারের সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালায়।

অবশেষে সাম্রাজ্যবাদীয় গভর্ণমেণ্টের সহিত কোন আপোষনামা

না হওয়ায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি তাহার ১৯৪২ খৃঃ অধিবেশনে "ভারত ছাড়" (Quit India) প্রস্তাব গ্রহণ করে। এতদ্বারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারত ত্যাগ করিবার কথাই বলা হয়। ফলে, দেশমধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। স্থানে স্থানে ইহা বিপ্লবের আকার ধারণ করে। সাতারা, বালিয়া, মেদিনীপুরে বিশেষ অভ্যুত্থান হয়। সাতারা এবং মেদিনীপুরে কংগ্রেসকর্ম্মীরা সমান্তরাল (Parallel) গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিয়া কিছুদিনের জন্য ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটায়। শেষে কিন্তু এই অভ্যুত্থান ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট নিষ্ঠুরভাবে দমন করে। কিন্তু বিদেশস্থিত বৈপ্লবিকেরা কয়েদী ভারতীয় সিপাহীদের লইয়া I.N.A. গঠন করিয়া বাহির হইতে মণিপুর আক্রমণ করেন কিন্তু জয়লাভ করিতে পারেন নাই। পুনঃ যুদ্ধের পরে ভারতীয় নৌসেনারা (Ratings) বিদ্রোহী হয়। অবশেষে যুদ্ধের পরে, ১৯৪৬ খৃঃ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট একটি ক্যাবিনেট মিশন (Cabinet mission) পাঠাইয়া একটা রাষ্ট্র গঠন প্রণালী প্রদান করিয়া কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগকে তাহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে। কিন্তু উভয় দলই তাহা অগ্রাহ্য করে। শেষে ১৯৪৭ খৃঃ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট পার্লামেণ্টে India Independence Bill (ভারতীয় স্বাধীনতা বিল) পাশ করাইয়া মুসলমান অধ্যুসিত অঞ্চলগুলি লইয়া "পাকীস্তান" এবং হিন্দু অধ্যুসিত অংশকে "হিন্দুস্থান বা ইণ্ডিয়া" নাম দিয়া বিভক্ত করিয়া উক্ত বৎসরের জুলাই মাসে ভারত হইতে চির বিদায় গ্রহণ করে। অবশ্য পার্লামেণ্ট উক্ত বিল দ্বারা ভারতের এই অংশকে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের 'Dominion'-রূপে বিবর্ত্তিত করে। কিন্তু ১৯৪৮ খৃঃ ভারতীয় "গণ-পরিষদ" (Constituent Assembly) "ইণ্ডিয়া যাহা ভারত" (India that is Bharat) রাষ্ট্রকে স্বাধীন সাধারণতন্ত্রীয় বলিয়া ঘোষণা করেন। এতদ্বারা ভারত জগত মধ্যে একটী বৃহৎ গণ-

তন্ত্রীয় রিপাবলিক বলিয়া গণ্য হইতেছে কিন্তু পাকীস্তান এখনও ব্রিটিশ "ডোমিনিয়ন" রূপে বিরাজ করিতেছে।

নানা আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জ্জাতিক কারণে বাধ্য হইয়া ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ভারত দ্বিখণ্ডীকৃত করিয়া তাহা পরিত্যাগ করে। এতদ্বারা ভারতবর্ষ বিষ্ণুপুরাণের প্রদত্ত সীমানা আর বহন করে না। মধ্যযুগের ন্যায় মুসলমান অধ্যুসিত সিন্ধুদেশ, পশ্চিম পঞ্জাব, পূর্ব্ববঙ্গ এবং উত্তর বঙ্গের কিয়দংশ, ভারত শরীবের বাহির হইয়া যাইল। এই কারণেই প্রাচীন বাহ্লিক, কপিশা, উদ্যান প্রভৃতি দেশ আজ আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান রূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছে।

ভারত স্বাধীনপ্রাপ্ত হইয়া তাহার গণ-পরিষদ দ্বারা যেমন ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ সাধারণতন্ত্রী (Secular Democratic State) প্রতিষ্ঠা করে সেই সঙ্গে জাতিধর্ম্ম, গাত্রবর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে: সকলকে সমান ভোটাধিকার দিয়া সর্ব্ব নাগরিককে রাষ্ট্রে রাজনীতিক, অর্থনীতিক এবং সামাজিকক্ষেত্রে সমানাধিকার প্রদান করিয়াছে (Preamble দ্রষ্টব্য)। এতদ্বারা অস্পৃশ্যতা, বর্ণভেদ, জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ রাষ্ট্রদ্বারা স্বীকৃত হয় নাই। ভারতীয় সমাজের ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তনের বীজ ইহাতে নিহিত আছে।

পুনঃ, স্বাধীন ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট একটা অঘটন ঘটন রাজনীতিক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। অর্দ্ধ স্বাধীন, করদ প্রভৃতি দেশজ রাজ্য-গুলিকে আইন দ্বারা (Instrument of accession) ভারত গভর্ণমেণ্ট স্বীয় অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। আজ সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যগুলি আর নাই। মধ্যযুগীয় "সূর্য্যবংশীয়", "চন্দ্রবংশীয়" রাজ্যগুলির অবসান হইয়াছে। একটা নীরব বিপ্লব দ্বারা ভারত আজ এক এবং অবিভাজ্য কেন্দ্রীভূত "একরাষ্ট্র" রূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছে।

ভারতের সামাজিক ইতিহাসের জের টানিবার জন্যই আমরা বর্ত্তমানের রাজনীতিক অবস্থার বর্ণনা করিলাম। ভারতের এই রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের ফল বর্ণাশ্রমীয় সমাজ-শরীরে কি প্রকারে প্রতিফলিত হইবে তাহা আজ কয়জন হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন!

অদ্যকার স্বাধীন ভারতীয় (Democratic Republic), সেই বৈদিক যুগের অর্দ্ধ-সামরিক অর্দ্ধ-ধর্ম্ম ভাবান্বীয় রাষ্ট্র নহে; মধ্যযুগীয় বর্ণাশ্রম ভিত্তিস্থাপিত রাষ্ট্রও নহে। বর্ত্তমানের ভারত বর্ণ, জাতি, ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সাধারণ সম্পত্তি (Commonwealth)। এই রাষ্ট্রে সকলের সমান অধিকার। আজ রাষ্ট্র হইতে সামন্ততান্ত্রিক সমস্ত চিহ্নই অপসারিত হইতেছে। ভারত আজ বুর্জ্জোয়া ডেমোক্রাসী বিবর্ত্তিত করিতেছে। স্বভাবতই ইহা সামন্ততান্ত্রিক বর্ণাশ্রমীয় সমাজ-পদ্ধতির পরিপন্থী। অশোক ও আকবরের পর এক্ষণে ভারত-রাষ্ট্রেও তজ্জনিত সমাজ-শরীরে নূতন পরীক্ষা চলিতেছে। ভারত আজ "সনাতনপন্থীয়" নাই। আজ পরিবর্ত্তনশীল এবং প্রাচীন বৈদিক ঋষির কথায় বলিতেছে, "চটরবেতি" (আগে চল)। নূতন পরিস্থিতি দ্বারা আভিভূত হইয়া ভারতীয় সমাজ-শরীর কি পদ্ধতি গ্রহণ করিবে তাহা ভবিষ্যতের ডায়ালেকটিক্সের উপর নির্ভর করে।

ভারতীয় সমাজতত্ত্বের এই দীর্ঘ আলোচনা হইতে আমরা দেখি যে ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ বিশেষ; প্রত্যেক প্রদেশ নিজ নিজ ইতিহাস অভিব্যক্ত করিয়াছে। ইহা সুদীর্ঘ ও নানা ঘটনাবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। এইজন্য এই ইতিহাসে সামাজিক পদ্ধতির বিবর্ত্তন এবং তন্মধ্যস্থিত স্তরভেদ বা শ্রেণীসমূহের উৎপত্তি ও তাহাদের বিবর্ত্তনের অনুসরণ করিতে গিয়া আমরা উপস্থিত সময় পর্য্যন্ত উপনীত হইলাম। দুই চার কথায় এই ঘটনা-বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিহাসের গোটাকতক মূলকথার পুনরাবৃত্তি

করিয়া দেখা যায়—বৈদিক আর্য্যজাতি বিভিন্ন কৌমে বিভক্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপ প্রতিষ্ঠান উদ্ভূত হইয়াছিল এবং এতৎসঙ্গে শ্রেণীসমূহ বিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এতদ্বারা সমাজ সমান্তরাল (parallel) ভাবে বিভক্ত হয়। কৌমগত রাষ্ট্রগুলি পরে ভাঙ্গিয়া সাম্রাজ্যে সংগঠিত হইয়াছিল এবং তৎসঙ্গে ভারত একজাতীয়তা প্রাপ্ত হয়। পরে পেশাগত ব্যবসায়ী সংঘগুলি বিবর্ত্তিত হয়। প্রত্যেক সংঘের একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিল, যখন সেই সংঘগুলি পরে জাতিতে (castes) পরিণত হয় তখন সেই দেবতারাই অনেকস্থলে সেই জাতির আদিপুরুষ বলিয়া গণ্য হয়। এতদ্বারা সমাজ পুনঃ vertical ভাবে বিভক্ত হয়। পূর্ব্বেকার শ্রেণীগুলি এখন সামাজিক জাতিতে পরিণত হয়, কিন্তু তন্মধ্যে অর্থনীতিক স্তর বা শ্রেণীভেদ রহিল।

ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার মধ্যেই সামন্ততন্ত্রীয় বীজ রোপিত হয়। সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীসমূহ পৃথক হয় এবং খাদ্যাখাদ্যের বিচার দৃঢ়ীভুত হয়; অতঃপর শ্রেণীগুলি জাতিতে পরিবর্ত্তিত হইলে বিবাহাদি ও পরস্পরের সহিত আহার-বিহারাদি বন্ধ হয়। ইহার পর, সামন্ততন্ত্রীয় মধ্যযুগ পরিপূর্ণমাত্রায় বিবর্ত্তিত হইলে জাতিভেদ বিবাহাদি সম্পর্কিত বিধিনিষেধ আরও কড়াকড়ি হয়। তখন প্রদেশে প্রদেশে একই জাতিমধ্যে বিবাহ ও খাওয়া বন্ধ হয়। এই খাওয়া ও বিবাহাদি বন্ধ হওয়ার ব্যাপারগুলি, Taboo, Purification প্রভৃতি প্রথা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে; ইহাই এক্ষণে আচার রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। বর্ত্তমান সময়ে মহেন-জো দাড়োতে আবিষ্কৃত দ্রব্যসমূহের মধ্যে totem চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ভারতের তথাকথিত বহু "আদিম" বা "অনার্য্য" জাতিদের মধ্যে Totem ও Taboo প্রথা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; (৬)।

৬। প্রাচীনকালের ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে Taboo,

সামন্ততন্ত্রীয় যুগের মধ্যকালে মুসলমান আক্রমণ হয়। তাহারা সামন্ততান্ত্রিক প্রথা আরও চালায়; মোগল-কেন্দ্রীভূত গভর্ণমেন্ট তাহা সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করিতে পারে নাই। এইসব সময়ে পতিত ও গণশ্রেণীর লোকেরা ধর্ম্মের মধ্য দিয়া নিজেদের উদ্ধারের চেষ্টা দেখিত। পরে ইংরেজ যুগে অর্থনীতিক বিপ্লব উপস্থিত হয়—পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন সৃষ্টি হইতে থাকে। বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যায় ইংরেজ গভর্ণমেন্ট জমিদারী বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তন করে। ভূমিবিলি পদ্ধতি বিষয়ে দেখা যায় ভারতে জমিদারী ও রায়তারী প্রথা বিদ্যমান আছে। পঞ্জাবে জমিদারী, ভাইয়াচারী, পট্টিদারী প্রথা উদ্ভূত হইয়াছে। অনেকের মতে, ইহা প্রাচীন কৌমগত কম্যুনিজম্ ভাঙ্গিয়া পরে বিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু কৌমগত ভূমিবিলি প্রথা সংস্কৃত কোন পুস্তকে লিখিত নাই। মেইনের উক্তি এই যে, উহা প্রাচীন ভারতীয় প্রথা; কিন্তু বেডেন-পাওয়েল তাহা অসত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

দক্ষিণে আবিষ্কৃত লেখমালায় দৃষ্ট হয় ভূমি রাজার ছিল, আর তথায় রাজার অধীন 'গ্রাম্যসভা' গ্রামের ভূমির উপর কর্ত্তৃক করিত। অন্যপক্ষে যাজ্ঞবল্ক্যে পৈতৃক ভূমিতে পিতাপুত্রে সমানাধিকার রূপ মত বৈদেশিক শক প্রভৃতি হইতে গৃহীত হওয়া সম্ভব। ইহা আর্য্যের নহে।

এখন ইংরেজ প্রবর্ত্তিত নূতন অর্থনীতিক বিপ্লবের ফলে মধ্যবিত্তশ্রেণী উদ্ভূত হইয়াছে; আর সেই সঙ্গে শ্রমজীবী শ্রেণীও সৃষ্টি হইয়াছে। পাশ্চাত্য

Purification, শ্রেণীভেদ, শ্রেণীর বাহিরে বিবাহের নিষেধ প্রভৃতি প্রথার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। প্রাচীন ঈজিপ্ট, ব্যাবিলন এবং প্যালেষ্টাইনেও ছুঁৎছাঁৎ এবং খাদ্যাখাদ্যের কড়া নিয়ম ছিল।

দেশসমূহের ন্যায় গ্রামের জমিশূন্য কৃষকের পুত্র "সর্ব্বহারা" হইয়া শহরের কলকারখানার "শ্রমিক" হইতেছে। এইরূপে শ্রমিকশ্রেণী বল-পুষ্টি করিতেছে।

কিন্তু ভারতের যেই যেই স্থলে "জমিদারী প্রথা" আছে সেখানে Land Capitalism থাকায় শ্রমশিল্প সমৃদ্ধশালী হইতে পারিতেছে না। পক্ষান্তরে ভারতব্যাপী একটি কৃষক-আন্দোলন সৃষ্ট হইয়াছে। ভারতে এক্ষণে জমিদারী প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা "কৃষিজমিতে কৃষকের অধিকার চাই"—এই দাবী করিতেছে।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা শূদ্রাইরাউ (শূদ্র ও বৈশ্য) সৃষ্টি করিয়াছিল; কিন্তু রাজন্য ও পুরোহিত শ্রেণীদ্বয় তাহাদের শোষণ করিত ও দাবাইয়া রাখিত। আজ নূতন যুগে তাহারা জাগ্রত হইতেছে, এবং নূতন আকারে নিজেদের প্রকট করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

ভারত এক্ষণে সভ্যতার একটি সন্ধিক্ষণে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। ভার. পু.াতন সামন্ততন্ত্রীয় সভ্যতা ভাঙ্গিয়া শ্রমশিল্পজাত বুর্জ্জোয়া-ডেমো ; ক্রাটিক সভ্যতার স্তরে প্রবেশ করিয়াছে।

কিন্তু নানা কারণ বশতঃ অর্থনীতিক পরিবর্ত্তন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে না, এইজন্য ভারতীয় সমাজও নূতন আকার ধারণ করিতে পারিতেছে না, কিন্তু যেইটুকু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে তদ্বারা জগতের অন্যান্য স্থানের বর্ত্তমান সভ্যতাপ্রাপ্ত সমাজের সমস্যাগুলিও ক্রমশঃ এই দেশে প্রকাশ পাইতেছে।

আমরা এই আলোচনায় ইহা লক্ষ্য করি যে, ভারতবর্ষ এক ও অবিভাজ্য (one and indivisible); এবং সৃষ্টিছাড়াভাবে জগতে অভিব্যক্ত হয় নাই। প্রাচীনকালে অন্যান্য দেশে যে প্রকারের বিবর্ত্তন হইয়াছিল, প্রাচীন ভারতের তাহাই হইয়াছিল। অস্পৃশ্যতা, শ্রেণীভেদ,

গ্রন্থকার-প্রণীত

১।	ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম	...	৩৲
২।	ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি (১ম)	...	২॥৹
৩।	" (২য়)	...	৫৲
৪।	" (২য় পরিশিষ্ট)	...	১৲
৫।	" (৩য়)	...	২॥৹
৬।	ভারতেব একজাতীয়তা-সমস্যা	...	॥৹
*৭।	যুগ-সমস্যা ...	...	
*৮।	জাতি সংঘটন ...	...	
*৯।	তরুণেব অভিযান ...	...	
*১০।	আমেরিকাব অভিজ্ঞতা (২ খণ্ডে সম্পূর্ণ)		
১১।	যৌবনের সাধনা	...	
১৩।	বৈষ্ণবসাহিত্যে সমাজ-তত্ত্ব	...	১৸৹
১২।	সাহিত্যে প্রগতি	...	৩॥৹
*১৪।	Stndies in Indian Social polity		৫৲
১৫।	Daiulectics of Hind Ritualism.		4-0-
১৬।	Dialectics of Land Economics of India.		6-8-0
১৭।	Mystic Tales of Lama Taranatha		4 0-
*১৮।	Vivekananada—Thc Socialist		
১৯।	অপ্রকাশিত বাজনৈতিক ইতিহাস		৪॥৹

* তারকা-চিহ্নিত গ্রন্থগুলি ছাপা নেই।